চি র প থে র স ঙ্গী

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত 'সম্মাননা সংকলন'

চিরপথের সঙ্গী

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত 'সম্মাননা সংকলন'

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
সনৎকুমার মিত্র • দিলীপকুমার নন্দী
সম্পাদিত

প রি বে শ ক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশ : ১৪ জুলাই ২০০০

প্রকাশক : শ্রীসনৎকুমার মিত্র
৬০ জেমস লঙ্ সরণি
বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৪

সম্পাদকমণ্ডলী :
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, সনৎকুমার মিত্র, দিলীপকুমার নন্দী, মীনাক্ষী সিংহ
চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপকুমার সোম
এবং বীথি চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : সায়ম ঘোষ

মুদ্রণ : দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
Message : Professor Ramaranjan Mukherji ১

প্রথম পর্ব

মননচর্চার বিবিধ ধারা

ক. কথাসাহিত্য :

সত্তার নিঃসঙ্গতা স্মৃতিচেতনা ও সময় : প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-ছোটগল্প ৫
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

বাংলা ছোটগল্পের নতুন মাত্রা [১৩০০-১৩৫০] ৯
কার্তিক লাহিড়ী

Body Language : নির্বাচিত কয়েকটি বঙ্কিম-উপন্যাস পাঠ ১৭
সনৎকুমার মিত্র

বঙ্কিম-চর্চার পরম্পরা... ২৪
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসে নতুন ভাবনা : উনিশ-বিশ শতকের আলোকে ২৮
সমরেশ মজুমদার

'হরিজন উন্নয়ন কথা' ৩৭
ছন্দা রায়

অশ্বমেধের ঘোড়া : আত্মগত মূল্যায়ন অথবা অপটু পাঠ ৫১
হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচর্চার ধারা : মোহিতলালের অবদান ৬০
সুদীপকুমার বসু

খ. কাব্য-কবিতা

কবিতার শব্দরূপ নিয়ে ৮৬
করুণাসিন্ধু দাস

সুকুমার রায় : একশ বছর পরের উদ্দেশে ৯৪
কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাণী বিচার ১০০
সুরেন মুখোপাধ্যায়

গ. নাটক-চিত্রনাট্য

মহাজ্ঞানের সন্ধানে : বাংলাদেশের একটি নাটক ১০৬
পল্লব সেনগুপ্ত

উৎপল দত্তের পথনাটক ১১৪
দর্শন চৌধুরী

প্লে-রাইট শেকস্‌পীয়ার : 'কালের রাখাল' ১৩১
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : চিত্রে নাট্য, নাট্যের চিত্র ১৩৮
ধীমান দাশগুপ্ত

ঘ. মধ্যযুগের সাহিত্য : নতুন ভাবনা

শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : সঙ্ঘাত ও সমন্বয় ১৪৯
কাননবিহারী গোস্বামী

গৌড়ীয় ও অসমীয় বৈষ্ণব পদাবলী : তুলনার নিরীখে ১৫৭
সত্য গিরি

বাংলা মঙ্গলকাব্য : অন্তর্লীন গঠনগত রূপকল্প ১৭৭
সনৎকুমার নস্কর

উমাপতি উপাধ্যায় : বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারের অভিজ্ঞানে ১৯৮
সত্যবতী গিরি

ঙ. ভাষা-ভাবনা

এখন আমাদের কোন্ ভাষাতত্ত্ব চাই ২১২
নির্মল দাস

বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ২১৬
অনিমেষকান্তি পাল

চ. তত্ত্ব ও সাধনা

বিশ শতকে মননচর্চা ২৩০
অলোক রায়

উত্তর-আধুনিকতা : আর্থসামাজিক উৎসের সন্ধানে ২৪১
পবিত্র সরকার

অন্বিত সম্পর্কে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য ২৬৪
বিমল মুখোপাধ্যায়

তখন বাঙালি ২৭০
শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

'চলাটা আমার নিজের, তাই কিছু স্বাতন্ত্র্য...' ২৭৭
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

লেখার ভিতর দিয়ে যখন দেখি ২৮৫
সন্দীপকুমার সোম

দ্বিতীয় পর্ব

অন্তরঙ্গ সাহচর্য

ক্ষেত্র গুপ্ত : আমার কথা ২৮৯
মমতাজউদ্দীন আহমদ

হৃদয়ে তাঁর বাংলাদেশও ২৯১
সৌমিত্র শেখর

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ক্ষেত্রদার সঙ্গে ২৯৪
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মাষ্টারমশাই সমীপেষু ২৯৭
তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অনন্য শিক্ষক ২৯৯
মীনাক্ষী সিংহ

একজন বর্ণময় শিক্ষকের সান্নিধ্যে ৩০১
দিব্যজ্যোতি মজুমদার

লোকসংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ৩০৪
বরুণকুমার চক্রবর্তী

যে যা খুশি বলতে পারে, আমি ক্ষেত্র গুপ্ত-পন্থী ৩০৮
দেবকুমার ঘোষ

আমার মাস্টারমশাই ৩১২
চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়

'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' ৩১৪
নন্দদুলাল বণিক

আমার শিক্ষক : স্মৃতিচারণ ৩১৮
তিমিরবরণ চক্রবর্তী

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ৩২১
চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

'ফতুয়ার মত পাঞ্জাবী—আর কালা পেড়ে ধুতি' ৩২৫
জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী

মন ভালো হয়ে যায় ৩২৮
বীথি চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব

'আমার ভাবনা, আমার লেখা' ক্ষেত্র গুপ্ত

❑ ভারততত্ত্ববিদ্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বঙ্গবিদ্যা চর্চা ৩৩১
❑ সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাসের তত্ত্ব এবং গোপাল হালদার ৩৩৫
❑ ফোকলোর—চর্চা : এই সময় ৩৪২
❑ অসিতবাবু স্যার — শেষ প্রণাম ৩৪৪

চতুর্থ পর্ব

জীবন-কর্ম

❑ জীবনপঞ্জী ৩৪৯
❑ পি.এইচ.ডি. তালিকা ৩৬১
❑ লেখক পরিচিতি ৩৬৫



প্রথম পর্ব

মননচর্চার বিবিধ ধারা

ক. কথাসাহিত্য

খ. কাব্য-কবিতা

গ. নাটক-চিত্রনাট্য

ঘ. মধ্যযুগের সাহিত্য : নতুন ভাবনা

ঙ. ভাষা-ভাবনা

চ. তত্ত্ব ও সাধনা

সত্তার নিঃসঙ্গতা, স্মৃতিচেতনা ও সময় : প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-ছোটগল্প

• • • • • •

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

ব্যক্তির অন্তর্জীবন-চিত্রণ রবীন্দ্রনাথের গল্পের অন্যতম প্রধান অন্বিষ্ট, একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তার রূপায়ণ পদ্ধতি সর্বত্র এক নয়। তা' মুখ্যত দু'ধরনের। একদিকে চরিত্রগুলি ফুটে ওঠে সূক্ষ্ম বর্ণ-বিরলতায়, অন্যদিকে যথেষ্ট ঘটনা-নির্ভর না হয়েও নরনারীর বাস্তব চরিত্ররূপ অনেক বেশি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছোটগল্পে, ব্যক্তিচরিত্রের পূর্ব-ইতিহাস বা আগের ঘটনার বিশদ বিবরণ তেমন নেই, কেবল একটি বিশেষ মুহূর্তে, আগের জীবনের চলমান প্রবাহের বাইরে যা স্থির, সেই সময়েই হয়তো সেই ব্যক্তির নিহিত সত্তার উদ্ভাবন ঘটে। 'একরাত্রি' গল্পের উপসংহারে প্রলয়রাত্রির মুহূর্তটি এখানে স্মরণযোগ্য। কোন বৃহদায়ত উপন্যাসে এই 'সিচুয়েশন'টি হবে অনেক ঘটনার অন্যতম মাত্র। কিন্তু ছোটগল্পে এরই দর্পণে ব্যঞ্জিত হয় চরিত্রটির অন্তর্গত সমগ্র মানস জগৎ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক মনে হয়—'I think action generally unreal. It's the thing we do in the dark is more real.'

অন্যদিকে, চেকভের মতো রবীন্দ্রনাথও মানুষের মনোজগৎ ও অন্তর্গূঢ় সত্তার ছবি আঁকতে অনেক সময় ঘটনা-নির্ভর 'অবজেকটিভ' রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। চেকভের গল্প-পাঠক তাঁর কাহিনীর 'inward reality'-র অনুভব করেন 'without forfeiting on outer realm of social behaviour, gesture and dress.' (ভার্জিনিয়া উল্‌ফ)।

চেকভের এধরনের গল্পগুলি উনিশ শতকের শেষ দশকে লেখা। রবীন্দরনাথও প্রায় সমকালে, এবং উত্তরকালেও যে সব গল্প লিখেছেন, তাদের অনেকগুলিই আমাদের বক্তব্য সমর্থন করে। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পের বৃদ্ধ রামকানাই, 'শাস্তি'-র চন্দরা, 'সমস্যাপূরণ'-এর জমিদার কৃষ্ণগোপাল, কিংবা শেষপর্বের গল্প 'ল্যাবরেটরি'-র সোহিনী ইত্যাদি চরিত্রের কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। বিষয় সম্পত্তি কিংবা নারীহত্যা নিয়ে আদালতে মামলা-মোকদ্দমার মতো পরিচিত জীবনের একান্ত বাস্তব ঘটনা-পরিস্থিতির বিবরণের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে গল্পগুলির একেবারে শেষ পর্যায়ে উদ্ভাসিত হয়েছে চরিত্রগুলির অন্তর্লোকের নিহিত স্বরূপ। বিনা দোষে ফাঁসির প্রাক-মুহূর্তে চন্দরার 'মরণ' কথাটির অর্থ-ব্যঞ্জনায় এক মুহূর্তে যেন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার সমগ্র চিত্তলোক। এইসব দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে ভ্যালেরিশ'-কথিত ব্যক্তির 'social behaviour' এবং 'inner reality'-র মিশ্রণরীতির অনন্য শিল্পপ্রতিমা।

ছোটগল্পে ব্যক্তিচরিত্রের এই 'inner reality'-র গভীর গহন রূপের আরেকটি মাত্রা ফুটে ওঠে চরিত্রের নিঃসঙ্গতা-বোধের ব্যঞ্জনায়। Frank O' connor নির্দ্বিধায় বলেছেন, উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পে চরিত্রের এই নিঃসঙ্গতার চেতনা অত্যন্ত তীব্র। উপন্যাসের অনেক চরিত্রের সংস্পর্শে নায়ক এবং পাঠক উভয়েই যেন এক ধরনের সঙ্গ খুঁজে পায়। কিন্তু ছোটগল্পের সীমিত ঘটনায়,

সংহত পরিবেশে, হয়তো বা একটি কি দুটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যেন একান্তভাবে নিজের গহন সত্তার মুখোমুখি হয়। সেখানে জনবহুল সংসার নেই, সমাজ-পরিবারের অজস্র নর-নারী নেই। সেখানে কেবল ব্যক্তি একা, একেবারে সঙ্গিহীন। সমবেদনাহীন পৃথিবীতে বুকচাপা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে কাহিনীর পৃষ্ঠপটে, আপনসত্তার স্বাতন্ত্র্যের মর্মদাহী একাকিত্বে। চেকভের 'The Dependents' ও 'Misery' গল্প প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। 'Misery' গল্পে ঘোড়ার গাড়ির এক বুড়ো কোচওয়ান নিজের সন্তান-বিয়োগের ব্যথা কাউকে জানাবার মতো সমব্যথী পায় না। শেষে সেই অসহায় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ যায় নিজের আস্তাবলে, সেখানে তার বুড়ো ঘোড়াটির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শোকার্ত মনের কথা বলে চলে। সেই মূক অবোলা প্রাণীই এই দুনিয়ায় তার একমাত্র সঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই এধরনের নিঃসঙ্গ চরিত্রের ছবি আছে। 'থীম', ঘটনা ও পরিবেশ সেখানে স্বতন্ত্র। কিন্তু সেই সব বিভিন্ন ঘটনার সাহায্যে লেখক ওই গল্পগুলিতে এমন একটি চরিত্র নির্মাণ করেন, কাহিনীর পরিণতি-পর্বে যাদের মনের সান্নিধ্যে কোথাও কেউ নেই। তারা যেন এক পরিত্যক্ত, নিরুপায়, নিঃসঙ্গ সত্তা। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বালিকা রতন, যার মনের গোপন ভালোবাসা ও বেদনা চিরদিনই অকথিত রয়ে গেল, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের উপসংহারে স্বেচ্ছায় পুত্রহারা রাইচরণ, 'জীবিতমৃত'-এর জীবন ও মৃত্যু, লোকায়ত ও শ্মশানের মাঝখানে 'দাঁড়িয়ে'-থাকা হতবুদ্ধি নিরুপায় কাদম্বিনী, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পের শেষে নির্জন রাত্রে আপন কক্ষদ্বারে একাকী দণ্ডায়মান বিনিদ্র বৈদ্যনাথ, 'ছুটি'র স্নেহমমতা-বঞ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী ফটিক, 'হৈমন্তী' গল্পের কারুণ্যের প্রতিমা লাঞ্ছিতা হৈমন্তী, কেবল 'নির্বাক আকাশের সঙ্গে' যার 'নির্বাক মনের কথা হয়'— এরা সকলেই সঙ্গিহীন পৃথিবীতে মর্মস্পর্শী বিষাদের করুণ মুখচ্ছবি। এই সব নিঃসঙ্গ চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, যার নিঃসঙ্গতার ছবিটি এদের সকলের থেকে আলাদা। সে 'অতিথি'র কিশোর তারাপদ।

পূর্বোক্ত গল্পগুলিতে যে সব চরিত্রের কথা স্মরণ করেছি, লেখক দেখিয়েছেন, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে কেমন করে তারা বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে— রতন, রাইচরণ, বৈদ্যনাথ, ফটিক, এমনকি হৈমন্তীও। কিন্তু তারাপদ রবীন্দ্রনাথের এক অসামান্য সৃষ্টি। সে যেন এক সহজাত নিঃসঙ্গতার বর্ম এঁটে রেখেছে তার সমগ্র সত্তাকে ঘিরে। সে আজন্ম এক ছিন্নবাধা পথিক, সে তার আন্তর চেতনায় একেবারে একা। চারপাশের যারা, তারা কেউই তার মনের যথার্থ সঙ্গী নয়, ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আপন করে নিতে পারে না। গরীব ঘরের এই ছেলেটি ধনী জমিদারের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে ক'রে বিপুল ঐশ্বর্য লাভের অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সব কিছু অনায়াসে পিছনে ফেলে অজানা পথের টানে একা বেরিয়ে পড়েছে এই চির-নিঃসঙ্গ কিশোর।

বস্তুত তারাপদ-র এই নিঃসঙ্গতা তার মনের গভীর আনন্দময় সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জড়িয়ে আছে। পূর্বোক্ত অন্য চরিত্রগুলির মতো তার নিঃসঙ্গতা বিষণ্ণতা আনে না, বরং 'বহু জনতার মাঝে বিচিত্র একা' হয়ে জীবন-সম্ভোগের আশ্চর্য ক্ষমতা নিহিত আছে তার রক্তে, তার সত্তার অতলে। এতেই তার আনন্দ, এতেই তার মনের মুক্তি।

ছোটগল্পে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হল—স্মৃতিবাহিত ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে সত্তার মর্মলোকের উন্মোচন। কোন ব্যক্তির স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে বিবৃত না করে, যেমন সচরাচর গল্প বলা হয়, অর্থাৎ সময়কে পিছন দিকে না ফিরিয়ে যদি সামনের দিকেই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তো, তাহলে মনে হয়, চরিত্রের অভীষ্ট অন্তর্গূঢ় রূপটি উদঘাটিত হ'তো না। কারণ,

কথক স্মৃতিচারণের সময় নির্বাচিত ঘটনার যে নির্যাসটুকু নিজে পরিবেশন করছে, তার মধ্য থেকেই তার সত্তার নিহিত বৈশিষ্ট্য, তার যন্ত্রণা, আনন্দ, অনুশোচনা, নৈতিক সংকট, উত্তরণের জন্য আকৃতি সব কিছুই ব্যঞ্জিত হতে পারে। চেকভের গল্পে সম্ভবত এজন্যই অনেকাংশে স্মৃতিবাহিত আখ্যান-বিন্যাস চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' কিংবা 'নিশীথে' গল্পে অতিপ্রাকৃতের প্রচ্ছদ থাকা সত্ত্বেও বলা চলে যে, 'কঙ্কাল'-এর নায়িকার কিংবা 'নিশীথে'র দক্ষিণাচরণবাবুর কাহিনী তাদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত না হলে চরিত্রদুটির বিশিষ্ট মাত্রাগুলি হয়তো তেমন তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সুযোগ পেত না,—স্মৃতিবাহিত হওয়ার ফলে যে সংহতি এসেছে, সাধারণ সমতলধর্মী কাহিনী-বিন্যাসের ফলে তার বুনোট কিছুটা শিথিল হয়ে যেত, অন্তর্লোক হয়তো তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতো না পাঠকের কাছে। শুধু অতিপ্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত কাহিনীই নয়, 'দুরাশা' বা 'বোষ্টমী' গল্প সম্পর্কেও একথা সত্য। স্মৃতির প্রেক্ষণী ব্যক্তির মনে আত্মাবলোকনের তথা আত্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। স্মরণের অতলে ডুব দিয়ে জীবনের 'বিপন্ন বিস্ময়ে' অভিভূত ব্যক্তিসত্তা আপন দ্বন্দ্বদীর্ণ ট্রাজিক স্বরূপের মুখোমুখি হতে পেরেছে। আর এর মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে ব্যক্তিচরিত্রের অনন্যতা।

আরেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকটি কথা বলে আলোচনা শেষ করতে চাই। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে নিঃসঙ্গতাবোধ, স্মৃতিচেতনা ও বহিরঙ্গ স্থান-কালের পরিবেশে যে সমন্বয়ের ছবি গল্পের অন্ত্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তা বস্তুত অসামান্য। ওই গল্পে ব্যক্তির একাকিত্ববোধের এক বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে সময়ের গূঢ় চেতনার সঙ্গে। দিন ও রাত্রি মিলিয়ে সময়ের দু-একটি খণ্ডিত পর্বে রূপায়িত হয়েছে নিঃসঙ্গতা তথা স্মৃতি-চেতনার গভীর অনুভব।

গল্পটির কেন্দ্রে যে নিঃসঙ্গতার অনুভব স্তব্ধ হয়ে আছে, স্বাভাবিক ভাবেই তার যোগ্য আধার হয়ে উঠেছে গ্রামাঞ্চলের নির্জন সন্ধ্যা বা রাত্রি। বিশেষভাবে শ্রাবণের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে যখন রোগক্লান্ত পোস্টমাস্টার চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সংকল্পের কথা রতনকে জানাচ্ছেন। রতন যখন জানল, পোস্টমাস্টার আর ফিরে আসবেন না, তখন সে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গেল।—'অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।'

—রতনের মনের দুঃসহ নিঃসঙ্গতার ব্যথা যেন সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় এক প্রায়ান্ধকার ঘরের নিঃশব্দ মুহূর্তের চূড়ায় দাঁড়িয়ে স্তিমিত প্রদীপ শিখাটির মতো থরথর করে কাঁপছে। এই সন্ধ্যা যেন রতনের জীবনের আসন্ন ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ সময়ের আভাস বয়ে আনে। এরপর এল সেই নিদারুণ মর্মস্পর্শী সকাল, যখন অনেক দিন ও রাত্রির কাহিনী শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পের একমুখীনতার অনিবার্য প্রবণতায় যেন একটি আবেগঘন দিনের সংহত সমাপ্তিতে পৌঁছতে চেয়েছে। বিদায়-ভৈরবীর বিষণ্ণ এক সুর সেই ভোরের আকাশে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সকালের নদীতীর থেকে পোস্টমাস্টারের নৌকো ভেসে যাওয়া, নদীতীরের শ্মশানের ছবি, এবং তার সঙ্গে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ের অনুভব, যার অনুষঙ্গে আছে 'কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু'—সব মিলিয়ে পাঠকের চিত্তে কাল, পরিবেশ ও নরনারীর ব্যক্তিসত্তার গূঢ় চেতনার এক সুসমন্বিত সংবেদন সৃষ্ট হয়। সমগ্র গল্পের মধ্যে সময় একটি বিশেষ ঋতু ও কয়েকটি সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা ও রাত্রির খণ্ডরূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু শেষ অবধি এই ক্ষুদ্র কালখণ্ডগুলি পোস্টমাস্টারের বিষণ্ণ চেতনায় স্মৃতিবাহিত হয়ে এক তীব্র আবেগের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেই আবেগ—আবার ফিরে গিয়ে রতনকে 'সঙ্গে করিয়া লইয়া' আসার ইচ্ছা—নিতান্ত ক্ষণিক। সেই ক্ষণকালটুকু শেষপর্যন্ত চলমান নদীপ্রবাহের মতো,

'পালে বাতাস পাওয়া' দ্রুত ভাসমান নৌকোর মতো নিরুদ্দেশ অন্তহীন সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে। বস্তুত, গল্পের শেষে শ্মশান-তীরবর্তী বহতা নদীর নিষ্ঠুর প্রবাহের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে গল্পের খণ্ডকালগুলি, যা রতনের মমতা ও ভালবাসার সঙ্গে তার হৃদয়ের আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় জড়ানো ফেলে-আসা দিনরাত্রির বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশ। মানবমনের স্মৃতিচেতনা-জড়িত গূঢ় আবেগের সঙ্গে গল্প-শেষের অন্তহীন নদীপ্রবাহের মতো অনিঃশেষ সময়ের রহস্য-গূঢ় মর্মস্পর্শী সম্পর্কের ব্যঞ্জনায় গল্পটি অনন্যতা লাভ করেছে।



বাংলা ছোটগল্পের নতুন মাত্রা [১৩০০-১৩৫০]

• • • • • •

কার্তিক লাহিড়ী

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি একটু বিস্তৃত—বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ। পঞ্চাশ বছরে অনেক গল্প লেখা হয়েছে, অনেক গল্পকার তাঁদের রচনা সম্ভারে বাংলা ছোটগল্প সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা সকলেই আমাদের স্মরণযোগ্য। এই পঞ্চাশ বছরে বিস্তর ছোটগল্প লেখা হয়েছে, সন তারিখ অনুযায়ী তা সব সাজিয়ে দিলে কিংবা এক-একজন গল্পকারের প্রতিটি গল্প নিয়ে আলোচনা করলে সেই প্রতিবেদন নানা কারণে পাঠের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে, এবং তাতে সমস্যার গভীরে যাওয়া সর্বদা সম্ভব না-ও হতে পারে।

তাই আমরা এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা ছোটগল্পের মাত্রা বেড়েছে কিনা বা প্রচলিত গল্পের ধারায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে কোথায় তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করবো, তবে এ আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না নিঃসন্দেহে। তবু এই দীর্ঘ সময়ের গল্পে নতুন মোড় বাঁক ইত্যাদির আভাস আঁচ করতে পারলে আলোচনা হয়ত কিছুটা সজীব হবে। তাই এ ধরনের আলোচনায় অনেক সফল সার্থক গল্পের বদলে একটি অস্ফুট অসার্থক রচনা প্রাধান্য পেয়ে যেতে পারে, এতে হয়ত একজন গৌণ গল্পকারের [প্রচলিত সমালোচনায় যে গল্পকারকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি] গল্প আলোচনার যোগ্য হয়ে উঠবে।

এই আলোচনায় আমরা অবশ্য কে বড় গল্পকার কে নয়—সে বিচার থেকে বিরত থাকব, যদিও বলতে কি বিচারের তেমন মানদণ্ড আমাদের জানা নেই, আর শিল্প সাহিত্যে এই তরতম বিচারের কোনো নির্দিষ্ট মানও নেই। এক-একসময় জনপ্রিয় সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়, পরবর্তীকালে সেই লেখা ধোপেই টেকে না, আবার সমকালে অনাদৃত রচনা পরে মর্যাদা পেয়েছে যথাযোগ্য—এ খুবই দেখা যায়।

প্রথমে বলা ভাল আমরা পঞ্চাশ বছরের ছোটগল্পকারদের নামের তালিকা বা তাঁদের গল্পগ্রন্থের পঞ্জি প্রস্তুত করছি না, একাজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে করা যায়, যদিও একাজ করা সহজ নয় এবং তা বহুসময় ও শ্রমসাপেক্ষ, বলা বাহুল্য সেই দক্ষতাও বর্তমান লেখকের নেই।

আমাদের আলোচনার সময় বাংলা ১৩০০ সাল থেকে ১৩৫০। এই সময়ের ছোটগল্পের প্রধান পুরুষ নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথ। তেরশ সালের আগেই তাঁর অনেক গল্প প্রকাশিত হয়, আর ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত 'বদনাম' জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ গল্প। কিন্তু আমরা তাঁর অসংখ্য ভালো গল্পের মধ্যে ১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত একটি গল্প বেছে নিচ্ছি, গল্পটির নাম 'অসম্ভব কথা'। গল্পটি কিন্তু প্রথমে 'গল্পগুচ্ছ'-এ সংকলিত হয় নি, ঠাঁই পায় 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ [১৯০৭], পরে অবশ্য 'গল্পগুচ্ছ'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। তপোব্রত ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের

শিল্পরূপ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন "...১৯০০-০১ খ্রীস্টাব্দে মজুমদার এজেন্সি প্রকাশিত দুই খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ'-এ এবং ১৯০৮-৯ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছ'-এ 'অসম্ভব কথা' নেই।" [পৃ. ৮৭] গল্পটি 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ ঠাঁই পাওয়ায় মনে হয় 'অসম্ভব কথা' সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়ত মনে করেছিলেন, 'তাহা ধর্মের কথা নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অবচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ।' [বাজে কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ]। এ ধরনের রচনার উদাহরণ হিসেবে মেঘদূতের উল্লেখ করেন তিনি। 'অসম্ভব কথা'য় কি সেই চেতন-অবচেতন লোপের খবর আছে?

'অসম্ভব কথা' পড়তে পড়তে মনে হবে এ গল্পটিকে কয়েক অংশে ভাগ করা যায় খুব সহজে। গল্পটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে :

'এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না।...'

রূপকথার মত আরম্ভ হলেও প্রথম অংশে কিন্তু রূপকথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে রূপকথার সম্বন্ধে, তার রূপের কথা প্রসঙ্গে—'রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য-উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ,...

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথা কোন্‌টুকু।...'

কথক রূপকথার সারটুকু বলে আসল গল্পে চলে আসেন এবার '...সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল।...' ছেলেটি চাইছিল বৃষ্টি খুব হোক আর মাস্টারমশাই যেন পড়াতে না আসেন। কিন্তু যথারীতি তাঁকে ছাতা মাথায় আসতে দেখা গেল। মা দিদিমা বিন্তি খেলছিলেন, ছেলে মা-কে গিয়ে ধরে বসল—শরীর খুব খারাপ, আজ সে পড়বে না। মা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। মাস্টার মশাইকে মানা করে দেওয়া হল, ছেলেটি দিদিমার কাছে বায়না করতে থাকে গল্প বলার জন্য।

বাধ্য হয়ে 'দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।...'

রূপকথার গল্প চলতে থাকে, সেই চলার ফাঁকে ফাঁকে বালকের ইচ্ছা বইয়ে দেওয়া হচ্ছে—'আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়োরানী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই।...'

গল্প চলাকালে আবার বয়স্ক কথকের আন্তর ভাষণ সহজেই ঢুকে পড়ে—'যখন সেই রাত্রে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুনগুন স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা-বদল হইয়া গেল;...'

দিদিমার গল্প বলা শেষ হয়ে গেলে কথকের বা লেখকের মন্তব্য এসে পড়ে—'ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম :

'আমার কথাটি ফুরোল, ন'টে গাছটি মুড়োল।

'এখন বয়স হইয়াছে, এখন ঠিক গল্পের মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন

কণ্ঠে শুনিতে পাই—আমার কথাটি ফুরোল না, ...'

তত্ত্বকথা, বাস্তব, রূপকথা; আবার রূপকথা ভেঙে একটা নতুন রূপ ও রীতির জন্ম হচ্ছে—দিশি ছাঁদে গল্প বলার চেষ্টা, তখন রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করতে প্রবন্ধ লিখতে ব্যস্ত। অবশ্য এর আগে রূপকথার ছাঁদে লিখেছেন 'একটা আষাঢ়ে গল্প' [আষাঢ় ১২৯৯], আর 'অসম্ভব কথা'-র পর লিখলেন 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' [ভাদ্র ১৩০০]। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গল্পটি একটি জটিল রূপকল্প তৈরি করে—এক আধুনিক গল্প। আধুনিক, কারণ এখন দিশি ছাঁদে রচনার কথা খুব শোনা যাচ্ছে, সেই ছাঁদের অন্বেষণ আজ আধুনিকতার সমার্থক হয়ে উঠেছে। অথচ এই ছাঁদে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন না মোটে, যদিও তিনি 'পথের পাঁচালী'-কে প্রশংসা করেছিলেন উপন্যাসের আখ্যানটি অত্যন্ত দিশি বলেই।

'অসম্ভব কথা' গল্পটি রূপকল্পের দিক থেকে অনন্য হয়ে ওঠে অন্যভাবেও। দেখা যাচ্ছে রূপকথা অংশের শ্রোতাটির মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, যা রূপকথার গল্পে লক্ষ্য করা যায় না। রূপকথার মাত্রা বাড়ানো বা নতুনভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া পাঠককে জানানোর মধ্যে। গল্পের কথক অন্তত দুজন, বলা চলে মূল কথক হচ্ছেন যিনি গল্পটি বলেছেন, আবার তিনিই শিশুশ্রোতা হয়ে পড়েন দিদিমার রূপকথা বলার সময়, ফলে গল্পটি বহুমাত্রিক হয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। কথকতার মতই দিশি ছাঁদ যেন নানা মাত্রায়।

সাহিত্য-বিশ্বের মানচিত্রে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিশি ছাঁদে রচনার আকর্ষণ দ্রুত বাড়ছে। টেক্‌নোলজির কল্যাণে পৃথিবীর পরিসর ছোট হয়ে যাচ্ছে বেশ, তাতে পিছিয়ে পড়া দেশের মানুষদের নিজস্বতা রক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়ছে, তার প্রতিফলন ও আবেগ দেখা দিচ্ছে শিল্প সাহিত্যের নানা বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ছাঁদটি গড়তে না গড়তেই কেন সেই ধারা অনুসরণ করলেন না আর? 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'পালপার্বণ যাত্রাগান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বাহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে।'

এই জন্যই কি তিনি ঐ ছাঁদটি পাকাভাবে ধরতে চাইলেন না, নাকি 'রূপকথার সেই ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই সরলতাটুকু...' দিয়ে ধরা যাবে না তাঁর দেখা জগৎ? জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা বলেই জগতের না দেখা অংশটাই বড় ছিল, তার জন্য বেদনা বোধ করতেন, তবে সেই ব্যথা ভরে দিতেন কল্পনার রসবোধে, সেই চোখ দিয়ে দেখেছিলেন বাংলাদেশ, তাই পল্লীগ্রামের আঁকাড়া চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে নি তাঁর, নইলে যাত্রাগান কথকতা ইত্যাদির রূপরীতি ছিরিছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও সেই লৌকিক উপাদান বা কারুকৃতির প্রয়োগ তাঁর পরবর্তী ছোটগল্পে অনুপস্থিত থাকে কেন—প্রশ্ন জাগে। অথচ তিনিই যথার্থভাবে লোকজীবন ও জগতের কত কিছু সম্বন্ধে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। ছড়া সম্পর্কে যে সব কথা বলেন যেমন :

১. 'সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন অলক্ষ্য বায়ু প্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তন-পূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্ব প্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত...'

২. 'আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিষ্ঠান ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়।...'

ইত্যাদি উদ্ধৃতি চেতনা-প্রবাহের কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? রবীন্দ্র-উপন্যাসে এ রীতির আংশিক প্রয়োগ দেখা গেলেও ছোটগল্পে তার চিহ্ন মেলে না, অথচ তিনি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন। তবে 'গল্পগুচ্ছ'-এ সংকলিত না হলেও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন বাদে আরেক ধরনের ছাঁদ তৈরি করে নেন, যার নিদর্শন 'লিপিকা'-য় আছে, কিন্তু এগুলোকে কেউ গল্প হিসাবে স্বীকার করতে চান না, কেন না ঐ রচনা সব প্রথাসিদ্ধ রীতিতে রচিত নয়—রূপকথা লোককথা রূপক ইত্যাদির মোড়কে এক অন্তরঙ্গ আদল। তাই বোধহয় এসব রচনা গল্পগুচ্ছ-এ সংকলিত করা যায় না কিছুতেই।

কাফকার গল্পগ্রন্থে [স্টোরিস ১৯০৪-১৯২৪, জে. এ. আণ্ডারউড-এর নতুন অনুবাদ (ইংরেজিতে) , প্রথম সং ১৯৮৩] এমন এমন লেখা স্থান পেয়েছে তা আমাদের কাছে হতবুদ্ধিকর ঠেকতে পারে, বাংলায় এমন দু-টি রচনা উদাহরণ হিসাবে রাখা যায় অনায়াসে :

ক. পাহাড়ে প্রমোদ ভ্রমণ

'আমি জানি না', নিঃশব্দে চিৎকার করি, 'সত্যি আমি জানি না, কেউ যদি না আসে, কেউ না আসুক। আমি কারো ক্ষতি করি নি, কেউই আমার ক্ষতি করে নি, কিন্তু কেউ আমায় সাহায্য করতে চায় না। কেউ না, কেউ না, কেউ না। এটা এমন হওয়া ঠিক নয় যদিও। এটা ঠিক কেউ-ই আমাকে সাহায্য করে না, নইলে এক দঙ্গল কেউ না-র ধারণা আমাকে টানে। আমি খুব পছন্দ করি—কেউ না-র একটা বিরাট দল নিয়ে বেড়াতে যেতে, কেন নয় বলুন—পাহাড়ে অবশ্য, আর কোথায়? কেমন করে তারা একে অন্যকে গুঁতো মারে। অতগুলো হাত বাড়ানো আর এক সঙ্গে ধরা, অতগুলো পা, আলাদা হয়ে আছে এক পা ফাঁকে, বলা বাহুল্য আমরা সবাই পরে আছি সান্ধ্য পোষাক, হাসতে হাসতে চলেছি খুশিতে ভরপুর, আর বাতাস বয়ে চলে আমাদের উপর দিয়ে শরীর ফাঁক দিয়ে সব। আহ্! গলা দারুণ পরিষ্কার হয়ে গেছে পাহাড়ে। অবাক কাণ্ড আমরা গাইছি না কিন্তু।'

খ. গাছ

বরফের মধ্যে আমরা যেন গাছের গুঁড়ি। চিত হয়ে শুয়ে আছি মনে হয়, আর একটু ধাক্কা দিলে পড়ে যাবো। না, কেউ পারবে না, কারণ মাটিতে গেঁথে আছে খুব। অথচ দেখুন সেটাও হয়ত নিছক একটা দৃশ্যই হবে।

এ ধরনের বেশ কয়েকটি রচনা কাফকার গল্প সংকলনে আছে। তাহলে কোন্ অজুহাতে 'লিপিকা'-র রচনাগুলি গল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে না? একমাত্র প্রচলিত রীতিতে লেখা নয় বলেই কি এগুলি গল্প হিসেবে ব্রাত্য হবে? আমরা এখানে 'লিপিকা'-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের রচনাগুলির কথা বলছি না, যাতে গল্পের সামান্য রূপরেখা পাওয়া যায়। আমরা কাফকা, বোর্হেস, লাগেরক্ভিস্ট-এর গল্প সামনে রেখে বলছি 'লিপিকা'-র প্রথম অংশে 'পায়ে চলার পথ', 'মেঘলা দিন', 'বাণী' প্রভৃতি লেখা গল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একথা প্রায় অনেকেরই জানা 'লিপিকা'-র প্রভাব অনেক গল্পকারের উপর পড়েছে বা অনুভব করা যায়, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্পে।

রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য সব গল্প লিখেছেন। তাঁর হাতে বাংলাগল্প এক লাফে যেন পরিণত স্তরে পৌঁছে যায়। আমরা এখানে শুধু 'অসম্ভব কথা' এবং 'লিপিকা'-র কয়েকটি রচনার উল্লেখ করে গল্পের নতুন মাত্রা-র বিষয় বুঝতে চেষ্টা করেছি।

॥ ২ ॥

এরপর অনেক কুশলী লেখক ছোটগল্পের ধারা প্রবহমান রাখেন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এর মধ্যে প্রভাতকুমার ছোটগল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর হাস্যরসপ্রধান গল্পগুলি, তবে সেই সব গল্প যথেষ্ট গভীরতা স্পর্শ করতে সবসময় সক্ষম হয় নি। বরং শরৎচন্দ্র ছোটগল্পকার না হয়েও দু-টি গল্পে ['অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ'] তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

'মহেশ' বেশ সহজ সরল গল্প, কোনো প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই, অথচ গল্পটির সবকিছু আবর্তিত হয়েছে একটি অবলা প্রাণীকে কেন্দ্র করে, এটি একটি নতুন দিক। আর এই গল্পের সূত্রে শরৎচন্দ্র একটি অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেন, যখন আমিনার "কোথায় বাবা?" উত্তরে "গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।" গ্রাম থেকে শহর অভিমুখে যাত্রা কিংবা উন্নয়নের জয়রথের দুরন্তগতির সামনে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে এ ছাড়া বিকল্প নেই আর, হয়ত এই যাত্রা তখন ত্বরান্বিত করে বর্ণহিন্দু ও জমিদারের দাপট।

॥৩॥

এবার আমরা একটু চলে যাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসময়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতবাসীর মনে একটু আশা জাগায়, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মনে। কিন্তু আশাভঙ্গ হতে দেরি হয় নি। তবু তার মধ্যে ঘটে যাচ্ছে দুনিয়া কাঁপানো এক দুর্দান্ত কাণ্ড—রুশ বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের পর এমন সাড়া জাগানো ঘটনা ঘটে নি আর। ভারতে তার ঢেউ পৌঁছতে একটু দেরি হয়, কিন্তু সেই ঢেউ আমাদের চিন্তা-ভাবনা পালটে দিতে থাকে। শ্রমিক, কৃষক সমস্যা আমাদের দৃষ্টিতে এসে যায়—'সংহতি' [১৯২৩], 'লাঙল' [১৯২৫] ইত্যাদি পত্রিকায় যার স্পষ্ট প্রকাশ।

অন্যদিকে গান্ধীজীর আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিকে প্রসারিত করে দেয় গ্রামে, তাতে চেতনার প্রসার ঘটে, ফলে আন্তর্জাতিক ও স্ব-দেশীয় পরিস্থিতি শিল্পী সাহিত্যিকদের তৃণমূলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে অন্যভাবে। আর এ বিষয়ে আমাদের প্রথম পথ দেখালেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : 'আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চরিত্ররা, সব সাঁওতাল কুলিমজুর।' ['গল্প লেখার গল্প', পৃ. ৫৫]। শুধু তাই নয়, শৈলজানন্দ বর্ধমান বীরভূমের সমাজ ও মানুষের ছবি তুলে আনেন স্থানীয় রঙে উজ্জ্বল করে—'কয়লা কুঠি' [মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩২৯], এবং 'রেজিং রিপোর্ট' [প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৯] গল্প দু-টি তার অনন্য উদাহরণ। 'দিনমজুর' গল্প সংকলনের ভূমিকায় শৈলজানন্দ লেখেন 'সাঁওতালদের লইয়াই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের যাত্রা শুরু করি এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে আমার সাঁওতাল গল্পগুলি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' এবং এই সব গল্পে তিনি সাঁওতালি শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেন অনায়াসে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দর গল্প পড়ে তারাশঙ্কর প্রেরণা পান, বিশেষ করে শৈলজানন্দর গল্প পড়ে : 'বীরভূম-কে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে রূপ দেওয়া যায়' উপলব্ধি করেই তারাশঙ্কর বীরভূম ও রাঢ় অঞ্চল-কে পটভূমি করে অনেক গল্প লেখেন।

অন্যদিকে আরেকভাবে তারাশঙ্কর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর আরেকটি কপাট খুলে দিলেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। 'সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব' তিনি দু-চোখ ভরে দেখেছিলেন, তিনি জানান 'সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।' [তারাশঙ্করের স্মৃতি কথা ১ খণ্ড, আমার কালের কথা", পৃ. ৮]। 'রায়বাড়ি', 'জলসাঘর' যার উজ্জ্বল উদাহরণ।

এছাড়া তারাশঙ্কর ব্যাপকভাবে তাঁর গল্পে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপস্থিত করেছেন, যেমন— চন্দ্রমশায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ['পদ্মবউ' গল্পে], ট্যারা-কানা ও জিভের জড়তা ['ট্যারা' গল্পে], খোঁড়া শেখ—খোঁড়া ['নারী ও নাগিনী' গল্পে], এমন কি তারিণী মাঝিও স্বাভাবিক নয়, সে 'অস্বাভাবিক দীর্ঘ'। প্রতিবন্ধীদের কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর দারুণ সব গল্প লেখেন। এমন কি মানবেতর প্রাণী সাপ 'নারী ও নাগিনী'-তে এক সজীব ও প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে যেন।

জগদীশ গুপ্ত আরেকভাবে বাংলা গল্পে এক নতুন বিষয়বস্তুর সূচনা করেন। নিয়তি তাঁর গল্পে এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই নিয়তি গ্রীক ট্রাজিডির নিয়তির মত, অনিলবরণ রায় যার নাম দেন শয়তানী শক্তি [আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ, বিচিত্রা ১৩৩৬]। নিয়তি একটু ফাঁক পেলেই মানুষকে পরাভূত করে, মানুষী দুর্বলতার সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। 'বিনোদিনী' গ্রন্থের 'দিবসের শেষে' যার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। রতির পাঁচ বছরের ছেলে পাঁচু বলল, আজ তাকে কুমিরে নেবে, শেষ পর্যন্ত তাকে কুমিরেই টেনে নেয়। কুমির যেন ওত পেতেই ছিল, মানুষের দুর্বলতা নয়, বাইরের এক শক্তি নিয়তি হয়ে পাঁচুর বোধ-কে যেন সত্যি করে তোলে।

জগদীশ গুপ্তর গল্পে নিয়তি অপেক্ষা করে থাকে, সেই নিয়তি চরিত্র ঘটনা ইত্যাদি নিরপেক্ষ স্বসিদ্ধ এক ব্যাপার, অন্যপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নিয়তি চরিত্রের মধ্যেই অবস্থান করে, তা কোনো বাইরের ব্যাপার নয়—'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু ডাকাতি করে। গল্পের শুরু হচ্ছে ভিখু শারীরিক ভাবে আহত হওয়ার পর। তবু তার লোভ লালসার অন্ত নেই। বন্ধুর স্ত্রীর উপর লালসায় সে বিতাড়িত হয় সেই আশ্রয় থেকে, পরে জড়িয়ে পড়ে পাঁচীর সঙ্গে, খুন করে বসির-কে, তার কাছে বড় হয়ে ওঠে অস্তিত্বের প্রশ্ন। তার জীবন বাইরের কোনো শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, সে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নেয়। এটিকে অস্তিত্ববাদী গল্প হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কিনা তা বিশেষ ভাবার বিষয়।

॥ ৪ ॥

আমরা এবার আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করছি, যে বিষয়টি অতি বাস্তব এবং আমাদের জীবনে ওতোপ্রোত জড়িত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে খুবই স্থূল কাণ্ড, কিন্তু অতি জরুরি সকলের জীবনে, তা হচ্ছে খিদে—পেটের খিদে। অথচ এই ভীষণ ঘটনা বা ব্যাপার লেখায় বিশেষ গুরুত্ব পায় নি কখনো। আমরা দেখব, খিদে বিষয়টি কেমন ভাবে তাঁর রচনায় ঠাঁই পেয়েছে। আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি, যদিও খিদে তাঁর মূল প্রসঙ্গ নয়।

তবু ভাবতে পারি 'পথের পাঁচালী'-র দুর্গার কথা। সে বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফল পাকড় তুলছে খাচ্ছে, অপুকে দিচ্ছে। বাড়িতে খাওয়ার পুরো সংস্থান থাকলে কি কেউ এমন করতে পারে দিনের পর দিন। অথচ লেখক কোথাও বলেন নি যে তারা খিদের তাড়নায় বুনো ফলমূল তুলছে খাচ্ছে, পাঠক আন্দাজ করে নিতে পারে কেন এমন হয়। আর 'আরণ্যক' তো এক হিসাবে অনাহারী উপোসী অর্ধাহারীদের আখ্যান। ম্যানেজার এসেছে, ভাত রান্না হবে জেনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে জমছে কাছারির চারপাশে—এটা কেন হচ্ছে তা নিশ্চয় বিশদ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা তাঁর অনেক গল্পের মধ্যে একটি গল্পের কথা উল্লেখ করছি। গল্পের নাম 'সই'। গল্পটিতে কোথাও খিদে শব্দটি উচ্চারিত হয় নি, অথচ পড়ে গেলে ঐ বিষয়টি বড় হয়ে ওঠে :

সই এসেছে কথকের বিধবা বোনের কাছে, সে বকবক করে চলেছে। কখনো বলছে সই পান দেবে, শেষে না পেরে সে ছেলেকে জল দিতে বলে। সে জানে সই ছেলেকে শুধু জল দেবে না,

'কিছু খ্যাতি দেবে তখন দেখিস।' কথকের বোন বাটিতে একটু গুড় সহ জল দিলে সে হতাশ হয় খুব। কথাবার্তা চলছে এমন সময় কথকের ভাগ্নে স্কুল থেকে ফেরে। সে সময় রাস্তা দিয়ে গোলাপছড়ি গেলে ভাগ্নে গোলাপছড়ি কেনে, এবং তার ভাগ দেয় সইয়ের ছেলেকে, তাতে খুশি হয় সই, 'ন্যাও হলো তো?... পাটালির চেয়ে কি বেশি মিষ্টি? দেখি দে তো একটু গালে দিয়ে...'। হাবলু আর মাকে ঐ মিষ্টি দিতে চায় না। এদিকে কথকের বোন ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে ঘুম দেয়। আর সই অপেক্ষা করতে থাকে।

সন্ধ্যার আগে টেনিস খেলে ফেরার পথে কথক দেখে সইয়ের ছেলে কি নিয়ে যেন বসে আছে—বোধহয় হাবলুর বাবা হাট থেকে ফিরবে সেই আশায়—

এই হচ্ছে গল্প। সই কেন আসে কথকের বোনের কাছে? কথক বুঝতে পারে—'ঠিক দুপুরের পরই সময়টা, এখন যে কিছু খাইয়ে দেওয়া প্রয়োজন, একথা আমার বোনের মাথায় আসে নাই বুঝিলাম।...' বলা বাহুল্য সইয়ের প্রতিটি আচরণ বুঝিয়ে দেয় নিহিত কথাটা।

অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমান্টিক আমেজ নিয়ে গল্প লেখা শুরু করেন, তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' পড়ে বোঝা যায়, উনি চলতি হাওয়ার পন্থী হতে রাজি নন মোটে। এবং এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে। এখানে এক নতুন প্রকরণ গ্রহণ করেন লেখক, মধ্যম পুরুষের মাধ্যমে গল্পটি পরিবেশিত হয়, তার ফলে গল্পটি এক অন্যমাত্রা পায়। যেমন 'স্টোভ' গল্পে সংবিদ্-প্রবাহের ছোঁয়ায় ঈর্ষা প্রেমের তির্যকতায় প্রতীক হয়ে উঠতে চায় স্টোভ। আবার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অবহেলিত মানুষের কথা উপজীব্য করে বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এর লেখকদের রচনায় বিস্তৃত হতে চায়।

॥৫॥

বিজ্ঞাপনের সুবাদে অনেক সময় গল্পের মাত্রা বাড়তে পারে, তার প্রমাণ কুন্তলীন পুরস্কার। প্রসিদ্ধ গন্ধতেল প্রস্তুতকারক হেমেন্দ্রমোহন বসু তাঁর তৈরি জিনিসপত্র প্রচারের জন্য এক গল্প প্রতিযোগিতার শুরু করেন। গল্প অবশ্যই ভাল হওয়া চাই, কিন্তু তার মধ্যে কৌশলে ঢুকিয়ে দিতে হবে তাঁর প্রতিষ্ঠানে তৈরি দেলখোস ও কুন্তলীনের নাম। এইভাবে বিজ্ঞাপন ঠাঁই পেয়ে যাচ্ছে গল্পের মধ্যে। অনেক লেখক এই পুরস্কার পেয়েছিলেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'কর্মফল' অন্যভাবে যুক্ত হয় কুন্তলীন পুরস্কারের তালিকায়।

আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'পলাতক তুফান' গল্পটির কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। এটি পুরস্কৃত গল্প নয়, তবে কুন্তলীনের গল্প। এ গল্পটির নাম ছিল 'নিরুদ্দেশ কাহিনী', তবে ঐ গল্পটি হুবহু অনুসরণ করা হয় না 'পলাতক তুফান'-এ। বঙ্গোপসাগরে যে প্রচণ্ড তুফান হবার কথা ছিল, তা কোথায় উধাও হয়ে যায়, তার রহস্য লুকিয়ে আছে 'কুন্তল কেশরী' বাণ নিক্ষেপের মধ্যে—"এই কারণেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে।" ['পলাতক তুফান', 'অব্যক্ত', কলিকাতা আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. ৭৩]

এর সঙ্গে অবশ্য মিল পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" উপন্যাসে বর্ণিত সমুদ্র ঝড়ের, সেখানে পিপে পিপে গর্জন তেল সমুদ্রে ঢেলে দিলে সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে বিজ্ঞাপন ঢুকে পড়ে নি আখ্যানে, এবং এখানে 'পলাতক তুফান' বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই গল্পটি নির্বাচন করার আরেক কারণ—গল্পটিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটা সাধারণ চেষ্টা আছে। এই গল্পে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন-কে ব্যবহার করা হয়েছে কৌশলে শিল্পরস ক্ষুণ্ণ না করে।

।।৬।।

আরেক ভাবে ছোটগল্পের মাত্রা বেড়েছে, যার সঙ্গে লেখার সম্পর্ক নেই, এবং তা গল্পের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে নেই। কিন্তু তার প্রয়োগে গল্পের মাত্রা বেড়ে যায় অন্যভাবে। আমরা এখানে পরশুরামের গল্পের কথা বলছি। তিনি দারুণ গল্পকার ছিলেন, কিন্তু যতীন্দ্রকুমার সেনের রেখাচিত্রগুলি গল্পগুলোর স্বাদ বাড়িয়ে দেয় দারুণ। তাঁর রঙ্গব্যঙ্গময় ছবি থেকে লেখক যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন, আর পরশুরামের গল্প কি যতীন্দ্রকুমারের ছবি ছাড়া ভাবা যায়? তাই লেখায় রেখা যুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয়টিকে অনবদ্য ও বিশেষ করে তোলে।

যেমন বনফুল ব্যাপকভাবে আকারে খুব ছোট গল্প লিখে আরেকভাবে বাংলা ছোটগল্পের নতুন কপাট খুলে দেন। 'লিপিকা'-র মতো ছোট, কিন্তু চারিত্র্যগত ভাবে একেবারে আলাদা। বনফুলের ঐ গল্পগুলিতে বাইরের আকর্ষণই সর্বৈব এবং শেষে থাকে মোচড়—মনের আঁতের কথা থাকে না বললেই চলে, ঘটনার বিবরণ থেকে তা আঁচ করে নিতে হয়। প্রায় স্কেচের মতো খুব সংক্ষেপে তবু ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে তা, যেমন—'চোখ গেল', 'বাড়তি মাসুল', 'আমলা', 'খোঁদি', 'আত্মপর' ইত্যাদি। সুকুমার সেন বলেন, '... বলাইবাবু কতকগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় ছোটগল্প লিখিতে ছিলেন, যাহাকে বলে ইংরেজিতে five minute short story আর আমেরিকান সাহিত্যিক শ্ল্যাঙে short short। এগুলিও নতুন জিনিস।" [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬৫, পৃ. ৩১৬]। আজকাল অণুগল্প লেখার বিশেষ চল হয়েছে, বনফুলের গল্পগুলি অণুগল্প হিসাবে চিহ্নিত করলে বোধহয় অন্যায্য হয় না।

।।৭।।

আমাদের আলোচ্য সীমার মধ্যে সোমেন চন্দ বোধহয় সেই লেখক, যিনি নিজস্ব রাজনীতি অর্থাৎ যে মতবাদে তিনি বিশ্বাসী, তাকে সরাসরি উপস্থাপিত করেন তাঁর গল্পে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজটি করেন আরও পরে, অবশ্য এরপর অনেক কথাকার রাজনীতিকে সরাসরি উপজীব্য করেন গল্প উপন্যাসে। রূপের দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিকে এ এক নতুন সংযোজন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ গল্প উপন্যাসে রাজনীতি এনেছিলেন, কিন্তু একটি বিশেষ মতবাদে অভিষিক্ত হয়ে তা উপজীব্য করে লেখার দায় সোমেন চন্দ সচেতনভাবে গ্রহণ করেন। তাঁর 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' আলোচনা করতে গিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকা [চৈত্র ১৩৪৯] লেখে : 'এই বইখানিতে...একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়—তার সমাজচৈতন্য এবং ঐতিহাসিক মূল্যবোধ তাকে কোন পথে চালিত করেছিল। এবং যে পথে সে অগ্রসর হচ্ছিল, সেটা তার স্বনির্বাচিত—সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ। সে পথের সাহিত্যিক বিপত্তি সে জানত, গল্পগুলির অসম্পূর্ণ উজ্জ্বলতাই তার প্রমাণ।...' 'সংকেত' গল্পে পুঁজিবাদে অনাস্থা, শোষণের বিরুদ্ধে শুধু তীব্র প্রতিবাদ নয়, সংঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রচেষ্টা, গল্পটিকে প্রথম গণ-গল্পের মর্যাদা দিতে পারে প্রায়, এবিষয়ে লীলাময় রায় ইঙ্গিত দেন প্রথম।

আমাদের আলোচনার পরিধির মধ্যে মাত্র এইসব গল্প ও গল্পকার একমাত্র বাংলা ছোটগল্পে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন—এটা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের নজরের বাইরে অনেক গল্প ও গল্পকার থেকে গেছেন, যাঁরা নানাভাবে ছোটগল্পের দিগন্ত বিস্তৃত করেছেন। ভবিষ্যতে আলোচক সেই সব গল্পকার ও তাঁদের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করবেন, এবং দেখাবেন সেই সব রচনা কীভাবে বাংলা ছোটগল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

❑

Body Language : নির্বাচিত কয়েকটি বঙ্কিম-উপন্যাস পাঠ

• • • • • •

সনৎকুমার মিত্র

১. Body Language- এর বাঙলা করা হয়েছে 'অঙ্গভাষা'। আর এই ভাষা অবশ্যই তৈরি হয়ে থাকে স্বতঃস্ফূর্ততার কারখানা ঘরে। মানবেতর প্রাণীদের প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়ে আমরা যদি মানুষের ভাষা জগতে প্রবেশ করি তবে স্থূল ও সূক্ষ্ম যেভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হোক না কেন যে কোনো মানুষ,— তিনি যে ধরনের স্বভাব বা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন, তাঁর স্পষ্ট ভাষা উচ্চারণের প্রতিটি মুহূর্তে অনেকানেক বা অসংখ্য অঙ্গভাষার ঢেউ উঠে থাকে;— যেমন কণ্ঠভাষা ব্যবহারকারীর চোখ নড়ছে, কপালে ভাঁজ পড়ছে, হাত নড়ছে, নানা ধরনের ম্যানারিজম্ [Mannerism]-এর জন্ম দিচ্ছে।

১.১. যদিও বলা হয় 'face is the mirror of mind' কিন্তু সেটাই সব নয়, কারণ, কেবল মুখ নয়, মন যে কথা বলতে চায় তা সারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্রিয়া-বিক্রয়ার মধ্যে দিয়েও ধরা পড়ে। এই অনুচ্চারিত ভাষা যা দেহের দেহভঙ্গীমায় শব্দহীনভাবেই উচ্চারিত হয় তাই অঙ্গভাষা বা Body Language।

২. বহুতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে অঙ্গভাষা উদ্ভবের মৌল ক্ষেত্রটি বেশ জটিল। ১৯৬৬ সালে বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম এস. কোলডোন আলোকচিত্রের সাহায্যে 'মাইক্রো বিশ্লেষণ' করে অঙ্গভাষার যে-সব তথ্য পেয়েছেন তা কিন্তু খালি চোখে দেখা যেতো না। এর থেকে দেখা গেছে যে শব্দহীন অঙ্গভাষা তো বটেই, যখন কেউ অন্তত একটি শব্দও [Word] উচ্চারণ করে তখন ঐ ওয়ার্ডের প্রতিটি অংশ [Syllable = 'a unit of pronunciation having one vowel sound, with or without surrounding consonants and forming all or part of a word' - OED] উচ্চারণ করতে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ নানা অঙ্গভাষা তৈরি করে— যেমন মাথা ডাইনে-বাঁয়ে নড়তে পারে, চোখের তারা স্থির থাকে পারে, মুখও আগুপিছু নড়ে, আঙুল নড়ে, ঘাড় হেলে— সামনে-পেছনে-পাশে। এইভাবে একটি অখণ্ড শব্দ [Word] এবং তাদের দিয়ে বানিয়ে তোলা বাক্য [Sentence] উচ্চারণ করতে যে-সব অঙ্গ-ভাষা ব্যবহার করা হয় সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত— মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আপনিই জন্মায়;— এটাই অঙ্গভাষার বৈশিষ্ট্য।

২.১. প্রসঙ্গত অবশ্যই তুলনায় আনতে হয় সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদির অভিনয় কালে যে সব অঙ্গ ভাষা ব্যবহৃত হয়,— মহামুনি ভরতের ভাষায় যাকে 'আঙ্গিক অভিনয়' বলেন; শতকরা হিসেবে তার সিংহভাগই চেষ্টাকৃত— শিক্ষাধীন এবং বাকিটা অনায়াসলব্ধ। তথাপি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেকক্ষেত্রেই বিনা আয়াসে উচ্চাঙ্গের ভাবপ্রকাশক অঙ্গভাষার প্রয়োগ করে তাঁদের অভিনেয় বিষয়কে রসোত্তীর্ণ করে তোলেন।

২.২. এই বিষয়ে একটি পরোক্ষ উদাহরণ দিই : "বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি— যাঁর মতো

নানা গুণ সমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পর অন্য কাউকে দেখা যায় নি, তিনি তাঁর কাকা বিখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ফিরেছিলুম যে অমরেন্দ্রনাথ একজন মহৎ অভিনেতা।..... অধিকাংশ বাঙালি স্বভাব-অভিনেতা.... কিন্তু তাঁর আয়ত দৃষ্টি, ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিমা আর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর—তাঁর অঙ্গের সেই সূক্ষ্মতম অর্থ বিকিরণের ক্ষমতা—বহুবর্ষ সাধনার ফলেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল' [দ্রষ্টব্য : হরীন্দ্রনাথ দত্ত : ''দত্ত পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়'-এর প্রকাশ' ১৯৭৫]।

২.৩. এই কারণেই বলা হয় : 'Body Language is powerful and indispensable in communication. Our verbal descriptions would fall flat without non-verbal accompaniments.'[H. Lewis : 'Body Language' 2000, p. 22]

২.৩. এইভাবে নৃত্য তো অবশ্যই গীত এবং অপরাপর কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রে অঙ্গভাষার ব্যবহার বহু ভাবেই নতুন নতুন তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অঙ্গভাষার এই সর্বন্ধর প্রয়োগ এবং তার থেকে অর্থ এবং ব্যবহারকারীর মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা—একে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্গত করে ফেলেছে এবং ঐ গবেষকেরা বিজ্ঞানের গবেষণাগারে ব্যাপক বিশ্লেষণের পরে বলছেন : 'There are several scientific expriment that explain the intricacies of the basis of body language. [ibid : p. 9]

৩. আমরা যদি মানবসভ্যতার বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ের পর্যালোচনায় মর্গনকে অনুসরণ করি তবে বলতে হয় : 'মানুষের ভাষা তার সাধারণ মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনেই বেড়ে উঠেছে। লুক্রেশিয়াস পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে অঙ্গভঙ্গী ও ইশারা দিয়ে প্রকাশ, উচ্চারিত ভাষার পূর্বে আসে। কারণ চিন্তা চলে, কথা আসে— আগু-পিছু। যেমন একস্বর শব্দ বহুস্বর শব্দের আগে এসেছে। তেমন বহুস্বর শব্দ সৃষ্টি হয়েছে কোনো সম্পূর্ণ শব্দের আগে। মানুষ তার অগোচরেই কণ্ঠস্বরকে কাজে লাগিয়ে স্পষ্ট উচ্চারিত ভাষায় রূপান্তরিত করেছে। [বুলবুল ওসমান অনূদিত ও সম্পাদিত 'আদিম সমাজ' (Ancient Society) ঢাকা ১৮৭৫, পৃ.১-৩।]

৩.১. স্বাভাবিকভাবে অনেক বছর ধরে বিবিধ বিবর্তনের নদী-সমুদ্র, পাহাড়- জঙ্গল অতিক্রম করে মানুষ স্পষ্ট-উচ্চারিত ভাষাকে কথ্য ও লেখ্য রূপ দিয়ে সাহিত্যের আসর বানিয়েছে,—একটি ভিন্নতর মাধ্যমে পরিণত 'তরুণ গরুড়সম মহৎক্ষুধা' মেটাবার প্রয়োজন অনুভব করেছে।

৩.২. উক্ত অনুভব থেকে, প্রয়োজনবোধ থেকে, বিশ্বমানবের সভ্যতা বিকাশের অনেক পরবর্তী স্তরে যে সাহিত্য-ভাষা তৈরি হলো তাকে আমরা দু-রূপে পেলাম : 'মৌখিক' ও 'লেখ্য'।

৩.৩. মৌখিক সাহিত্য কণ্ঠস্বর নির্ভর। সেখানে মৌখিক সাহিত্য স্রষ্টা বিষয়ের গুরুত্ব এবং ভাবের উচ্চাবচের ক্রমানুসারে বিবিধ অঙ্গভাষার ব্যবহার করে [জেনে বা না জেনে]। এখানে কণ্ঠ স্বরতন্ত্রী [Vocal Cord] নির্গত যে 'ধ্বনি' [Sound] 'শব্দ' [Word] হয়ে 'বাক্য'কে [Sentence] নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে।

৩.৪. কিন্তু লিখিত ভাষা-সাহিত্যে সেই অবকাশ নেই। কবি [সম্প্রসারিত অর্থে] শব্দের পর শব্দের জাল ফেলে ফেলে 'মানবের জীর্ণ বাক্যে'র সাহায্যে যে-সব নতুন নতুন জগতের সৃষ্টি করেন তারা সচল হয়ে ভাবের স্বাধীন লোকে পরিভ্রমণ করে; নিজেদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব সমন্বিত জীবনের প্রত্যক্ষবৎ নানা পরিচয় রচনা করে। সেগুলিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে তাৎপর্যময় করে তুলতে বিভিন্ন অঙ্গভাষাকে শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে বেঁধে এনে কথা এবং কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারির মতো জুড়ে দেন। সুরে বাঁধা বীণা থেকে যেমন অমৃতনিষ্যন্দী সুর ওঠে তেমন সিদ্ধ সাহিত্যসাধক অঙ্গ-ভাষার সাহায্যে ঘটনা ও চরিত্রকে নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে

থাকেন। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য একচিলতে 'অঙ্গভাষা'ই কাহিনীর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে— কোথাও বা নায়ক-নায়িকার জীবনের ঘটনাকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। এই [অঙ্গ] ভাষার কোনো ধ্বনিরূপ নেই,— আছে বোধ্যরূপ, কেবল ব্রহ্মাস্বাদসহোদর আনন্দসায়রে অবগাহন।

৪. ভূমিকা অনেকটা হলো। এটা হওয়ার দরকার ছিলো। কারণ অঙ্গভাষা বা body language নিয়ে বাঙলায় কোনো আলোচনাই হয় নি,— একমাত্র 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা'র অঙ্গভাষা' [body language] বিশেষ সংখ্যা : ১৭ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৪১১ ছাড়া।

৪.১. বাঙলার পিতৃপ্রতিম কথাকোবিদ বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত মাত্র কয়েকটি উপন্যাসের বাছাই করা কিছু অংশে পাওয়া অঙ্গভাষার উদাহরণ দিয়ে দেখাবো যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় কেমনতর অঙ্গ ভাষার ব্যবহার করেছেন। কুশলী মণিকার যেমন মহামূল্য রত্নসংস্থাপন দ্বারা সুদুর্লভ মণিহার নির্মাণ করেন; ঠিক সেই মতো বঙ্কিম তাঁর রচনায় সার্থক অঙ্গভাষা ব্যবহার করে কথাকাহিনীকে গতিদান করেছেন, চরিত্রগুলিও সুপরিস্ফুট হতে পেরেছে, ঘটনাগ্রন্থি দৃঢ় হয়েছে, এমন কি কোনো ক্ষেত্রে কাহিনীও চরম নাটকীয় বাঁক নিয়েছে।

৫. আমরা প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫] থেকে যদৃচ্ছ উদাহরণ নেবো।

৫.১. "রাজপুত্র ওসমানের **মুখপানে দৃষ্টি করিলেন**।— ওসমান রাজপুত্র **কৃত নির্ব্বাক তিরস্কার বুঝতে পারিয়া** কহিলেন : 'রাজপুত্র ইহাতে দোষ কি? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্মই সত্যধর্ম, বলে হউক, ছলে হউক সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্মই আছে।" [২য় খন্ড : ৯ পরিচ্ছেদ পৃ ১০৯ সাহিত্য সংসদ সংস্করণ। এর পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতিগুলি উক্ত সংস্করণ থেকেই নেওয়া হবে। এবং মূল বানান অপরিবর্তিত থাকবে।]

৫.১.১. এই অংশে জগৎসিংহ বিদ্যাদিগ্‌গজের কথায় যে একান্ত বিরক্ত হয়েছেন, তা কথায় নয় নীরব দৃষ্টিপাতের দ্বারা ['নির্ব্বাক তিরস্কার'] বুঝিয়ে দিলেন। হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করার মধ্যে মুসলমানেরা কোনো অন্যায় দেখে না। এ-কথায় হিন্দু জগৎসিংহের মনে যে অসন্তোষ-বিরক্তি-ক্রোধ জ্বালা তৈরি হয়েছিলো তা যদি বাক্যে প্রকাশ পেত তাহলে সেইখানে— সেই সময়, অত্যন্ত অপ্রিয় পরিবেশ তৈরি হতো, হয়তো উভয়ের মধ্যে অসি-যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতো। তাই এখানে কণ্ঠভাষা অপেক্ষা অঙ্গভাষার প্রয়োগ অনেক বেশি সার্থক হয়েছে— এমন কি লেখক তার সাহায্যে তাঁর ঈপ্সিত পথে সহজে অগ্রসর হতে পেরেছেন।

৫.২. অঙ্গভাষার ক্ষেত্রে চোখ বড় বেশি কথা কয় — ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়তই বঙ্কিম তাঁর উপাখ্যানে চোখের ভাষা ব্যবহার করে ['চোখে চোখে কথা নয় গো বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা'] ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। চরিত্রের গড়নই পাল্টে দিয়েছেন। ওপরের উদ্ধৃতিতে [৫.১] তাই-ই দেখালাম। জগৎসিংহের 'ওসমানের প্রতি দৃষ্টি'করার মধ্যে দিয়ে মুসলমানকৃত হিন্দুদের ধর্মনষ্ট করার যে প্রবণতার কথা বলা হয়েছে, তাতে মুসলমান
ওসমানের চরিত্রের দৃঢ়তা, স্বধর্মপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু উপরের উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশেও বিবিধ প্রকার অঙ্গভাষা বা অঙ্গসঙ্কেত করে ওসামান-জগৎসিংহ ও বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রত্রয়কে মানবীয় আচরণসমৃদ্ধ প্রত্যক্ষবৎ করে তুলতে পেরেছেন।

৬. উক্ত উপন্যাস থেকে আরও কিছু উদারহণ নেওয়া যেতে পারে।

৬.১.ক. 'রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন তাঁহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিয়া আয়েষার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন [ঐ : পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পৃ. ১২২]।

৬.১. খ. 'আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন।' [ঐ : পৃ. ১২১]

৬.১. গ. 'আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শতখণ্ড হইলে কহিলেন' [ঐ : পৃ. ১২২]

৬.২. আয়েষার নীরবে অশ্রুপাত কিংবা গোলাপের পাপড়ি ছিন্ন করার মধ্যে দিয়ে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার নিঃসীম ভালোবাসা, নিখাদ প্রেম,— যা কখনও সার্থক হবে না [ধর্মের ভিন্নতার বাধা]: অধিকন্তু জগৎসিংহের হৃদয়-মকুরে 'বীরেন্দ্র সিংহের কন্যার' প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়ে আয়েষা হৃদয়ে যে মনোবেদনা, প্রণয়ের হাহাকার সৃষ্টি করেছে তা লক্ষ লক্ষ শব্দ-বাক্য ব্যবহার করেও বোঝানো যেত না, যা মাত্র দুটি আঙ্গিক [অভিনয়] আচরণ প্রয়োগ দ্বারা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৬.২.১. অধিকন্তু উক্ত আচরণ/ ক্রিয়া অঙ্গভাষার ব্যবহারঐ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে [পৃ. : ১২৩] আয়েসার দুরন্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস, বাঙলা সাহিত্যের অতি পরিচিত ও অতি বিখ্যাত প্রেম-বাক্য 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' হয়ে ঝরে পড়েছে। অর্থাৎ ওপরে উদ্ধৃত ৬.১, ৬.১.ক, ৬.১.খ. অঙ্গ ভাষাগুলি একে একে প্রয়োগ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বরে' পৌঁছেছেন। নাটকীয়তার ঢেউ ভেঙে ভেঙে পরিণতির সমে পৌঁছানো,— বাঙলার **প্রথম উপন্যাসে** কি ভাবে সম্ভব হলো?

৬.২.২. এই প্রসঙ্গের শেষে আরও একটি কথা বলা দরকার। আমরা ঐ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখেছি আয়েষার হৃদয়ে প্রেমের যে স্ফোটক গুটি বেঁধেছিলো তা প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক হয়ে আয়েষাকে নিঃশেষ করে দেয়। 'সমাপ্তি' পরিচ্ছেদ-এ— তিলোত্তমা-জগৎসিংহের বিবাহ সম্পাদিত হবার পর আয়েষা গরল পান করতে গিয়েও গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ প্রাকারের জলে নিক্ষেপ করলেন এবং আত্মগত হয়ে বললেন : 'যদি এ যন্ত্রণা সইতে না পারিলাম তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?'— 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না — ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে' [শ্রীকান্ত ১ পর্ব / ১২ পরিচ্ছেদ]।

৭. এবারে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের **দ্বিতীয়** উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬]-য় অঙ্গভাষার ব্যবহারের সার্থকতা সম্বন্ধে মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বলবো।

৭.১. এই উপন্যাসে প্রকৃতি-কন্যা কপালকুণ্ডলা খুবই কম কথা বলেছে— কিন্তু তার চোখ-দেহ নানাভাবে বহুবিধ ভাষা-ভাব প্রয়োগ করেছে। তার অনুপম রূপাবলী অরূপ হয়ে উঠেছে। তার 'বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়,' যা কিনা নবকুমারকে উন্মাদ করেছে, তার 'হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে গিয়াছে।'

৭.২. এখন কপালকুণ্ডলা ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ থেকে অনন্য একটি উদাহরণ গ্রহণ করবো— যেখানে মাত্র **তিনটি** কণ্ঠভাষা ও **তিনটি** অঙ্গভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিম। প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করা যাক :

৭.২.১. **প্রদীপ নিভিয়া গেল** : অত্যন্ত নাটকীয় এই অংশটুকু। মাত্র তিনটি পদ ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন তা সেই সময়কার তো বটেই, পরবর্তী কালেও এমনটি আর পেলাম কই? নবকুমার আত্মপরিচয় দান করেছেন মাত্র দুটি বাক্যে ১. নিবাস স্থান এবং ২. নাম। প্রথম বাক্যে 'আমার নিবাস সপ্তগ্রাম' বলার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন মতিবিবি ১. 'উত্তর করিলেন না'। ২. 'মুখাবনত' করলেন ৩. প্রদীপ উস্‌কে দিয়ে 'উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন'।

৭.২.২. এই অঙ্গভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির কোন মনস্তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করলেন? তা দেখা যাক :

প্রথমটিতে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমান বেগে জেগে উঠে হৃদয়কে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে— তাই কোনো উত্তর নেই।

দ্বিতীয়টিতে মুখ নত করার মধ্যে দিয়ে মতি তাঁর হৃদয়ে উত্থিত ঝড়কে মুখাভাসে ফুটিয়ে তুলতে চান নি, যদি ফুটে ওঠে, তবে মুখ তোলা থাকলে তা ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

তৃতীয় প্রদীপ উজ্জ্বল করা কি আশাকে উজ্জ্বল করে তোলা? ইনি সপ্তগ্রামের **সেইজন হন** যদি, তবে অনেকদিন আগে নিভে যাওয়া আলো কি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে? অথচ সাহস হয় না— হৃদয়ের উত্থিত আলোড়ন মুখের আয়নায় ফুটিয়ে না তুলতে তাই মুখ নিচু করে নিজের নাম বলছে 'মতি'। কিন্তু মহাশয়ের নাম শুনে অবশ্যই মতির হৃৎস্পন্দন শতগুণ হয়েছে— মুখভাব আবার রক্তিম হয়ে উঠেছে— সেই ভাব লুকোতে প্রদীপ নিভে গেছে না **নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে**। কিংবা পশ্চিম- প্রদেশীয়া মুসলমানীকে কি এই ব্রাহ্মণসন্তান আবার স্ত্রী-র- স্বীকৃতি দেবে?— অতএব যে আশা শতগুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা নিভে গেল, সব আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর অন্ধকারের কালি লেপে দেওয়া হলো। অননুকরণীয় এই 'অঙ্গভাষা'র প্রয়োগ।

৮. এর পর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩] সম্পর্কে আলোচনা করবো। কুন্দনন্দিনী এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হিসাবে গৃহীত হতে পারে— কারণ বঙ্কিমচন্দ্র কথিত রূপ-তৃষ্ণা সদৃশ **বিষবৃক্ষের** কুন্দই সবচেয়ে স্বাদু বিষ-ফল। তাই সে এই কাহিনীতে সবচেয়ে কম কথা বলেছে। চোখের জলেই তার দুঃখ-বেদনা-আশা-নিরাশা এমনকি সুখও বুঝি ব্যক্ত হতো। তাই বিবাহের পর— 'কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁর সে সুখ হইয়াছিল।' তাই নগেন্দ্রের শয্যায় আশ্রয় পেয়েও সে শুধুই কেঁদেছে। [দ্রষ্টব্য একত্রিংশতম পরিচ্ছেদ : পৃ. ৩১১-২]

৮.১. তার অপূর্ব রূপরাশি, আশ্রয়হীনার অসহায়তা, দুর্বলচিত্ততা এবং কিশোরীসুলভ সারল্যই ['কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না'] তার নিয়তি [character is destiny]। তথাপি সে-ই এই উপন্যাসে সর্বনাশা ঝড় তুলেছে— কণ্ঠভাষা প্রয়োগ করে নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্গ ভাষা বা চোখের জল ব্যবহার করে।

৮.২. চতুর্থ পরিচ্ছেদে কুন্দর অঙ্গভাষা— তার কান্না, 'অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায়' দাঁড়ানো, 'বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্র প্রতি' চেয়ে থাকা এবং আকাশে দেখা তার মৃত মায়ের স্বপ্ন— সব মিলিয়ে সমগ্র উপন্যাসের দুর্ভাগ্যকে তৈরি করে দিয়েছে। বঙ্কিম কুন্দর অঙ্গভাষা দিয়ে তৈরি ঘটনাসংস্থানে মূলত কুন্দের জীবন-পরিণতির প্রতি আমাদের pity and fear জাগিয়ে দিয়েছেন। অধিকন্তু তার অন্তরের অন্দরমহলও আমাদের কাছে অর্গলমুক্ত হয়েছে।

৮.৩. 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : 'ধরা পড়িল'— অধ্যায়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর অঙ্গভাষা এবং তদ্‌-অনুষঙ্গে চোখের জলধারার যে ব্যবহার ঘটিয়েছেন তার দ্বারা কাহিনীর নাট্যমূল্য,— চরিত্রব্যাখ্যান,— ঘটনার গতি দুরন্ত বাঁক নিয়ে চরম ও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কমল কুন্দর যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছে, তাতে এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলরূপী স্টেথোতেই 'মানব সংসারের কারখানা ঘরের হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতু-মূর্তির আঁতের ধুকধুকিটা' প্রথম [কিছুটা মৃদু হলেও] ধরা পড়েছে;—যা বাঙলা সাহিত্যে প্রথম। আমার বক্তব্যের সপক্ষের সাক্ষীর deposition এই রকম :

ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, 'কুন্দ'।

কুন্দ মাথা তুলিয়া চাহিল।

কমল। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল।

কমল বলিল, 'নইলে নয়।—সোণার সংসার ছারখার গেল।'

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, 'যাবি? মনে করিয়া দেখ্?—

কুন্দ **অনেকক্ষণ পরে** চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল 'যাব।'

অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল- মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, **কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।'**

[ওপরের স্থূলাক্ষরগুলির মাধ্যমে আমি বলতে চাই বঙ্কিমের দ্বারাই 'চরিত্রের মন' খোঁজার চেষ্টার সূত্রপাত। আর রবীন্দ্রনাথে [১৯০৩] সেই মনের স্বরূপ ব্যাখ্যা, কার্যকারণের সম্বন্ধ আবিষ্কারজনিত শিল্পসৃষ্টি।]

এ-রকম আরো আছে— তবে আপাতত এটুকুই থাক।

১০. এরপর বঙ্কিমের অপর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৮] উল্লেখ করতে হয়।

১০.১. বৃহৎ এই উপন্যাসে বহুতর অঙ্গভাষার সার্থক প্রয়োগ আছে। আমরা অনন্ত শরীরী-সমুদ্রের লক্ষ-কোটি তরঙ্গভঙ্গের সুবিস্তৃত সংবাদ নেবো না,— মাত্র একটির উল্লেখ করবো যেটি কাহিনীর প্রথমাংশে প্রযুক্ত হয়ে সমগ্র কাহিনীর, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর নিয়তিকে সুনিশ্চিত করেছে।

উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদ-এ চুরি করা উইল ফেরৎ দিতে এসে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে ধরা পড়ে যায়। তখন তার শাস্তিবিধানের জন্য প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে ডেকে পাঠান। গোবিন্দলালের 'কণ্ঠস্বর শুনিয়া রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল।' গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্তের কথা শুনতে পেলেন না। ঐ কটাক্ষ-বাণে গোবিন্দলাল বিমনাভাবাক্রান্ত হয়; ফল, স্নেহরসের উৎসৃজন > শুভেচ্ছা-প্রীতির স্তর অতিক্রম > অচিরে ভালোবাসা এবং প্রেমের মহান মন্দিরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা।

১০.২. মনস্তত্ত্ব পাঠে কুশলী, নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে নাট্যদ্রুতি [tempo] সৃষ্টিতে পারঙ্গম, ঔপন্যাসিক ঐ 'ক্ষণিক কটাক্ষ'কেই একাঘ্নী বাণের মতো গোবিন্দলালের প্রতি প্রয়োগ করলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ করে, অষ্টম-নবম-দশম পরিচ্ছেদ অতিক্রম করে একাদশ পরিচ্ছেদের 'ক্ষণিক কটাক্ষ' [পৃ. ৫৫৬] —উভয়ের নিয়তি নির্ধারিত করে দিল।

১১. বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অঙ্গভাষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করবো।

১১.১. মাত্র ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রায় ছোট গল্পের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ইন্দিরা'। মৃত্যুর একবছর আগে সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে 'ইন্দিরা' ছোট থেকে বড়ো হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

১১.২. এই উপাখ্যানের নায়িকা ইন্দিরা। তার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। তার স্বামী ধনী শ্বশুরের

দ্বারা অপমানিত হয়ে পশ্চিমে চলে যান এবং সাত/আট বছর পরে 'অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি' হয়ে দেশে ফেরেন। এমন পরিবারের মেয়ে ও বৌ পথে ডাকাতের হাতে পড়ে অশেষ লাঞ্ছনা-দুঃখ সহ্য করে কলকাতায় এক উকিলের বাড়িতে রাঁধুনির কাজের সূত্রে আশ্রয় পায়। এই চরম দুর্ভাগ্য যখন তার রূপ-যৌবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-আনন্দকে প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলেছে তখন কেবল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা অঙ্গভাষার সার্থক প্রয়োগ তার সৌভাগ্য-রত্ন স্বামী-সম্পদকে ফিরিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র রসসমৃদ্ধ করে মনোরম বাক্যবিন্যাসে সেই অঙ্গভাষাকে আমাদের পরিবেষণ করেছেন। এখানে সেটি উপস্থিত করা গেলো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটা চোরা চাহনি

'আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে এক্‌বার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল। আমি বিদ্যুচ্চমকিতের ন্যায় একটু অন্যমনস্ক হইলাম। মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন— দেখিতে পাইলেন যে, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছি। আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ করি নাই। তত পাপ এ হৃদয়ে ছিল না। তবে সাপও বুঝি, জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরে না; ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলেই ফণা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। সাপেরও পাপহৃদয় না হইতে পারে। বুঝি সেইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে। বুঝি তিনি একটা কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম।'

এরপর দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আবার ইন্দিরা সুভাষিণীকে বলেছে :

'দুই একটা চাহনি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলাম তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন।'

১২. বাঙলা সাহিত্যে অঙ্গভাষা এবং বিশেষ করে কথাসাহিত্যে তার ব্যবহার ও তা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম। শক্তিমান লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই বিবিধ অঙ্গভাষা ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্যকে রসবেদ্য করে তুলে থাকেন। এ-বিষয়ে, নতুন পথে, নবীন উৎসাহে চলা শুরু করলে গতানুগতিকতাকে পেছনে রেখে বলা যাবে 'এলেম নতুন দেশে'।*



* এই প্রবন্ধ রচনায় আমার কন্যা শ্রীমতী মহুয়া মিত্র মুখোপাধ্যায় এম.এ., বি.এড. বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

বঙ্কিম-চর্চার পরম্পরা....

• • • • • •

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস শিল্প ও সমালোচনা শিল্পের প্রথম সংগঠক-প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র। আমরা সেই আদি পিতারই বংশধর। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথ ও পদ্ধতিকে মজবুত করাই ছিল বঙ্কিমের জীবনের ব্রত। এ জন্য সমন্বয় মার্গে বিচরণ করাকেই তিনি তাঁর প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করেছেন। য়ুরোপীয় দর্শনের 'হাট করা' দরজায় দাঁড়িয়ে হড়্পা বানের গতিবেগকে প্রশমিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। মানবধর্ম ও সাম্য দুই প্রেরণার উপর তাঁর আস্থা ছিল অটুট। কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সমীকরণ ঘটানোই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। বাঙালির জাতিসত্তা ও ভারতীয় দর্শনের বীজমন্ত্র দুয়েরই সচেতন সংরক্ষক হিসাবে তাঁকে পেয়েছি আমরা। চিন্তনে-মননে তাঁকে খাঁটি বাঙালি বলাই বেশি শোভা পায়। দেশীয় জীবনকাঠামোয় প্রগতিশীল নবসভ্যতার চিহ্ন উৎকীর্ণ করাই ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের মূল কাজ ছিল একথা বুঝতে আজকে আর কোন অসুবিধে নেই।

প্রগতিশীল নবসাহিত্যের জাগ্রত প্রহরী অপোষহীন সংগঠন ও সংস্কার কাজে নিরন্তর হাত লাগিয়ে অনেকের অপছন্দের শিকার হয়েচিলেন। উপন্যাসের পাঠককুলকে সংগঠিত করার জন্য শক্ত হাতে (grip) রুচিকে তৈরি করা ও ধরে রাখা, বাঙালি পাঠকের নবজাগ্রত মনীষাকে যোগ্য সমালোচনার মডেল সরবরাহ করে যুক্তিবোধের পথনির্দেশিকার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি ছিল যথেষ্ট দুরূহ। তারও চেয়ে কঠিন কাজ ছিল অনুরাগী সহ-লেখকদের নিয়ে স্কুল বা গোষ্ঠী তৈরির কাজ। বঙ্গদর্শনের অনুগামী লেখকরা একসুরে শৃঙ্খলিত কাজে না নামলে উনিশ শতকের উত্তরার্ধে জাতীয়তাবোধের অনুশীলন পর্ব থম্‌কে থাকতো একথা স্বীকার করতে আজকের দিনে কোন দ্বিধা রাখার জায়গা নেই।

প্রথম প্রবর্তনার ঐতিহাসিক গৌরববোধ বঙ্কিমী প্রতিভার প্রতি একাংশের সংশয় ও অনীহাকে ছাপিয়ে গিয়েছে বলেই আজও বঙ্কিমের কাছে অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকারের এত ঘটা। বস্তুত উনিশ শতকের প্রাণপুরুষ বঙ্কিম ও বিশ শতকের চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ এই দুই ডানায় ভর করেই বঙ্গ দর্শনের পক্ষপুটে লালিত বাংলা সমালোচনা নিজের সক্ষমতাকে প্রকাশ করার পথ পেয়েছিল। ফলত বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-সমালোচনার সমান্তরাল ধারাক্রম মনস্ক বাঙালির চোখে পড়ার কথা। একটু মনোযোগ রাখলে দেখা যাবে, এই দুই ধারার চর্চা-সমালোচনা স্রষ্টা-ব্যক্তিত্বের ধাতু প্রকৃতির দ্বারাই কার্যত নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। যাঁরা ক্লাসিকতার অনুরাগী তাঁরা বঙ্কিমের সাহিত্যের ধ্রুপদী ঠাটকে ধরায় সক্ষম হয়েছেন, আর যাঁরা অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যে আসক্ত তাঁদের হাতেই রবীন্দ্র-সমালোচনার রাশ থেকে গেছে। পন্থার দিক দিয়েও যাঁরা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দক্ষ, হয়তো তাঁদের কাছেই বঙ্কিম-সমালোচনার চাবিকাঠি গচ্ছিত আছে।

দুই শতকের বঙ্কিম-সমালোচনার পরম্পরাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে ভাগ করা যায়। বঙ্কিমের জীবৎকাল এবং প্রয়াত বঙ্কিমের উত্তরাধিকার বহন করে এই তাৎপর্যে ধরলে উনিশ শতক ও বিশ

শতকের পর্যালোচনার প্রকৃতিগত ভেদ সুস্পষ্ট ভাবে নজর করা যায়। উনিশ শতকের শেষ ভাগে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্রে রেখে প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রে বঙ্কিম-চর্চার যে আন্দোলন, তার লক্ষ্য ছিল, বঙ্কিম-বরণ, বঙ্কিমের সাহিত্য সংস্কারের কাজকে সাধুবাদ জানিয়ে সংগঠিত সহযোগিতায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানো। অবশ্যই এর সঙ্গে সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনবোধের তাড়না জড়িয়ে ছিল। নব্য হিন্দুত্বের প্রচারে বঙ্কিমের নেতৃত্বদানের পক্ষে বড় সমর্থন এই উদ্যোগের পক্ষ থেকে এসেছিল। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক বঙ্কিমের ওজনকে তৌল করা হয়েছিল এই মানদণ্ডেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' এবং বীরেশ্বর পাঁড়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' এই প্রেরণারই সোচ্চার উদ্দীপ্ত প্রকাশ। চন্দ্রনাথ বসু, সুরেশ সমাজপতি, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির বঙ্কিম জয়গানে এরই প্রতিধ্বনি। পাশাপাশি উপন্যাস-স্রষ্টা বঙ্কিমের প্রতি সমকালের সম্মোহনের উদ্দীপনা ও বঙ্কিম সমালোচনার আর এক লক্ষণ ছিল। বঙ্কিমের [High Romance]। 'তাঁর নৈতিক চরিত্রায়নের বৈশিষ্ট্য এবং গল্পজমানোর চমকপ্রদ জাদু সমালোচকদের আকর্ষণের বিষয় ছিল। পূর্ণচন্দ্র বসুর 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' [চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর ছাঁদে লেখা] এবং বঙ্কিমী রোমান্সের নায়িকাদের উপর্যুপরি বিশ্লেষণ। Calcutta Review পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসুর বঙ্কিম-সৃষ্টির সোৎসাহ আলোচনা এরই নিদর্শন। অবশ্য পদ্যস্ত হিন্দু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীত কটাক্ষের ['বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী'] দংশনজ্বালাটুকুও বেশ উপভোগ্য ছিল। এই পর্বের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি একালের পাঠকের ভ্রূ-কুঞ্চনের কারণ হলেও বলতে হবে, বঙ্কিম-অনুরাগের যূথবদ্ধ সম্প্রচারে সাহিত্যিক বঙ্কিমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিফলে গেলে সাগর-পারের দার্শনিক রসায়নের ফলপ্রদ মডেলটি আমাদের অধরাই থেকে যেতো। প্রয়োজনে শক্তি, সংহতি ও প্রেরণা সন্ধানের জন্য আর কোন্ আকর-দৃষ্টান্তের দিকেই বা আমরা হাত বাড়াতে পারতাম!

বঙ্কিম-চর্চা তার দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছালো বিশ শতকের প্রথমার্ধে। বঙ্কিম-সাহিত্যের রসালোচনার মুখ প্রথমেই অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্প-কাঠামোর ছকে ফেলা বঙ্কিম-উপন্যাসের কেজো সমালোচনার মুখ ঘুরে গেল আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত অনবদ্য সমালোচনা 'রাজসিংহ' থেকে। একটাই দৃষ্টান্ত। কিন্তু অনুভবী সমালোচনাকে আর পিছন দিকে ফিরে তাকাতে হলো না। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কে বড়ো—ইতিহাস না উপন্যাস, এদের মিশ্রণ-অনুপাত কী, এইসব কূটতর্কের ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়ার পথ দেখা গেল। রাজসিংহের তীব্র গতিবেগের শিল্পগত তাৎপর্য অপূর্ব মানদণ্ড পেল। সৃষ্টি-তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নব্যপন্থার ঘোষণা পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে [সমালোচনা পূজা... ইত্যাদি], অথচ তাঁর নিজের হাতের প্রয়োগ-কৃপণতা আমাদের মনে ক্ষুণ্ণতাই রেখে গেল।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক বিকাশধারায় বঙ্কিমী অবদানের মূল্যায়ন করার তাগিদ চোখে পড়লো। প্রথম প্রবক্তা যেমনই হোন, তাঁর পদচিহ্ন খোঁজা একটা প্রচলিত সাহিত্যিক রেওয়াজ। তদুপরি বঙ্কিম আবার জবরদস্ত্ আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব। তাই নবশতাব্দীর [বিশ শতক] সূচনা থেকেই তাঁর স্মরণ-বরণের পালা চললো। উপন্যাসের শিল্প-মার্গকে আলাদা করে এনে তার নিজস্ব গতি-প্রকৃতির চালকে ধরার জন্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্বশীল দৃষ্টান্ত-স্থাপনার কাজে এগিয়ে এলেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কালজয়ী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলো 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। ইংরাজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য মানুষটি ইংরাজি সাহিত্যে ইতিহাস গ্রন্থনার বিজ্ঞানসম্মত অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনসূত্র যুগ, প্রবাহধর্ম এবং ব্যক্তি অবদানকে লক্ষ্যে রেখে শ্রীকুমারবাবুর অনন্য কৃতির মূল্য আজও অম্লান। বঙ্কিমের যুগন্ধর ভূমিকা তাঁরই সাহিত্যের রসোজ্জ্বল বিশ্লেষণে কীভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে

তারই স্মৃতি সঞ্জীবতায় আজও আমরা মন্ত্রমুগ্ধ।

বঙ্কিমের মনন-বৈশিষ্ট্যের উদ্ধারকর্মও বিশ শতকীয় ভাবনায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর মনন সঞ্চালনের কেন্দ্রীয় শক্তি হলো তাঁর সমন্বয় ধর্ম। যুগবাহিত অভিপ্রায়গুলিকে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দর্শনে জারিত করে নিয়ে আকার দেওয়াই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। মিল, বেন্থাম, কোঁত্, রুশোর মানবদর্শনকে ধারণ করার যৌক্তিকতাই তাঁকে একাজে চালিত করেছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্যেই পাশ্চাত্যের ব্যবহারিকতাকে মান্য করার বঙ্কিমী ভঙ্গিমাটি সমালোচকদের বিস্ময়াপন্নতার হেতু হয়ে উঠেছিল। মোহিতলালের 'বঙ্কিম বরণ' থেকে শুরু করে সুবোধ সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র', ভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' ইত্যাদিতে এই ধারানুসৃতির লক্ষণ দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত নবীন প্রজন্ম আমাদের কালে বঙ্কিমী সমালোচনাশক্তির বহুধা বৈচিত্র্য এবং ক্ষুরধার শক্তির দিকটিকে ধরার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছে। বঙ্কিমী মনীষার যথাযথ ভরটিকে সন্ধান করার কৌতূহল একালের সমালোচনায় পরিদৃষ্ট হয়ে উঠছে। বঙ্কিম শুধু একাই সর্বেসর্বা নন, তাঁর শক্তির ব্যাপ্তি ও সঞ্জীবতা সঞ্চারিত হয়েছে সমকালীন অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে। এঁদের মিলিত মনীষার মধ্যেও বঙ্কিম অনুস্যূত হয়ে আছেন অপরিহার্যভাবেই, এই আবিষ্কার হয়তো আমাদের কালের বোধির মধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে।

তৃতীয় ধাপে আমরা পৌঁছাতে পারি আমাদের কালের কথায়। পঞ্চাশ-ষাটোত্তর বয়সের সমালোচকেরা এক্ষেত্রে হয়তো অক্লান্ত সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের কথাই আগে স্মরণ করবেন। কারণ বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞ হিসাবে একালের মানসিকতায় তাঁর একটা জায়গা থেকে গেছে। এবং এ-সম্মান সম্পূর্ণভাবে তাঁর অর্জিত, লবিতন্ত্রের দোর ধরে তাঁকে এ জায়গায় পৌঁছাতে হয়নি। যতটুকু জানি, ইতিহাসচর্চা সম্বন্ধে তাঁর একটা পৃথক বোধ আছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখেও উপন্যাস সম্বন্ধে এক নয়া ঐতিহাসিক অভিনিবেশ নিয়েই এই বয়সে তিনি উপন্যাস সাহিত্যের পর্বভিত্তিক ইতিহাস রচনায় এখনো পর্যন্ত ছয়টি খণ্ড প্রকাশ করে ফেলেছেন। শ্রদ্ধা-ভক্তির নিয়ম-কৃত্যের বাইরে নতুনকালের মানুষ হিসাবে পুরানোদের সাহিত্যিক মানদণ্ডে ঝাড়াই-বাছাই করে নিয়ে শুধু তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার অংশটুকুকেই তিনি ইতিহাসের ভাঁড়ার থেকে তুলে নিতে চান। তাই অভ্যস্ত দায়বদ্ধতার বাইরে থেকে তাঁর মূল্যায়ন প্রকাশের সাহসিক ভঙ্গিমাটি একালের মনে ধরেছে।

বিশ শতকের উত্তরার্ধের বঙ্কিম-চর্চায় ক্ষেত্র গুপ্তকে পথিকৃৎ বলা যায়। মোহিতলালের ধ্রুপদী ধারা এবং রবীন্দ্রনাথের রসাত্মক উপভোগ সমীকৃত হয়ে ড. গুপ্তকে একটা অনুসরণ-যোগ্য মানদণ্ডে পৌঁছে দিয়েছে। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার উপর দাঁড়িয়ে যুগের অগ্রসর মূল্য-চেতনার নিরিখে বঙ্কিমের সাহিত্যিক সঞ্জীবতার সার অংশটুকু নিষ্কাশন করাই তাঁর কাজ, অবশ্যই এজন্য প্রথাগত আপ্তধারণা থেকে নিজেকে সর্বাগ্রে মুক্ত রেখেছেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর বহুগামী অনুসন্ধিৎসার ঝলকগুলি একালের চিন্তারাজ্যে আলোড়ন তুলেছে। যেমন, বঙ্কিমের ধীশক্তির মূলে শাক্ত সাধনার নিগূঢ় বীজমন্ত্রকে আবিষ্কার করা এবং তারই উদ্ভাস হিসাবে সৃষ্টি বিশেষকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলা। এভাবে অনেক সম্ভাব্য ভাবনার দিকে তিনি অনায়াসে আমাদের পরিচালিত করেছেন। ঐ ধরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে বঙ্কিম-চর্চার এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি। কেন যে নিকট উত্তরসূরী আমরা তাঁকে পুরোধা বলে ভাবছি তার ধারণা এ-থেকে হয়তো কিছুটা স্পষ্ট হলো।

ক্ষেত্র গুপ্তের প্রতি একালীন মান্যতার আরও একটি দিক আছে। বঙ্কিম-চর্চাকে কেবলই নিজের মৌলিক চিন্তার মধ্যে বন্দী করে না রেখে সমকালের সমালোচনাকে উদ্রিক্ত করে তোলার জন্য

প্রাচীন ও নবীনদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন তিনি। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' এবং 'পুনশ্চ বঙ্কিম' যেমন তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নের নিদর্শন, তেমনি 'বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন', 'বঙ্কিমী রঙ্গব্যঙ্গ' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র : বাস্তবতা এবং' তাঁর সম্পাদিত ও পরিচালিত অন্য সব চিন্তার সমাহার গ্রন্থ। সমকালীন বঙ্কিম-চর্চার মধ্যমণি হয়ে উঠে এভাবেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আধুনিক মূল্যায়নের সুব্যবস্থা করতে পেরেছেন। আমরাও কার্যত এ-তত্ত্ব বিশ্বাস করি, যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক অনুধাবন একটা প্রক্রিয়া, আর তাঁর সাহিত্য-সফল রচনা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত রচনার অনবদ্যতাকে সাহিত্যালোকে জাগিয়ে রাখা অন্য এক প্রক্রিয়া। কখন অবয়ববাদের সাহায্য নিয়ে, প্রয়োজনে তত্ত্বের গুহ্যতাকে টেনে বার করে, আরও গভীরতর প্রয়োজনবোধে সাহিত্যিক উপভোগ্যতাকে নানান দিক থেকে জমিয়ে তুলে একজন সাহিত্যিকের যোগ্য তর্পণ করা যায়। ক্ষেত্রবাবুর মতো আমরাও বুঝতে শিখেছি, কোন কালজয়ী সাহিত্যিকের ওজন বোঝার জন্য দু-চারখানা কালজয়ী সৃষ্টি থাকাটাই যথেষ্ট। এজন্য স্রষ্টার রচনার মান কখনও নামতে পারবে না এমন ভাবনাটা বাতুলতা। সমালোচক দ্বিতীয়-তৃতীয় মানের রচনার জটলা থেকে সেই দু-চারখানা হীরকখণ্ডকে তুলে আনতে পারলেন কিনা, সেই সামর্থ্যেই তারও মূল্যায়ন করতে হবে। এই অনুভবের জোরেই বঙ্কিমের খণ্ডিত সৃষ্টির অপূর্বতার দিকে একালের চোখ পড়েছে। বঙ্কিম-চর্চায় ক্রমেই সহজিয়া ছন্দ ফিরে আসছে। পাঠ এবং উপভোগ্যতা এই দ্বৈত মন্ত্রের ছোঁয়ায় বঙ্কিম-সমাচেলাচনায় দুরূহতার অভিশাপ কাটার বোধ হয় সময় এসে গিয়েছে।



উপন্যাসে নতুন ভাবনা : উনিশ-বিশ শতকের আলোকে

• • • • • •

সমরেশ মজুমদার

এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পসরা নিয়ে বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। নিশ্চিতরূপে ভেতরে ভেতরে একটি গভীরতর প্রস্তুতিপর্ব এক অনিবার্য পরিণতি-অভিমুখী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে অনেক লেখকই উপন্যাস নামক অবয়ব-নির্মিতির জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাস-শিল্প যে একটি বিশিষ্ট আঙ্গিককলা নির্ভর, সেই বিন্দু স্পর্শের যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো যাদুকরি বিদ্যার সহায়তা নেন নি, বিষয় ও সৃজননিপুণতার দ্বারা, পাশ্চাত্যসাহিত্যের গভীর পঠনক্রিয়ার সাযুজ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যথার্থ অর্থে উপন্যাসের সৃজন-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। রোমান্সের আলোছায়া প্রেক্ষাপটের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকল, কিন্তু ভিতর-বাইরে উপন্যাসের আদলটি স্পষ্ট হয়ে রইল। এরপর আরো তথ্যনিষ্ঠতা ও আঙ্গিক-সচেতন তাঁর লেখনীসঞ্জাত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত পরিবর্তমানতার কাজ সহজ করে দিতে সক্ষম হল। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো প্রথম রচয়িতার পক্ষে উৎকর্ষে উত্তীর্ণ হওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি, যদিচ দেশকালের বিবর্তনে নতুন নতুন ভাবনা, নব আঙ্গিক অন্যতর মাত্রা এনে দিতে সক্ষম হয়েছে, বস্তুত এটাই প্রার্থিত। আশার কথা এই বাংলা উপন্যাস উন্মেষ-লগ্নে ত্রয়ী ঔপন্যাসিককে পেয়ে ধন্য হয়েছে, যেকোনো উপন্যাস-সাহিত্যে এ-এক দুর্লভ প্রাপ্তি, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যে অক্ষয়কীর্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন—এ ধারাবাহিকতার মূল্য নির্ধারণের চেয়ে সুখদায়ক অনুভূতি আর কিছুই হতে পারে না। উল্লেখ্য এই যে বিশ্ব তথা ভারতবর্ষীয় জীবনে রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কালে এঁরা উপন্যাস রচনায় বৃত হয়েছেন, সচেতন শিল্পী হিসেবে চতুষ্পার্শ্বে নানান উত্থান-পতন তাঁদের রচনায় আছড়ে পড়েছে, বিচিত্র সঙ্কট, বিচিত্র মূল্যবোধের টানাপোড়েন উপন্যাসের সঙ্কটকেও ঘনীভূত করেছে, ফলত বঙ্গ উপন্যাস-সাহিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এক বিস্তৃত ক্যানভাসে তাঁদের অধিকাংশ উপন্যাসকে উপস্থাপিত করেছেন, সমসময়ের মধ্য থেকে উচ্চতর মানসচর্চায় কর্ষিত হয়ে তাঁদের অনেকানেক চরিত্র উঁচুমাপের হয়ে অবির্ভূত হয়েছে। উপন্যাসের সঙ্গে মহাকাব্যের যে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় এ-দুয়ের উপন্যাস পাঠে তাদের সন্নিহিত হওয়া যায়। ত্রয়ীর শেষতম বেছে নিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তের এলাকাকে, সেখানে অন্য অর্থে সহনীয় চরিত্র আছে কিন্তু মহাকাব্যিক উচ্চতার সঙ্গে একাসনে বসানো যায় না, তবু হৃদয়ধর্মের ঔদার্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বাংলা উপন্যাসের যাত্রাপথের উত্তরণে অনেক উপলবন্ধুর সরণি পেরোতে হয়েছে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে এসেছে অভিনবত্ব, বিষয়-বৈচিত্র্য, আঙ্গিক-সচেতনতা—শতাব্দীর নিজস্ব ভঙ্গি নিয়েই বিবর্তনের ইতিপর্ব। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পেরিয়ে চমকপ্রদ উপস্থাপনা উপন্যাস-সৃজনের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয়েছে। স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই একই মঞ্চে আবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

বিংশ শতাব্দীর আগমনধ্বনির মধ্যেই নতুন নতুন ভাবনার রসসিঞ্চন ঘটেছে তাঁর মধ্যে, বৈচিত্র্য কষ্টকল্প প্রক্রিয়ায় নয়, সহজাত স্রোতেই বহমান হয়েছে। অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা, একই উপন্যাসকে সংস্করণে সংস্করণে আমূল পরিমার্জনায় তাঁর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব এতাবৎ বাংলা উপন্যাসে কেউ আবির্ভূত হন নি। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উদাহরণই এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর নিজস্ব সীমা সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন তবু নিজের উপন্যাস রচনার সূচনাপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই অভিভূত হয়েছেন, কিন্তু অচিরাৎ উপলব্ধি করেছেন তাঁর পথ পৃথক, তত্ত্বের প্রতি প্রভূত আকর্ষণ সত্ত্বেও সামাজিক উপন্যাসের রীতিবদল, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব প্যাটার্ন তাঁকে নিশ্চিত এক ভূগোলের সন্ধান দিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট দুটি সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁকে আত্মান্বেষণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। সামাজিক উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব-নির্ভরতা অতিসূক্ষ্ম বয়নে, বাক্য-নির্মিতিতে নতুন পথের প্রদর্শক হয়ে উঠেছিল উপন্যাসদ্বয়। এখান থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বাংলার যথার্থ অর্থে প্রথম রচিত উপন্যাস 'চোখের বালি'-র বিষয় ও বক্তব্যে মাঝে মধ্যেই 'বিষবৃক্ষ'-এর নাম উঠে এসেছে, তথাচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের এই উপন্যাসটি সর্বাঙ্গে ভূষিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে তাঁর পথের বদল ঘটেছে, বিষয়ের অভিনব সংযোজনে, ভাষার বাতাবরণে, ব্যঞ্জনাধর্মিতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের একই পঙ্ক্তিতে আসন নেবার উপযুক্ততার প্রমাণ দিয়েছেন। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে নানান বিচিত্রতার এই সূচনা, এখান থেকে বহুতর অভিনবত্বসঞ্চারী হয়ে উঠেছে বাংলা উপন্যাস—বিংশ শতাব্দী সেই বৈচিত্র্যেরই অন্য নাম।

যেকোনো সাহিত্যের উপন্যাসের পশ্চাদ্‌পটে থাকে সাময়িকপত্রের মহান ভূমিকা—বাংলা উপন্যাস তার ব্যতিক্রম নয়। 'বঙ্গদর্শন' যার অগ্রগণ্যতার দাবিদার, 'ভারতী'র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসকে স্মরণ রেখেও দুটি পত্রিকার অবদান স্বরূপ নতুন যুগের আবির্ভাব না ঘটলে একশ চল্লিশ বৎসর-উর্ধ্ব বাংলা উপন্যাস তার প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারত না, বলা বাহুল্য 'সবুজপত্র' এবং 'কল্লোল' পত্রিকা তথা গোষ্ঠীর কথা এখানে উচ্চারিত হচ্ছে। নিশ্চিত 'সবুজপত্র' দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে, আমূল বদলে দিয়েছে বাংলা উপন্যাসের পথ, আধুনিকতা, নব-উপলব্ধি, অন্তর্গূঢ় জট-জটিল তন্তুগুল্মজালের সন্ধান ১৯১৪-এর সাময়িকপত্রটির প্রধানতম কৃতিত্ব, এর পেছন পেছন এসেছে 'চতুরঙ্গ' [১৯১৬], বাংলা উপন্যাস নতুন বাঁকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এতে যে শুধু বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সঞ্চারিত হয়েছে এটুকু বললে তাকে খাটো করে দেয়া হবে, প্রকরণ ও আঙ্গিক যে চিন্তার কত বদল ঘটিয়ে দিতে সক্ষম 'চতুরঙ্গ'-এর সন্নিহিত না হলে তা অজানা থেকে যেত। লক্ষণীয় এই শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং গভীরতাবোধক উপন্যাস 'গৃহদাহ' একই বছরে রচিত। সময়কে একারণেই স্বীকার করে নেওয়া সঙ্গত। এর মধ্যে কাকতালীয় কিছু নেই, দেশ-কাল-সমাজের নিপুণ শিল্প উপন্যাস—ওর ছায়াসম্পাত সহজাত এবং স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল'-এর ['কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি' একত্র ধরেই] ভূমিকা, অভিনবত্ব, চমক, বিস্তার এবং পরবর্তী সাহিত্যে তার যে প্রভাব এর মূলেই আছে প্রমথ চৌধুরীর বিশাল ও বিপুল প্রচেষ্টা ও প্রযত্ন। উপন্যাসের সৃষ্টির মূলে লেখকের যে অবদান তার চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয় তার জন্যে নির্মিত একটি মঞ্চ, দেশকালের বিচিত্র কোলাহলের উত্তাপের মধ্যে সেই মঞ্চের পটরেখা সৃজনের দায়িত্ব এসে বর্তায় সাময়িকপত্রের ওপর, তার মানের ওপরে। একটি কাল প্রতীক্ষাঘনিম থাকে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের, উপযুক্ত লেখনীর— বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক 'সবুজপত্র'-এর মধ্য দিয়ে সে তিতিক্ষার সময় কাটিয়েছে। মঞ্চটি তৈরি হয়েছে, অতএব ১৯২৩ তার বিচিত্র-

বিস্তারের ডালপালা নিয়ে কখনো স্পেশজ-কখনো কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাব ও প্রবাহ নিয়ে কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল। কুড়ির দশকের মাঝামাঝি থেকে ত্রিশের সময়সীমায় এর আলোড়ন উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। অতি-আধুনিকতা খুব যে জোর করে চাপানো তা-ও নয়, তবে সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে দেখা যায় 'কল্লোল'-এর যে আস্ফালন তা সর্বার্থে নব-আধুনিকতার দ্যোতক হয়ে ওঠে নি, কিন্তু দেশ-বিদেশের সাহিত্যের মেলবন্ধনে, আঙ্গিক ও অপরাপর প্রকরণগত বিন্যাস অভিনবত্বের সঞ্চার করেছিল নিশ্চিতরূপে, তার ফলাফলে উপন্যাসের বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ ওঠে এবং এখান থেকে নবপর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের সাফল্য নির্ভর করে। কোনো কোনো সামাজিক সমস্যার মধ্যে উভয়ের দ্বিধা লক্ষণীয়, তবু সময়ের প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ভুবনকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ের উত্তাল সাহিত্যগোষ্ঠীর কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের সমস্যা ছিল রবীন্দ্রনাথের পথ পরিহার এবং না-রবীন্দ্রনাথীয় জগতে পৌঁছে যাওয়া। 'কল্লোল'-এর প্রকৃতি ও কর্মধারা প্রসঙ্গে সেখানে পৌঁছানো যাবে। এখন বিবেচ্য, সংশয়ের পিঞ্জর থেকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের উত্তরণের পথটি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধের সংকোচ থেকে তাঁকে রূঢ়-বাস্তব সঙ্কটের ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-সমস্যার মূলটি অনুভব করেছিলেন সত্য, নইলে সমকালীন সামাজিক সঙ্কটের নানাবিধ প্রসঙ্গে তিনিই অগ্রগণ্য হতেন না, তিনি দেখেছেন নীতিবাদের দ্বারাই সমাজ শাসিত। এটাই যুগধর্ম, কিন্তু সমাজত্রাতার ভূমিকায় কথাশিল্পী অবতীর্ণ না হলেও এই সঙ্কটের উত্তরণের পথটি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টায় রত থাকতে হয় যাতে সঠিক মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের দিকে মানুষের মুখটি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। 'চোখের বালি'তে এসে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তবু সম্পূর্ণত সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠার জন্যে 'চতুরঙ্গ' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। চরিত্র-প্রধান এই উপন্যাসে বিষয় খুব সহজ-অন্তরঙ্গতায় মিলেমিশে গেছে। উপন্যাস-শিল্পের অভিনবত্বে দুটি মুখ্য অভিমুখ থাকে, সময়ের প্রবহমানতায় বিষয়কে আধুনিক করে তোলা, দ্বিতীয়ত প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তোলা। প্রথম ক্ষেত্রটির প্রেক্ষাপট 'চোখের বালি'তে ছিল, কিন্তু সচেতনভাবে আঙ্গিকের আমূল পরিবর্তন, উপন্যাসের কায়াগঠন, সেই গাঠনিকতা বিশিষ্টতায় বিজড়িত হয়ে সময়কে পেরিয়ে যাওয়ার উপযুক্ততা নিয়ে 'চতুরঙ্গ'ই আবির্ভূত হয়েছিল। বিংশ শতকের উপন্যাসের বহুতর নবীন উপাদানের মধ্যে বক্ষ্যমান উপন্যাসের অভিনব শিল্প-প্রকরণ বাংলা উপন্যাস- শিল্পের সংজ্ঞা পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একবার ১৯১৬-র দিক থেকে ১৯২০-র দিকে ফিরে তাকাতে হয়। 'গোরা'র মতো বিস্তার, মহাকাব্যিক রূপারোপ বাংলা উপন্যাসে আগন্তুক, বিশাল-বিস্তৃত প্রেক্ষাপট আধুনিক উপন্যাসের যে যুগলক্ষণ এই উপন্যাসের সূত্রে বাঙালি পাঠক অবগত হয়, দেশকালধৃত বিস্তার কতো গভীর ও অন্তর্ভেদী হতে পারে 'গোরা' তারই সূচনাপর্ব। এ না হলে আমরা পেতাম না অন্নদাশঙ্করকে, গোপাল হালদারকে এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। 'গোরা' নবযুগের ঘোষক, সেই-ই বস্তুত নবীন উপন্যাসের বিশালতার প্রেক্ষাপট প্রদর্শনে। এই পর্বে আমরা ফিরে আসব, তার আগে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র পরবর্তী পর্বের নতুন ভাবনার বৈচিত্র্যের পসরা নিয়ে সমাজজীবনকে আমূল পরিবর্তনের আয়ুধ নিয়ে সমুপস্থিত কল্লোলীয়দের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনভাবনার পরিবেশ-পরিসরের একটু সংবাদ নেওয়া যেতে পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা দিয়েই শুরু করা যায় 'বস্তুত' কল্লোলীয়েরা' কী চেয়েছিলেন? খুব স্পষ্টভাবেই বলা যায়, জীবনানন্দের ভাষায় "নষ্ট শশা, পচা চালকুমার ছাঁচে"...তাঁদের এক চোখে অশ্রু, অন্য চোখে জ্বালা আর শিল্পীর তৃতীয় নয়নে সুন্দরের ধ্যানমূর্তি।' বৈপরীত্যের এক যুগলস্বরূপের

নামই 'কল্লোল'। যদিও 'কল্লোল' [১৯২৩], 'কালিকলম' [১৯২৬], 'প্রগতি' [১৯২৭], 'উত্তরা'-'সংহতি' [১৯২৩] মিলিয়েই বিস্তৃত কল্লোলবৃত্ত। অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অভিযানের স্বরূপ নির্ণয়ে লিখেছেন, 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বাচিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করবার আলোড়ন', কিন্তু সঙ্গে একথা লিখতে ভুললেন না, 'এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহুল ভাববিলাস'—এর সঙ্গে জানালেন '...সেই যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো'—লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় চিন্তা ও কর্মপন্থার বৈচিত্র্য বা বিরুদ্ধতার বিষয়টি। একটি অস্থির সময়ের উক্তি বলে এগুলিকে ধরে নেওয়া যায়। স্বপ্ন ও কর্মোদ্যোগিতা উভয়েরই প্রতিফলন এ থেকে বোঝা যায়। নবীনতার সাধনার সঙ্গে দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজমের সাযুজ্য ঘটেছিল কল্লোলীয়দের মধ্যে। বস্তুত ভারতীয় এক সংকটারূঢ় পরিস্থিতিতে কল্লোলীয়রা সাহিত্যসাধনা করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, মানবতার ওপর বীভৎস নগ্ন আক্রমণ, হতাশা-জর্জরতার পিঙ্গল ছায়া এসে আছড়ে পড়েছে সর্বত্র, এর মধ্যে বসবাস করে বস্তুত সুস্থ স্বাভাবিক সাহিত্য রচনা বাস্তবিক কষ্টসাধ্য, তদুপরি যদি লেখকবৃন্দের লক্ষ্যের স্থিরতা না থাকে— তাতে নতুনযুগের আগমনবার্তা ধ্বনিত হওয়া কতদূর সম্ভব ভাববার বিষয়। তবু 'কল্লোল'-এর সামনে দেশ-বিদেশের অসংখ্য সাহিত্যের পর্বান্তরের বার্তা ছিল, নির্বিচারে তাঁরা পঠনপাঠন করেছেন রুশ-ফরাসী সাহিত্য, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান সাহিত্য পঠনেও তাঁদের অনীহা ছিল না, 'কল্লোল'-এর সঙ্গে একই বছরে 'সংহতি' বেরিয়েছে। 'বাঙ্গালী'র রুশিয়ার সঙ্গে ১৯১০ সালের পর থেকে একটা যোগাযোগ হচ্ছিল'। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'কল্লোল'-এ লিখলেন 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী'। এর সঙ্গে সহাবস্থান ঘটল ফ্রয়েড, এলিস, ইয়ুং প্রভৃতি মনোবিকলনের তত্ত্ব। ভাবনা ও পঠনে সে-এক হরিহরছত্রের মেলা। এতে কতখানি কালবদল সম্ভব বিচার করে দেখা হয় নি। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় নতুন চিন্তা, নতুন চেতনায় বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছিল। 'কল্লোল' এর পুরোহিত। রুশবিপ্লবের অমোঘ প্রভাব এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব একই আধারে পান করেছিলেন কল্লোলীয়রা। সমাজতন্ত্রবাদ যেমন নতুন চিন্তার জগতে তাঁদের নিয়ে গেল, তেমনি এতকালের 'দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাস' থেকে তাঁদের দেহবাদী বাস্তব বিচারের পথ প্রদর্শন করল, দুই-ই নবীনতার আস্বাদনে ধন্য। রোমান্টিকরা জীবন বদলের স্বপ্ন তো সবসময়ে দেখতেই অভ্যস্ত, রোমান্টিকতায় আপাদমস্তক আবৃত 'কল্লোল' এর থেকে পিছু হাঁটবে কেন? 'বিহুল ভাববিলাস' বিরতিহীন সংগ্রামের সঙ্গী হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই। পুনরায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, 'কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা নৈরাজ্যবাদী হলেও মোটের ওপর নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। কারো কারো মধ্যে তিক্ততা হয়তো কিছু কিছু প্রবল হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো হয়তো মনে হয়েছে যন্ত্রণার এই কারাবৃত্তি থেকে বুঝি কোথাও মুক্তি নেই, কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীয়দের শেষ কথা নয়'। একারণে আপাত বৈষম্য থাকলেও নব নব পথান্বেষণে তাঁদের ভূমিকা কখনোই খাটো করে দেখা চলে না। এ দেশজ নানান সঙ্কোচের আব্রু অপসারণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কল্লোলীয়রা, কখনো তা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে বটে, তথাপি সামগ্রিকভাবে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অনুপযোগী হয়েছিল, এ ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে আমাদের অনেক গোঁড়ামি চূর্ণ হতে দেখেছেন, আবার অন্যতম কল্লোলী প্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্রাংশ, 'জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন-গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি.....'র প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'মনে আছে, মাদার পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?... ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মতো আপাদমস্তক সামঞ্জস্যে ভরা মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কল্লোলীয়দের ভাবনার সঙ্গতিহীনতায় স্তম্ভিত হতেই পারেন। তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি একেবারেই কিছু এই উত্তরাধিকার থেকে পেতে পারেন না? ভাবলে দেখা যায় মার্কসবাদের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় সত্ত্বেও জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ফ্রয়েডকে বাতিল করতে পারেন নি। কোনো কোনো বৈপরীত্য নতুন ধারণার জন্মদান করেই থাকে, তিনি নিজেই বলেছেন ভাবাবেগ সম্পূর্ণত বর্জন করতে পারেন নি, তা পারা তো সম্ভবপর নয়, ভাবাবেগহীনতা কখন কার হৃদয়ের কথা বলতে ব্যাকুল হতে পারে? 'কল্লোল'-এর উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাঁর জীবনাচরণের অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই মিলের সূক্ষ্ম জীবনবোধের কারিগর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা কথাসাহিত্যে। তার অভিনবত্ব বাংলা উপন্যাসকে করেছিল অগ্রসর।

বাংলা উপন্যাসের বহুতর অভিনবত্ব ঘিরে আছে বিংশ শতক। বিষয়, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গিজনিত বিচিত্রতা প্রত্যক্ষ হয় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবে— তিন দশকের এই কথাকারদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও অনন্যতা নতুন মাত্রা যোগ করেছে বাংলা উপন্যাসে। কল্লোলের কোলাহলের মধ্যেই বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসের পটভূমিতে এসে গেছেন। বিভূতিভূষণের সঙ্গে 'কল্লোল'-এর যোগ না থাকলেও তারাশঙ্করের সূচনাপর্বে 'কল্লোল' কালিকলমে'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত ভোলা যাবে না, 'বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমাজ তপ্তোজ্জ্বল' জগদীশচন্দ্র গুপ্তকে। নিয়তির অনিবার্যতা সত্ত্বেও কল্লোলীয় মনগড়া কৃত্রিম ভালোবাসার জগতৎকে নস্যাৎ করে দিয়ে হিংসা-রিরংসা-ক্লেদে-পঙ্কিলতায় সমাকীর্ণ জীবনের বার্তা বয়ে এনেছিলেন তিনি, 'কল্লোল' কালেই, 'কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তন কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ রচনায়' একান্তপর হয়েছেন তিনি। তিনি এক স্বতন্ত্র জগতের দিকে প্রথানুগ বাঙালি কথাসাহিত্যকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, সক্ষমও হয়েছেন, নারীর সমাজের অবস্থানকে এমনভাবে আর কেউ দেখাতে পারেন নি, 'অভ্যস্ত চোখ দিয়ে মানুষ ও সমাজকে দেখেননি এবং বিশ্লেষণ করেননি বলেই জগদীশচন্দ্র আমাদের কাছে বিস্ময়ের।' শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র ও জগদীশচন্দ্রের নারীচরিত্রের মূলগত পার্থক্য লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বাস্তবতার মূলে নিহিত। 'জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির সংখ্যা ও বিশিষ্টতা বহুতর। আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্যও তাদের যথেষ্ট। বহুক্ষেত্রে তাদের কামনা-বাসনা স্পষ্ট। পেটের ক্ষুধা ও দেহের বাসনা গোপন করবার চিৎপ্রকর্ষপূর্ণ কৌশলটি তাদের অজ্ঞাত। এ এমন একটি সমাজ ও কাল ইচ্ছে করলেও শুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব নয়।' 'কল্লোল' যে যৌনজীবনের আস্ফালনটুকুই প্রকাশ করেছে, ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকর্মে তাকেই বাস্তবরূপ দিতে জগদীশচন্দ্র সক্ষম হয়েছেন। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছনোর পূর্বে এই নতুন তথ্যের দিশারীর আলোচনা সঙ্গত বলেই মনে হয়েছে। এবার বিভূতিভূষণের অন্যতর জগতের সম্মুখীন হওয়া যেতেই পারে, আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বাক্য ব্যবহার করতেই হচ্ছে : 'ঝড়ের যুগে তাঁর প্রশান্তি ঈর্ষণীয়'—এর মধ্যে দিয়ে সমকালীন পটভূমিকায় লেখকের অবস্থানটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রসঙ্গত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যায় : 'এই বিভূতিভূষণের আওতায় এসে শনিবারের চিঠি তার সুর বদলাতেও শুরু করল। অর্থাৎ সে স্তুতি ধরলে।' বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে জুড়ে জানাতে চেয়েছেন, বিভূতিভূষণ তাকে তাঁর উপন্যাসে এমন অনায়াস সাফল্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন, এর দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। 'পথের পাঁচালী' সেই অনন্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল, তাঁর স্বপ্নের দুই উপন্যাস 'দেবযান' ও 'ইছামতী' নতুন বিষয় ও তার ব্যবহারে নিপুণ দুই আলেখ্য। নদীভিত্তিক উপন্যাসের অভাব নেই বাংলা সাহিত্যে, কিন্তু 'ইছামতী' যেন লেখকের নিজ

হাতে গড়া এক নদী, পার্শ্বস্থ মানুষেরা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসদৃশ। 'দেবযান'-এ স্বপ্নময় এক মানুষের ইহলোকের কাহিনী যেন বিবৃত হয়েছে পরলোকের পটভূমিকায়—এ আস্বাদনও নতুন পৃথিবীর সঙ্গে মানুষকে বিজড়িত করে। 'নির্বাণ তাঁর চরম লক্ষ্য ছিল না, বিচিত্রলোকে অভিনব সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ উপভোগই তাঁর কাম্য ছিল। সেইজন্য মৃত্যু তাঁর কাছে ঐহিক বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বলে বিবেচিত হয় নি, মৃত্যু তাঁর কল্পনায় জীবনের নতুন ক্ষেত্রে বিচরণ করার অবলম্বন।' বস্তুত নিশ্চিন্দিপুরই তাঁর অন্বিষ্ট, আমাদের বিস্মৃতপ্রায় বাল্যজীবন নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' বাংলা উপন্যাসের এক অভিনব দিকদর্শন।

বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিশালতায় তারাশঙ্করের তুল্যমূল্য অন্য কেউই নন, আঞ্চলিকতা থেকে তাঁর সাহিত্যের উদ্বোধন, কিন্তু অঞ্চল-উত্তীর্ণ মহিমায় তিনি আধিপত্য করে গেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে। Complete Novelist-এর শিরোপা তাঁর মাথাতেই শোভা পায়। দেখেছেন জীবন অজস্রভাবে, সেই দেখা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে, সেবাব্রতীর ভূমিকায় আসীন থেকেছেন, দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে মানুষের দুর্গতি লাঘবের জন্যে প্রাণপাত করেছেন, জমিদারি মহিমার দিকটি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজের অচ্ছুৎ মানুষদের সঙ্গে একত্রে পা মিলিয়ে চলেছেন, তাদের নিজস্ব জীবনধারা, শুভ-অশুভবোধ, সংস্কার- কুসংস্কারের সঙ্গে নিবিড় হয়েছেন, এদের বিচিত্র জীবনপদ্ধতির নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, কাহার-বেদে-ডোম-বাউরী-বীরবংশী-সাঁওতাল-বাগদী ও বাঁশবাঁদির লাট জাঙল ও সাঁতালীর বিষবেদে, হিজল বিলের একান্ত গভীরতর সংবাদ পরিবেশন করেছেন। বেদেদের অবলুপ্তির জন্যে অস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা একান্তভাবে তাঁরই চরিত্র থেকে উদ্ভূত। মহাকাব্যিক ব্যাপক আয়োজন তাঁর উপন্যাসে। 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম'-এর বিপুল বিশাল মানবজীবনের কোলাহল মুখরিত অধ্যায়ের তিনিই ভাগ্যবিধাতা। 'আরোগ্য নিকেতন'-এর জীবনমশায় ও প্রদ্যোৎ ডাক্তারের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে জীবন ও মৃত্যুর রহস্যের দ্বারপ্রান্তে মানুষকে নিয়ে এসেছেন—অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর রঙ-রূপ-গন্ধ কী বিচিত্রভাবে আপতিত হয় মনুষ্যজীবনের ওপর, তার ঠিকানা খুঁজতে চেয়েছেন। এই লেখকই কাহারদের লোক-সংস্কৃতির জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করেন, মনুষ্যজীবনের অন্তর্গত আদিম সর্প-অভিপ্রায় তাঁর চিন্তা থেকে দূরবর্তী থাকে না। আবার Tribal Heroism বর্ণনাতেও তাঁর আগ্রহ বড়ে কম নয়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় এত বিচিত্র কর্মশালার কারিগরে তিনি পরিণত হলেন কী করে, অথচ তাঁকে 'আঞ্চলিক' তক্‌মা দিয়ে অনেকেই খাটো করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এইরকম আদিজনজীবনের কথাকার, জীবনবৃত্তির মানুষের উপকথার জগৎ, মনুষ্যসম্বন্ধের প্রাচীনতম উপাখ্যানের চিত্রকরের পথ চেয়েছিলেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা তো তিনি পূরণ করেছেনই, অপিচ ব্যাপ্ত জীবনপিপাসার আস্বাদনে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে ধন্য করেছেন, নতুন ভাবনা, নতুন জীবন, নতুন মানুষ, অন্ত্যজ জীবন-কথকতার অপূর্ব লীলারহস্য এমনভাবে উন্মোচিত হতে বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নি। সেদিক থেকে বিংশ শতকের বাংলা উপন্যাস ধনী, ঋদ্ধ ও বিস্তৃত হতে পেরেছে, মাটির কাছাকাছি মানুষ তো বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায় নি, তারাশঙ্কর একাই অজস্র হয়ে তার অভাব পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দী শিল্প-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরের এমন এক কাল যখন একের পর এক পালাবদলের সঙ্কেত নিয়ে এসেছে, কথাসাহিত্যের সেই দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হবার কোনো কারণ নেই। একজন লেখক তো তাঁর সমকালের নিপুণ চিত্রকর, তাই তাঁর রেখা ও রঙে নানান ছবি ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। বিষয়টি বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে পুলক ও বিস্ময় সঞ্চার করে। আলোচ্য নতুন পথান্বেষণে ব্যস্ত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভূতিভূষণের অরণ্য ও মানুষের

সহাবস্থান, তারাশঙ্করের বৈচিত্র্য ও এপিক লক্ষণাক্রান্ত বহুবিধ উপন্যাসমালা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা স্বল্পাক্ষরে বর্ণিতব্য নয়, তবুও এর সঙ্কেতসূত্রটি সামনে রাখলে নতুনত্বের প্রভায় বাংলা উপন্যাসকে আলোকিত দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার নাম। নিজে জানিয়েছিলেন তিরিশের আগে কারো উপন্যাস রচনা করা উচিত নয়, অভিজ্ঞতার গাঢ়তা না থাকলে লেখক সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন না, কিন্তু নিজেই এ প্রথা তিনি ভেঙে ফেলেন, মাত্র ২৮ বছর বয়সে তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' লিখে বাংলা উপন্যাসের ললাটে চিরন্তনতার পতাকা উড্ডীন করেছেন। নিজেকে একটু একটু করে প্রস্তুত করার পিছনে যুগ-সংশয়িত অভিজ্ঞতা, মানবমনের গভীর কূটৈষণা ও বিজ্ঞান প্রভাবিত বস্তুবাদী প্রত্যয় বিশেষভাবে কাজ করেছে। বস্তুধর্মিতা উপন্যাসের ভেতর-মধ্যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে আর কারো চোখে তা ধরা পড়েনি। তাকে দেওয়া 'a belated kollolian' আখ্যা অনেকখানিই তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সম্পূর্ণত নয়। যুগযন্ত্রণার ব্যথাদীর্ণ আর্তনাদ তিনি শুনেছেন, তাই স্পষ্টত উচ্চারণ করেছেন ভদ্রজীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার কথা। তিনি শ্রমজীবী-মজুর-চাষিদের মধ্যে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন—প্রকৃতপক্ষে মার্কস-এঙ্গেলসকে জেনে আরো বেশি সচেতন ও সক্রিয় হয়েছেন। কল্লোলীয়রাও এ-দুজনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ওইটুকুই, তাঁদের আত্মস্থ করে সাহিত্যের প্রবহমানতার তত্ত্ব ও তথ্যকে পৌঁছে দিতে আপরগ হয়েছেন, এখানেই মানিকের অভিনবত্ব ও নতুন বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে। ১৯৪৪-এ তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তখন আরো বেশি করে দায়িত্ব সচেতন হয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহে একান্তমনা হন, নইলে কেমন করে লিখবেন 'দর্পণ' [১৯৪৫], 'চিন্তামণি' [১৯৪৬], 'চিহ্ন'-এর [১৯৪৭] মতো উপন্যাস। 'চিহ্ন' বাংলা উপন্যাসের নতুন পথের নিদর্শক, একসময়ের সমাজবিমুখ, সম্মুখে ঘটে যাওয়া মানুষের বুকফাটা কান্না ও আন্দোলনের প্রতি উদাসীন হেমন্ত বুঝেছে, 'পৃথিবীটা সত্যই বদলে গেছে। কল্পনাতীত ঘটনা সত্য সত্যই আজ ঘটছে তারই চোখের সামনে; দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ছেলেদের মধ্যেও। নতুনভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে—নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়।' এ থেকেই প্রতীতি জন্মেছে মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রদেরও একটা অংশ আছে, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এ চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়া বস্তুত এক নতুনকালের কর্মযজ্ঞের আহ্বানের কাজ করেছেন লেখক। যদিও ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারেন নি লেখক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের বিপুল সমারোহে বস্তুচেতনার যথার্থতা দেখিয়ে নতুনকালের উদ্বোধন করেছেন।

বাংলা উপন্যাসের মহাকাব্যিক পর্ব শুরু হয়েছিল 'গোরা' উপন্যাসের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। সেই স্রোত বহতা হয়েছে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'কে আশ্রয় করে এবং এছাড়াও মহাকাব্যিক উপাদান আরো অনেকগুলি উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, বিভূতিভূষণের অপু কথামালার মধ্যে মহাকাব্যিক বিস্তৃত লক্ষ্য করা যায়, বিস্তার ও গভীরতার দিক থেকে আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' মহাকাব্যিক পরিকাঠামোর সমতুল, প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ও 'লালকেল্লা' একই ধারাবাহী; এক্ষেত্রে বিস্মৃত হবার উপায় থাকে না গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে', 'পৌষ ফাল্গুনের পালা' ত্রয়ী উপন্যাসের পটভূমিকা ও বিস্তার, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর দুই চরণ মহাকাব্যিক মর্যাদা অবশ্যই পাবার যোগ্য। যদিচ তৃতীয় খণ্ডের রচনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সময়াভাবে লেখা হয়নি, আমাদের কাছে হয়তো আরো বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকতো। এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিমল

করের 'দেওয়াল' অন্যতর ভাবে যুগযন্ত্রণার বিস্তারের আলোকে উদ্ভাসিত, খণ্ডত্রয় 'ছোটঘর', 'ছোটমন', 'খোলা জানালা' একত্রিত হয়ে এক অখণ্ড চিত্র তুলে ধরেছে। ১৯৫৫-এ লিখিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' ভঙ্গুর সময়ের যে দলিলচিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, তাতে যে মহাকাব্যিক আয়োজন বহুতর পরিমাণে প্রাপ্তব্য—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আরো পরে সমরেশ বসুর 'যুগ যুগ জীয়ে'তে বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত থেকে স্বাধীনতা-উত্তরকালের বিস্তৃত জীবনবিন্যাস বিবৃত, একজন নিষ্ঠাবান বামপন্থী কর্মী সাহিত্যিকের পক্ষেই একমাত্র এরকম একটি উপন্যাস উপহার দেওয়া সম্ভব। এ-সব উপন্যাসের পশ্চাদ্‌পট ভুলে গেলে চলবে না, যেখানে মহাকাব্যিক বিস্তারের সঙ্গে চেতনাপ্রবাহরীতি সমন্বিত হয়েছে, বলা বাহুল্য এখানে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম ছ'খণ্ডের উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-এর পাশাপাশি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আর্বত', 'মোহানা'র কথা বিস্মৃত হলে চলবে না, মনে রাখতে হবে গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর-একদিন'কে—'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ বারংবার উঠে আসে এই কারণে যে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রবর্তক উইলিয়াম জেমস তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ The Principles of Psychology-তে মানবচেতনার সঙ্গে প্রবহমান জলধারার তুলনা করছেন। বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের নতুন ভাবনায় এই নতুন চেতনার সংযোজন উল্লেখযোগ্য। 'এক আত্মনির্ভর নিঃসঙ্গতা প্রীতি'র সঙ্গে রবীন্দ্র-ভাবনার খুব মিল থাকলেও কালক্রমে বিভিন্ন রচয়িতার হাতে পড়ে interior monologue ও solioque-র সংমিশ্রণে বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এপিকধর্মিতা জ্ঞান-পিপাসা, তথ্যাকাঙক্ষা ও ধর্মবোধের নিয়তির এক অমোঘ পরিণতির কথা উচ্চারিত হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন 'জয়েস প্রুস্তের ছায়াচ্ছন্ন সে নদী' তাঁর মনে হয়েছে 'বুদ্ধির উগ্র প্রহরায় ক্লান্ত মন মুক্তি খুঁজছে—এই হল ধূর্জটিপ্রসাদের বিষয়'। মননপ্রাধান্যের এই জগতের সঙ্গে বনফুলের অপূর্ব টেকনিকচর্চা 'নির্মোক', 'সে ও আমি' 'জঙ্গম', 'ডানা' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সীমারেখায় বঙ্গদেশীয় শিল্প-বাণিজ্য-সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উনিশ বিশেষত বিশ শতকে তার তীব্রতা বেশি, বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে নতুন নতুন খাতে সেই স্রোতোধারা দুর্বার হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয় এই যে দুই বিশ্বযুদ্ধ, দেশ দ্বিখণ্ডীকরণ, নতুন নতুন ধাক্কা—কখনো রাজনৈতিকভাবে, কখনো ভঙ্গুর অর্থনীতির চাপে, কখনো সমাজের নানান ভাঙন নতুন নতুন ভাবনা ও চিন্তার প্রবাহে ঊর্মিচঞ্চল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ-মহামারী কেবল অর্থনীতিকে ভাঙে না, স্থাবর-অস্থাবরকে চূর্ণ করে না, বিশ্বাসের মধ্যেও ফাটল ধরায়। বিংশ শতাব্দী এত সব ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব সময় মূল্যবোধের উর্ধ্বায়নের পথে যেতে পারে নি, কিন্তু মানুষকে বিপর্যস্ত অবস্থায় সংগ্রামের মন্ত্রটি শিখিয়ে দিয়েছে। মানুষ বিমূঢ় চোখে লক্ষ্য করেছে ভাঙছে একান্নবর্তী পরিবার, পরিবারের আব্রু শিথিল হয়ে আসছে, জীবিকার জন্যে মানুষ ভিটে ছাড়া, তার স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, নারীরা গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষেত্র থেকে বাইরে আসতে বাধ্য হয়ে রূঢ়-কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছে। চরিত্র নষ্ট হতে দেখছে মানুষ; ফলত সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন তৈরি হচ্ছে, সমাজ নামক অমূর্ত ধারণাটির আর কোনো অস্তিত্ব থাকছে না। 'মন্বন্তর' নাম নিয়েই তারাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস শুরু, তখনও দেশবিভাগজনিত আর্তস্বর ধ্বনিত হয় নি। অবশেষে দেশ স্বাধীন হল বটে কিন্তু খণ্ডীকরণ ঠেকানো গেল না, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যে কতো পার্থক্য তা অচিরেই মানুষ অনুভব করল। প্রসঙ্গত একটি কথা না উচ্চারণ করলে বর্তমান সময়কালের উপন্যাসের অপূর্ণতার কথা অনুক্ত থেকে যায়। এই বিশাল দেশভাগকে কেন্দ্র করে উৎকৃষ্ট কিছু গল্প লেখা হলেও উল্লেখযোগ্য

কয়েকটি মাত্র উপন্যাস কেন লেখা হল সেটা বিস্ময়ের হয়েই রইল। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' [১৯৪৪] উপন্যাসের পাশে গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' [১৯৪৪], 'তেরশ পঞ্চাশ' [১৯৪৫], 'উনপঞ্চাশী [১৯৪৬] রচিত হয়েছিল। ইতোপূর্বে আমরা 'চিন্তামণি' [১৯৪৬]-র প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি—এর মাঝে সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' [১৯৪৪]-র উল্লেখ করতেই হয়, কিন্তু দেশভাগের মতো এত মর্মান্তিক স্বজনহারানো বিয়োগ-ব্যথার উপহার ছিন্নমূল জীবনের ইতিকথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে কতিপয় উপন্যাসের কথা, নারায়ণ সান্যাল লিখেছিলেন 'বকুলতালা পি. এল. ক্যাম্প', 'বল্মীক', প্রফুল্ল রায়ের উদ্দীপনাসঞ্চারী 'কেয়াপাতার নৌকো', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন', 'পূর্ব-পশ্চিম'-এরা কি যথেষ্ট এই ভাঙাদেশের সর্বস্ব খোয়ানোর ইতিহাসের পক্ষে? এর মধ্যে অনেকগুলিই স্মৃতিভারাক্রান্ত। এক্ষেত্রে নতুন ভাবনাকুণ্ডলী ভাবিত করতে পারত লেখককুলকে, পাঠককে। একথাগুলি বলা হল এ-কারণে যে দু-শতকের নানান ওঠাপড়া ভাবনানিচয়ে এক অভূতপূর্ব নতুন ভাবনার জগতে উত্তীর্ণ হওয়া যেত , কিন্তু আক্ষেপটুকু রেখেই প্রবন্ধের অন্তিম শব্দ সংযোজন করতে হল।



'হরিজন উন্নয়ন কথা'

• • • • • •

ছন্দা রায়

শিরোনাম দেখলে মনে হবে ইতিহাসের কোনো দলিলপত্র অথবা ভারি মেজাজের রিপোর্টাজ। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'হরিজন উন্নয়ন কথা' আসলে উপন্যাস। কথাবস্তুতে মূল ধারার বিরল ব্যতিক্রম। আখ্যানের প্রধান কুশীলব হিন্দুসমাজের চূড়ান্ত প্রান্তিকায়নে পঙ্গু অস্পৃশ্য হীনবর্ণের মানুষ। জাতির জনকের আরোপিত মহিমায় 'হরিজন'। স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের স্বনির্মিত সংস্কারে বর্ণবিভাজনের অমানবিক দায় এদের বহন করতে হয়েছে। ব্রহ্মার পদতল থেকে সৃষ্ট সবার অধম শূদ্রজাতির মধ্যে জন্ম-পরিচয়ে আরও নিকৃষ্ট এই মানুষেরা যুগ যুগ ধরে বর্ণদম্ভীদের অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত ও পদদলিত।

হরিজন উন্নয়নের জটিল প্রশ্নে জ্যোতির্ময়ী এমন একটা সময়ে ভাবিত হলেন যখনও দলিত সাহিত্য আন্দোলনের দক্ষিণী ঘূর্ণি বাংলা সাহিত্যের সীমানায় পৌঁছয়নি। দলিত উত্থানকে কেন্দ্র করে ভারতে সাহিত্যিক আন্দোলনের সূচনা বর্ণবৈষম্যে বিক্ষত মহার-অধ্যুষিত মহারাষ্ট্রে। হিন্দু সমাজগঠনে উচ্চবর্ণের বহুকালব্যাপী স্বৈরাচারী প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর তুলেছিলেন মারাঠী সাহিত্যিকেরা। ১৯৫৮ সালে মাহাদে অনুষ্ঠিত হল তাঁদের দলিত সাহিত্য সম্মেলন। ১৯৬৭-র পর থেকে আন্দোলন ক্রমশ নতুন গতিবেগ পেল। আমেরিকার 'ব্ল্যাক লিটারেচার' তথা কৃষ্ণসাহিত্য সম্মেলনের আগ্নেয় প্রেরণায় ১৯৭২ সালে বোম্বেতে 'ব্ল্যাক প্যান্থার'-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হল 'দলিত প্যান্থার' সংগঠন। একটু একটু করে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের উদ্যোগ তুলনামূলকভাবে বিলম্বিত। সাংগঠনিক পদক্ষেপের প্রথম স্মরণীয় প্রয়াস 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ' [১৯৮৭] এবং তারপর 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা' [১৯৯২]। সময়ের হিসেব নিলে একক ভূমিকায় জ্যোতির্ময়ী কিন্তু অগ্রবর্তী। তাঁর উপন্যাসটি প্রথমে 'হরিজন উন্নয়ন কোষ' নামে ধারাবাহিক ভাবে [বৈশাখ ১৩৮১ ফাল্গুন ১৩৮২] প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। শিরোনামের সামান্য পরিবর্তনসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৯৮৪ সাল।

দলিত সাহিত্য সংগঠনগুলির উদ্যোক্তা এবং সদস্যেরা বিশেষভাবে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী চেতনার মানুষ। বর্ণসংস্কার মানলে জ্যোতির্ময়ী অবশ্যই এঁদের সমগোত্রভুক্ত নন। কোনো সক্রিয় আন্দোলনে তাঁর সামিল হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। সম্পূর্ণ নিজস্ব সচেতনতায় তিনি বর্ণব্রাত্যদের সংকটগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনাও জাগিয়ে রাখলেন। ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর নির্মোহ চিন্তাধারা পরবর্তীকালের দলিত সংস্থাগুলির কাছে কোনো স্বীকৃতি পায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে যাঁরা দলিত সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের বিবরণী অথবা গ্রন্থসারণীতে ''হরিজন উন্নয়ন কথা''র উল্লেখমাত্র নেই।

হতে পারে অনবধানতা। হতে পারে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা। অনাদরের কারণ খুঁজতে গেলে দুটি মৌল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। প্রথমত, দলিত মানুষদের নিয়ে লেখা সাহিত্য মানেই কি দলিত সাহিত্য? দ্বিতীয়ত, দলিত সাহিত্য লিখবেন কারা? সেখানে কি অধিকারী-অনধিকারীর

ভেদরেখা গুরুত্ব পাবে? ভুলে গেলে চলবে না, দলিত সাহিত্য আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণের স্বার্থের সহযোগী প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এমনকী প্রগতিশীল সাহিত্যকেও তা অভিযোগের দায় থেকে রেহাই দেয়নি, যেহেতু তাতে শোষিত মানুষের যন্ত্রণার কথা থাকলেও ভারতীয় সমাজে জাতিবর্ণব্যবচ্ছেদের নির্মমতাকে তা যথাযথ প্রতিফলিত করেনি। সুতরাং প্রকৃত দলিত সাহিত্য তাকেই বলা যাবে, যার মধ্যে হিন্দু সমাজ-সংগঠনের শোষণভিত্তিক রূপটি সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পাবে এবং তার প্রেক্ষিতে অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি ধর্মীয় সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক যাবতীয় বৈষম্যমূলক অবিচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ উঠে আসবে। উত্তরণের প্রেরণা দিয়ে তাদের সামনে জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

কিন্তু কাদের কলম যোগাবে দলিত সাহিত্যের ভাষা? কট্টরপন্থী দলিত শিবিরের অভিমত— "দলিত মানুষদের নিয়ে অ-দলিত তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিগণ অনেক মহার্ঘ সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধও করেছেন। সে-সব সাহিত্য সহানুভূতির সাহিত্য। সহানুভূতির কলমে কৃপা আছে, ভালোবাসা আছে, অনুকম্পা আছে। দলিত সাহিত্যিকেরা সেই অনুকম্পা, দয়া, সহানুভূতি প্রত্যাখ্যান করেন, নিজেরা নিজের হাতে কলম ধরেন, নিজের কথা নিজের মত করে বলতে প্রয়াসী হন।...দলিত সাহিত্য দলিত মানুষেরই সৃষ্টি। অন্য কারো নয়। "[১] দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বুকে নিয়ে মারখানেওয়ালা মানুষ যখন রুখে দাঁড়ায়, তখন এমন তীব্র প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবল আবেগের মধ্যে অযুক্তির কিছু রন্ধ্রপথ থেকে যায়। মূল সাহিত্যধারার বিপরীতে কোন প্রতিস্পর্ধী ধারাকে বেগবান করতে হলে, দলিতের কণ্ঠস্বরকে প্রচারপত্রের ভাষা না দিয়ে শিল্পাধারে স্থাপন করতে হলে দক্ষতার প্রশ্নকে বাতিল করা যায় না। চাপের কাঠামো ভাঙার জন্য বদ্ধ আখ্যান বর্জনীয় হতে পারে। কিন্তু মুক্ত আখ্যানও অক্ষমের নির্মাণ নয়। উলটো দিক থেকে দেখলে অ-দলিত লেখকদের সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থান দলিত মানুষের সঙ্গে সমানুভূতিতে বাধা তৈরি করতে পারে। কিন্তু আত্মতা অতিক্রমের সৎ চেষ্টাকে বেষ্টনীর বাধায় ফিরিয়ে দেওয়া আরেক ধরনের রক্ষণশীলতা।

"হরিজন উন্নয়ন কথা"র পাঠকেরা বোধহয় একটা বিষয়ে অভিন্নমত হবেন, শৌখিন মজদুরি জ্যোতির্ময়ীর ধাতে ছিল না। বরং নারী হিসেবে লিঙ্গশূদ্রত্বের বোধ থেকে যে-কোনো শ্রেণীর সামাজিক শোষণে তাঁর যন্ত্রণা পাওয়ার কথা। দলিত সাহিত্যে ঈপ্সিত 'সমানুভূতির'র তত্ত্বটি সামনে রেখেই আমরা যাচাই করে নেব, দলিত আন্দোলনকারীদের আপোষহীন সংগ্রামী চেতনায় জ্যোতির্ময়ীর হরিজন-ভাবনা কতটা গ্রাহ্য।

শুরুতেই লক্ষণীয় গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি। জ্যোতির্ময়ী পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন মহাত্মা গান্ধীকে, "অস্পৃশ্য অচ্ছুতদের হরিজন অভিধা দিলেন যিনি।" অথচ বিদ্রোহী দলিতেরা গান্ধীজীর পতিতোদ্ধার ব্রতের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। শব্দার্থ-তত্ত্বে অশুভ, নিন্দিত বা কুৎসিত শব্দকে শীলিত আবরণ দেওয়ার নাম সুভাষণ [Euphemism]। অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' নামকরণও নিছকই সামাজিক বিকার ঢাকার ভাষিক কৌশল। অবশ্য গান্ধীজির হরিজন-আন্দোলনের পিছনে সৎসংকল্প ছিল না এমন নয়। কিন্তু রাজনীতিও ছিল। বাইরের অভিঘাতে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে চিরকালই উপরতলার সমাজ নীচের তলার সঙ্গে আত্মীয়তার গরজ দেখিয়েছে। গান্ধীজিও ঔপনিবেশিক শাসকদের আসন টলাতে সার্বিক গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে 'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের' ডাক দিলেন। তাঁর মতো একজন সর্বভারতীয় নেতার উদ্যমের ফলে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে বর্ণান্ধ সমাজের দৃষ্টিপথে এসেছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার না করে উপায়

নেই। জ্যোতির্ময়ী তা মেনেছেন বলেই গান্ধীজিকে মান দিয়েছেন।

কিন্তু তার পরেও কিছু কথা থেকে যায়। অন্ত্যজদের উত্তরণ নিয়ে গান্ধীজি তখনই বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন, যখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সবরকম কূটনৈতিক আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। জেলে বন্দী অবস্থাতেই তিনি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতাবিরোধী সংগঠন [১৯৩২] এবং সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকার [১৯৩৩] মাধ্যমে নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম বর্জন করে হরিজন কল্যাণব্রতে তিনি আরও বেশি নিবিষ্ট হলেন। গান্ধীজির ঘোষণায়—"Untouchability is not a sanction of religion, it is a device of Satan. ....There is neither nobility nor bravery in treating the great and uncomplaining scavengers of the nation as worse than dogs to be despised and spat upon".[২] ধর্মের নামে মানুষকে পশুবৎ অবমাননা করার শয়তানি কারসাজির বিরোধিতা মহাত্মার উপযুক্ত কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু সংকট হল, 'Gandhi deliberately confined the Harijan campaign to limited social reform [opening of wells, roads and particularly temples, plus humanitarian work], delinking it from any economic demands....and also refusing to attack caste as a whole'.[৩]

স্বভাবতই গান্ধীজির পরিকল্পনা ও কার্যকারিতার মধ্যে অসংগতি থেকে গিয়েছিল। বর্ণসংস্কারের ভিত্তিমূলে ঘা না পড়ায় তাঁর ছুৎমার্গবিরোধী আন্দোলন যে সমাজের মন বদল করতে পারেনি, এই অবধারিত সত্য সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ী পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বেছে নিলেন ১৯৪৯-৫৩ সালের সময়-পটভূমি। তিনি দেখালেন, স্বাধীনতার পর অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হলেও মজ্জায় মিশে থাকা জাতপাতের সংস্কার হরিজনদের ব্রাত্য করেই রেখেছে। শিক্ষা ও উন্নততর জীবিকার সুযোগ দিয়ে তাদের সমাজের মূল স্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। অচলায়তন টিকিয়ে রাখার সুবিধাবাদী মানসিকতায় বর্ণপরিচয়ে ন্যুব্জ মানুষদের প্রতি যে-যুক্তিহীন প্রবঞ্চনা, তার থেকে জ্যোতির্ময়ী সমাজবাস্তবতার পাঠ নিলেন। তাতে মোহ বা বিভ্রান্তির কোনো জায়গা ছিল না।

উৎসর্গপত্রের পর গ্রন্থের 'স্মরণিকা'। বর্ণবৈষম্যবিরোধী চারজন মহিমময় ব্যক্তিত্বকে জ্যোতির্ময়ী এনেছেন তাঁর স্মরণ-তালিকায়। প্রাগাধুনিক ভারতবর্ষে চৈতন্যদেব, যিনি হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠের মর্যাদা দেওয়ার বৈপ্লবিক ঘোষণা করেছিলেন এবং গুরু নানক, যিনি হিন্দু ও মুসলিম শিষ্যকে সঙ্গী করে তীর্থ পর্যটনে তাঁর অসাম্প্রদায়িক অভিযান চালিয়েছিলেন। আধুনিক ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর উদাত্ত বাণীতে আছে মুচি, মেথর, দরিদ্র, অজ্ঞ ও পদদলিতকে ঈশ্বর জ্ঞান করার আহ্বান এবং আম্বেদকর, যিনি অচ্ছুৎ ও হরিজন আন্দোলনের পুরোধা নেতা ও স্বাধীন দেশের সংবিধান-প্রণেতা। এঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু বর্ণগত কারণে মনুষ্যত্বের অবমাননার তীব্র বিরোধী হলেও গুণকর্মভিত্তিক বর্ণাশ্রম প্রথায় আস্থাশীল ছিলেন, সেই জন্যই হয়তো দলিত প্রতিনিধিদের মুখে তাঁর নাম শোনা যায়নি। জ্যোতির্ময়ী তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেও তাঁর আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ পরিণামকে বারবার চিহ্নিত করেছেন। দরদী দলিতনেতা আম্বেদকরের উদ্দেশে স্মৃতি-তর্পণে জ্যোতির্ময়ী নিশ্চয়ই দলিত মুক্তিসংগ্রামীদের হৃদয় ছুঁয়ে যান।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার বিলয় এবং দলিতদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে আম্বেদকর সম্পূর্ণভাবেই গান্ধীজির বিপরীত মেরুর মানুষ। উনিশ শতকের শেষে নিম্নবর্ণোদ্ভূত মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে শূদ্র-অতিশূদ্র নির্বিশেষে নিম্নবর্গীয় মানুষকে রাজনীতির ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করার যে-আন্দোলন শুরু করেছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে আম্বেদকর তার সূত্র

ধরে দলিত সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সামিল করতে চাইলেন। নিজে দরিদ্র অবর্ণ মাহার পরিবারে জন্ম নেওয়ায় বর্ণহিন্দুদের প্রভুত্বের হৃদয়হীন চেহারাটা তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ্য সমাজকাঠামো বজায় রেখে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার অবাস্তব পরিকল্পনায় তিনি গান্ধীজির সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন নি। অন্যদিকে গান্ধীজি শুধু বর্ণব্যবস্থার গুণগানই করেননি, এই ব্যবস্থায় চিড় ধরার আশঙ্কায় তিনি চেয়েছিলেন বিদ্রোহীদের বিক্ষোভের অবদমন : 'I am certainly against any attempt at destroying the fundamental divisions. The caste system is not based on inequality, there is no question of inferiority, and so far as there is any such question arising, as in Madras, Maharashtra, or elsewhere, the tendency should undoubtedly be checked'.[৪] সমাজব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে শ্রেণীগত অসাম্যের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অধিকার পর্যন্ত হরণ করা—একেই বলে উচ্চবর্গীয় কূটনীতি। দলিত উত্থানের নেতাদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব। গান্ধীজি এবং আম্বেদকরের মধ্যে তাই মতাদর্শগত সংঘাত অনিবার্য ছিল।

আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই। হরিজন উন্নয়ন নিয়ে ভাবিত, অথচ ভিন্ন সামাজিক অবস্থান, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্ন কর্মপন্থার দুজন মানুষ, যাঁরা শুধু জ্যোতির্ময়ীর গ্রন্থের নৈবেদ্য বা স্মরণিকায় নয়, সমগ্র আখ্যানের পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের সম্পর্কে লেখিকার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত জানাটা আমাদের কাছে জরুরি। তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে বোঝা দরকার জ্যোতির্ময়ীর অভিজ্ঞতায় উঠে আসা সেই সব সাব-অলটার্ন শ্রেণীর মানুষদের, যারা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ এবং বর্ণগত পীড়ন ও হীনম্মন্যতার শিকার। আর সেই অর্থে শুধু দলিত নয়, বিশুদ্ধ দলিত।

'লেখিকার নিবেদন'-এ জ্যোতির্ময়ী জানান, তাঁর উপন্যাসের চরিত্র কাল্পনিক। কিন্তু পটভূমি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী দিল্লীর ভাঙ্গি কলোনির-বাস্তব চিত্র। ভাঙ্গী সমাজের 'সুখ দুঃখ নৈরাশ্য বেদনাভরা' জীবন নিয়ে তাঁর গল্প। তিনি বলেন : 'তাদের মুখে যা শুনেছি, তাতে ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু সে ভ্রান্তি তাদের তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে। তাদের মুখের ভাষা আমি বদলাইনি।'[৫] ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ প্রসঙ্গে সংশয় জাগতে পারে, জ্যোতির্ময়ী কি তবে সাবধানী হতে চাইছেন? অঞ্চলবিশেষের অন্ত্যজদের ছবিই গোটা দেশের সঠিক প্রতিবিম্ব কিনা, সেই বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চাইছেন? আখ্যানবৃত্তে প্রবেশ করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, তাঁর সমাজচেতনার মূল কত গভীরে। কোনো দ্বিধা না রেখেই তিনি উচ্চবর্গের তথা উচ্চবর্ণের ছলনার কারসাজিগুলো ধরে ফেলেন। কলোনিবিশেষের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত হয় তাঁর দৃষ্টি। পরিবর্তিত সময়ের অভিঘাতে আলোড়িত হতে হতে এতকালের প্রবঞ্চিত মানুষেরা যেটুকু ভাবে বা বলতে চায়, তার স্ফুট ভাষাটুকু তিনি অবিকল তুলে আনেন। অস্ফুট ভাষাটুকু সমানুভূতিতে গড়ে দেন। 'Can the subaltern speak'—সেই মূলগত প্রশ্নে অধিকারবঞ্চিত হতবাক হৃতবাক মানুষের সঙ্গে তাদের নির্মাণকারীর এমন নিভৃত আদানপ্রদানই তো প্রার্থিত। ভাষা জাগলে আশাও জাগে। হীনতার বোধে তলিয়ে যাওয়া প্রান্তিক মানুষের মূঢ় ম্লান মুখে জ্যোতির্ময়ী আকাঙ্ক্ষার আলো খোঁজেন।

অন্ত্যজ অনুভবের শরিক হতে গিয়ে উচ্চবর্গীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর শিল্পচেতনাও সমঝোতা করেনি। । 'হরিজন উন্নয়ন কথা' তাই পরম্পরাসিদ্ধ আখ্যান-কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, কাহিনী ও চরিত্রের সুনির্দিষ্ট বিবর্তনের পথ ধরে পরিণতিতে পৌঁছবার যে অঙ্গসৌষ্ঠবময় রূপকলা, তাও তো কাব্যশাস্ত্রের শাসন। তাকে অগ্রাহ্য না করলে দলিত জীবনকথা আবার অধীনের বাণীই বলবে। গল্প জমিয়ে তোলার তাগিদে নয়, হরিজন

সংকটের সামাজিক দলিলীকরণের প্রয়োজনে টুকরো টুকরো ঘটনাকে কোলাজের ঢঙে রেখে জ্যোতির্ময়ী যেন তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার অকপট সাক্ষ্য হাজির করলেন। ওদের কথা ওদেরই বলতে দিয়ে মাঝে মাঝে সূচীমুখ মন্তব্যে প্রতিপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তিগুলো গুঁড়িয়ে দিলেন। তবে হ্যাঁ, অন্তর্গত বাঁধুনি তো একটা আছেই। বঞ্চনার মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্যেও যে-আবেগ, যে-ভালবাসা জন্ম নেয়, জীবন ও জীবিকার গ্লানির মধ্যে যে-বিষাদ আশ্চর্য উদাসীন হয়ে যায়, সেই সব ছুঁয়ে ছেনে গড়ে ওঠে ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের কাহিনী। দলিত সমাজবাস্তবতাই তৈরি করে দলিত উপন্যাসের বনিয়াদ।

উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যোন্মোচন দিল্লীর হরিজন কলোনিতে। সেখানে ৭০০ ঘর বাসিন্দা। তাদের উন্নয়নের জন্য লোকদেখানো আয়োজনের ত্রুটি নেই। কলোনির মধ্যেই শিক্ষাকেন্দ্র বাল্মীকি-ভবন। ভবনের সামনের ঘরে চরকা-তকলি-তাঁত-খদ্দরের প্রদর্শনী। তাদের প্রয়োজন শুধু গান্ধীজির জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীতে সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য এবং বিদেশি পর্যটকদের কাছে বিজ্ঞাপিত হওয়ার জন্য। একটি বড় দালানে হরিজনদের পাঠশালার ব্যবস্থা। সকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে 'পহেলী' ও 'দুসরী' কিতাব এবং 'পহাড়া' [নামতা]। দুপুরবেলার মহিলা পড়ুয়াদের সলজ্জ সাধ, অক্ষরজ্ঞান হলে যদি স্বজনদের কাছে চিঠি লিখতে বা তাদের চিঠি পড়তে পারা যায়। ভাঙ্গী পুরুষদের মধ্যে যারা শুঁড়িখানার লোভ খানিকটা সংবরণ করতে পারে, তারা আসে সন্ধ্যেবেলায় পাঠ নিতে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আসলে শিক্ষার গুরুত্ব এখনও ওরা বুঝে উঠতে পারেনি। বোঝাবার উদ্যমই বা কোথায়?

তবে সময়ের মর্জি কিছুটা ধরতে শিখেছে ভাঙ্গি কিশোর-কিশোরীরা। মোটরগাড়ি চড়া বামুনবেনিয়া বা শেঠজিদের দেখে নিজেদের অবস্থানের ফারাক নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্রের নয়া নীতিতে তাদের মতো অবর্ণের কোনো মানুষকে রাজনৈতিক পদাধিকারে বিলাসী জীবনযাপন করতে দেখে নিজেদের বৃত্তির হেযতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। জ্যোতির্ময়ী আমাদের শোনান সেই বিদ্রোহের সংলাপ :

রামধারী বলে—"আমি এখানকার 'লিখাপড়াই' শেষ করেই বড় ইস্কুলে পড়তে যাব, মাস্টার সাহেবকে বলে রেখেছি। ও ঝাড়ু চম্‌মচ কুলো কভি ছোঁব না হাম।"[৬]

সমবেত ছেলেমেয়েরা প্রতিধ্বনি করে—"আমরাও তাহলে চম্‌মচ ঝাড়ু ধরব না।"[৭]

ওদের এক দিদি বুধিয়া বলে, "আমাদের বাপদাদারা কেন লিখনা পরনা শেখেনি ভাইয়া? আগ ঘরে গিয়ে পুছব। দাদা পরদাদা থেকে সবাই ঝাড়ুদার হয়ে রইল কেন? আর যত গন্ধা (নোংরা) শির'পর নিয়ে রোদ্দুরে পুড়ে বর্ষায় ভিজে শীতে কেঁপে কাজ করে মরছে জনমভোর। আমাদেরও করাবে। হম্‌মি ও কাম না করব।"[৮]

চোখ ফুটছে ওদের। প্রশ্ন জাগছে নতুন প্রজন্মের মনে। গ্লানি মোচনের আকুতিও আন্তরিক। কিন্তু পরিপার্শ্বের সহায়তা নেই। ক্ষমতাবানের সমর্থন নেই। ওদের অভিভাবকদের ভয়, লেখাপড়া শিখলেও বাবুদের মতো নোক্‌রি মিলবে না। তার চেয়ে নয়াদিল্লীতে বাঁধা মাইনের জমাদারগিরি ভাল। হরিজন-উন্নয়নব্রতীরা ওদের প্রাথমিক পাঠের সুযোগ করে দিয়ে অনেকটাই কর্তব্য করেছেন ভেবে আত্মতৃপ্ত। কিন্তু এমন করুণাগণ্ডূষে আর মন ভরে না রামধারীদের। অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সংকল্পে মরিয়া হয়ে ওঠে ওরা। আদর্শবাদী দরদী শিক্ষক রাজনারায়ণজি ওদের মদত দেন। কিন্তু আসল সংকট তো সেই জাত-পাতের সংস্কারে, যার ফাঁদে পড়ে স্বাধীন দেশের শিক্ষাও প্রতিবন্ধী। খাতায় কলমে বর্ণ বা সম্প্রদায় বিচারের নির্দেশনামা কোথাও নেই। তবু বর্ণহিন্দু কমিটির সদস্যদের আপত্তির আশঙ্কায় ভাঙ্গি ছেলেদের জন্য বড় স্কুলের দরজা খোলে না। খ্রিস্টান সাহেবদের

স্কুলে যদি বা ভর্তির সুযোগ মেলে, কিন্তু সেখানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে বর্ণহিন্দুর সন্তানেরা। অনর্থক ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী? সুতরাং হরিজন ছাত্রদের বেলায় 'নাম ডাকার খাতায় শুধু রইল নাম। কোনও পদবী থাকল না।'[৯] কর্তৃপক্ষ এতটাই বুদ্ধিমান এবং সতর্ক।

ভাঙ্গি ছেলেদের দেখাদেখি ভাঙ্গি মেয়েরাও চায় উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্মণরেখা পার হতে। অভ্যাসের দীনতা থেকে স্বপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে কেউ কেউ। কিন্তু সমস্যা এখানেও। ওদের জন্য বড় স্কুলের ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থাপকরা নির্লিপ্ত থাকলেও বাল্মীকি-ভবনের শিক্ষিকারা, যাঁরা ওদের অনেক বেশি কাছের থেকে দেখেন, তাঁরা ওদের ইচ্ছেগুলোকে অনাদর করতে পারেন না। তাঁদের আনুকূল্যে কুইনস্ পার্কের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে তালিম পেয়ে সুখমতিয়া আর গজমোতিয়া ক্রমেই বুদ্ধিতে বেশে আচরণে মার্জিত হতে থাকে। নিজেদের অজান্তে 'তাদের ভীত হরিজন জীবন ভরসা সাহসহীন কোন এক জন্মের ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে' এগিয়ে চলে। এভাবেই সময় বদলায়। সমাজ বদলায়। পরিবর্তনের আলোকরেখাকে ফুটিয়ে তোলেন জ্যোতির্ময়ী—অস্তিত্বের বোধ হারানো মানুষগুলোকে নাড়া দেবার জন্য। দলিত কথাকারের এটাই কৃত্য।

কিন্তু এতো একা এবং কয়েকজনের গল্প। যারা রোদ্দুর হতে চেয়েছে, তাদের গল্প। হরিজন কলোনির অধিকাংশটা জুড়ে তখনো অতল আঁধার। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধ সংস্কার আর সব কিছুর সঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো জন্মের অভিশাপ। অথচ পরিকল্পনায় ঘাটতি ছিল না। অর্থও ছিল গান্ধীজির গড়ে দেওয়া হরিজন উন্নয়ন তহবিলে। কিন্তু অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব ট্রাস্টি বা অছি-পরিষদের হাতে। অছিদের হাতের মুঠো আলগা হয়নি। এও গান্ধীজির অদূরদর্শিতার ফল। কঠোরকণ্ঠ সমালোচনায় দ্বিধা করেননি জ্যোতির্ময়ী। আগেই তিনি সেকথা বলেছেন তাঁর 'স্বাধীনতার স্বাদ—জাতীয় চরিত্র' [১৯৭৪] প্রবন্ধে। অশুচি ছিদ্রপথে মানুষের দেহে পাপ প্রবেশ করে, পুরাণের নলরাজার কাহিনীর এই প্রতীকী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন :

'অশুচি ছিদ্র মানে দুর্বলতা। যে-কোনো দুর্বল মোহ বলা যায়।

... ...

এই ২৭ বছরে কী করে আমাদের জাতীয় চরিত্রের ভিতে একটু একটু করে ঘুণ ধরল?... দেখতে গেলে সব প্রথমেই চোখে পড়বে গান্ধীজিরই দুর্বলতা, যাকে পুরাণকার 'পাপ-পথ', 'অশুচি-পথ' বলেছেন। রাজনীতির দল নির্বাচনের জুয়াখেলায় যে দল 'জনবল' দিয়ে তাঁর পাশে সমবেত হয়েছিল, জেলে যেতে, সত্যাগ্রহ করতে, বণিক সম্প্রদায়, যারা তাকে অর্থ সাহায্য দিয়ে ধনবলের সহায়তা করেছিল, তারাই সেই জাতীয় চরিত্রের 'দুর্বল অশুচি পথ'।'[১০]

বণিক সম্প্রদায়ের হৃদয় পরিবর্তনের উপর আস্থা রেখেছিলেন গান্ধীজি। তাঁদের দাক্ষিণ্যেই তাঁর তহবিল। তাঁরাই জনগণের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য অছি হবেন ভেবে গান্ধীজি হরিজন উন্নয়ন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার অভাবে পরিকল্পনার বন্ধ্যা দশা প্রকট হল। অছিদের সদিচ্ছার অভাব ও অকর্মণ্যতারও প্রমাণ মিলল। হরিজন উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা করার জন্য জ্যোতির্ময়ী বারবার তাঁদের দিকে আঙুল তুলেছেন। ভাঙ্গি কলোনির মানুষেরা অসুস্থ হলে উপযুক্ত চিকিৎসা পায় না। অশিক্ষাজনিত কুসংস্কারে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার বদলে ওরা শীতলা পুজো করে। কোনো শিশুর পোলিও হলে ভাবে ডাকিনীর নজর পড়েছে। এই সব অজ্ঞতা দূর করার মূল উপায় শিক্ষার সম্প্রসারণ। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে ওদের চৈতন্য জাগলে সুবিধাভোগী সমাজের ক্ষতি। তাই বাল্মীকি-ভবনের বুজরুকিতে ওদের ভোলাবার চেষ্টা হয়েছে।

শুভবুদ্ধি ও বিবেকের তাড়নায় বাল্মীকিভবনের স্থায়ী শিক্ষিকারা মাঝে মাঝে অছিদের কাছে

প্রশ্ন তোলেন এবং প্রতিকার দাবি করেন। হরিজনদের জন্য কিছু ঘরবাড়ি আর চরকা-খাদি-তাঁতঘরের বন্দোবস্ত করে মহামান্য অছিরা যখন দায়মুক্ত হতে চান, শিক্ষয়িত্রী সীতা মেহরা ভাবেন, বড় গভীর করেই ভাবেন :

'তাঁত? চরকা? আজ অবধি কতটুকু কাকে শেখানো হয়েছে?... যত বড় বড় পরিকল্পনা—কাজও তত ব্যর্থ। ছোট্ট কাজ বোধগম্য শিক্ষায় দরিদ্রের দুঃখীর ছোট শিক্ষার সেখানে ঠাঁই হয় না।

বড় বড় বক্তৃতায়, ৬০/৭০/৯০ মিনিটের বক্তৃতার স্রোতে নব উৎসাহে কর্মক্ষমতা ভেসে যায়। শ্রোতাদের হাই ওঠে। বক্তারা দেশ-বিদেশের পাণ্ডিত্যে ভরে দেন বক্তব্য। তাঁরা কেউই বুঝতে পারেন না আত্মপ্রচারের মহিমায় যে ওরা একেবারে নিরক্ষর। ওরা গাড়ি দেখে, ভিড় দেখে, জামাকাপড় দেখে। আর ঘরে অন্ধকারে ফিরে আসে।'[১১]

না, হরিজন নামমাহাত্ম্যে ওদের জীবনের গ্লানি ঘোচেনি। চতুর অছিরা দৃষ্টান্ত দেখান, স্বাধীন দেশে অন্ত্যজ বর্ণের কে হয়েছেন মন্ত্রী, কে হয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু সে তো শিয়ালের পাঠশালায় কুমীরছানা দেখাবার মতো। হাতে গোনা দু-চারজনের রাষ্ট্রীয় পদাধিকার পাওয়ার গৌরবের চেয়ে ওদের সকলের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার, ওদের জন্য সেবাসদন শিক্ষাসদন অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু হরিজন-ফাণ্ডের টাকা মঞ্জুর হওয়ার পথ বড় জটিল—'অত মন্ত্রী কমিটী সদস্য অছি লালফিতা বক্তৃতা বক্তা সভা—অগাধ সাগরে পয়োধি,—প্রলয়পয়োধি!'[১২]

কে করবে ত্রাণ? জ্যোতির্ময়ী সার কথাটা বোঝেন। অধিকার কেউ কারও হাতে তুলে দেয় না। আদায় করে নিতে হয়। বর্ণের হীনতা ভুলতে হয় এবং ভুলিয়ে দিতে হয় নিজেদের অর্জনের জোরে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার চেয়েও অনেক কঠিন সেই কাজ। কারণ লড়াই এখানে শুধু বহুকালের সামাজিক অভ্যাসের সঙ্গে নয়, উচ্চবর্ণের অহংকারের সঙ্গে।

সংকল্পের নিষ্ঠা থাকলে অচ্ছুতেরও উজ্জ্বল উদ্ধার হয়, হরিজন পল্লীর সুখমতিয়া ধাপে ধাপে তার প্রমাণ দিয়েছে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উৎরে যাওয়ার পর বর্ণহিন্দুদের কলেজে ঠাঁই না পেলেও শিক্ষিকা কৃষ্ণা সেনের পরিকল্পনা এবং অপর শিক্ষিকাদের মদতে হাসপাতালের স্কুলে নার্সিং শেখার সুযোগ পেয়েছে সে। যেদিন তার সাফল্যের সংবাদ বেরোয়, সেদিন পাড়া জুড়ে মহোৎসব। 'যারা জানেই না তারা আর কি কাজ করতে পারে, শিখতে পারে এবং দরকার কেন শেখবার, আর মানুষ হওয়া কাকে বলে', তাদের জাতের মেয়ে হয়ে মাথায় নার্সের রুমাল, কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা সুখমতিয়ার মুখ আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করে। হাসপাতালের অন্য নার্সদের সঙ্গে নিজেকে আর আলাদা মনে হয় না।

তবু সমাজমনের ভিতরে জীবাণুগুলো মরে না। জাতির জনকের চেতনাতেই তো বৈষম্যের ব্যাধি,—'He advised caution on inter-dining and inter-marriage, and went on defending the original varnasrama system.'[১৩] তাই গান্ধীর আদর্শব্রতী শিক্ষিকারা ভাঙ্গি মেয়ের জীবনে আলোর পথ খুলে দিলেও তার সঙ্গে পান-ভোজনের ছুৎমার্গ ত্যাগ করতে পারেন না। পাঞ্জাবের মেয়ে সন্ত কওর নিজে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাকর্মী হয়েও শুধুমাত্র ভাঙ্গি বলেই নিজের কুণ্ঠিত দূরত্ব রক্ষা করে। তার পরিচয় জানাজানি হলে সকলের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আর সুখমতিয়া, যার সেবায় রুগীরা তৃপ্ত, যার নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় ডাক্তার এবং সহকর্মীরা সপ্রশংস, তাকে হরিজন পল্লীর বাসিন্দা বলে জানবার পর সকলের মুগ্ধতা সাময়িক কালের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ায়।

জ্যোতির্ময়ীর অন্ত্যজ জীবনভাবনা সম্প্রসারিত হতে হতে হিন্দু সমাজধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে

আরও অনেক জটিল প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সন্ত কওর বিবির পিছনে ফেলে আসা জীবনের ইতিহাস প্রমাণ দেয়, জাতি-কুল-মান-ধর্মের বিভেদমুক্ত গুরুগোবিন্দ সিংহের উদার শিখধর্মও শেষ পর্যন্ত জাতের জাঁতাকলে বন্দী। ভাঙ্গি মায়ের মেয়ে সন্ত কওর অমৃতসর দরবার সাহেবের গুরু সর্দরজির কৃপায় মন্দিরে সেবা ও ভক্তিগান করার সুযোগ পেয়েছিল। একবার একদল পুণ্যার্থী এলেন মন্দিরে। সন্ত কওরের সুরেলা কণ্ঠ তাঁদের অভিভূত করল। তার সম্পর্কে যুবক চন্দন সিং-এর বিশেষ আগ্রহ সন্ত কওরের তরুণী মনকে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু তারপরই ভুল ভাঙার পালা। জেনে শুনে কি আর অচ্ছুৎ ভাঙ্গি মেয়েকে ঘরের বউ করা যায়? নীরব প্রত্যাখ্যানের সেই ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে সন্ত কওর। নিজেকে প্রস্তুত করেছে। স্বাধীন জীবিকা অর্জন করেছে। তবু কোথায় একটা সংকোচ। আর স্মৃতির তাড়না। আঘাত খেতে খেতেই ঘটে তার সত্যদর্শন—'মানুষের মধ্যে অনেক দেওয়াল ও প্রাচীরের ব্যবধান, যেখানে মৌখিক বন্ধুত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে জাত-ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্ক স্বজনের গণ্ডী ভেদ করা যায় না। নীরন্ধ্র কঠিন সে বেড়া। ... কেউ যদি প্রবেশ করেও কখনো—তাকে পুরাতন সব ছাড়তে হয়,...নতুনও তাকে সহজে নেয় না, আবার পুরাতনও মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[১৪]

রক্ষণশীল পরিবার ও সমাজের মধ্যে আজন্ম বর্ধিত হয়েও জ্যোতির্ময়ী প্রথাগত ধর্মের নিগড়গুলো যেমন চিনেছেন, তেমনি নিগড় ভাঙার সংকটও তাঁর অবোধ্য নয়। সন্ত কওরের কৌতূহলের সূত্র ধরে তিনি চলে যান আম্বেদকরের প্রসঙ্গে। কেন এই দলিত দলপতি স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সম্মান পেয়েও স্বধর্ম ত্যাগ করলেন এবং একটা বিরাট সম্প্রদায় নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন? সহকর্মী কৃষ্ণাবিবি সন্ত কওরকে সহজ করে বুঝিয়ে দেন, হিন্দু সমাজের ছুৎ-অচ্ছুৎ বিচারই আম্বেদকরকে বিদ্রোহী করেছিল। আর 'একলা একলা ধর্মান্তর নিলে তো সব স্বজন বন্ধু আপন রিস্তেদার কুটুম্ব সব ছাড়তে হয়।'[১৫] তাই তাঁর এই সদল জেহাদ। এভাবেই অনতিদূর ইতিহাস হরিজন-কথার অঙ্গে অর্থবহতা পায়। নিজের সমাজের বাইরে নিঃসঙ্গ হওয়ার যন্ত্রণা সন্ত কওর জানে।

একই সংকটের রকমফের সুখমতিয়ার জীবনেও। হিন্দু সামাজিক কাঠামোয় বর্ণব্যবস্থা এতটাই দুর্ভেদ্য সংস্কার গেঁথে দিয়েছে যে, বর্ণপরিচয়ের আবরণ ছেড়ে বেরিয়ে এলে অস্তিত্বের ভারসাম্যেই টান পড়ে। আসল অসবর্ণত্ব তো জন্মের নয়, শিক্ষার সংস্কৃতির রুচির। সুখমতিয়া শৈশবেই যে-রামসুখের বাগদত্তা, আজ শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক প্রথা আর অভিভাবকদের মর্জি মেটাতে তাকে বিবাহ করা তার পক্ষে একটা প্রহসন মাত্র। এখন সে জীবিকায় স্বাধীন। নার্স কোয়ার্টারে থেকে তার জীবনধারা বদলে গেছে। উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে ব্যবধানের অস্বস্তি না কাটলেও সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক সহজ। রামসুখের জীবনের ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত। লেখাপড়ার আগ্রহে অর্ধপথে জলাঞ্জলি দিয়ে পারিবারিক দায় মেটাতে সে দিল্লীর অভিজাত পাড়ায় জমাদারের পাকাপোক্ত চাকরিতে বহাল হয়েছে।

পাত্রপাত্রীর দুই পরিবারই বুঝতে পারে, আজকের সুখমতিয়ার সঙ্গে রামসুখের বর্ণ এক হলেও শ্রেণী ভিন্ন। তবু অবর্ণেরও নিজস্ব সংস্কার থাকে। নিজস্ব ধর্মের অহংকার থাকে। ভেদবুদ্ধির সংক্রমণ থেকে তাদেরও রেহাই নেই। তাই হরিজন কলোনির বাসিন্দারা যেদিন জানতে পারে, সন্ত কওরের ভাই হরভজনের সঙ্গে সুখমতিয়ার বিবাহের উদ্যোগ চলেছে, সেদিন গোটা পল্লীর বুকে ঝড় বয়ে যায়। শিখ হরিজন আর হিন্দু হরিজন তো এক নয়! শিখ হরিজনেরা পুরুত দেবতা বামুন মানে না। ওদের বিয়ে হয় গুরুদ্বারে। হিন্দু হরিজন মেয়েকে ওদের ঘরের বউ করার স্পর্ধা ক্ষমার অযোগ্য। বিবাদের রঙ্গমঞ্চে অবশ্য রামসুখ বা সুখমতিয়া থাকে না। থাকে না তাদের অভিভাবকেরাও।

কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে না পেরে রামসুখের বন্ধুরা সুখমতিয়ার পাণিপ্রত্যাশী ভাঙ্গি শিখের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে মরিয়া হয়ে ওঠে। হরিজন পল্লীর এই প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময়ী জাত-পাতের ব্যাধির আরও একটা উপসর্গ তুলে ধরেন। সমাজের নাড়ীতে সঞ্চারিত বিষক্রিয়ায় অপমানে তলিয়ে যাওয়া মানুষেরাও সমতার চেতনায় এক হতে পারে না। বরং উপেক্ষার যন্ত্রণা সামান্যতম সুযোগেও আত্মম্ভরিতার সাধ মেটায়।

এই স্পৃহা আশ্চর্যভাবে শমিত রামসুখের মধ্যে। সুখমতিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন ছিল তার। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক দম্ভে বাগ্‌দত্তাকে বধূ করার হঠকারিতাকে সে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেয়নি। পিতার অস্থি সমর্পণের জন্য হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে ট্রেনের কামরায় বসে তার চোখের সামনে যেন ঘুরে ফিরে এসেছে সুখমতিয়া। নার্সের পোশাক পরা তার ভদ্র সভ্য মূর্তি। তাদের পল্লীতে বসন্তরোগীদের মাঝখানে তার সেবাময়ী মূর্তি।—'ঐ অচেনা সুদূরের মতো এ সুখমতি যেন অন্য ধরনের মেয়ে। তাদের জাতের মতো নয়।'[১৬] এ মেয়ে কি কোনদিন তাদের ঘরের ঝাড়ুদারের বউ হতে পারে? তবু মনে হয়, সুখমতিয়ার সঙ্গে একবার সরাসরি কথা বলা ভাল। তীর্থ থেকে ফিরে রামসুখ একদিন গিয়ে দাঁড়ায় হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারের দরজায়। সুখমতিয়া তাকে সহজ উচ্ছ্বাসে আহ্বান জানায়। তার মধ্যে সিদ্ধান্তের টানাপোড়েন নেই বলে আড়ষ্টতাও নেই। কিন্তু রামসুখের পুরনো মন থমকে দাঁড়ায়। তুই না তুমি? কী বলে সে সম্বোধন করবে একদা ভাঙ্গিপাড়ার মেয়ে সুখমতিয়াকে? ক্রমে দ্বিধা কাটে। গল্প জমে ওঠে। কিন্তু বিয়ের কথা মুখেও আনতে পারে না রামসুখ। বরং ফিরে যায় এক রাশ অভিজ্ঞতার বিস্ময় নিয়ে। সুখমতিয়ার সঙ্গে নিজের ফারাকটা আরও স্পষ্ট হওয়ার গোপন যন্ত্রণা নিয়ে। সে তার মাকে জানিয়ে দেয়, সুখমতিয়া এখন 'ইলেমদার লেড়কী, রইস ঘরানার মতো।' যে-মেয়ে বিজলির চুলোয় রান্না করে, ঠাণ্ডা মেশিন থেকে মালাই বরফ বের করে খাওয়ায়, হিন্দি-ইংরেজি কেতাব পড়ে, গন্ধা কাজ-করা মানুষদের মাঝখানে তাকে আর মানায় না। রামসুখ ভাবে। বড় বেদনার মতো বাজে তার ভাবনা। সুখমতিয়ার মতো দু-একজনের নাহয় গোত্রবদল হল। কিন্তু তাদের গোটা জাতটার শাপমোচন হবে কেমন করে?—'হরিজন? একটু হাসে একালের আলো ছোঁয়া মন। কাকে উন্নত করেছেন গান্ধীজি? নামই নতুন দিয়েছেন। কিন্তু 'কাম' (কর্ম) কাজ সেই একই রয়ে গেছে।'[১৭] ভেতরের ক্ষত জিইয়ে রেখে ওপরে প্রলেপ দেওয়ার সান্ত্বনায় জ্যোতির্ময়ী আস্থা রাখতে পারেন না।

রামসুখের তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে হরিজন উন্নয়নের ভাবনায় ঔপন্যাসিক নতুন মাত্রা সংযোগ করেছেন। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আন্তঃপ্রাদেশিক তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের সঙ্গম,—'নিদারুণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিষ্পেষিত জনতা, ভারতবর্ষের দলিত ক্ষুধিত প্রতীক মহা-জনতা নিষ্পিষ্টভাবে হাঁটু মুড়ে বসে আছে।'[১৮] স্বামী বিবেকানন্দ এদের শিবরূপে সেবা করার কথা বলেছেন। গান্ধীজি এদের সর্বসুখময় রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অবস্থা বদলায়নি। তবে জ্যোতির্ময়ী ধ্রুবজ্ঞানে জানেন, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ অবর্ণকে যা একাকার করে দিতে পারে, তার নাম দারিদ্র্য। অর্থসম্মানহীন সম্ভ্রমহীন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের একটাই জাত। সবাই ঘেঁষাঘেঁষি বসে। মুচি-মেথর-হাড়ি-ডোম কে কার খবর রাখে। তবু মাঝে মাঝে ঘুণপোকা নড়ে ওঠে। ভিড়ের কামরায় এক বাঙালি সাধু মহারাজ রামসুখের হাত দিয়ে চায়ের ভাঁড় নিতে চাইলে কুণ্ঠিত রামসুখ জানায়, সে ভাঙ্গি। এক পলকের জন্য হলেও গাড়ির অর্ধসুপ্ত জনতার যেন ঘুম ভেঙে যায়। স্বামীজিও তো মাটির পাত্র মুখে তোলেন কিছুটা দ্বিধার সঙ্গেই। তবে হরিদ্বারের পুণ্যস্নানে আবার সবাই একাকার। কন্‌খলে মহাযজ্ঞসভাতেও খাওয়ার পাতে কেউ জাতের প্রশ্ন তোলে না।

কিন্তু মন্দির মানেই যেন প্রাচীরবেষ্টিত বদ্ধতা। রামসুখ এবং ঘটনাচক্রে তার সহযাত্রী শিখ

ভাঙ্গি হরভজন কৃপানন্দজির কেদারবদরি যাত্রার সঙ্গী হতে চাইলে অন্য এক স্বামীজি সতর্ক হন—'ওরা তো মন্দিরে ঢুকতে পাবে না। আর পথে ও ধর্মশালায় তীর্থযাত্রী বর্ণহিন্দুরা শুনলে অচ্ছুৎ বলে তফাৎ করবে। গোলমাল বাধবে।'[১৯] না, জাতিভেদের হিন্দুসমাজে তীর্থক্ষেত্রেও ধূলামন্দির গড়া হয়নি। তবু দুই ভাঙ্গির ব্যাকুল আগ্রহকে কৃপানন্দজি ফেরাতে পারেন না। হিমালয়ের অজানা পথে অগণিত যাত্রী আর উদার সাধুসঙ্গ রামসুখ-হরভজনকে নতুন বিশ্বের সন্ধান দেয়। কিন্তু মন্দিরে ঢোকা হয় না। ধর্ম নিয়েও কূটনীতির খেলা! কৃপানন্দজি ওদের প্রবোধ দেন, মূর্তি শুধু মন্দিরে নেই। নিসর্গ জুড়ে বিশ্বরাজের অবস্থান। বিবেকের দংশন এড়াতে তিনি কৌশলে জানিয়ে দেন—'কোনো নিয়মকে লঙ্ঘন করা আমাদের গুরুদেব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দজীর কানুন নয়।'[২০] যদি মানবাত্মার অপমান হয়, তাহলেও নয়? উত্তর কে দেবে? রামসুখরা মাথা পেতে নেয় কৃপানন্দের নির্দেশ। অনেক না পাওয়া জীবনে কিছু তো পাওয়া গেল!

হীনম্মন্যতায় ক্লিষ্ট মানুষ মেনে নিতে পারে এই অবিচার। কিন্তু আত্মপরিচয়ের শিকড় খুঁজে পাওয়া সুখমতিয়া তা মানবে কেন? রামসুখের কাছে তীর্থভ্রমণের গল্প শুনতে শুনতে ফুঁসে উঠেছে সে—'অতদূরে অত খরচ করে কষ্ট করে গিয়েছিলি। আর মন্দিরে ঢুকতে দিল না?'[২১] সুখমতিয়ার মধ্যে শুধু অধিকারবোধ নয়, সমালোচনার সাহস জেগেছে। গান্ধীজি তো সকলের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দিতে বলেছিলেন। তাঁর কথার মর্যাদা রইল কোথায়?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। নিম্নবর্গের কণ্ঠে ভাষা দিতে দিতে জ্যোতির্ময়ী নিজেও ঢুকে পড়েন প্রতিবাদীর বৃত্তে। তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর বিশ্লেষণ। নিম্নবর্গের উত্তরণের জন্য উচ্চবর্গের দেওয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতার পিছনে সাজানো অক্ষম অজুহাতগুলি শরাহত হয় তাঁর কলমে। প্রচার দিয়ে তো উন্নয়ন হয় না। চাই পরিসংখ্যান।—'যারা ভাবতে, কথা বলতে জানে না—যারা শুধু যুগ যুগ ধরে বাণী আর বক্তৃতা শুনে এলো...সবশুদ্ধ তারা কত কোটি?'[২২] পরাধীন ভারতবর্ষে নাহয় জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সফল না হওয়ার পিছনে ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির হাত ছিল। তাঁদের চতুর অভিপ্রায় নাহয় সাধারণ মানুষকে অশিক্ষিত মূঢ় করে রেখেছিল। নাহয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু বিদেশিদের হাত থেকে একবার শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিতে পারলে সব সংকটের অবসান হবে এমনটাই শপথ শুনিয়েছিলেন দেশপ্রেমিক নেতারা। অথচ 'অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জীবিকা' দেশবাসী কি তা পেয়েছে?'[২৩]

ঔপন্যাসিকের কলম হাতে নিয়েও জ্যোতির্ময়ীর চোখে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি। খণ্ড কালকে তিনি দেখেন অখণ্ড সময়ের পরম্পরায়। তাই এত স্বচ্ছ তাঁর বীক্ষণ। তাই দলিত-নির্যাতন এবং দলিত-বিদ্রোহ, কোনোটাই তাঁর কাহিনীতে বিচ্ছিন্ন চেতনা হিসেবে আসে না। নির্মোহ বোধের ফলেই তিনি জেনে যান—'এ আমার এ তোমার পাপ।' বন্দরের বন্ধনকাল ছিন্ন করে পালাবদলের লগ্ন যেদিন এলো, পঞ্চাশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা মানুষেরা সেদিন স্থবির। জাতির কর্ণধার মহাত্মাজি নিহত। ক্ষমতা যাঁদের হাতে কেন্দ্রীভূত হলো, তাঁদের চোখে অপরিসীম লোভ। তাঁদের কোষাগার ভরা ধন। প্রাসাদ ভরা বিলাসের উপকরণ। তাঁরা সব বৈশ্যবৃত্তির মানুষ। তাঁদের লুব্ধ মুখে শীল-শান্তি-আধ্যাত্মিকতার ললিত ছলনা। দেশে জ্ঞানী-আদর্শ ব্রাহ্মণ নেই। আত্মত্যাগে প্রস্তুত শৌর্যশালী ক্ষত্রিয়েরা নেই। আছে শুধু 'হরিজন আদিবাসী নিম্নবিত্ত দুরাশামুগ্ধ, চিরকালের মতোই কপটবাক নেতৃত্বে বিশ্বস্ত মূঢ় শূদ্র জনতা।' চতুর্বর্ণবিভাজিত সমাজকাঠামোর কঙ্কালে উচ্চবর্গের গুণকর্মগরিমার চিহ্নমাত্র নেই। আর নিপীড়িত শূদ্রের অবস্থা কালান্তরেও অপরিবর্তিত। সেদিনও যা ছিল আজও তাই।

দলিত আন্দোলনকারীদের বক্তব্যের সূত্র ধরে আমরা শুরুতেই প্রশ্ন রেখেছিলাম, অদলিত

লেখকদের পক্ষে দলিত সাহিত্য রচনা সম্ভব কিনা। উত্তরটা নারী লেখকদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হওয়ার কথা, যদি তাঁরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকেন। জ্যোতির্ময়ী ছিলেন। 'দৈন্য' প্রবন্ধে তিনি সরাসরি প্রাবন্ধিকের একোক্তিবাচনে লেখেন : "শুনেছিলাম 'শূদ্র' কথাটার উৎপত্তি 'ক্ষুদ্র' থেকে। সংস্কৃত বিশুদ্ধ উচ্চারণে ক্ষুদ্র তাই-ই বটে।...আর 'স্ত্রী' জাতের সঙ্গে শূদ্রের বড় অবস্থাভেদ নেই।"[২৪] এই ভাবনারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'হরিজন উন্নয়ন কথা'য় বাল্মীকিভবনের শিক্ষিকাদের সংলাপে। বহু হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে হরিজন পল্লীর বাসিন্দারা যখন বিক্ষুব্ধ, স্বামীজিরাও তাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থ, তখন কৃপাবিবি তাদের বোঝান, 'আমাদের শাস্ত্রে মেয়েদেরও দেবদেবী পূজা করতে দেবার নিয়ম নেই।'[২৫] করুণা রায় মন্তব্য করেন—'আমরা মেয়েরাও তোমাদের মতো অচ্ছুৎ।.... যদিও আমাদের তাঁরা দেবী বলেন।'[২৬] আন্তরিকভাবে হরিজন কল্যাণার্থী হয়েও যে-শিক্ষিকারা কোনোমতেই বর্ণের শ্রেয়তা ভুলতে পারেন না, অন্ত্যজদের প্রবোধ দিতে গিয়ে তাঁরাও কখন সামাজিক বঞ্চনায় একাকার হয়ে যান। এই 'সমানুভূতি' জ্যোতির্ময়ীর বহুদর্শী বোধের নির্মাণ। তাতে ছলনা নেই বলে তাঁর ভাষাও অনুকম্পার ভাষা নয়। এমন লেখকের রচনা বিচারে দলিত সাহিত্য আন্দোলনকারীদের আরও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি কাম্য।

'হরিজন উন্নয়ন কথা'র প্রারম্ভ ও সমাপ্তি দুটি উল্লেখযোগ্য স্মরণতিথির উৎসবে—নেহেরু জন্মজয়ন্তী ও গান্ধী জন্মজয়ন্তী। অচ্ছুৎ-উদ্ধারের ভাবনা প্রসঙ্গে দুটিরই তাৎপর্য গভীর। নেহেরু জন্মদিবস মানে বালদিবস। কিন্তু উচ্চবর্ণ আর অধোবর্ণের বালক-বালিকাদের সামাজিক সংজ্ঞা তো এক নয়। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষয়িত্রীদের সেদিন চিন্তা, বহু বিদেশি অতিথি সমাকীর্ণ জনসভায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অপরাপর মন্ত্রীমহোদয়ের হাতে কারা তুলে দেবে ফুলের স্তবক। অবশ্যই বড়লোকের ঘরের সুরূপ আদবকায়দাপালিশ ছেলেমেয়েরা! প্রস্তুতির আয়োজনের মধ্যেই হঠাৎ বাল্মীকিভবনের মলিন বসন পরা কিছু শিশুমুখ আর্জি জানায়—'বিবিজি, আমাদের নিয়ে যাবেন?'[২৭] অবাক করা প্রশ্ন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। গান্ধীদিবসের মতো বালদিবসে হরিজন-পল্লীর জন্য কোনো কর্মসূচি নেই। তবু শিক্ষিকারা ভাবেন, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়। আশ্বাস পেয়ে ওরা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওদিকে ওদের বাবা-মায়েরা নতুন দিল্লীকে সভ্যভব্য আর পুরনো দিল্লীকে সাফসুতরো করার কাজে দিনভোর রাতভোর ঝাঁটা কুলো ঠেলাগাড়ি নিয়ে হয়রান হয়ে ঘোরে। এদিকে ওরা স্নান করে সেজেগুজে বাল্মীকি-ভবনে সারাদিন প্রতীক্ষা করে। না, ওদের জন্য অনুমতিপত্র আসে না। গাড়িও আসে না। বালদিবসের উৎসব শেষহয় ওদের মুখে আঁধার নামিয়ে।

বেদনার এই বিবরণী দিয়ে জ্যোতির্ময়ী হরিজন উন্নয়নের প্রহসনকে শুরুতেই ঘা মারেন। তারপর ভাঙ্গি কলোনিতে সময়ের অনেক স্রোত বয়ে যায়। অনেক আশা-নিরাশা, গতি আর স্থবিরতা, বদ্ধতা আর মুক্তির টানাপোড়েন, পায়ের তলায় মাটি সরে যাওয়া অথবা জমি খুঁজে পাওয়া, পুরনো সম্পর্কে ভাঙন আর নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠা, আনুগত্যের হীনতা ও তার মধ্যে মাথা তোলা বিদ্রোহের বয়ন—সব মিলিয়ে একটা কথা বোঝা যায়, অল্প হলেও ঢেউ উঠেছে হরিজন-পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনে। এতকালের অভ্যাস টাল খাচ্ছে। গণ্ডির বাধা পেরিয়ে নিজের নিজের মতো করে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে নিতে চাইছে কেউ কেউ। সুখমতিয়াকে পাওয়ার আশা নেই জেনে ঘর-উদাসীন রামসুখ তার মা আর ছোট দুই ভাইকে নিয়ে চলে যায় কন্‌খলে। স্বামীজির কৃপায় ওরা কাজ পায় সেবাশ্রমে। সুখমতিয়া আর হরভজনের সম্বন্ধের জট সহজে খোলে না। সুখমতিয়া জানে—'ওদের সমাজ এত আধুনিক হয়নি যে ইচ্ছামতো কেউ স্বজাতির বিয়ের সম্বন্ধ 'সগাই'য়ের কথা উল্টে বিয়ে ভেঙে দিতে পারে।'[২৮] কৃষ্ণাবিবিরাও উদ্যোগ নিতে দ্বিধা করেন,

যেহেতু 'পুতুলের বিয়ের মতো পুতুলনাচের খেলার মতো সবই সমাজ নামক খেলাঘরের কর্তাদের হাতে।'[২৯] সেই অচল কর্তৃত্বকে নাড়া দেবে কে? সুখমতিয়ার মা-বাবাও সমাজের ভয়ে সংকুচিত থাকে। বাবা লছমন ক্রুদ্ধ মনে ভাবে, রামসুখের মতো তরক্কীয়ালা ছেলে কটা আছে তাদের ঘরে? শিখ ছেলেটি কম্পাউণ্ডারি করে কত টাকা রোজগার করবে? কে মানবে এমন বিয়ে? পঞ্চায়েত তাদের জাতিচ্যুত করবে। সমাজ তাদের থেকে মুখ ফেরাবে। ভয়ে ভয়ে দিশাহারা মানুষটা।—

"সে যেন দেখতে পায় চিরকালের সমাজের মুখ কঠিন লাল চোখে হুঁকাপানি বন্ধ করবার তর্জনী তুলে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে আছে সমাজের সমস্ত মানুষ। 'দারু সালান দহি জিলাবী লাড্ডু' ভোজের আশায় আনন্দে ছাই দিয়ে যদি-ই বা এ বিয়ে হয় তো তারা নেমন্তন্ন খাবে না। কারণ এ বিঁয়ে অসিদ্ধ, সমাজ মতে।"[৩০]

উচ্চবর্ণ-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক কাঠামোর তলায় আরও একটা সমাজ। সেখানেও হরিজনদের নিজস্ব জাতের বিধান। সেখানেও গোষ্ঠীপ্রভুত্ব। অ-দলিত জ্যোতির্ময়ী অভিজ্ঞতার নিরিখে দলিত বাস্তবতাকে চিনতে ভুল করেন না। পরিবর্তনের হাওয়া লেগে অচল গড়ে চিড় ধরছে, এও তাঁর কষ্টকল্পনা নয়। চারপাশে অজস্র বিরূপতা, অজস্র প্রতিরোধ। তবু সুখমতিয়া আর হরভজন জীবনে জীবনে গ্রন্থি বাঁধে। হিন্দু আর শিখ হরিজনের তফাত ওরা ভুলে যায় শিক্ষা, রুচি, ভাল-লাগা, ভালবাসায় সিদ্ধ সবর্ণতায়।

অবশ্যই এ সিদ্ধি নিয়মের নয়, নিপাতনের। স্বাধীনতার ছ'বছর পরেও রক্তাল্পতায় ক্ষীণ হরিজন পল্লীর সাধারণ চেহারাটা উৎসাহ জাগাবার মতো নয়। কাহিনীর যবনিকাপাতের সময় আসে ১৯৫৩-য়। তারিখ ২ অক্টোবর। হরিজন কলোনির ছেলেমেয়েরা বালদিবসে ব্রাত্য হলেও গান্ধী জন্মজয়ন্তী উৎসব তাদের ছাড়া চলে না। তারাই জননেতাদের তুরুপের তাস। তারাই উন্নয়ন-ব্রতের বিজ্ঞাপন। বস্তিবাড়িগুলো তাই পরিষ্কার করা হয়েছে। রাস্তাঘাট ঝকঝকে। বাল্মীকিভবনের ঘর-দালান-প্রাঙ্গণ জুড়ে খদ্দরধারী দর্শকদের ভিড়। গান্ধীজয়ন্তীর প্রধান প্রতীকী অনুষ্ঠান সূত্রযজ্ঞ। পাখার নীচে ঘর্মাক্ত কলেবরে গান্ধীভক্তরা একঘণ্টা ধরে মৌনমুখে অভ্যস্ত বা অনভ্যস্ত হাতে সুতো কাটেন। হরিজন শিশুরা অবাক চোখে কী ভাবে?—'চরখাপূজা হোয়ত মালুম।'[৩১] হ্যাঁ, পূজাপার্বণের প্রথার মতোই সুতাকাটাও বৎসরান্তিক ব্যাপার।

সমারোহের আয়োজন যতই লোক দেখানো হোক, এই উপলক্ষে বাল্মীকি-ভবনে নানা প্রদেশের মানুষের সমাগম হয়। ভাবনার আদান-প্রদান চলে। এখানেও ভারতবর্ষীয় পরিচয়ের চিরন্তন প্রথায় জাতি-পঙ্‌ক্তি-কর্ম-বিত্তের প্রসঙ্গ আসে। মালাবারের মেয়ে কামাক্ষী আম্মা, মাদ্রাজের মেয়ে কাবেরী আম্মার কাছে রাজধানীর শিক্ষিকারা জানতে পারেন, আগে এঁরা ছিলেন হরিজনদের মতোই 'মাদ্রাজী অচ্ছুৎ'—পারিয়া। বাপ-দাদারা তিন পুরুষ আগে খ্রিস্টান হন। মিশনারীদের চেষ্টায় লেখাপড়ার এবং ভালো চাকরি করার সুযোগ পান। এখন আর কেউ তাদের অজাত বলে না।—'লেখাপড়া ধর্মান্তর জাত বদলে দিয়েছে।'[৩২]

সাহস করে সংকীর্ণতার সীমা পেরোলে সকলেরই জাত বদল হয়। সূত্রযজ্ঞ সভার দ্বারে সেই বার্তা নিয়েই এসে দাঁড়ায় রামসুখের দুই ভাই। এক ভাই কম্পাউণ্ডারি পাশ করে কনখলের সেবাশ্রমের হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে। আরেক ভাই ম্যাট্রিক পাশ করে সেবাশ্রমের স্কুলে পড়ায়. হীনম্মন্যতার ছায়ামাত্র নেই ওদের মধ্যে। জন্মান্তর পাওয়া দুই তরুণের আশ্চর্য উত্থানকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেন জ্যোতির্ময়ী। বড় বেদনার সঙ্গে দেখেন বিপরীত ছবিটাও।—

"দুটি কিশোরের চোখে মানুষের সঙ্গে এসে দাঁড়াল ভরসার আলো ভরা একটি নতুন কাল।

ভাঙ্গি? অচ্ছুৎ? তারা ভুলে গেছে।

সহসা বিমর্ষ হয়ে যায় চারদিকের সেই পুরাতন বস্তি। ঝাড়ু ময়লার টিন সুপ চামচ চোখে পড়ে।

তারা জানে না এখনো আট কোটি ভাঙ্গির সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ নরনারী শিশু বালক পবিত্র 'হরিজন' নামেই ঐ কাজটি করে চলেছে। দেশের দশের চিরকাল ধরে নোংরা-ময়লা পরিষ্কারের কাজ।"[৩৩]

জীবনে অন্ধকার যদি সত্য হয়, আলোও সমান সত্য। কিন্তু জোর করে যাদের তমসার কারাগারে বন্দী করা হয়, তাদের পায়ের বেড়ি ভাঙতে হবে নিজের জোরে। যাত্রা একবার শুরু করলে সূর্যতোরণ খুলবেই। প্রথমে হয়তো একলা পথ চলা। ধীরে ধীরে জনসমুদ্রে জোয়ার আসবে। দলিত সাহিত্যের মূল প্রাণনা আর প্রত্যয় নিয়েই কাহিনীর সমাপ্তিতে জ্যোতির্ময়ীর গাঢ় উচ্চারণ। তার জন্য এক সম্ভাবনাময় অমল উদ্ভাসনের প্রয়োজন ছিল। তাই সূত্রযজ্ঞ সভায় খদ্দরধারীদের বুজরুকির মাঝখানে হঠাৎ দেখা গেল একটি শিশুকে। মাথায় শিখদের মতো ঝুঁটি। মুখে অনাবিল হাসি। সুখমতিয়া আর হরভজনের নিয়মভাঙা পরিণয়ের শুদ্ধ জাতক সে। তার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সভায় উপস্থিত একজন স্বামীজি বললেন—' তোমাদের শিশুটিকে ডক্টর আম্বেদজীর মতো বিদ্বান মানুষ করে তুলো।'[৩৪]

অন্য সাধুজিরা সমবেত হরিজনদের আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন—"দেওয়ালীতে প্রথমে একটি প্রদীপই জ্বালা হয় দেখেছেন তো? সেই একটি দীপ থেকেই একে একে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালা যায়। জ্বালা হয় চিরকাল। আপনাদের 'হরিজন' অচ্ছুৎদের মধ্যে সেই প্রথম প্রদীপ হলেন ডক্টর আম্বেদকরজী।"[৩৫]

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপ্ত বাণীতে শূদ্র জাগরণের কথাও তাঁরা বলেন। কিন্তু জাতপাতের পোষক ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দলিত সম্প্রদায়ের শোষণবিরোধী আন্দোলনে ভাববাদী দর্শনের চেয়ে সক্রিয় বিদ্রোহ অনেক বেশি ফলবান। জ্যোতির্ময়ী তাই নতুন প্রজন্মের হরিজন শিশুর জন্য আদর্শ হিসেবে সামনে রাখেন আম্বেদকরকে। গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর ক্যারিশমার মোহ থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন।

না, জ্যোতির্ময়ীর 'হরিজন উন্নয়ন কথা'র জন্য আমরা 'দলিত সাহিত্য'-এর তকমা দাবি করি না। কিন্তু লেখকের অ-দলিত শ্রেণী-পরিচিতির কারণে তাঁর গ্রন্থের অবমূল্যায়ন অথবা তাঁর সততার অমর্যাদায় আমাদের আপত্তি আছে। জন্মগত উত্তরাধিকার যদি বিচ্ছিন্নতার কারক হয়, সমাজগত শূদ্রত্বের যন্ত্রণা তবে তাঁর মর্মের সেতুবন্ধন। হরিজন কলোনির মানুষদের দেখতে দেখতে জ্যোতির্ময়ী তাঁর শ্রেণীচৈতন্যের আবরণ ভেঙে বেরিয়ে আসেন। কলোনির সীমা ছাড়িয়ে, প্রদেশের সীমা ছাড়িয়ে বৃত্তের পর বৃত্তের পরিধি বাড়াতে বাড়াতে তিনি চোখের সামনে গোটা ভারতের দলিত মানুষের মুখ দেখতে পান, রামরাজত্বের মরীচিকা যাদের তৃষ্ণার জ্বালা বাড়িয়েছে, যাদের উন্নয়ন আজও কল্পকথা।

প্রাসঙ্গিক সূত্র :

১। যতীন বালা—'দলিত সাহিত্য আন্দোলন (উৎস, ইতিহাস, মূল্যায়ন)', চতুর্থ দুনিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ১ম প্রকাশ ২০০২। পৃ. ৪০।

২। Mahatma Gandhi–'The Untouchables', Selected Writings of Mahatma Gandhi, Edited by Ronald Duncan, Fontana/Collins, University Press, Oxford, 1971. Page 173.

৩। Sumit Sarkar–Modern India [1885-1947], Macmillia India Limited, Delhi, 1983. Page 329.

৪। Mahatma Gandhi, as mentioned before, Page 176.

৫। জ্যোতির্ময়ী দেবী—'লেখিকার নিবেদন' হরিজন উন্নয়ন কথা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন [৪র্থ খণ্ড], গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪।

৬। জ্যোতির্ময়ী—'বাল্মীকিভবন শিক্ষাকেন্দ্র', হরিজন উন্নয়ন কথা। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

৭। প্রাগুক্ত।

৮। প্রাগুক্ত।

৯। জ্যোতির্ময়ী—'সেন্ট স্টিফেন কলেজ ক্রিশ্চান স্কুল', হরিজন উন্নয়ন কথা, প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭।

১০। জ্যোতির্ময়ী—'স্বাধীনতার স্বাদ—জাতীয় চরিত্র', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন [৫ম খণ্ড], প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫। পৃ. ৪২৪।

১১। 'হরিজন ফাগু' হরিজন উন্নয়ন কথা, প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৮।

১২। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬০।

১৩। Sumit Sarkar, as mentioned before.

১৪। 'আম্বেদকরের কথা', হরিজন উন্নয়ন কথা, প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৫।

১৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৩।

১৬। 'হরিদ্বার পথে', প্রাগুক্ত। পৃ. ৭০।

১৭। 'লগন', প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬।

১৮। 'হরিদ্বার পথে', প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৯।

১৯। 'তীর্থ সাধ', প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৬।

২০। 'মলাই কা কুঞ্জে', প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৩।

২১। প্রাগুক্ত।

২২। 'সেই সব "ম্লান মূক মূঢ় মুখ"', প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৫।

২৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৬।

২৪। জ্যোতির্ময়ী—'দৈন্য', জ্যোতির্ময়ী রচনা সংকলন [৫ম খণ্ড], প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪।

২৫। 'দান ও ব্যয়', হরিজন উন্নয়ন কথা, প্রাগুক্ত। পৃ. ১০০।

২৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০১।

২৭। 'বালদিবস [নেহরু জয়ন্তী]', প্রাগুক্ত। পৃ. ১২।

২৮। 'রামপতিয়া সুখমতিয়া', প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৪।

২৯। 'সবর্ণে ও সম্প্রদায়ে', প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৫।

৩০। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৬।

৩১। 'পর দীপমালা নগরে নগরে', প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৮।

৩২। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৯।

৩৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১১।

৩৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১২।

৩৫। প্রাগুক্ত।



অশ্বমেধের ঘোড়া : আত্মগত মূল্যায়ন অথবা অপটু পাঠ

• • • • • •

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা কাঞ্চন-রেখা। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে।

তথাকথিত উন্নতি আর প্রগতির অশ্বমেধের ঘোড়া। বিজিত জনপদের মতো পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্মতা আর সংবেদন, হারিয়ে যাচ্ছে মুগ্ধতা আর অভিমান। নাগরিক সাফল্যের কুহক যেন দুচোখে ঠুলি হয়ে আছে। দিগ্বিজয়ের উল্লসিত হ্রেষায়, তার তুখোড় গতির পরাক্রমে, হর্ষের হর্সপাওয়ার দীপ্তিতে পুরনো সহজ মানবিক সেন্টিমেন্টগুলি ছিটকে পিছু হটে গেছে কবে। ছুটছে অশ্বমেধের ঘোড়া। সময়-সমাজ-স্বভাবের মিলিত বর্ণময় কোলাজ তার শরীরে।

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন দেখছে এইসব, আর ভাবছে, 'এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বর হচ্ছে, সূক্ষ্মতার নামে দরকচা মেরে যাচ্ছে।' ত্রিমাত্রিক তঞ্চকতার এমন এক বিশ্বে দাঁড়িয়ে একজন রেখা দেখেছে এইসব, আর বলছে, 'এত বাণী দিও না মাস্টার মশাই। লোকে ধরে বেঁধে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে।' এদের দ্যাখা আর এদের অনুভব-অভিমানটুকু দ্যাখানোর দায়ভার যেন সেধে নিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অসামান্য গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র অক্ষরে অক্ষরে। কাঞ্চন এবং রেখা সেই গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

জীবনের গল্পগুলিতে সাধারণত যেমন হয়, প্রথমে ওদের বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম। তারপর চুপিচুপি বিয়ে। রেজিষ্ট্রি। গোপন গেরিলাযুদ্ধের মতো এই বিয়ের শরিকও দুচারজনই মাত্র, সুকুমার, প্রফুল্ল, চন্দন। কারণ বাড়ি মানেনি, সমাজও সম্ভবত না। সইসাবুদ-শেষে প্রতীকী মালাবদলের মালা হাতে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত যুগলে বাঘমার্কা ডাবলডেকারে উঠে এবং আর এক প্রস্থ অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমে বাস কন্ডাকটারের টিটকিরি শুনতে শুনতে ঠিক যে কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথ যেন তাদের হয়েও তাদের নয়। সানাইয়ের সুর, কান্নার স্বাদ আর অসম্মানের গন্ধমাখা সেই রাজপথে মাঙ্গলিক মালাজোড়া অভিমানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা দেখেছিল, 'একটা স্থবির বলদ সেটি চিবুচ্ছে।'

ওরা, কাঞ্চন আর রেখা। স্বামী-স্ত্রী। অথচ চারপাশের কেউ জানে না ওদের বিয়ের কথা। কারণ একসঙ্গে থাকে না ওরা, থাকেনি একদিনও। "রেখা রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর মুছে" ফেলেছিল সেই রেজিস্ট্রির দিনেই। তারপর থেকে শুধুই ভয়। লুকোচুরি। যেন গোটা পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। এবং তারপরও প্রাপ্য আর প্রাপ্তের ব্যবধানে দাঁড়ানো দুটি স্পর্শকাতর, অতএব স্পষ্ট কাতর নারীপুরুষের পরস্পর সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে বাঁচার বিচিত্র বারোমাস্যা। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের চেয়ে ঢের বেশি সংবেদনশীল আর কল্পনাপ্রবণ হওয়াটাই যেন কাঞ্চনদের ক্ষেত্রে সত্যিকার সমস্যা। যে নির্বোধ হঠকারিতাকে আমরা সাহস বলি, যে বাচাল চাতুরিকে আমরা সপ্রতিভতা বুঝি, যে বৈষয়িক ধূর্ততাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল হওয়া ভাবি—সেই সবের থেকে

অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এরা দ্যাখে, সৌন্দর্য আর স্বপ্নের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল, যেন কুৎসিত ক্যাকোফনির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। যেন আসলে ভেঙে যাচ্ছে তাদেরই ঘরবাঁধার স্বপ্নটা। আর সেই নষ্টনীড় বেদনাবেলায় গল্পে তাদের শুধু বারবার দ্যাখা যায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে, কিংবা বাসে চেপে গোধূলিমদির শহরের অলিগলি ঘুরে আবার যে যার মতন ডেরায় ফিরে যেতে। সুসভ্য প্রেমিকসুলভ এই শোচনীয় অবদমনই অগত্যা তাদের অনন্যোপায় দাম্পত্য। অথবা, তার শতছিন্ন ছদ্মবেশ। সুতরাং জয় করে তবু ভয় কিছুতেই যায় না। তবু এই ভীরু প্রেমের মেঘাচ্ছন্ন মন্থর আকাশে ধ্রুবতারাটির মতো বেঁচে থাকে তাদের কমিটমেন্ট! ভালোবাসা।

বড্ড বেশি বুদ্ধিজীবী ওরা। একটু বেশিমাত্রায় পোশাকিও যেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পারস্পরিক ব্যবধানের দীর্ঘশ্বাস পার হয়ে তাদের দ্যাখা হলেও তারা যতোটা আন্তরিক ততোটাই যেন অ-শরীরী। বহুমূল্য মুহূর্তগুলি শুধু কথায় ভরে রাখে তারা, কুণ্ঠিত হাতে হাত রাখা কিংবা পায়ে পায়ে সতর্ক পথচলা বিনা কতোটুকু উষ্ণতা বিনিময় হয় তাদের? লোকলোচন এড়িয়ে, এই সুবিমলদের মতো পরিচিতের অশালীন কৌতূহল এড়িয়ে চলতে চলতে কতোটুকু উষ্ণতা রাখাই বা সম্ভব? হয়তো কিছু মর্মান্তিক সত্যকে দুজনেই দুজনের কাছে আড়াল করতে চায় এবং চায় বলেই বৃথা এত কথার ইমারত রচা। হয়তো তাই কাঞ্চন কখনো বা বলেই ফ্যালে 'জানো, এই কথার খেলা সত্যি আর ভাল লাগে না।' তবু এমন খেলা চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আশেপাশে পড়ে থাকে হেলাফেলা সারা বেলা, আশাহত। এমনি করে বিধিবদ্ধ বেঁচে থাকার ফাঁকেই, কী আশ্চর্য, বছর ঘুরে যায়! ফিরে আসে কাঞ্চন আর রেখার প্রথম বিবাহবার্ষিকী। গল্পের মূল সময়াঙ্ক সেই দিনটাই।

ভয়াবহ বাস্তবের প্রহারে পাংশু এরা দুজন ঠিক করেছিল, একটু আলাদাভাবে কাটাবে দিনটা, একটু বেশি যত্নে, একটু বেশি মর্যাদার সঙ্গে। সহজে লজ্জা পাওয়া অথবা সহজে দুঃখ পাওয়ার ভদ্রলোকি অভ্যেস জলাঞ্জলি না দিয়েও একটু বেশি সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের ব্যক্তিগত বড়ো দিনটাকে বাড়তি একটু মূল্য দিতে চাইলো দুইজনে। স্মৃতিকাতর কাঞ্চন পুরনো সেই দিনের মতো আবার যেন সন্ধ্যার বাতাসে শুনতে পেল চন্দ্রকোশ, সঙ্কোচের বিহ্বলতা ছেড়ে রেখা আবার পথের প্রৌঢ় পসারির থেকে কিনে নিলো ফুলমালা। এবং সেই ব্যতিক্রমী শুক্লপক্ষে হঠাৎ যখন কাঞ্চনের 'বেশ একটু মোগলাই মেজাজ হচ্ছে' ওরা দুজনে সাব্যস্ত করলো, আজ যে যার ঘরে ফেরার পথটায় আর বাসযাত্রার জনগণতান্ত্রিক নিয়মে অথবা, ট্যাক্সির বেলেল্লা দ্রুতির ডানায় ভর করে ফিরবে না, ফিরবে সময়কে উপভোগ করতে করতে আয়েস করে, স্মরণযোগ্যভাবে। কার্যত যা হবে, এমন দিনে, দুজনকে দুজনের দেওয়া সেরা উপহার।

আইডিয়াটা কাঞ্চনের। তারা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ফিরবে। যেন বা উনিশ শতকী বাবুর মতো, অলৌকিক দুলকি চালে, গতিময় নগরেব তাৎপর্যহীন ব্যস্ততাকে করুণা করতে করতে। নিজস্ব নির্জনতায়, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে মেলামেশা রঙিনতম মুহূর্তগুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে। কারণ তারা তো জানেই গোটা বছরভর কিছুই দিতে পারে নি তারা নিজেদের, অবশিষ্ট পরিচিত পৃথিবীর থেকে পালিয়েছে শুধু, কারণ তারা তো জানেই :

'ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, একপেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ আকর্ষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। একদিন কোনও এক নিকট অথচ বিস্তৃত অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। আর আজ, আর এখন, ঘেন্না করে।'

সুতরাং, আজ, এখন, এই বিশেষ স্মরণের সরণিতে দাঁড়িয়ে, ঘৃণা মুছে, নানান মাত্রার অভাব পাশে সরিয়ে ওরা এই সময়টুকুর সম্রাট হতে চেয়েছে, তাই কাঞ্চন চিৎকার করে ডাকে— 'গাড়োয়ান রোককে'। তারপর বিস্মিত রেখার অবাক উপস্থিতি এবং নীরব তারিফকে তারিয়ে তারিয়ে গ্রহণ করতে করতে উঠে বসে ফিটনে। ওরা দুজন, কাঞ্চন আর রেখা। এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর—এই নিত্যযাত্রাপথ আজ একটু অচেনার আবহে বর্ণময় হোক, এই ভেবে। সহিস বলে :

'পোলের ওপারভি যাবেন?

না।

গঙ্গার কিনারা দিয়ে?

হ্যাঁ।

চার টাকা লাগবে স্যার।'

এই হতভাগ্য শহরে, এই বর্তমানে, স্বপ্নেরও দরদস্তুর চলে। কংক্রিটের এই জঙ্গলে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে চলে নিয়ত টানাপোড়েন। সেই নৈমিত্তিক দড়ি টানাটানির খেলায় অতিস্পর্শকাতর কাঞ্চন সহজে আহত হয়। তার হীনম্মন্যতা ও ব্যর্থ পৌরুষ কখনো কখনো রেখার প্রতি ক্রোধ হয়ে ঝরে। একসময় অশিষ্ট গাড়োয়ানের সঙ্গেও বার্গেনিং শেষ হয় আড়াইটাকায়। ওরা ঘোড়া-গাড়িতে উঠে বসে। কাঞ্চনের 'অদ্ভুত আনন্দ' হয়।

'তারপর গাড়ি চলতে শুরু করল। পরপর কতগুলো বাস বাতাসের ঝাপট দিয়ে চলে গেল। জানলার পাশে দু-একজন যাত্রী একটু ঝুঁকে কাঞ্চনদের দেখল।... গাড়িটা দক্ষিণে ঘুরল।... কাঞ্চন এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে সে অত্যন্ত কমপ্লেক্স বোধ করছিল।

আর বৃষ্টি নামল। রেখা বাইরে হাত পেতে ধরল। ফোঁটা ফোঁটা জলে হাতটা অপরূপ হয়ে উঠল। আঙুলগুলিতে একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে হঠাৎ নূপুরের মৃদু শব্দতরঙ্গের অনুষঙ্গ এল। সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোষ বেজে উঠল।'

এই মন্ত্রমুগ্ধ পরিপার্শ্ব কাঞ্চনের অতিরোমান্টিক অনুভূতির কোণে যে ফাল্গুনী রচনা করে চলেছিল, হঠাৎ তার মগ্নতায় ধাক্কা দিয়ে, সমস্ত সূক্ষ্ম মীড়ের মায়াজালকে নাকচ করে দিয়ে সহসা সহিস হেঁকে বললো :

'বাবু?

কেন?

পর্দাটা ফেলে দিব?

কাঞ্চন জানত না এ জাতীয় ফিটনে পর্দা থাকে। অবাক হয়ে বলল 'দাও'। মুহূর্তে যেটাকে ভেবেছিল গাড়ির ছাউনি, তার ওপর থেকে দুপাশে দুটো চামড়ার পর্দা ঝুলে পড়ল। আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।'

অতএব, পুনর্বার স্তব্ধতা ও বিস্ময়। যে নির্জনতা ও নৈকট্য তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা ছিল এতোদিন, অথচ যা শহর কোলকাতার রকমারি ঔৎসুক্য আর তার হৃদয়হীন নিরেট ব্যস্ততা দ্যায় নি, হঠাৎ তা-ই পেয়ে প্রথম বিবাহবার্ষিকীর অন্তরাতে এসে তারা কিছুটা হতবাক হয়ে গেল। কাঞ্চনের আত্মসমালোচক মন এই অবকাশে অকস্মাৎ জানালো :

'রেখাকে নতুন করে কিছুই জানি না। রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না। আসলে আমরা

দুজনেই আমাদের আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।'

যে সুস্থ পারিবারিক জীবন পরস্পরকে চেনার স্বাভাবিক সুযোগটুকু করে দ্যায়, কাঞ্চন-রেখার পক্ষে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চেনাজানার সেই সুযোগ ছিল না। কেন ছিল না, কেন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার সৎসাহস 'সাহিত্যের অধ্যাপকের' ছিল না, কেন রেখার অনমনীয় জেদ প্রেমটুকুকে বিমূর্ত আদর্শের মতো আঁকড়ে ধরে থাকলেও তার স্বাদু সাধ, অথবা সাধু স্বাদকে পেতে চাইবে না? না, গল্পে এই জরুরি প্রশ্নের কোনো বুদ্ধিবিবেচনাগ্রাহ্য সদুত্তর নেই। কেন নেই? মন মন, তোমাদের কি শরীর নেই কাঞ্চন-রেখা?

তবু যে তারা ড্রইংরুমের দম দেওয়া সিন্থেটিক পুতুল নয়, চলমান কোনো প্লেটোনিক থিয়োরি নয়, রক্তমাংসের মানুষ, এই ছোট্ট মুহূর্তের একান্ত আড়ালে তার কিছু পরিচয় ধরা ছিল কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষার ভাষায় :

'ছুঁতে ইচ্ছা করছে। খোঁপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মত চুলগুলোকে যদি রেখার মুখে বুকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দি? হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম্? আমার রক্ত আমার মন বৃষ্টি হতে চায়।'

কিন্তু দ্বিধাও আছে। পরাজিতের দ্বিধা নয়, বিজয়ীর দ্বিধা, প্রকৃত পুরুষের স্বাভিমান। যে নারী তার নিজস্ব, তার স্ত্রী, তাকে পেতে চাওয়ার এই কাঙালপনা কি কাঞ্চনের সাজে? কোনো মর্যাদাবান প্রেমিকের সাজে? সুতরাং তার মনে হয় :

'আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।'

কাঞ্চন পারে না এই অন্ধকার নির্জনতার সুযোগ নিতে। রেখা পারে না তার ভীষণ ভালোলাগাকে অযথা ভিখারি বানাতে। কারণ তারা তো সত্যি সত্যি ভালোবাসে পরস্পরকে। সময় ছেনতাই করা এই ব্যতিক্রমী সুখটুকুকে তাই গলায় বরণমালা করে পরে নিতে চায় রেখা, সম্পর্কের স্বীকৃতি যেন, আর কিছু নয়, বেয়াদপ আদর না, কারণ কামনাকে লালসায় বদলে নিতে তার, তাদের রুচিতে বাধে। যা দামি, তাকে মূল্যহীন করেনি তারা। অথচ সময় আর সড়ক তো থেমে থাকে না। গন্তব্য এসে যায়।

'গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল—বাবু?

কী?

খিদিরপুর।'

ফিটন থেকে নামলো ওরা, দুজনে মিলে ভাড়ার আড়াইটাকা গাড়োয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিতেই বিপত্তি :

'সে চটে উঠল বলল 'সে কী? পাঁচ টাকার কম হবে না।'

কাঞ্চন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল 'কেন? তুমিই তো বলেছিলে।'

গাড়োয়ান বলল, 'ফূর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?'

ভাবতে ইচ্ছা করে, ঠিক কি রকম মুখভঙ্গি ছিল তখন এই গাড়োয়ানের, এই কথাগুলো বলার সময়? ঘোলাটে রক্তিম দুচোখে ঠিক কতটা অশ্লীল আশ্লেষ মাখা ছিল? সকলে যে একইরকম হয় না, সব ব্যক্তিমানুষেরা যে একই রকম সুখ দুঃখে বিষণ্ণ বা উল্লসিত হয় না, তা এই মূর্খ গাড়োয়ান জানবে কি করে। জানবে কি করে একটা সামান্য কথার খোঁচা কতোটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে কোনো কোনো নিরীহ, নির্বিরোধ, সন্তর্পণে বেঁচে থাকা স্বপ্নদর্শী মানুষের বুক, কিভাবে

খেলাচ্ছলে খুন করে তাদের মূল্যবোধ। কাঞ্চনেরা অনুভব করে, এই গল্পের পাঠকের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব.করে, মজ্জাগত স্থূলতায় ভরে গেছে শহরের দেহমন। হিংস্র অভব্যতা চারিদিকে। মজ্জাগত ধর্ষকাম, মানুষের। না হলে এমন জঘন্য ইঙ্গিত সত্যি কি পাওনা ছিল কাঞ্চনদের? যে নিভৃত মুহূর্তে তারা তাদের ফেলে আসা দিনগুলির দিনগত পাপক্ষয়ের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল চাওয়া পাওয়া না পাওয়ার দরিয়ায় ডুবে সেই পাপস্খালনে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সমবেত ব্যর্থতাকে ভুলে নিজেদের মধ্যে একটু খুশি, একটু আনন্দ বাঁটোয়ারা করে নিতে—সেই মুহূর্তটুকু-কে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলো তারা, এমন অপ্রত্যাশিত আঘাতে চূর্ণ হতে দেখলো। হয়তো বুঝলো, হয়তো বুঝলো না, যে, ভদ্রলোক, ভালোমানুষ, প্রখর অনুভূতিপরায়ণের জন্য পৃথিবীটা নেই আর, কর্কশ স্থূলতার রোমহর্ষে বেপথুমান হয়ে গেছে সমস্ত সংবেদনশীলতা! মানুষকে অনায়াসে ভুল বোঝা, মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে দেগে দেওয়া এই সময়ের এক ইতর অভ্যেস। 'মালাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল'—আবার! ওদের চোখের কোণে তখন ফোঁটা ফোঁটা নোনতা সেন্টিমেন্ট, স্বপ্নভঙ্গ। আঁধার ঘনিয়ে আসা এ শহরে ওরা যেন একেবারে অপরিচিত, আউটসাইডার। রেখা আর কাঞ্চন। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে। অশ্বমেধের ঘোড়া। 'সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়!' সেই যজ্ঞের আহুতি শুধু একালে যোগ্যের আহুতিতে বদলে গেছে। তুমি অতিরিক্ত সেনসেটিভ হবে, আর তার শাস্তি পাবে না, তা কি হয়? সবকিছুর একটা সমাজমান্য মাপ আছে, জানো না?

দুই.

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটির আধুনিকতা নির্ভর করে আছে অনেকখানি তার কথনভঙ্গির অনন্য স্বভাবে। আখ্যান-অংশটি সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য আখ্যানকে অসামান্য মুন্সিয়ানায় চেতনা-অবচেতনে জুড়ে, সময়ের সরলরৈখিক চলনকে দুমড়ে মুচড়ে নিয়ে এখানে পাত্রপাত্রীর একদিন প্রতিদিনকে চিরদিনের বৌদ্ধিক উচ্চতা ও আদল দেওয়া হয়েছে। আখ্যানের চরিত্রও স্থির নয়, কেন্দ্রীয় অনুভবটি বারবার বদলে বদলে গেছে, প্রথম পুরুষ থেকে উত্তমপুরুষে। অর্থাৎ গল্পের বয়ান কোথাও লেখকের, কোথাও বা নায়ক কাঞ্চনের এবং এই দ্বিমাত্রিক ন্যারেটিভের কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে স্থান বদল ঘটেছে। সতর্ক পাঠকের অনুভবে লেখকের সঙ্গে কাঞ্চনের এমন একাকার অস্তিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। একটানা কাহিনিবুননের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথ ছেড়ে দীপেন্দ্রনাথ কখনো ঘটনার মধ্যে থেকে আবার কখনো ঘটনার বাইরে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে অনুভূতিশীল মানুষের অসহায়তায় গল্প লিখেছেন। যে গল্পের মেজাজ লিরিক্যাল, কিন্তু পরিণতিতে আছে গদ্যের কড়া হাতুড়ির প্রচণ্ড ধাক্কা।

কাঞ্চন বা রেখা যে সব কারণে দুঃখ পায়, তা হয়তো গড়পড়তা বাঙালি মধ্যবিত্তের চেনা দুঃখ নয়, তারা যাতে আনন্দ পায় তা-ও হয়তো সকলের জন্য নয়। তবু তো হাইপার সেনসেটিভ এমন বিরল কিছু মানুষ থাকেই। তাদের পৃথিবী ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ধরনটাও আর সকলের মতন হবার নয়। এই গল্পের কাঞ্চন এবং রেখার জীবন যাপন, প্রাপ্তি ও প্রক্ষোভ, তাদের প্রবণতা এবং প্রশমন এই কারণেই জটিলতার বিন্যাসে গড়া। তারা সাধারণতন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও বৈশিষ্ট্যে 'বিশেষ'। নিয়মিত জীবনপ্রবাহে ভাসমান ব্যতিক্রমী প্রাণকণা। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই সব দলছুট মানুষের বিপন্নতার, বিষণ্ণতার কথকতা। এমন আততায়ী সময়ের মহাট্র্যাজেডি।

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পের নানা দুরন্ত বাঁকে কিছু আশ্চর্য প্রতীকের প্রয়োগ দ্যাখা গেছে। যেমন এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এসেছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এমন সুরের আবহ, ক্ষেত্রবিশেষে অন্তত, বাস্তবে নেই বোধহয়, সুর শুধু বাজছে কাঞ্চনের কল্পনায়।

চারদিকের বেসুরো বেতালা বেঁচে থাকাকে পাশ কাটিয়ে, অর্থহীন নানা শব্দবমনের মাঝে কাঞ্চন, শুধু কাঞ্চনই খুঁজে নিতে পারে যে সুরেলা স্বর। সানাইয়ের বিষণ্ণমধুর মিশ্র সুরতরঙ্গের অনুষঙ্গে এই গল্পের স্মৃতি ও সময় একবছরের বিস্তৃত প্রেক্ষিতে মথিত হয়েছে—বিয়ে থেকে বিবাহবার্ষিকী।

পুরাণ এবং পরম্পরা সাক্ষী, অশ্বমেধের ঘোড়ারা কখনও নিজের জন্য যুদ্ধ করেনি, করার কথাও নয়, অথচ তারা যুদ্ধজয়ের পতাকা বহন করেছে, হয়ে উঠেছে বীরত্বের চিহ্নিত প্রতীক, বিজয়ের নিরঙ্কুশ আইকন। তারপর নানা নিষিদ্ধ কলাকুশলী যৌনাচারের শেষে, তাদের হত্যা করে আর্য সম্রাটেরা হয়েছেন রাজচক্রবর্তী। বলাবাহুল্য, ইতিহাসের অন্ধকার আস্তাবলেও ঠাঁই হয়নি সেইসব হতভাগ্য চারপেয়েদের। অনেকগুলো টুকরো এক্সপ্লয়টেশনে এভাবে পূর্ণ হয়েছে কতিপয়ের অ্যামবিশান, ঠিক যেমন আধুনিক সভ্য সমাজের মুখ বারবার ঢেকে গেছে তথাকথিত শিষ্টতার বিজ্ঞাপনে। নানা হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেশে উপদেশে গুরুকুল ও প্রতিষ্ঠান বরাবর চেয়েছে জনসাধারণ হয়ে উঠুক সহজ সরল, অনুগত এবং দায়বদ্ধ। কিন্তু প্রথাগত, ঘোষিত সুসমাচারের বাইরে, বাস্তবে, দ্যাখা গেছে বিপরীত রঙ্গ, যাদের নাকি আদর্শ হওয়ার কথা, তারাই হয়ে উঠলো চাঁদমারি, তেমন মানুষদেরই মনে মনে মেরে দিল এই বর্তমান, প্রতিদিন পুঁতে দিল ষড়যন্ত্রী নিন্দার পাঁকে। দ্যাখা গেল, বাস্তবে সরলতার অন্তর্ধানপটে প্রতিদিন লেখা হচ্ছে সফলতার সাম্প্রতিক ব্যালাড। অর্থাৎ আর এক ধরনের সূক্ষ্মতর এক্সেপ্লয়টেশন, ক্ষমতার অলিন্দ থেকে যা অহরহ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে একালেও, আর এক ধরনের বর্বরতা, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ভিন্ন নামে। ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্নতর পরিভাষায়। সুতরাং সরাসরি বলা না হলেও একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এই বিশেষ গল্পে গল্পকার কেন এবং কীভাবে সেই রণজয় আর হননবৃত্তান্তকে এখানে শিল্পের প্রত্যাহে, নামকরণের মধ্যে, উচিত প্রতীকী মূল্যে গ্রহণ করেছেন। কেন এবং কীভাবে একালের কাঞ্চনেরা সেই অস্বস্তিকর প্রতারক পরম্পরায় অসচেতনভাবে লগ্ন হয়ে যায়।

গল্পে সত্যি পৌরাণিক 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ নেই, যজ্ঞাশ্বও নেই। তবু একটা ঘোড়া আছে। তাকে কেন্দ্র করে আছে সেই আবহমানের চলচ্ছবি। রেখা আর কাঞ্চন ঘোড়াগাড়ির ছোট্ট পরিসরের বাধ্যত প্রাপ্ত চলমান নিরালায় যেন নিরীক্ষণ করেছে সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার, মনে মনে, এক বিপরীত বিশ্বের ব্যাহত সময়ে, আকাঙ্ক্ষার অপচয়ের মাঝে :

"অশ্বমেধের যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড় কন্যা আর্য ঘোড়াসওয়ারের পায়ের তলায় হাহা করে কেঁদে উঠলো। তারপর চেঙ্গিজ খাঁ অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এমন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঝে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বাজি দৌড়ায়; আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াইটাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে।"

পুরনো যুদ্ধ, যৌনতা আর দিগ্বিজয়ের ধরনটা বেসাতির এই বেশরম সময়ে বদলে গিয়ে যে গৌরবহীন ভোঁতামির নামান্তর হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী। বরং এই পরিবর্তনের মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই কিছু রয়ে গেছে।

আরও বেশ কিছু বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল নানা প্রতীকের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার এই গল্পে চোখে পড়েছে। যেমন ভেঙে পড়া সেনেট হল যেন নব্যনাগরিক বাঙালির ঐতিহ্য হারানো আর পতনশীল বোধের প্রতীক, যেখানে সৌন্দর্যের বদলে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আটপৌরে প্রয়োজনের মোটা দাগকে। বিবাহচিহ্ন মালাটিকে বলদের খাদ্য বানানোর নির্মম ছবিতেও আছে নির্বোধ স্থূলতার ভয়ঙ্কর সংকেত। ফিটনের খোপে অপ্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতায় কাঞ্চনের শারীরিক উত্তেজনার অসামান্য চিত্ররূপ,

'আমার এই শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে'—দ্যোতনাময় এই প্রকাশভঙ্গিমা যৌনতার শরীরী আবেশকে অনবদ্যতায় বদলে দিয়েছে। গল্পের আরও একাধিক অংশের দৃষ্টান্ত পেশ করে দ্যাখানো যায়, শব্দে শব্দে ছবি আঁকা দীপেন্দ্রনাথের প্রিয় অভ্যেস। এবং এইসব চিত্রকল্পের মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষ নির্ভুল জটিলতায় মিশ্রিত হয়েছে।

এই গল্প প্রধানত কাঞ্চনের। তার আবেগ, আবেদন এবং অবদমনের। হীনম্মন্যতা আর হীন নাগরিক তামাসার বাইরে নিজস্ব নিরালম্ব অবস্থিতির, আততি ও উচ্ছ্বাসের। রেখার প্রতি তার মনোযোগের, এমনকি অমনোযোগের, ভালোবাসাময় অধিকারবোধের, ছেলেমানুষির আবার ব্যর্থকাম হতাশার। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হবার জন্যই একটু বেশি এক্সপ্রেসিভ সে। মুহূর্তে মুহূর্তে তার আবেগের রঙ বদলায়। কখনো সানাইয়ের সুর শুনে 'চমকে' ওঠে তো কখনো রেখার মন্তব্যে "হা হা করে হেসে' ওঠে। পরক্ষণেই 'লজ্জা' পায়, আবার প্রায় পরে পরেই রেখার সাহস দেখে 'স্তম্ভিত' হয়। তার সমস্ত মানবিক আবেগগুলিই সৎ, শুধু সংবেদনশীলতা সৃষ্টিছাড়া। হিংস্র-অসুন্দর এক কেজো জগতে সে বেমানানরকম মৃদু ও ম্রিয়মান, অনুকম্পায়ী, অতএব ক্ষণে ক্ষণে আক্রান্ত, সন্ত্রস্ত এবং রক্তাক্ত। তবু জীবনকে, জীবনের পেলব নান্দনিকতাকে সে ভালোবাসে। তাই জীবন থেকে পালানোর কথা ভাবতেও পারে না। একধরনের মৌলিক দায়িত্ববোধ তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারসাম্যে ভরে রাখে। রেখাকে সে তীব্রভাবে ভালোবাসে। রেখাকে ভালোবাসাই তার জীবনকে ভালোবাসা। গোটা গল্পে রেখার ভূমিকা কিছুটা গৌণ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি সে অনেকটাই যেন কাঞ্চনের ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের অভাব নেই, তার অনুভূতি ও পছন্দগুলিও বৈশিষ্ট্যময়। সে স্বার্থপর নয়, সে জানে সে এমন কাউকে ভালোবাসে, যে মানুষটা একটু আলাদা, জটিল ধরনের, বিশেষভাবে অন্তর্মুখী। রেখা তার কথা আর কাজের মধ্যে কাঞ্চনকে নানাভাবে সমর্থন যোগায়। সে বোঝে, তার অস্তিত্ব কাঞ্চনের কাছে কতোটা দামি। তার ভালাবাসা ছাড়া, সে বোঝে কাঞ্চনের অস্তিত্ব কতোটা বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই এই ভালোবাসা রেখাকে অহংকারী করে, একজনের জীবনে তার ভূমিকা এবং তাৎপর্য এতোখানি, বোঝার অহংকার। কেতাবি নারীবাদ যে অহংকারকে কখনো বুঝবে না।

একটা নাছোড় খটকা তবু ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি আনে। আচ্ছা, আমরা, মানে মধ্যবিত্ত পাঠকেরা, মধ্যবিত্ত কাঞ্চন ও রেখার পক্ষে দাঁড়িয়ে গল্পটাকে পড়ছি বলে একধরনের ভুল পক্ষপাতে ঘোড়াগাড়ির ঐ গাড়োয়ানকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভিলেন বানাচ্ছি না তো? লোকটার কাছে আমরা যে ভাষারুচি, যে ব্যবহার আশা করছি, তা আমাদেরই মধ্যবিত্ত সুলভ 'আদর্শ' ব্যবহারের বানিয়ে তোলা প্রত্যাশা নয় তো? কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা ভোঁতা, ভালগার। হ্যাঁ, সে অসৎ, অপারচুনিস্টও। কিন্তু তার শ্রেণি-স্বভাবের পক্ষে তার এই আচরণ এতোই স্বাভাবিক, যে, তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি রকম হা হুতাশ করাটাই অতিকল্পনা বলে মনে হতে পারে। আচ্ছা, কোন্‌টা বেশি আঘাত করেছে কাঞ্চনদের—অন্যায়ভাবে বাড়তি টাকা চাওয়া, নাকি 'ফুর্তি' জনিত যৌন ইঙ্গিত? মধ্যবিত্ত তো দীপেন্দ্রনাথ নিজেও, তবু তাঁর মার্কসবাদী মন ও মনন নিশ্চয় স্বীকার করবে, গাড়ি, শ্রম এবং 'সুযোগে'র বিক্রেতা হিসেবে মওকা বুঝে চাপ দিয়ে এই 'বাবু'-দের [কাঞ্চনকে এই সম্বোধন সে গল্পে বারবার করেছে] থেকে বাড়তি দুপয়সা কামিয়ে নেওয়াটা এই গাড়োয়ানের পক্ষে অন্যায় হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কার্যত তার অশালীন উচ্চারণের মধ্যে ভিতু, হিপোক্রিট, পেটে খিদে মুখে লাজ এই বাবুশ্রেণির প্রতি আগে থেকে স্থির, পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্ধারিত একরকম ফিচেল বদমায়েশি-ধারণারই প্রকাশ ঘটেছে। 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন

না'—বলাটা তাই মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে, মধ্যবিত্ত লেখকের কাছে, এমনকি মধ্যবিত্ত নায়ক-নায়িকার কাছে যতোটা অশালীন, অতএব শকিং—স্বয়ং বক্তার কাছে কিন্তু আদৌ তেমন নয়। তার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়েছিল, এমন ক্ষেত্রে বাবুরা একটু আধটু ফস্টিনস্টি কোরে থাকে, তাই সে ঘটনাচক্রে দাঁও মারতে চেয়েছে, সত্যি বলতে কি, আঘাত করতে চায়নি, করবে কেন, খদ্দেরকে কেউ চটায়? আসলে শালীনতার সংজ্ঞাও তো শিক্ষিত ভদ্রসাধারণ নিজেদের মতো করে নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, ঝোপ বুঝে কোপ মারা, খুচরো ব্ল্যাকমেল এবং অশালীন ইঙ্গিত খুব অন্যায়। কিন্তু শিক্ষিত অধ্যাপকের ন্যায়বোধ আর প্রান্তিক সহিসের ন্যায়বোধকে কবেই বা এক মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে? শ্রেণিবিভক্ত সমাজ জানিয়েছে, 'ওরা' আর 'আমরা' এক নই, কারণটা সহজে অনুমেয়। তাদের সমস্যা, সমাজ, বেঁচে থাকার ব্যাকরণ, আর্থসামাজিক পরিকাঠামো—কোন্‌টা একরকম? ন্যায় অন্যায়ের ধারণা তো জীবনযাপনের এই সমগ্র থেকেই উঠে আসে। তাই 'ওদের' আচরণ আর 'আমাদের' আচরণের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তাছাড়া আমরাও কি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আলাদা হয়ে ওঠা, আলাদা দুঃখ সুখের বোধ, আলাদা প্রতিক্রিয়াকে সব সময় সততার সঙ্গে স্বীকার করি? একই রকম পরিস্থিতিতে দশজন মানুষ যে সত্যি সত্যি দশটা আলাদা রকম আচরণ করতে পারে—এই মৌলিক সত্যে আমরা নিজেরাই কি যথেষ্ট বিশ্বাস রাখি? আমরা, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও কি প্রতিটি পৃথকের মূল্য না বুঝে, তারতম্য না বুঝে, মেরে দিই না সবকিছুতে গড়পড়তা সাধারণীকরণের মোটা মার্কা? কাঞ্চনেরা যে সুভদ্র, আলাদা ধরনের মানুষ—গাড়োয়ান তা বোঝে নি। কিন্তু অন্যেরা কি তা বুঝেছে? না হলে সারা বছর এভাবে তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয় কেন? কিসের ভয়ে? কাদের ভয়ে? আসলে কারণ তো একটাই, তারা বড্ড বেশি ভালো, বড্ড আলাদা। কারণ তারা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। নিয়মের দুনিয়া তাই তাদের আঘাত করে। ক্রমাগত আঘাত করেই চলে। কিন্তু তবু সব জেনে-শুনে-বুঝেও পাঠক রেখা আর কাঞ্চনের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের সঙ্গে একাকার আইডেনটিটি, অনুভব খুঁজে পায়। অনুভব করে, এই যন্ত্রণা এই অপমান তাদের কখনো প্রাপ্য ছিল না। এটা আর যাই হোক, জাস্টিস নয়।

এবং সেই কারণেই হয়তো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কাঞ্চন আর রেখার মতো দুজনকে তবু কেন শুনতে হবে 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?' তবে কি এই ধরনের অশ্লীল মন্তব্য, কুইঙ্গিত, সন্দেহ আর সুযোগ-সন্ধানই প্রচলিত রীতি বলে? সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুতাপহীন জীবনাচার বলে? কিছু কিছু তাপ-উত্তাপশূন্য মানুষ—কী আশ্চর্য—বুঝতেই পারে না, তাদের আচরণ বিচরণ উচ্চারণ আর একজন মানুষের গভীরে কতোটা রক্তপাত ঘটায়। সামান্যতম সহমর্মিতাও কেমন সব দিক থেকে হারিয়ে গেছে যেন। অবশ্য নির্বোধরা কবেই বা নিজেদের নির্বোধ বলে চিনেছে! যেমন কাঞ্চনের তথাকথিত 'বন্ধু' সুবিমল রেখার দিকে তাকিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে 'আপনার বোন?'

না।

ছাত্রী?

না।

ও বুঝেছি। সুবিমল মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, 'দেখেও আনন্দ।''

কেন এত অপবিত্র কৌতূহল? একজন প্রাপ্তবয়স্কের ব্যক্তিগত এলাকাকে আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক কেন সম্মান করবে না? যথাবিহিত মান্যতা দেবে না? তা হলে এ কেমন শিষ্ট সমাজ, এ কেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সদাচার, সহবত? এ কেমন প্রগতি তবে? এ কোন্ অশ্বমেধের ঘোড়া? এ কিসের দিগ্বিজয়?

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন ভাবছিল এই সব। একজন রেখা দেখছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির এই জগৎকে। মানুষ গড়তে গড়তে ভাঙছে, আবার ভাঙতে ভাঙতে গড়ছে। তারা দেখছিল এই ঘুরপাক, এই পাল্লাদৌড়, এই ঘরবারান্দা দরদালানে মিলিয়ে বাঁচার নানা কসরত। যার শেষ অভিমুখ তবু তো সেই মানুষ। সেই মানুষ, যে উদাসীন, প্রশান্ত, আবার যে আগ্রাসী, জাঁহাবাজ। যে জীবনের রাজপথে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা হাসিল করে কৃতার্থ, হিসেবি, চৌখস, চাকচিক্যময়। পরম বিজয়ী। আবার যে চরম পরাজিত। সোনালি সফলতার সহজপাঠ যে জীবনেও পড়েনি, পড়তে চায়নি। ইঁদুরদৌড়ের পৃথুল হ্যাংলামির থেকে ঢের দূরে থেকেছে। যে একেবারে হেরে হেরে ভূত, জীবনের সরাইখানায় ভুল নেশায় চুর, ফতুর—হাসতে হাসতে কপর্দকশূন্য—এদের সব্বাইকে নিয়ে, এদের সবাইয়ের জন্যই দীপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। সময়টা ছিল যাট-সত্তরের গোধূলিসন্ধি, নতুন মিলেনিয়াম তখনও ঢের দূরে।

আর এখন, আমরা দেখছি বিশ্বায়ন, বিন লাদেন, বাজার অর্থনীতি, আর বেবাক বুদ্ধিজীবীদের উত্তর-আধুনিক তত্ত্বতামাসা। বুঝেছি, 'অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে/ আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।' ভাবছি, সমস্ত কাঞ্চন কি কাঁচ হয়ে গেল তবে? কোনো রেখাই কি তবে সরল নয়? শেষ পর্যন্ত তারা সবাই কি সময়ের কারসাজিতে বৃত্তাকার শূন্যে হারিয়ে যায়?



শরৎচর্চার ধারা : মোহিতলালের অবদান

• • • • • •

সুদীপ বসু

১.

বিশ শতকের ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী মোহিতলাল মজুমদার। কবিরূপে প্রথমে তাঁর প্রতিষ্ঠা,[১] পরে সাহিত্যসমালোচনায় খ্যাতিমান। সাহিত্যচর্চা তাঁর কাছে সুগভীর জীবনসত্য কিংবা তাই যেন তাঁর স্নায়ুশিরাময় জীবন। মোহিতলাল জীবনে যা বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যে তারই প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন। তার স্বীকৃতি স্বয়ং তাঁর পত্রে : "প্রায় বিশ বৎসর আমি বাংলা সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, খ্যাতি, অর্থ, বন্ধুত্ব সকলই তুচ্ছ করিয়া 'আধুনিক সাহিত্যের আধুনিক সমালোচনা' প্রবর্তিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।"[২] বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির উন্নতিসাধন তাঁর জীবনব্রত। তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জাতি অভিন্ন। সাহিত্যের উন্নতি ঘটলে জাতিরও উন্নতি হবে — এই তাঁর একান্ত বিশ্বাস।

মোহিতলাল তাঁর কালে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোন্ মূল্য পেয়েছেন তা দেখা প্রয়োজন। মোহিতলালের একদা-ছাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে : 'Bengali Literature was his life.'[৩] পূর্ণশক্তিতে সাহিত্যচর্চাকারী মোহিতলালকে নীরদচন্দ্র দেখেছিলেন। আর ভগ্নস্বাস্থ্য কিন্তু সাহিত্যসম্পর্কে একই ভালোবাসা ও উন্মাদনায় আলোড়িত মোহিতলালের কথা বলেছেন বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল আলোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে মোহিতলাল 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা' দেবার সময় 'সমস্ত প্রতিবেশটি যেন একটি অনির্বচনীয় বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছিল।' শ্রীকুমারের আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে আরো শুনি : "মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহুতি দিবার সময় যজ্ঞস্থলী যেমন একটি দিব্য আবির্ভাবের প্রত্যাশায় স্তব্ধ উন্মুখ হইয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকণ্ঠ মুখরিত, বাদানুবাদবিধূনিত সাধারণ সভাকক্ষ তেমনই নীরব গাম্ভীর্যমণ্ডিত হইয়া এক অসাধারণ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হইয়াছিল। তদুপরি মোহিতলালের অনুচ্চারিত ভাবভঙ্গিতে ও লিখিত ভাষার স্থানে স্থানে এই বিষাদজনক সত্যটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, বক্তৃতাটি বাগ্‌দেবীর চরণতলে তাঁহার অন্তিম অর্ঘ্য নিবেদন।"[৪]

একালের সাহিত্যচিন্তকদের শ্রদ্ধাও মোহিতলাল পেয়েছেন। তাঁর অন্য ছাত্র, তাঁর জীবনীকার এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্তের মূল্যায়ন : 'সমালোচনা-কর্মকে মোহিতলাল প্রায় তাঁর ব্রত করে তুলেছিলেন। সাহিত্যধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা তুলনারহিত। তাঁর নিষ্ঠা তাঁর ভাষাগাম্ভীর্যে চিন্তায় ও বিশ্লেষণে স্বতঃপ্রকাশিত। মোহিতলালের সমালোচনার বিশেষত্ব তাঁর ভাবনার দার্শনিক ভঙ্গি।... তাঁর সমালোচনা পড়লে সাহিত্যের সৃষ্টি সৌন্দর্য কল্পনার নৈপুণ্য যেমন পাঠকের কাছে প্রকাশিত হয়, তেমনি উপন্যাস্ মহাকাব্যের সমালোচনা পড়লে অনুভব করা যায় জীবন ও জগতের নিয়তিলীলা, দ্বন্দ্বমিলন, সুখদুঃখ প্রেম ও পরিণামের এক অখণ্ড রূপ।'[৫] একালীন অপর সমালোচকের কাছে একথা স্বীকৃত, সমালোচনার 'উচ্চতম আদর্শ' থেকে মোহিতলাল কখনো বিচ্যুত হননি, '...শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়...তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর অনমনীয়তা। তাঁর বিশ্বাসের অগ্নিহোত্র তিনি একাই জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।'[৬]

কিন্তু এও আমরা দেখেছি, পরিবর্তিত কালের দোহাই দিয়ে মোহিতলালের সাহিত্যসিদ্ধান্ত বাতিল করার ঝোঁক দেখা গেছে। যেমন, মোহিতলাল-পুত্র মনসিজ মজুমদার মোহিতলাল-শতবর্ষে পিতার প্রতি কেবল শ্রদ্ধাটুকু অর্পণ করেছেন। সেখানে মোহিতলালের সাহিত্য-সমালোচনার গুরুত্ব বিচারে অনীহা ছিল।[৭] কিন্তু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচক যখন মোহিতলালের 'শিকড় খুঁজে ফেরা'কে নিছক 'কুলজীতল্লাস' আখ্যা দিয়ে তাকে একটা তত্ত্বে দাঁড় করানোর অক্ষম প্রয়াস বলে অভিহিত করেন এবং প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জর করেন এই বলে—'সে শিকড় খুঁজে ফেরা কতখানি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানসম্মত, কতখানি ইতিহাসনির্ভর, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা দুর্মর'—তখন মনে হয় বাঙালি জাতিগতভাবে আজ ছিন্নমূল।[৮] নচেৎ জাতীয় চেতনার সন্ধানে নিঃশেষে আত্মক্ষয়কারী মোহিতলালকে কেন শুধু সমাজবিজ্ঞান কিংবা ইতিহাসের দোহাই দিয়ে সরিয়ে রাখা হবে? কেনই বা আমরা ভুলে যাব, মানুষই নতুন বিজ্ঞান এবং ইতিহাস রচনা করে এবং সে-ই তার চালিকাশক্তি? এসব প্রশ্ন মোহিতলালের আধুনিক সমালোচকদের সম্ভবত বিব্রত করে না।

সাহিত্যসমালোচনার সূচনাপর্বে মোহিতলালের সামনে ছিল তিনটি 'আদর্শ'—সংস্কৃত অলংকারতত্ত্ব, পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক পর্যালোচনা। এদের মধ্যে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্ব মোহিতলাল-মানসে বিশেষ রেখাপাত করেছে। মোহিতলালের প্রবন্ধাদির প্রধান তিন ভাগ—সমাজ, সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ত্ব। দেখা গেছে তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনায় তন্ত্রভাবনার নিগূঢ় ছায়াসঞ্চার। সাহিত্যিক বা সমালোচকের মতবাদের পিছনে অনেক সময় সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় সক্রিয় থাকে। তন্ত্রের মধ্যে মোহিতলাল সেই প্রত্যয় লাভ করেছিলেন, যে-তন্ত্র জীবনমন্থনকারী সাধনা। বাঙালি জীবনে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাব। সেকারণে অন্য আর্যাবর্তবাসীদের সঙ্গে বাঙালির জীবনচর্চা ও জীবনচর্যার পার্থক্য। মোহিতলালের বিবেচনায় সেখানে কোনো বাঙালি সাহিত্যিক এই বাঙালিত্ব থেকে ভ্রষ্ট, সেখানেই বাংলা সাহিত্য হারিয়েছে তার শিকড়। মোহিতলালের শেষ পর্যায়ের গ্রন্থগুলিতে [যেমন 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'বাংলা ও বাঙালি', 'কবি শ্রীমধুসূদন'] এই দার্শনিক তত্ত্ব সাহিত্যবিচারকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সাহিত্যে তন্ত্রপ্রভাব কিভাবে আবিষ্কার করা যায়, মোহিতলাল তা নিজেই শরৎরচনার বিচারসূত্রে স্পষ্ট করেছেন : 'তান্ত্রিক শক্তিকে উপলব্ধি করিতে চায় ভীষণের মধ্যে, মথিত হৃৎপিণ্ডের উপরেই শক্তির পদ্মাসন গড়িয়া তোলে। আমাদের এই হীনবীর্য পুরুষের সমাজে নারীই শক্তির আধার হইতে বাধ্য। ক্ষীণ বলিয়াই নিষ্করুণ যে নর, তাহার অত্যাচারে আমাদের দেশের মেয়েদের দেহে মনে ও প্রাণে এমন একটা সংযম-সহিষ্ণুতার বিকাশ হয়, যাহা অবস্থা বিশেষে অমানুষী শক্তির আকার ধারণ করে। নারীর মধ্যে এই শক্তির নানারূপ তিনি দেখিয়াছিলেন—সাহিত্যে তাহার সব প্রকাশযোগ্য নয়; জীবনের সত্য ও আর্টের সঙ্গতি—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবেই। এই অস্বাভাবিক অবস্থার পীড়নে নারী ক্রমাগত আত্মসঙ্কোচ করে—সেই আত্মসঙ্কোচের দ্বারাই তাহার সকল বৃত্তি একমুখী হইয়া যে বজ্রগর্ভ তড়িত উৎপাদন করে, তাহার আঘাতে মৃত্যু, ও আলোকে অমৃতলাভ হয়।...মানুষকে — কোন তত্ত্ব, ধর্ম, বা নীতিসংস্কারের দ্বারা নয় — কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ে আলিঙ্গ ন করিয়া, তাহার প্রাণের আকৃতিকেই আর সকল সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া ঘোষণা করার যে মানবতা, বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এই মানবতার সাধনা তাঁহার জীবনেই হইয়াছিল—ভাব বা কল্পনাযোগে নয়; সেইজন্যই তাঁহার সাধনাকে তান্ত্রিক সাধনা বলিয়াছি। রক্ত-মাংস-শিরা-শোণিতের মধ্য দিয়া যে উপলব্ধি, তাহাই তান্ত্রিক সাধনা...।'[৯] সমালোচনা সাহিত্য রচনার পূর্বেই মোহিতলালের কবিতায় এই তত্ত্বের সাহিত্যরূপ দেখা দিয়েছে।

তন্ত্রের প্রভাব ছাড়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাবাদর্শ মোহিতলালে ছায়াপাত করেছে বলে মনে হয়। চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকার লেখক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী প্রমুখ যেখানে বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হতো। সুভাষচন্দ্র বিষয়েও মোহিতলালের আকর্ষণ কম নয়। সব মিলিয়ে বলা যায় এঁদের চিন্তাতরঙ্গ মোহিতলালকে আলোড়িত করেছে যার ফল রবীন্দ্রসাহিত্যের আন্তর্জাতিক আকার বিষয়ে মোহিতলালের বিরূপ মত প্রকাশে।[১০]

কিন্তু একথা কোনোভাবে অস্বীকারের উপায় নেই যে, মোহিতলালের সাহিত্যসমালোচনা বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। তদ্‌গত সাহিত্যোন্মাদ আলোচকরূপে তিনি বোধহয় বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। সাহিত্যকে জীবনধর্ম করে, সেই ধর্মের তিনি মহাসাধক। সিদ্ধির শিখরও তিনি মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছেন। স্বীয় বোধগত বিশ্বাসকে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার চেষ্টায় অবিরাম সক্রিয় তাঁর লেখনী। ফলে একই কথা বারেবারে বলেছেন, যদিও দেখা যায় একই বস্তুকে তিনি নতুনভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। গভীরে অবগাঢ় হওয়ার জন্য ভাষাশক্তিতে এসেছেন নব অর্থব্যঞ্জনা। ভাষার জাদুকর তিনি, শব্দনির্মাণে এবং প্রয়োগে সুদক্ষ শিল্পী, একই সঙ্গে দুর্বার প্রাণশক্তিতে গতিশীল।

।। ২।।
মোহিতলালের আঁকা চিত্রপটে মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রের চিত্তপট

মোহিতলালের শরৎচর্চা আমাদের মূল আলোচ্য। শরৎচন্দ্র ছাড়াও মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের চিন্তাপরিধিতে এসেছেন। মোহিতলালের এই চিন্তাবলয়ে প্রবেশ করলে দেখা যায় নবচিন্তার বিদ্যুৎঝলক।

মোহিতলালের মনোভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাধিক ছায়াবিস্তার। শ্রদ্ধানত মোহিতলালের মন্তব্য : 'আমার ধর্মগুরু বঙ্কিমচন্দ্র।'[১১] তাঁর *হেমন্তগোধূলি* কাব্যের *বঙ্কিমচন্দ্র* কবিতা, *বঙ্কিমবরণ* গ্রন্থের এগারোটি প্রবন্ধের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র। তবু মোহিতলাল মনে করেন নি 'ঋষিঋণ' শোধ করা গেছে। একটি চিঠির ভূমিকা-অংশে লিখেছেন, ইংরেজ সমালোচক এ সি ব্র্যাডলির 'Shakespearean' ট্র্যাজেডির আদলে 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করবেন, যার পিছনে 'কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কারণ একালে তেমন গ্রন্থের কোনা মূল্য নাই।'[১২] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা'র লিখিত রূপ সেই গ্রন্থ —*বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস* [১৯৫৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত]। মোহিতলালের এই সমস্ত রচনাদিতে বঙ্কিমপ্রতিভার মূল্যায়ন এবং বঙ্কিমবিরোধী গোষ্ঠীর কঠিন প্রতিবাদ আছে।

মোহিতলালের দৃষ্টিতে *মেঘনাদবধ কাব্যের* থেকেও উচ্চাসন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের [*আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক ভাবধারা*, ১৩২৩]। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের তুলনা তিনি খুঁজে পেলেন শেকস্‌পীরীয় হ্যামলেট, ওথেলো, টেনিসনের Idylls of the king-এ। মনে করলেন বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে খাঁটি রোম্যান্টিক প্রেরণা লাভ করে হয়ে উঠেছেন এযুগের নবমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি এবং উদ্‌গাতা কবি। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী-লেখক মহলে বঙ্কিম-বিরোধিতার প্রতিবাদে মোহিতলালের হাতে খরশান তরবারি। তাঁর কাছে এই বিরোধীরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—একদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র-সহ আধুনিক লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-বিরোধিতার একটি ব্যক্তিগত কারণ মোহিতলাল নির্দেশ করেছেন—পারিবারিক শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ 'পৌত্তলিক' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বদ্ধমূল অশ্রদ্ধার কারণ। তাছাড়া

রবীন্দ্রনাথের অতি-উদার বিশ্বমানবতার কালচার বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ত্তে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ — বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রিয়ালিজম্ নেই, তিনি নিছক রোমান্স-লেখক, তাঁর উপন্যাসে ধর্মতত্ত্ব ও স্বদেশপ্রেমের প্লাবন বইয়ে কবিকল্পনার মর্যাদাহানি করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগের যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা মোহিতলাল করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসের কিছু দোষ স্বীকার করেও তিনি লেখকের কবিত্বশক্তি এবং প্রতিভ-ঐশ্বর্যের প্রকাশকে মূল্য দিয়েছেন। তাঁর তির্যক মন্তব্য, আধুনিক চোখে কেবল সাইকো-অ্যানালেসিস যদি উপন্যাসের একমাত্র লক্ষণধর্ম হয়, তাহলে নিছক একাল ছাড়া যুগ-জাতি-সমাজের লক্ষণাক্রান্ত কোনো উপন্যাসই তো গ্রাহ্য হবার নয়। মোহিতলাল, এমন কি, ঘোষণা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'রোমান্স লিখিয়া কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই।' বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ-কথিত ঐ আপত্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আস্থাহীন মোহিতলালের মন্তব্য — নিকৃষ্ট কাব্যকে যদি রোমান্স বলা হয় এবং ভাষ্যদানে গর্বিত টীকাকার যদি বিশুদ্ধ রিয়ালিজমের জন্য কোনো উপন্যাসকে উচ্চাঙ্গের বলেন, 'তাহা হইলে ... আজকালকার অনেক রিয়ালিস্টিক লেখক রাম শ্যাম হরিও বঙ্কিমের অনেক উপরে।' রীতিগত ক্রমবিকাশনীতি আর্টে অসত্য বলে, অজন্তার চিত্রলিখন পদ্ধতি, কালিদাসের শকুন্তলা এখনো শিখরাসীন। অন্যদিকে বঙ্কিম-উপন্যাসে বাঙালিদুর্লভ এমন পুরুষ-প্রতিভার পরিচয় আছে যা মহাকাব্য এবং নাটকসৃষ্টিতে সক্ষম। একই সঙ্গে মহাকাব্য এবং নাটক রচনার দুর্লভ ক্ষমতাধারী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নকে অগ্রাহ্য করে মোহিতলাল বললেন—এ প্রতিভার 'মূল্যনির্ণয় এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক করিবেন।' সর্বদা 'আপ-টু-ডেট' থাকার সাধনায় অতিমাত্রায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-বিষয়ে উপরিলিখিত অভিযোগ পুনরায় খণ্ডন করে মোহিতলালের মন্তব্য : বাস্তবের নিখুঁত প্রতিকৃতি রচনার দায়ভার বঙ্কিমচন্দ্র মাথায় তুলে নেননি। তবে বঙ্কিম-উপন্যাস সর্বত্র 'রসবস্তু' হয়েছে, এমন কথা মোহিতলালও বলেন নি যদিও তেমন দৃষ্টান্ত বঙ্কিমসাহিত্যে অল্পই [*রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র*, ১৩৩৯ বৈশাখ; *অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র*, ১৩৪৩ পৌষ]।

শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য আধুনিকদের বঙ্কিম-বিরোধিতার প্রতিবাদও মোহিতলাল করেছেন [*রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র*, ১৩৩৯ বৈশাখ; *অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র*, ১৩৪৩ পৌষ; *শরৎ-পরিচয়*, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ]। শরৎ-প্রসঙ্গে আমরা তা উপস্থিত করব।

মোহিতলালের মধুসূদন-প্রীতি একাধিক প্রবন্ধে [*আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবধারা*, ১৩২৩; *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, ১৩৩৬ শ্রাবণ; *সাহিত্যের স্বরাজ*, ১৩৩৮ শ্রাবণ] এবং *কবি শ্রীমধুসূদন* গ্রন্থে। সাহেবী পোশাকের মানুষটির অন্তরবাসী খাঁটি বাঙালিকে তিনি 'শ্রীমধুসূদন' নামে চিহ্নিত করেছিলেন। জাতির দীনতায় হতাশ্বাস মোহিতলাল *হেমন্তগোধূলি* কাব্যে মধুসূদনের উদ্দেশে লিখলেন :

জীয়াইয়া তোল নব বাণীমন্ত্রে তব,
এ জাতির কুল-মান রাখ এ সঙ্কটে। [*মধু-উদ্বোধন*]

মধুসূদনের রচনায় বাঙালিত্বের সন্ধানে মোহিতলাল অগ্রসর। 'কবি শ্রীমধুসূদন বইতেও মহাকাব্যের উদাত্ত তার সঙ্গে বাঙালির স্বভাবের গীতিপ্রবণ করুণ-কোমলতাকে' মিলিয়েছেন তিনি।[১৩] *মেঘনাদবধ কাব্য* বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত — এ কাব্য ক্লাসিক নয়, রোমান্টিক, বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবের পূর্ণ ধারক। তাঁর যুক্তি, *মেঘনাদবধ কাব্যের* আদর্শ ইউরোপীয় ক্লাসিক্যাল কাব্য হলেও ছন্দ, ভাষা, কবিহৃদয়ের প্রেরণার বিচারে তা 'আমাদের সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য।' *মেঘনাদবধ কাব্যে*-র কবি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং 'কবির সেই স্বপ্ন সেই যুগেরই প্রতীক।' কিন্তু এই স্বপ্নমূলে সক্রিয় ছিল ব্যর্থতার বীজ। তাই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় নির্মিত 'মেঘনাদবধ মহাকাব্য হইতে পারিল না,

জয়োল্লাসের পরিবর্তে ট্রাজেডির করুণরসে অভিষিক্ত হইয়াছে। ... কেবল সেই কাব্যের আবেগসম্ভূত যে ছন্দধ্বনি, তাহাই আধুনিক বঙ্গবাসীর একতারাকে সপ্ততারায় পরিণত করিয়াছে।' তাই এর বিচার রোমান্টিক কাব্যের নিরিখেই হবে। রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত *মেঘনাদবধ কাব্যে*-র সঙ্গে বঙ্কিম-উপন্যাসের রোমান্স-লক্ষণের তুলনাও মোহিতলাল করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, *মেঘনাদবধ কাব্যের* রোমান্টিকতা 'সার্থক স্টাইল বা আর্ট হিসাবে ... পূর্ণ পরিণতি' পেলেও বঙ্কিম-উপন্যাসের সমান গৌরবপ্রাপ্তি তার ঘটেনি।

তথাপি *মেঘনাদবধ কাব্য*-কে বাঙালির 'জাতীয় মহাকাব্যের' শিরোপা দিয়ে এর যে-ভাষ্য মোহিতলাল রচনা করেছেন, তা অনবদ্য এবং বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত :

'এই কাব্য-কাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দনরবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। ... সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জল-কল্লোল জাগিয়া উঠিল — কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলুকুলু ধ্বনি? — এ যে কপোতাক্ষ! তীরে, ভগ্ন শিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে 'নূতন গগন যেন, নব তারাবলী', এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে! সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক —তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল,—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী'।"

মোহিতলালের রবীন্দ্রবিচার একাধিক মাত্রাযুক্ত। এই মহাপ্রতিভার ঐশ্বর্যে তিনি মুগ্ধ। অন্যদিকে রবীন্দ্রসাহিত্যের খাতবদল তাঁর অপছন্দের বলে প্রতিবাদও আছে। রবীন্দ্রনাথের আরো একটি জিনিস মোহিতলালের সমালোচনালক্ষ্য—আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনা রবীন্দ্রনাথের ভালো না লাগলেও নিজেকে তরুণ প্রমাণের চেষ্টায় তাদের যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষকতা তিনি করেছেন। কবির এই কাজের বিপক্ষতা না-করে মোহিতলাল পারেন নি। সংক্ষেপে বলতে পারি, রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারে মোহিতলালের মধ্যে দুই মনোভাবের বিস্ময়কর সহাবস্থান।

মোহিতলাল প্রথমাবধি নিজেকে রবীন্দ্রশিষ্য রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। যখন রবীন্দ্রসাহিত্যের নিন্দা রক্ষণশীল এবং আধুনিক সাহিত্যসমাজে অতীব উপভোগ্য, তখনই মোহিতলাল ঐ কাজ করেছেন [*সাহিত্যে সত্যবাদ ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ*, ১৩৩৪ ফাল্গুন; *আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম*, ১৩৩৫ আষাঢ়; *রডোডেনড্রনগুচ্ছ*; ১৩৩৫ ভাদ্র; *সাহিত্যবিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল*, ১৩৩৫ কার্তিক; *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য*, ১৩৩৮; *রবীন্দ্রনাথ*, ১৩৩৮ পৌষ; *রবি-প্রদক্ষিণ*, ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ; *রবীন্দ্রকাব্যের কবিপুরুষ*, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ]। 'বাস্তব সত্যের' জয় ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনিন্দা মোহিতলালকে উত্তেজিত করেছিল। ঐ বিচারকে 'বিকট ভ্রান্তি' বলে উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন : "ঢাক বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথকে 'দুয়ো' দিবার এই প্রবৃত্তি কেন?... তাঁহার প্রতিভার সেই অভ্রভেদী পর্ব্বতচূড়া [কি] পূর্ব ও পশ্চিম তোয়নিধি পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের মানদণ্ডস্বরূপ বিচার করিবে না? একদিকে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং 'উকিল সাহিত্যিক' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রুজু করা 'ঘোরতর মামলার' যথার্থে তিনি যেমন সন্দিহান, তেমনি নগ্ন বাস্তবের পূজারী নবীন সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র-বিরোধিতাও তাঁর কাছে অসার। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরে রবীন্দ্রনাথের মৌল কবিপ্রেরণার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় তিনি ঘটিয়েছিলেন। প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদ্‌রূপে তাঁর বক্তব্য—'ভাব ও রূপের সঙ্গতিসাধনই' রবীন্দ্রনাথের মূল প্রেরণা। সেজন্য তা আকুল আগ্রহে সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যকে বরণ করেছে। সমগ্র জীবন ধরে কবির সাধনা 'এই বিরোধকে—এই বেসুরাকে—বশ

করিবার জন্য।' রবীন্দ্র-কাব্যসাধনা একই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক হওয়ায় তা দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রমী। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্য যেমন সংসার, সমাজ বা রাষ্ট্রঘটিত কোনো ইজম্-এর দ্বারা যাচাই করা চলে না, তেমনি প্রত্যক্ষ মানবজীবন সম্পর্কে কোনো আদর্শের প্রতিষ্ঠাও এর দ্বারা সম্ভব নয়। এও সত্য, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে মানবচৈতন্যের যে-প্রকাশ সাহিত্যে ঘটেছে, ইতিহাসে তা তুলনাহীন।

রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* গ্রন্থটি মোহিতলালের প্রিয় ছিল। কেননা তাঁর মনে হয়েছে অতি-আধুনিক সাহিত্যের অক্ষমতার দম্ভ ও নবত্বের অন্তর্গত প্রমত্ততার ভঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিদ্রূপ করেছেন। উচ্চাঙ্গের এই আলোচনায় অমিত রায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ যেমন সূক্ষ্ম তেমনই রসময়। প্রাণপ্রাচুর্যের আবেগ *শেষের কবিতা*-র ছত্রে ছত্রে যে-ছন্দে উৎসারিত তাতে 'পড়িবার সময় ... ছন্দের উন্মাদনাই যেন পাঠককে পাইয়া বসে।'

রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠক-মনের সত্যকার সংযোগ কিভাবে ঘটতে পারে, তার উপায় নির্দেশ করলেন মোহিতলাল :

'রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিলে, অথবা তাহার সহিত আক্রোশ করিয়া সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিলে, বাংলা সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটিবে। এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র উপায় — রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত বাঙালির ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সাধনের চেষ্টা, এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতম রূপটিকে চরম আদর্শ না করিয়া, সকল কালের সাহিত্য হইতে সাহিত্যের স্বরূপ ও স্বধর্মকে উদ্ধার করিয়া, উদার রসবোধের প্রতিষ্ঠা করা। তবেই বাংলা সাহিত্যে বাঙালির প্রকৃত মানস-মুক্তি ঘটিবে, তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্লভ সম্পদকে আমরা আত্মসাৎ করিতে পারিব — সে প্রতিভার গৌরবে আমরা যথার্থ গৌরবান্বিত হইতে পারিব।'

কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে পরিণত এবং তাঁর সাহিত্যের ভাবধারায় দিক্‌বদল সূচিত, তখন থেকেই সুতীক্ষ্ণ হতে শুরু করেছে মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনা। তিনি মনে করলেন, বাঙালিত্ব হারিয়ে আন্তর্জাতিক হওয়ার মোহে রবীন্দ্রনাথ লঙ্ঘন করছেন সৃষ্টির মূল নীতি। সাহিত্যক্ষেত্রে —'সামান্য' [Universal] থেকে 'বিশেষে' [Particular] অবতরণ নয়, 'বিশেষ' থেকে 'সামান্যে' উত্তরণই আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলালের মতে প্রফেট হওয়ার প্রলোভনে 'বিশেষ'কে ত্যাগ করে 'সামান্যে'র পশ্চাদ্ধাবনে রত, ফলে হারিয়ে ফেলছেন 'কবি'-পদবী। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে মোহিতলালের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত— রবীন্দ্রনাথ তখন আর কবি নন ['কবি' শব্দের বিশেষ অর্থ নির্ণয় করে মোহিতলালের এই ঘোষণা], 'সুপ্রীম আর্টিস্ট'।

ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে কবির নব মত মোহিতলালকে তুষ্ট করতে পারেনি। সেই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি রবীন্দ্র-সমর্থনও তাঁর অপছন্দের। অব্যাহতভাবে মোহিতলাল বলে গেছেন — জীবনকে ফাঁকি দিয়ে রসকে মনোবিলাসের দ্বারা আবৃত করার প্রবৃত্তির পিছনে সক্রিয় 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের...প্ররোচনা।' এসব কথা ক্রমান্বয়ে স্থান পেয়েছে *আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম* [১৩৩৫ আষাঢ়], *সাহিত্যের স্বরাজ* [১৩৩৮ আশ্বিন], *অতি-আধুনিক প্রতিভা* [১৩৩৮ অগ্রহায়ণ], *রবীন্দ্রনাথ* [১৩৩৮ পৌষ], *সাহিত্য ও যুগধর্ম* [১৩৩৮ ফাল্গুন], *কাব্যে আধুনিকতা* [১৩৩৯ বৈশাখ], *সাহিত্যে অশ্লীলতা* [১৩৩৯ চৈত্র], *রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা* [১৩৫০ অগ্রহায়ণ] ইত্যাদি প্রবন্ধে।

মোহিতলালের এই রবীন্দ্রভাবনা একালে বেশ সমালোচিত। তাঁর কালের আরেক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গ এনে কেউ কেউ তুলনায় বলতে চেয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পাশে মোহিতলালের দৃষ্টি রবীন্দ্রবিচারে 'খণ্ডিত'। সেই 'সঙ্কীর্ণ' খণ্ডিতদৃষ্টির জন্যই মোহিতলালের রবীন্দ্রচেতনা খণ্ড।'

কেননা রসশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও জীবনজিজ্ঞাসু চলিষ্ণু রবীন্দ্রনাথের অন্বয় মোহিতলাল ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি। আর্টের দাবি ও জীবনের দাবির মোকাবিলা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে করতে চেয়েছিলেন তাও তিনি ধরতে পারেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ নিয়ে চিন্তামগ্ন মোহিতলাল বোঝেন নি যে, 'সংক্ষুব্ধ বিংশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য নতুন আয়ুধ দরকার।' এমন কি রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষা যে তরুণ সাহিত্যিকদের মূলধন—তাতেও মোহিতলালের সায় ছিল না। অর্থাৎ 'স্বনির্মিত বৃত্তে বন্দী' হয়েছেন তিনি।[১৪]

আমাদের প্রশ্ন : রবীন্দ্রবিচারে মোহিতলাল কি খণ্ডিত দৃষ্টি? দেখা গেছে নির্দিষ্টভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে দুই অর্ধে বিভক্ত করে তিনি তার মূল্যায়ন করেছেন। সেইকালে উনিশ শতকীয় নবযুগ ভাবনা অবশ্যই তাঁকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তাকে কখনোই তিনি অস্বীকার করেন নি। তদনুযায়ী তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ — সুপ্রীম আর্টিস্ট। আমরা লক্ষ্য করব, আধুনিক সমালোচক এই উচ্চ প্রশংসার ব্যাপারটি এড়িয়ে আক্রমণলক্ষ্য করেছেন মোহিতলাল কর্তৃক পরবর্তী রবীন্দ্রনাথকে 'বিশেষ' অর্থে 'কবি' না-বলাকে।

।। ৩।।
'শরৎচন্দ্রের জীবনেতিহাস জানিবার জন্য উন্মুখ...'

মোহিতলাল-চর্চিত শরৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রবেশ করেছি। শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনী জানায় তাঁর আগ্রহের কথা প্রথমেই আসবে। সেই জানা মোহিতলালের পক্ষে সুখকর হয়নি। তিনি রক্ষণশীল। তাই বাউণ্ডুলে ঘরছাড়া সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষটির জীবনকথা মোহিতলালের 'সংস্কারে আঘাত' করেছিল। কিন্তু 'বিশ্বাস হারাইলাম না, মনে একটা বিস্ময়বোধ রহিয়া গেল।'

বর্মা-ফেরত শরৎচন্দ্রকে আকস্মিকভাবে মোহিতলাল দেখেছেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে যমুনা পত্রিকার অফিসঘরে শরৎচন্দ্র — 'একটু রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি — খাঁটি দেশী চেহারা।' সঙ্গে আদরের দেশি কুকুর ভেলু। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দোকান থেকে আসা চা ও চপের ভেলু-ভোজন চলেছে; স্নেহ ওপচানো চোখে শরৎচন্দ্র বললেন—তিনি ভেলুর জন্য 'ভাল সঙ্গিনী'র খোঁজ করছেন—পাওয়া যাবে কি? শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই প্রথম আলাপের পরে *ভারতী*-র বৈঠকে শরৎচন্দ্র-মোহিতলাল একাধিকবার সাক্ষাৎ, পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ। মোহিতলাল অনুভব করেছেন :

"তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] কথাবার্ত্তায় যে জিনিষটি বিশেষ করিয়া মনকে স্পর্শ করিত, তাহা পাণ্ডিত্য বা সূক্ষ্ম বিচারশক্তি নয়— জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার ফলে একটা অতিশয় সহজ ও সুদৃঢ় প্রত্যয়; তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার নির্য্যাস নয়, প্রত্যক্ষদর্শনের নিঃসংশয় ধারণা। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন মৃদু অথচ দৃঢ় ছিল, এবং কথার ভাষা এমন পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুট ও প্রাণময় ছিল যে, তাহা আর কোন ভাষায় উদ্ধৃত করা যায় না।"

শরৎচন্দ্রের স্বমুখে তাঁর 'নারী'-বিষয়ক অভিজ্ঞতার কথা মোহিতলাল শুনেছেন যা তাঁর মনে চিরকালের মতো দাগ কেটে বসেছে। অভিজ্ঞতার নানা পরত মেলে ধরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : 'ও জাতের কথা ব'ল না, ওরা পারে না এমন কাজ জগতে নেই।' বিবাহোত্তর জীবনে অসহনীয় পরিবেশের চাপে মেয়েদের দেহে-মনে-প্রাণে বিপুল 'সংযম সহিষ্ণুতার বিকাশ হয়, যাহা অবস্থাবিশেষে অমানুষী শক্তির আকার ধারণ করে।' সেই শক্তির বিস্ফোরণ শরৎচন্দ্র দেখেছেন এবং কয়েকটি উদাহরণও মোহিতলালকে দিয়েছেন। যেমন, ভদ্রবংশের জনৈক মহিলা জাতি-কুল-মান-নারীত্ব-মাতৃত্ব হেলায় ত্যাগ করে 'অতিশয় নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়পারবশ্যের যে পরিচয়' দিয়েছিলেন, তা যেন

মোহিতলালকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বিস্ময়-বিমূঢ় মোহিতলাল প্রশ্ন করেছেন 'জীবপ্রসূতি সর্ব্বংসহা' নারীর পক্ষে কিভাবে এই কাজ সম্ভব? তাঁর ধারণা, নারী "যেন একটা elemental বা অন্ধজড়শক্তির লীলা, তাই বুদ্ধিজীবী পুরুষ তাহা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সেই শক্তির একদিক — আত্মত্যাগের দিক —সৃষ্টির সহায়তা করে বলিয়া, সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর বলিয়া, পুরুষচিত্ত মুগ্ধ হয়; তাহার জীবনের সেই ট্রাজেডি আমাদের মনে এক অপরূপ মহিমাবোধ উদ্রিক্ত করে। শরৎচন্দ্রের হৃদয় স্বভাবত এই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল।'

শরৎচন্দ্রের বাজেশিবপুরের বাড়িতে মোহিতলাল গেছেন এবং সামতাবেড়ের বাড়িতেও। রূপনারায়ণের কূলে চমৎকার উদ্যানশোভিত সেই বাড়িতে মোহিতলাল-সজনীকান্ত হাজির হয়েছিলেন আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মত জানার জন্য। প্রত্যাশিত আলাপ শেষ হবার পর শরৎচন্দ্রের অন্য পরিচয় সেদিন তাঁরা পেয়েছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা সংসারত্যাগী দেবানন্দের মৃত্যুতে শোকাকাতর শরৎচন্দ্র 'যে ভাষায়, যে স্বরে' তাঁর ব্যথা প্রকাশ করেছিলেন, মোহিতলালের মনে হয়েছিল — 'মানুষের যন্ত্রণাকে যেন চাক্ষুষ করিলাম।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মোহিতলালের শেষ দেখা ঢাকায়—১৯৪৩ সালে শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি নেবার জন্য সেখানে গেছেন। আর মোহিতলাল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ঢাকায় বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে শরৎচন্দ্র অতিথি। উপাধি-দান-অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরে অসুস্থ শরৎচন্দ্র ক-দিন বিশ্রাম করছেন। ঢাকা-ত্যাগের তারিখ পেছিয়ে গেছে। মোহিতলাল লিখেছেন :

'তাঁহাকে একটু একা পাওয়া অসম্ভব, ভিড় কিছুতেই কমে না। যেদিন কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক তাহার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কথাবার্ত্তার কোন অবকাশই পাইলাম না—কেবল দেখিলাম, নানা জন যাইতেছে ও আসিতেছে, সামাজিকতার দাবি মিটাইতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গলার বেদনা ও জ্বর তখনও আছে — পাশের টেবিলে নানা প্রকারের শিশি ও যন্ত্রাদি সাজানো রহিয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, প্রকাশিতপ্রায় আমার একখানি বই প্রথম তাঁহার হাতেই উপহার দিই, কিন্তু তাহা দপ্তরীর ঘর হইতে বাহির হইতে তখনও একটু বিলম্ব আছে। আমি তাড়াতাড়ি একখণ্ডমাত্র বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিলাম—পরদিন প্রাতঃকালে তাহা পাইবার কথা। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, পরদিন কোন্ সময়ে আসিলে অসুবিধা হইবে না। তিনি অতিশয় আগ্রহ করিয়া আমাকে যে-কোন সময় আসিতে বলিলেন—যাত্রা-কালের পূর্ব্বে হইলেই চলিবে। পরদিন বেলা ৮। ৮।। টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরখানি জনবিরল; চারুবাবু সকল দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন— সকলেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। আমি বইখানি হাতে দিয়া বসিতেই আলাপ সুরু হইল। ... ইহাই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ, এইখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সমাপ্তি।'[১৫]

।। ৪ ।।
'...তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয়ের ত শেষ নাই'

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয় অপরিমেয়—মোহিতলাল তেমন কথা বলতে চেয়েছেন। *শরৎচন্দ্রের প্রতি* কবিতায় [পরিবর্তিত নাম *শরৎচন্দ্র, স্মরগরল কাব্য*], কয়েকটি প্রবন্ধে [*সমাজ ও সাহিত্য*, ১৩৩৫ আষাঢ়; *সাহিত্যবিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল* [পূর্বনাম *শরৎচন্দ্র-মরীচি*, *কালিকলম* পত্রিকা], ১৩৩৫ কার্ত্তিক; *দুইখানি উপন্যাস*, ১৩৩৮ ফাল্গুন; *অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র*, ১৩৪৩;

শরৎচন্দ্র, ১৩৪৫ আশ্বিন; *শরৎ-পরিচয়*, ১৩৪৭) এবং *শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র* [১৩৫৭] গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয় মোহিতলাল উপস্থিত করেছেন। এই উপস্থাপনার পরিমাণ কি যথেষ্ট?

মোহিতলালের বঙ্কিম-রবীন্দ্র-দর্শন, এমন কি মধুসূদন-দর্শনের মধ্যে সামগ্রিকতার বোধ আছে। কিন্তু শরৎ-প্রতিভার বিচারে মোহিতলাল যথেষ্ট মনোযোগ দেননি এমন অভিযোগ উঠতে পারে। শরৎচন্দ্রের পূর্ণ শক্তির পরিচয়বাহী রচনাগুলির বিষয়ে তিনি উদাসীন। অথচ বাঙালি জীবনের সার্বিক পরিধি শরৎরচনায় এসেছে। স্নেহ-প্রেম-ত্যাগ-স্ত্রীপুরুষের ব্যক্তিত্ব-উদারতা-বাৎসল্য-সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব শরৎচন্দ্র কম দেখান নি। সেখানে আছে হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব, শহুরে মানুষের চিত্র, সামাজিকের মধ্যে অসামাজিক মানুষ, বহুমাত্রিক মানুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত মানুষ। এসেছে বহির্গত-অন্তর্গত মানুষ, বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত-আত্মদীর্ণ মানুষ, প্রতারক-প্রতারিত-আত্মসম্মোহিত মানুষ, অপথ-বিপথগামী লোভার্ত মানুষ — শরৎসাহিত্য মানুষের চিত্রশালা।

মোহিতলাল নিজেও অনুভব করেছেন যে, শরৎসাহিত্য সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট মনোযোগী হতে পারেন নি। ১৯৪৭-এ নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সম্পাদক হবার পর, সেখানে *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনা তিনি শুরু করেন। পরে তা *শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র* নামক বৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হয়। শরৎরচনার উপযুক্ত মূল্যায়ন না-করার জন্য মোহিতলালের মনে যদি কোনো ক্ষোভ থাকে, জীবনের শেষ পর্বে এই গ্রন্থ রচনায় হয়তো তার পূরণ হয়েছিল।

মোহিতলালের বিচারশীল মনে শরৎপ্রতিভার মৌল রূপ এইরকম :

'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্য-সাগরের শেষ সীমা উদ্ভাসিত করিয়াছে, তখনই সেই রবীন্দ্রালোকিত মহাদেশের এক প্রান্তে একটা নূতন আলো বিচ্ছুরিত হইল, নিথর নিবিড় জ্যোৎস্নাকাশের এক কোণে বিদ্যুৎ শিহরণ আরম্ভ হইল। ... [শরৎচন্দ্র] জীবনকে খুব বিস্তৃত করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু যেটুকু দেখিয়াছেন গভীর করিয়া দেখিয়াছেন — সে গভীরতা ততটা কল্পনার নয়, যতটা অনুভূতির। এই সহানুভূতি যেখানে যতটুকু পৌঁছিতে পারিয়াছে ততটুকুই তাঁহার কল্পনার প্রসার। সমাজ যে-পাপে জর্জ্জরিত হইয়াও তাহাকে স্বীকার করে না — আত্মঘাতীর সেই ব্যথাকে শরৎচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন বিনা-সঙ্কোচে তাহার সবটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন; সবটুকু প্রকাশ না করিলে যে সে ব্যথার পরিমাপ করা যাইবে না। অসহায় শক্তিহীন সমাজের এই ব্যথাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদেরই মত অসহায়ভাবে তিনি নিজেও সেই ব্যথা ভোগ করিয়াছেন। ... তিনি দুঃখের কোন দার্শনিক মীমাংসা করিতে চাহেন নাই, তার বাস্তব রূপটি ধ্যান করিয়াছেন; চোখে দেখা এবং গভীর করিয়া অনুভব করা — ইহাই হইল তাঁহার কল্পনার উৎস।'[১৬]

শরৎচন্দ্রের লেখকসত্তার বিচারে মোহিতলালের কোনো ভ্রান্তি হয়নি। বাঁধনভাঙা-গোষ্ঠীর লেখকরূপে তাঁকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে মোহিতলাল তাঁকে আইডিয়ালিস্ট লেখক বলেছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতোই শরৎচন্দ্রের রচনাবিশ্ব কোথাও কল্পনাকে ছাপিয়ে যায়নি। এই তিন মহান সাহিত্যিকের ধারাবাহিকতাকে একইসূত্রে মোহিতলাল গ্রথিত করেছেন। তাঁর মতে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য ভাবপ্রধান হওয়ায় কল্পনাদৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির প্রসার ঘটেছিল। সে-কারণে বঙ্কিম-উপন্যাস 'ঠিক নভেল নয় — গদ্য রোমান্স', তা 'ভাষা, ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে পাঠকের মনকে স্বপ্নাতুর করিয়া তুলে।' অন্যদিকে রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে বিশেষত *গল্পগুচ্ছ*-এ কবির আইডিয়ালিজম্ 'বাস্তবকেই এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।' অন্যের পক্ষে কবির এই আইডিয়ালিজম্ আয়ত্ত করা নিতান্ত দুরূহ। কারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ সাধনা নয়। রবীন্দ্রনাথের পাশে ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মতো অবস্থিত

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ছিল হাস্যোজ্জ্বল অথচ শিশিরস্নিগ্ধ বাস্তব কল্পনা। সমাজ ও সংসারের 'সংকীর্ণ ফ্রেমে বাঁধা' গল্পগুলি স্বচ্ছন্দ রসিকতার জন্য জনপ্রিয়। সেখানে সাহিত্যে জীবন-ট্র্যাজেডির ঘনচ্ছায়া আনলেন শরৎচন্দ্র যিনি রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যপর্বে আবির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ যে-বাস্তবকে অন্তরের আলোয় উজ্জ্বল করলেন, শরৎচন্দ্র তাকেই নিকটতর করে দেখালেন যাতে 'ব্যথার শেষটুকু শেষপর্যন্ত জাগিয়াই থাকে'। মোহিতলালের মতে শরৎচন্দ্রের ভাষায় রবীন্দ্রপ্রভাব থাকলেও তাঁর কল্পনা মৌলিক এবং স্টাইল নিজস্ব।

শরৎ-প্রতিভার এই প্রশংসাধর্মী আলোচনার পাশে তাঁর দুর্বলতার দিকটিও মোহিতলাল পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর মতে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা-দৃষ্টি খণ্ডিত। গৃহপ্রাঙ্গণ বা সমাজসীমানার বাইরে যে বিপুল প্রাকৃতিক রহস্য, তা শরৎচন্দ্রের নজর এড়িয়ে গেছে। ব্যতিক্রম *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে, যদিও সেখানে প্রকৃতির অবস্থান 'যেন জীবনের বহির্দ্দেশে, সে যেন আগন্তুক, অন্তরঙ্গ নহে। এরূপ সঙ্কীর্ণ কল্পনার পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রেরণা যতটুকু সফল হইবার, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে তাহা হইয়াছে।'

আমরা মনে রেখেছি, শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি-অভিজ্ঞতার স্বল্পতা বিষয়ে মোহিতলালের উক্ত মন্তব্য *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসের আলোচনার প্রেক্ষিতে। সে আলোচনায় বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী*-কে তিনি উচ্চাসন দিয়েছেন। তথাপি মন্তব্যটি মোহিতলালের কলমনিঃসৃত বলেই তার যৌক্তিকতা বিচারের প্রয়োজন। একথা সত্য, শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রকৃতি বৃহৎ আকারে আসেনি। কারণ তাঁর মন টেনেছিল মানুষ। মানবিক রূপের নানা বিভঙ্গ তিনি দেখেছেন। ডুব দিয়েছেন মানুষের হৃদয়রহস্যে। তারই তিনি রূপকার। তবু অল্প যেক্ষেত্রে প্রকৃতি এসেছে, তা হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি। গভীর ঔদাসীন্যে ভরা শরৎচন্দ্র নামক মানুষটি গভীরতর জীবনপ্রশ্নে আলোড়িত ছিলেন। জীবন কি কেবল প্রত্যক্ষদৃষ্ট পটচিত্র? জীবন রহস্য বলে কি কিছু নেই? নিয়তির সঙ্গে জীবনের সম্পর্কই বা কি? কালচেতনা কি কেবল তাৎকালিকতা? নাকি নিরন্তর প্রবাহিত কালস্রোতের অনুভূতি? এসবের পরিচয় আছে *শ্রীকান্ত*-র মধ্যে। মহাশ্মশানের গহনরাত্রি শ্রীকান্তের চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল ঘন তমসার রূপ। আলোর খেলা শেষ করে কৃষ্ণ ঘন অন্ধকার নিশীথের গভীর গম্ভীর রূপ ধারণ করেন—কৃষ্ণের সঙ্গে কালী মিশে যান। সেই মহারহস্য কোনো প্রশ্নের মীমাংসা করে না — শুধু জীবনকে দেয় অনন্ত বিস্তার। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তার 'ভয়ংকর-সুন্দর' ছবি আঁকার মতো শিল্পী শরৎচন্দ্রই। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে সমুদ্রের প্রলয় ঝড় বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয়।

মোহিতলালের শরৎ-সমালোচনার কিছু অংশ শরৎচন্দ্রের কর্ণগোচর হয়েছিল। নিজ রচনা সম্পর্কে স্পর্শকাতর এই শিল্পী মোহিতলালের সমালোচকসত্তা বিষয়ে সমতাযুক্ত মন্তব্য করেছেন। এর পাশে অন্য সমালোচকদের আঘাত তাঁর মনোকষ্টের কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গভীর মনোবেদনায় দিলীপকুমার রায়কে লিখেছেন : 'আধুনিক কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালিগালাজ ক'রে, সভয়ে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য কত সামান্য।'[১৭] মৌখিক আলাপে *বাতায়ন* পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন: 'কেউ যদি শুধু হিংসের বশে বা বাহাদুরি করবার জন্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, সেটাই অসহ্য হয়। আমাদের দেশের সমালোচনায় 'ছোট মুখে বড় কথা'র ভাবটাই বেশি।'[১৮] শরৎচন্দ্র-নির্দিষ্ট এই সমালোচক-মহলভুক্ত নন বলেই মোহিতলালের বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য : '...মোহিতের ... সমালোচনা লেখবার শক্তি আছে। ... একটু prejudiced বটে, কিন্তু সমালোচনার বোধ আছে।'[১৯]

॥ ৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক সাহিত্যিক-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মত : মোহিতলালের প্রতিবাদ

এটি জ্ঞাত সত্য, ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের আবেগ এবং হৃদয়োচ্ছ্বাস শিল্পীর কলমকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিষয়টির উল্লেখ করে সঙ্গীতজ্ঞ-সাহিত্যসমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ভাবের উপর অভিজ্ঞতার সাহায্যে, হৃদয়ের আনুকূল্যে যে-সিদ্ধান্ত রচনার বিষয়বস্তু হয়, সেটি একাদশদর্শী হতে বাধ্য। ... শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল না। ... শরৎচন্দ্রের চোখ ছিল বুকে।'[২০] বঙ্কিম-সমালোচনার ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র এই মনোভাবের দ্বারা চালিত। তাঁর আলোচনায় তাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে রোহিণির প্রসঙ্গ, কখনো শৈবলিনীও। একাধিক রচনায় [*আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত, সাহিত্য ও নীতি*] এবং মৌখিক আলাপে কার্যত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রাদ্ধ করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন : 'নারীজীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, তাহাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে — ইহাতে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা কবিপ্রাণের গৌরব কোথায়?' তাঁর আক্ষেপ, সমাজের বিরুদ্ধে মানুষের নিরূপায় অপরাধ যদি সাহিত্যেও বিচারহীন দণ্ডবিধানের বিষয় হয়, তাহলে মানুষের কোনো মূল্যই স্বীকৃত হয়না। শরৎচন্দ্র এমন কি নিজ চিন্তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রতিফলিত পর্যন্ত দেখেছেন: 'আমার আজও যেন মনে হয় [রোহিণী, শৈবলিনীর] দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রু-পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।' এই 'মনে হওয়া' ব্যাপারটি কতটা যুক্তিগ্রাহ্য সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। এও দেখা গেছে শরৎচন্দ্রের বঙ্কিমবিরোধী মনোভাব মেনে না নেওয়ায় অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন বাক্যালাপ বন্ধ রেখেছেন।[২১] শরৎচন্দ্র এতোটাই বঙ্কিম-বিরোধী!!

এই সব অভিযোগের যথাযোগ্য উত্তর দেবার চেষ্টা মোহিতলাল করেছেন। বিদ্রূপের বাঁকানো হুল ফুটিয়ে তিনি লিখলেন :

'আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-বিরোধ মনোভাবে... [বোঝা যায়] বঙ্কিমচন্দ্রকে অপদস্থ না করিলে আধুনিক হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের মনোভাব অতিশয় সহজবোধ্য, ... শরৎচন্দ্র যে বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা সমালোচনা নয় — সমালোচনা বলিয়া মনে করিলে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা হয়। কারণ, কোনরূপ সবল মনোবৃত্তি বা বিচারশক্তি যদি তাঁহার সৃজনীশক্তির সহিত যুক্ত থাকিত, তবে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তেমনটি হইত না — শরৎচন্দ্র এত 'পপুলার' হইতেন না। *বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আক্রোশ যদি না থাকিত, তবে বিস্মিত হইবার কারণ ঘটিত*। বঙ্কিম-প্রতিভা ও শরৎ-প্রতিভা — পুরুষ ও নারী-চরিত্রের মত বিপরীত; অতএব **ভাবের ক্ষেত্রে, বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি শরৎ-চিত্তের একটা আদিম বিতৃষ্ণা বা natural antipathy থাকাই স্বাভাবিক।**''

স্বয়ং শরৎচন্দ্রের মুখের ওপর তাঁর এই বঙ্কিম-বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ মোহিতলাল করেছিলেন এবং তা 'কড়া জবাব' ছিল। শরৎচন্দ্রের ঢাকা-ত্যাগের দিন সকালে শরৎ-সন্নিধানে হাজির মোহিতলাল বলেছেন, বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি নিয়ে পাঠক যদি লেখকের সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয় [শরৎচন্দ্র যা হতে পারেন নি বা চাননি], তাহলে রোহিণীর 'অসঙ্গত বিকাশ' সম্পূর্ণ অসঙ্গত নাও মনে হতে পারে। বরং শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ-এর আচরণে অসঙ্গতি আছে [শরৎচন্দ্রের মুখের ওপর মোহিতলাল একথা বলতে পেরেছিলেন?]। সুতরাং *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর মতো বঙ্কিম-প্রতিভার পরিচয়বাহী রচনার ত্রুটি বিচারের সময় সৃষ্ট চরিত্রসমূহের অন্তর বাহির সকল অবস্থার

পরিচয় নেওয়া একান্ত প্রয়োজন — এই মোহিতলালের মত।

আমরা দেখেছি শরৎ-অভিযোগের উত্তর দেবার সময় মোহিতলাল যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। রোহিণী চরিত্র নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটিনির্দেশ পর্যন্ত সেখানে আছে যদিও তা কোনোভাবেই শরৎচন্দ্রীয় পন্থায় নয়। মোহিতলাল বলতে চেয়েছেন, রোহিণীর পরিণামকে তার স্রষ্টা 'বড় আকস্মিক' করে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে কবিকল্পনার ভারকেন্দ্রে অবস্থিত রোহিণী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তার নির্দিষ্ট স্থান হারিয়েছে। তাহলেও রোহিণীর পরিণামকে উপন্যাসিকের মানবচরিত্রজ্ঞানের অভাব বলে মোহিতলাল মনে করেন নি। এই চরিত্রের মূল ভিত্তি পরীক্ষা করে তিনি দেখালেন, হরলালকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যানের মধ্যে একদিকে রোহিণীর ধর্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় আছে, অন্যদিকে গোবিন্দলালকে সে আশ্রয় করেছিল হৃদয়বান শক্তিমান এক আদর্শ পুরুষরূপে। তার চরিত্রের জন্মগত মর্যাদাবোধ মুছে যায়নি বলে 'মোহের মধ্যে সে অন্তরের সত্যকে হারাইতে রাজি নয়।' সুতরাং একদিকে স্বাধীন প্রেমচেতনার প্রবলতা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণঘরের বৈধব্য আদর্শের রক্তগত সংস্কার — এই দুই়ের টানাপোড়েনে রোহিণী রক্তাক্ত। কারণ সংস্কারকে কেবল "দমন করিতেই পারা যায়, উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়।' ফলে গোবিন্দলালের দুর্বলতার জন্য তার প্রতি রোহিণীর বিশ্বাস যখন ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তখন রোহিনীর রক্তগত সংস্কার প্রবল পাপবোধের সৃষ্টি করে তার চরিত্রের শেষ গ্রন্থি মুহূর্তে ছিন্ন করেছে। বঙ্কিমের ত্রুটি এখানেই — তিনি রোহিণীর দগ্ধ-অঙ্গার মূর্তি দেখিয়েছেন, দাহ্যমান অবস্থা দেখান নি। তারপর 'তাহারই এক মুষ্টি ভগ্নাবশেষ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।' তাঁর লক্ষ্য তখন গোবিন্দলাল, রোহিণী উপলক্ষ্যমাত্র।

মোহিতলাল স্বীকার করেছেন, "আজি আমি কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীচরিত্র-ঘটিত বাদবিতর্কের প্রসঙ্গে ... যাহা লিখিলাম — শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় এত কথা এমনভাবে বলি নাই। ... কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিকটে আমার মূল বক্তব্য ছিল ইহাই।" তাঁর সংযোজন —শরৎচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন [অসুস্থ অবস্থায় বাগ্‌বিতণ্ডা বাড়াতে চাননি বলে, অথবা মোহিতলালের প্রবল বক্তব্যশক্তির বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা?]। "শরৎচন্দ্র অতিশয় নিবিষ্ট মনে আমার বক্তব্য শুনিলেন। ...তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সত্যই এদিক দিয়া কখনো ভাবিয়া দেখেন নাই — সেজন্য যেন লজ্জিত ও দুঃখিত।... তিনি বলিলেন, 'মোহিত, তোমার সঙ্গে এইরূপ আলাপ-আলোচনার সুযোগ যদি হইত, তাহা হইলে তোমার ও আমার দুইজনেরই উপকার হইত'।"

মোহিতলাল উল্লেখ করেন নি, তেমনি আরো একটি বঙ্কিম-উপন্যাস *আনন্দমঠ*, শরৎচন্দ্রের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উপর নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর প্রভাবকে কটাক্ষ করে শরৎচন্দ্র একটি ভাষণ দেন। উক্ত 'অভিভাষণ' তাঁর ৫৫-তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা শরৎবিষয়ে নানা ব্যক্তির রচনা-সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের *শরৎচন্দ্র* রচনাটি ছিল। ঐ রচনায় *আনন্দমঠ*-এর বিপক্ষে বলা কবির কথাকে সমর্থন জানিয়ে শরৎচন্দ্র বলেন : "কবি, 'আনন্দমঠে'র উল্লেখ করে বলেছেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র তুলনায় এর মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়, মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। হঠাৎ 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা, বোধ করি এর পূর্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। এবং একথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই

হচ্চে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত সবাই গ্রাহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু যারা পারবে, উত্তরকালে তাদের গন্তব্যপথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। এবং যারা পারবে না তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের — যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।"

বঙ্কিমপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্য কতদূর সমর্থনযোগ্য? প্রথমত, প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ নামাঙ্কিত যে-সমিতি শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই প্রয়াত বঙ্কিমচন্দ্র এবং জীবিত শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল মূল্যায়ন করা। অন্তত সমিতির নাম থেকে তাই মনে হয়। পরিহাসের ব্যাপার এটাই, ঐ সভায় শরৎচন্দ্র প্রকারান্তরে বঙ্কিম-নিন্দা করেছেন। সম্ভবত তাঁর মনে ছিলনা যে, যাঁর নামে সমিতির নামকরণ, প্রকাশ্য সভায় তাঁর নিন্দা করা সাহিত্যিক ভদ্রতাসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যুর জন্য যে-শরৎচন্দ্র অন্যত্র কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রকে তুলোধোনা করেছেন, সেই তিনিই এখানে *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর প্রশংসামুখর। এই ভূমিপরিবর্তন কি রবীন্দ্রনাথের পথানুসরণের আগ্রহ দমন করতে না পারা? তৃতীয়ত, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য কবিত্বকে গুরুত্ব না-দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর কেবল 'নীতিবাদী' তক্‌মা সেঁটে দেবার জন্য শরৎচন্দ্র ব্যস্ত ছিলেন কেন? *আনন্দমঠ* শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিশেষত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে, কী প্রবল প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, তাও শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত নয়। তাঁর নিজের প্রচারধর্মী উপন্যাস *পথের দাবী* যখন সরকারি রোষে বাজেয়াপ্ত [এবং প্রতিবাদে অস্বীকৃত রবীন্দ্রনাথের উপর তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ, রুষ্ট], তখন কি তাঁর মনে পড়েনি *আনন্দমঠ*-এর সম-ভূমিকার কথা? শরৎ পূর্ববর্তীকালের 'নীতিবাদী' বঙ্কিমচন্দ্র তবু বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন, সংস্কারবাদী শরৎচন্দ্র বেশ কয়েকটি যোগ্য বিধবার সৃষ্টি করলেও তাদের পুনর্বিবাহ দিতে পারেন নি। বস্তুত তা পারা সম্ভব ছিল না। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন নৈতিক সংস্কার। মনের দৃঢ়মূল সংস্কার মানুষের গভীর সুখ ও অসুখের কারণ। লেখক সেই সংস্কারের রূপ তাঁর সাহিত্যে দেখাবেন — এটাই প্রত্যাশিত। নীতির প্রশ্নে বিবেচ্য — লেখকের ঈপ্সিত আদর্শের ঘোষণাই কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য, নাকি সমাজবাস্তবতা রক্ষা করে তার অন্তঃসারশূন্যতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা? চিত্ত-আলোড়নকারী প্রশ্ন জাগাতে পারলেই সমাজের মধ্য থেকে সংস্কারেচ্ছা জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রশ্ন জাগিয়েছিলেন *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এ। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ — খড়্গহস্ত শরৎচন্দ্র। অথচ তিনি নিজে কোথাও বিধবাবিবাহ দিতে পারেন নি। তাই যদি হয়, তিনি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা করলেন কোন্ যুক্তিতে? বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে অনেকগুলো বছর এগিয়ে গেছে যে-পৃথিবী, তার বাসিন্দা তো শরৎচন্দ্র! *আনন্দমঠ*-র উপন্যাসধর্মের কথা বাদ দিলাম, যা কিন্তু যথেষ্টই ছিল।

কেবল বঙ্কিমপ্রসঙ্গে নয়, আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে শরৎচন্দ্রের আবেগময় প্রশস্তিও মোহিতলালের কটাক্ষলক্ষ্য ছিল। *কল্লোল—কালি-কলম—প্রগতি—উত্তরা—ধূপছায়া* পত্রিকায় প্রকাশিত যৌনতা কিংবা কুলি-মুটে-মজুরের অতিবাস্তব জীবনসম্বলিত রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারানুসরণকারীদের চিত্তবিচলনের কারণ দাঁড়ায়। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাংলার সাহিত্যসমাজ বস্তুত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একদিকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল প্রমুখ। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র ও কল্লোল—কালি-কলম—প্রগতি—উত্তরা—ধূপছায়া গোষ্ঠীর লেখকেরা। বাংলা সাহিত্যে এত বড় সাহিত্যবিতর্ক কমই হয়েছে।

প্রসঙ্গটির সূত্রপাত অমল হোমের *অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য* [*ভারতবর্ষ*, ১৩৩৩ মাঘ] প্রবন্ধ রচনায় এবং সজনীকান্ত দাসের উদ্যমে। আধুনিক কথাসাহিত্যের চরিত্র উন্মোচন করে অমল হোম লিখেছিলেন, এখানে 'কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত

অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাহীন অনুভূতির মায়াকান্না' চোখে পড়ে। অমল হোমের এই প্রবন্ধ রচনার পাশে *শনিবারের চিঠি*-ও কিছুদিন যাবৎ কল্লোল—কালি-কলম—প্রগতি—উত্তরা—ধূপছায়া সাহিত্যগোষ্ঠীর বিপক্ষে দংশাত্মক সমালোচনা প্রকাশ করছিল। রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ অমল হোমের প্রবন্ধ প্রকাশের পর নিজ মতের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে একত্র করতে সজনীকান্ত উৎসাহিত হলেন। সজনীকান্তর সঙ্গে মোহিতলালও সামতাবেড় গিয়েছিলেন আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের সাক্ষ্যগ্রহণ এবং তাঁকে প্রকাশ্য সংগ্রামে সামিল করার জন্য। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে মোহিতলাল-সজনীকান্ত উভয়েরই মনে হয়েছিল, 'আগাছা-ক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। ... তাঁহার মতে কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।'[২২]

রবীন্দ্রনাথকেও খোলা চিঠি লিখে আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের জন্য সজনীকান্ত তাঁকে আহবান জানালেন।[২৩] ২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩-এ সজনীকান্তর চিঠির জবাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২৪] সেখানে 'আব্রু'-খোলা আধুনিক কলমকে তিনি 'সুশ্রী' বলেন নি। উপরন্তু লিখেছেন বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মত জানিয়ে 'বাগবাত্যার ধুলো দিগ্‌দিগান্তে ছড়াবার সখ [তাঁর] একটুও নেই।' এর পরেও তিনি *সাহিত্যধর্ম* লিখলেন [*বিচিত্রা*, ১৩৩৪ শ্রাবণ]। সেখানে তাঁর কথা দিবালোকের মতো স্বচ্ছ : 'বিদেশ থেকে আমদানি করা বে-আব্রুতা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞানের অপক্ষপাত কৌতূহল সাহিত্যিকদের শোভা পায়না, অলংকৃত কাব্য রসাত্মক বাক্য বা কাব্য।' মনে রাখতে হবে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব পূর্বাবধি নেতিবাচক, নতুবা ঐ কঠোর মন্তব্য তিনি করতেন না। কিন্তু তাঁর কথা 'আধুনিক'-মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করল। আধুনিকদের ব্রিফ নিলেন আইনজীবী-সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। *সাহিত্যধর্মের সীমানা* [*বিচিত্রা*, ১৩৩৪ ভাদ্র] রচনায় তিনি লিখলেন, রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্যধর্ম* প্রবন্ধটি রসরচনা মাত্র। আসর জমিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে *শনিবারের চিঠি*-তে [১৩৩৪ ভাদ্র] সজনীকান্ত প্রকাশ করলেন — আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর এবং সামতাবেড়েতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মোহিতলাল-সজনীকান্তর সাহিত্যালাপ।

শনিবারের চিঠি-তে উপরিউক্ত রচনাপ্রকাশের অবিলম্বে সজনীকান্তর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন শরৎচন্দ্র। আধুনিক সাহিত্যিকদের সমর্থনে তাঁর রচনা *সাহিত্যের রীতি ও নীতি* [*বঙ্গবাণী*, ১৩৩৪ আশ্বিন] প্রকাশিত হলো। কেন? সজনীকান্তের অনুমান — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কথাসাহিত্যের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত *শনিবারের চিঠি*-র উক্ত ১৩৩৪ ভাদ্র সংখ্যায় সজনীকান্ত প্রকাশ করায় 'ভীরু' শরৎচন্দ্র 'প্রমাদ' গণেছিলেন। 'সকল সাধুব্যক্তির ন্যায় তিনিও উকিলের জেরাকে অতিশয় ভয় করিতেন — মস্ত উকিলের তো কথাই নাই। ...তিনি নরেশচন্দ্রের রচনাকে কখনোই অনবদ্য জ্ঞান করিতেন না, তর্কের ঝোঁকে হঠাৎ বিড়ালকে বাঘ কল্পনা করিয়া বসিলেন।'[২৫] সজনীকান্তর এই অনুমান সজনীকান্তরই। পক্ষান্তরে আমাদের বিবেচনায়, শরৎচন্দ্র ঐ পর্বে রবীন্দ্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে চেয়েছেন। *পথের দাবী*-কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-শরৎ সম্পর্ক ঐকালে বেশ তিক্ত ছিল। এর প্রমাণ অমল হোমকে শরৎচন্দ্রের চিঠি, যেখানে আধুনিক সাহিত্যের বিপক্ষে লেখা অমল হোমের মন্তব্যকে শরৎচন্দ্র সমর্থন করেছেন।[২৬] কিন্তু *শনিবারের চিঠি*-তে আধুনিক সাহিত্যের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মত জানার পরেই তিনি শিবিরবদল করলেন। রাধারাণী দেবী এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্বল্প ব্যবধানে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিতে স্পষ্টই আছে, পথের দাবী সম্পর্কে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের হয়ে সাফাই গাইতে শুরু করেছিলেন।[২৭] *সাহিত্যের রীতি ও নীতি* রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যিকদের

বিলক্ষণ উস্‌কে দিলেন শরৎচন্দ্র। তার মধ্যে শ্লেষ যথেষ্ট :

'কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচি-ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ-সকল অধ্যয়ন করিবার মতো সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রা-টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।'

ব্যঙ্গে শরৎচন্দ্র সুনিপুণ।

এইকালে মোহিতলালের ভূমিকা কি ছিল? মোহিতলাল নিজেই বলেছেন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে তিনি এবং সজনীকান্ত দাস আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মত জানার জন্য [আসলে স্বদলভুক্ত করার জন্য] গিয়েছিলেন। পরে শরৎচন্দ্রের মতবদল হওয়ায় শরৎচন্দ্রের বাজেশিবপুরের বাড়িতে মোহিতলাল শরৎচন্দ্রের *সাহিত্যের রীতি ও নীতি* প্রবন্ধ বিষয়ে খোলাখুলি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, 'ইহাও বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সমালোচনা-শক্তির অনুকূল নয়; অনুভূতির দিক দিয়া তিনি সাহিত্যের বিষয় ও প্রেরণা সম্বন্ধে খুব সত্য ও গভীর কথা—সূক্ষ্ম যুক্তি-বিচার না মানিয়াও বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা কবিরই মত, সমালোচকের মত নয়; এজন্য কোনরূপ রীতিমত বিতর্কে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি একথা তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কোন প্রতিবাদ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।'

এখানে মোহিতলাল সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। মোহিতলাল নিজেই একদা *কল্লোল-কালিকলম-পন্থী* ছিলেন। কিন্তু পরে ভূমিকাবদল করেন। কারণ আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় বলিষ্ঠ জীবনবোধের অভাব তিনি দেখেছেন। একালীন সমালোচকের ভাষায়, 'নূতন বৎসরের গোড়া হইতে [অর্থাৎ ১৩৩৩] জল-কল্লোল হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায়' মেতে উঠলে মোহিতলাল 'কল্লোল' ও 'উত্তরা' থেকে সরে এলেন।... এরপরেই দেখা যাচ্ছে মোহিতলালের চিত্তে একটি পরিবর্তন কাজ করছে। 'কল্লোলগোষ্ঠী' এবং 'উত্তরা'র লেখকগোষ্ঠীর জীবনদর্শনকে তিনি অভিনন্দিত করতে পারলেন না। যে বলিষ্ঠ ভোগবাদ বা জীবনবাদ মোহিতলালের লেখনীতে একটি সংযম-শুভ্র শুচিতার বেষ্টনে সুন্দর হয়ে উঠলো—অক্ষমের হাতে তাই কদর্য যৌনবিকারে পরিণত হচ্ছে, এইরূপ একটি ধারণা তাঁকে পেয়ে বসল। তাছাড়া অবিমিশ্র ভোগই জীবনের সব নয়—অতিরিক্ত তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে এ-ভাবচিত্ত তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল।'[২৮] মোহিতলালের এই মনোভাব স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল *প্রগতি*-বাদী বুদ্ধদেব বসুর। বুদ্ধদেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোহিতলাল তখনো ওখানকার অধ্যাপক হননি। বক্তৃতা দিতে ঢাকায় গেছেন। অতঃপর বুদ্ধদেবের মন্তব্য : বাংলা সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ পাঠকালে 'সবুজ' বিশেষণের ব্যাখ্যায় মোহিতলাল "হঠাৎ যখন বললেন 'কোনো-কোনো সাপের রংও সবুজ', আমি বুঝে নিলাম ঐ 'সাপেরা' 'সবুজপত্র' ছেড়ে সম্প্রতি '*কল্লোলে*' বাসা বেঁধেছে। এটা ঠিক প্রত্যাশিত

ছিলনা, কেননা 'কল্লোলে'র সহচর-পত্রিকা 'কালি-কলমে' প্রায়ই তাঁর কবিতা বেরোয়; আর মাঝে মাঝে 'কল্লোল'-গন্ধী রচনাও তিনি লিখে থাকেন।" এই মোহিতলাল 'বদ্ধপরিকরভাবে' আধুনিকদের যে বিরোধী, তা অল্পদিন পরেই 'ছাপার অক্ষরে রাষ্ট্র হলো।' সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে মোহিতলালের যোগদানের পরে 'তাঁর কবিতার...ভক্ত' হয়েও বুদ্ধদেব তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করেন নি।[২৯]

এহেন মোহিতলাল আধুনিক সাহিত্যের সমর্থক শরৎচন্দ্রকেও ছেড়ে দিলেন না। আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের *আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত* [১৩৩০ আষাঢ়], *সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি* [১৩৩১ চৈত্র] রচনাদুটির কোনো প্রতিবাদ মোহিতলাল করেন নি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ৫৩-তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেশবাসী-প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্রের ভাষণ [ভাষণটি *মনের কথা* নামে *কালি-কলম* পত্রিকার ১৩৩৫ আশ্বিনে প্রকাশিত] মোহিতলালের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল। ওখানে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—১. কোনো দেশের সাহিত্যই নিত্যকালের সাহিত্য হয়না; ২. কাব্য-উপন্যাসের ভালোমন্দ বিচারের ভার বৃদ্ধরা গ্রহণ করেছেন যা তরুণদের প্রাপ্য। শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে চাঁচাছোলা ভাষায় *শরচ্চন্দ্র-মরীচি* [*শনিবারের চিঠি*, ১৩৩৫ কার্ত্তিক, পরিবর্তিত নাম *সাহিত্যবিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল*] রচনায় সাহিত্য-সমালোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির আদি প্রবর্তক জার্মানির হার্ডারের উল্লেখ করে মোহিতলাল জানালেন, শরৎচন্দ্র 'নিত্যকাল' শব্দটিকে অযথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। আসলে মহৎ সাহিত্য 'দীর্ঘজীবী' এবং তাকেই বলা হয় স্থায়ী সাহিত্য। জীবনপ্রবাহের গভীরে যে 'স্থিরতর অন্তঃপ্রবাহ' আছে, সাহিত্যে তার পরিচয় মেলে। এই কারণে দেশকালের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে নিরপেক্ষ বিশ্বজনীনতার আভাস থাকে। সেই অংশটি সর্বকালেই সত্য ও সুন্দর। শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় কথার উত্তরে মোহিতলাল : সাহিত্যসৃষ্টি ও তার বিচার 'যৌনধর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল' নয়। যদি তাই হতো, ঈষৎ ব্যঙ্গরস মিশিয়ে মোহিতলাল বললেন, তাহলে যে-কোনো প্রাণীরই যৌবনে রসজ্ঞান থাকত। কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্যের 'মধুদ্বিরেফঃ' শ্লোকে 'যৌবনের আবেগ' বা আসঙ্গলিপ্সা পশুপ্রকৃতিকে মানুষের সমকক্ষ করেছে বলে তাদের পক্ষে 'সেই স্বভাবধর্মের বশেই কি ঐ শ্লোকটির মধ্যে যে কাব্যরস আছে, তার সৃষ্টি বা বিচারশক্তি সম্ভব?' কবিমানসের যৌবনের পরিমাপ বয়োধর্মের নিরিখে হয়না। সে যৌবন সাধারণত নবীনের থাকেনা—থাকে প্রবীণের মধ্যেই। তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

মোহিতলালের এই জোরালো রচনার উত্তর শরৎচন্দ্র দিয়েছিলেন [মৌখিক না লিখিত আকারে], তার কোনো সংবাদ আমরা পাইনি।

।। ৬।।

'আমি শরৎ-সাহিত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, তাহা...আমারই দৃষ্টি'

শরৎ-কথাসাহিত্যের আলোচনাকালে মোহিতলাল নিজ শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। সেখানে প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই। *শরৎচন্দ্রের প্রতি* কবিতায় [*কালিকলম*, ১৩৩৪ ভাদ্র, পরবর্তী নাম *শরৎচন্দ্র*, *স্মরগরল* কাব্যভুক্ত] *বিরাজ-বৌ* ও *শ্রীকান্ত*-১ম পর্ব পাঠে মোহিতলালের মুগ্ধতার কথা পাই। শরৎ-চন্দ্র-দর্শনে মোহিত যুবকের গদ্‌গদ ভাষণ :

সেইকালে—অবারিত ছিল যবে আশিস বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে!

সে কি চিত্ত চমৎকার!
বিরাজ-বৌ তাঁর মনপ্রাণ লুট করে নিয়েছিল :
পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সামান্যা সে রমনীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে।
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি।

বিরাজের পাশে 'সতী-শোকে' স্তব্ধ 'ধ্যানী মহেশ্বর' নীলাম্বরকেও দেখেছেন কবি মোহিতলাল। কবিতার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশে শরৎসাহিত্যে তন্ত্রানুভূতির অনুসন্ধানী তিনি :

শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে!
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায়!

বিরাজ-বৌ প্রথম পাঠের প্রায় তিন দশক পরে *শরৎ-পরিচয়* [১৩৪৭] রচনায় সেই অভিজ্ঞতার রোমন্থন করলেন মোহিতলাল। তখনো তাঁর কণ্ঠে আবেগউচ্ছ্বাস : 'আপনারা ভাবিয়া দেখুন, এত বড় সুগভীর অনুভূতিসম্পন্ন একজন লেখক—তাঁহার সেই অনবদ্য লিপিকৌশল লইয়া অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্যের সেই প্রায়-গতানুগতিকতা-ক্লিষ্ট সমতলপথে সহসা আবির্ভূত হইলেন। ইহার পূর্বে সেই আবির্ভাবের কিছুমাত্র সূচনা বা প্রত্যাশা ছিল না; এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই।'[৩০] *বিরাজ-বৌ* পড়ে মোহিতলালের মনে হয়েছিল, কবিত্বশক্তি থাকলে বাস্তবকে অক্ষুন্ন রেখেও 'কাব্য' সৃষ্টি করা যায়। এই উপন্যাসে অপর একটি সত্য তিনি অনুভব করেছিলেন—বিরাজ বাঙালি ঘরের সেই নারী যে একই কালে 'অপূর্ব্ব' ও 'অতি-পরিচিত'। মোহিতলালের ভাবগম্ভীর উচ্চারণ : 'বাঙালীর দাম্পত্য-প্রেমকে,— আমাদের সেই হিন্দু আচার ও সংস্কার-বন্ধনের মধ্যেই ব্যক্তি-চেতনার এক অতি প্রবল গভীর উন্মেষকে, মানবভাগ্যের এমন মহনীয় ট্র্যাজেডির দ্বারা মণ্ডিত করা—বাঙালী-প্রাণের বৃন্দাবনী গাথায় এমন আকাশভাঙা বজ্রঝঞ্ঝা-ধ্বনি মিলাইয়া দেওয়া, আমার নিজস্ব রসবোধ ও কাব্যসংস্কারকে চরিতার্থ করিয়াছিল।' কিন্তু মোহিতলালের বিরাজস্তুতি চিরকাল ছিল না। ঢাকায় শরৎচন্দ্রকে তিনি জানিয়েছিলেন বিরাজের আচরণগত অসঙ্গতি পাঠকের সংস্কারে আঘাত করে [হয়তো শরৎচন্দ্রের বঙ্কিম-বিরোধিতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তাঁর এই মন্তব্য, অথবা বিরাজ চরিত্রের নবমূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করেছেন]।

বিরাজ-বৌ-এর তুলনায় *পল্লীসমাজ* উপন্যাসের রস উপভোগ আরো রোমাঞ্চকরভাবে। কর্মসূত্রে মোহিতলাল তখন উত্তরবঙ্গে। পদ্মাতীরে একটি বাড়িতে রাত্রে আছেন, সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ কাছারিবাড়ির ডাক্তার অঘোরলাল মজুমদার যাঁর সাহিত্যবোধে মোহিতলালের গভীর আস্থা ছিল। মোহিতলালের 'অতিরিক্ত' শরৎ-প্রশংসায়, কুঞ্চিতনাসিকা অঘোরলাল [এর আগে তিনি শরৎসাহিত্য পড়েন নি] *পল্লীসমাজ* টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। বাকি ঘটনাংশ মোহিতলালের ভাষায় : 'এক সময় গভীর রাত্রে তিনি [অঘোরলাল] আমার শয্যাপার্শ্বে কি একটা খুঁজিবার আছিলায় আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলেন। দেখিলাম, বই বন্ধ করিয়াছেন—অন্তরের ভাবাবেগ একটু প্রকাশ না করিয়া আর যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিলেন না, কিছুক্ষণ পরে আবার পড়িতে লাগিলেন। সকালে উঠিয়া শুনিলাম, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া

বইখানি শেষ করিয়াছেন; তারপর আমার সঙ্গে সে কি আলোচনা! এমন করিয়া সাহিত্যরস ভাগ করিয়া ভোগ, আমি জীবনে আর কখনও করি নাই।' [*শরৎ-পরিচয়*]।

অরক্ষণীয়া প্রসঙ্গে মোহিতলালের কিছু মন্তব্য পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের *পোস্টমাস্টার* গল্পের নায়িকা রতনের সঙ্গে *অরক্ষণীয়া*-র নায়িকার তুলনা করে মোহিতলাল লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপরে থাকলেও শরৎচন্দ্রের স্টাইল মৌলিক ও কল্পনা নিজস্ব :

'রতনের দুঃখ যেন সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল, তাহার মধ্যে মানবভাগ্যের চিরন্তন ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে—সে-দুঃখ যেন ভাবের শাশ্বত লোকে একটি পরম পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। 'অরক্ষণীয়া'র মধ্যে সে রকমের ভাবুকতা নাই; তাহার মধ্যে যে দুঃখের বর্ণনা আছে, সে ঠিক সেই ব্যক্তি ও সেই অবস্থার মধ্যেই কঠিন ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া জাগিয়া রহিল, কোনও একটি ভাবলোকে সমাপ্তি লাভ করিল না। এখানে কবিত্ব হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতিই তাঁহাকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি-শক্তির অধিকারী করিয়াছে।' [*শরৎচন্দ্র*, ১৩৪৫ আশ্বিন]।

একই আলোচনাংশে মোহিতলাল *চন্দ্রনাথ* উপন্যাসের কৈলাস খুড়ো ও বিশু-কে বাংলা কথাসাহিত্যে 'অতুলনীয়' বলে *চন্দ্রনাথ*-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *কাবুলিওয়ালা*-র তুলনা করেছেন:

"ঐ [চন্দ্রনাথ] উপন্যাসখানির শেষের দিকে এই যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মূল কাহিনী ম্লান হইয়া গিয়াছে। একি শুধু বাস্তবের তীব্র অনুভূতি? কত বড় রস-কল্পনার প্রমাণ ঐ চিত্রটি! ইহার সঙ্গে একদিকে দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির তুলনা করা যায়। 'কাবুলিওয়ালা'র ব্যথা বিশ্বজনীন হইয়া এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিয়াছে বটে, তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের করুণরস যেন আরো গভীর, আরো উজ্জ্বল।... তাঁহার নিজের সমাজে তিনি যে জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকে গভীর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, আর কিছুর ভাবনা তিনি করেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবতাটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, বিশ্ব-মানবতা বা বিশ্ব-প্রাণতার দিক দিয়াও তিনি যান নাই।" [*শরৎচন্দ্র*, ১৩৪৫ আশ্বিন]।

তথাপি একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ব্যথার অনুভূতির ক্ষেত্রে কাবুলিওয়ালার ব্যথা ও কৈলাস খুড়ো-র ব্যথার যে-তুলনাই মোহিতলাল করুন না কেন, সে তুলনা খুবই আংশিক। কেননা *কাবুলিওয়ালা* নিখুঁত সৃষ্টি আর *চন্দ্রনাথ* কাঠামোগতভাবে অত্যন্ত অসংলগ্ন।

।। ৭।।

'এ শরৎচন্দ্র যে শরৎচন্দ্র নয়'

শরৎচন্দ্রের *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসের আলোচনায় মোহিতলালের বক্র মনোভাব শিরোনামের বাক্যটিতে পাওয়া গেছে। এমন রূঢ় পরুষ ভাষায় শরৎসাহিত্যের আলোচনা তিনি আর কখনো করেন নি। শরৎচন্দ্রের অবসিত প্রতিভার *শেষ প্রশ্ন* এবং বিভূতি-প্রতিভার উদয়চিহ্ন *পথের পাঁচালী*-র যে-তুলনাত্মক আলোচনা মোহিতলাল করেছেন, তাতে কলমের ধার এবং বিদ্রূপের ঝাঁঝ দু-ই সমমাত্রায় বর্তমান—সেইসঙ্গে ছিল সত্যদর্শনের আশ্চর্য ক্ষমতা। রচনাটির নাম *দুইখানি উপন্যাস* [১৩৩৮ ফাল্গুন]। *শেষ প্রশ্ন* সম্পর্কে মোহিতলাল : ওখানে 'কবি-প্রতিভার পরাজয়'। আর *পথের পাঁচালী*-তে 'দুইটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া...জীবন-দেবতার দীপারতি'। *পথের পাঁচালী* সম্পর্কে মোহিতলাল আরো লিখেছেন : 'সকল কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এ উপন্যাসে তাহা আছে। চরিত্রসৃষ্টি বা ঘটনাবিবৃতিই এ রচনার রসবৈশিষ্ট্য নয়; জটিল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, বা আধুনিক কালের অতি সজ্ঞান

নর-নারীর মানসবিষের ব্যাখ্যান ইহাতে নাই। মানুষ যে দৃষ্টি হারাইয়াছে—সেই চিরতরুণ গাঢ়নীল চক্ষুতারকার অনাবিল দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তিনি [বিভূতিভূষণ] তাহার জীবনকে গভীরতরভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন...।' উল্টোদিকে *শেষ প্রশ্ন* বিষয়ে মোহিতলালের খর মন্তব্যের কিছু অংশ : 'উপন্যাস কই? এ যে নবধর্ম্ম-প্রচারের প্রশ্নোত্তর মালা! এ ত নরনারীর জীবনযাত্রার কাহিনী নয়—এ যে কড়া নেশার ধোঁয়ায় আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের বাগ্‌বিতণ্ডা।' চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সরস গদ্যে 'প্রবীণ সাহিত্যিক' শরৎচন্দ্র তাঁর সমাজচিন্তা এখানে হাজির করেছেন। মানুষের জীবন, চরিত্র ও নিয়তির চিরন্তন রহস্যসন্ধানের আভাসমাত্রা *শেষপ্রশ্ন*-এ নেই। বরং উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাক্য ও চিন্তার প্রহারে 'মরজীবনের নিয়তিনিয়মকে ভূমিসাৎ করিতে চায়।' *শেষপ্রশ্ন*-র কমল কবি-বিধাতার চির-চমৎকার কল্পনার বিরুদ্ধে 'একজন চিন্তাভিমানী মানুষের বিকট দন্তবিকাশ'। মোহিতলাল আরো লিখেছেন, 'তার সেই চমকপ্রদ মিথ্যা উক্তিগুলি শরৎচন্দ্রের মিথ্যাবিলাসমাত্র; সেই উক্তিগুলি যে-চরিত্রের দ্বারা তিনি বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে চরিত্রটি কতকগুলি বাক্যস্ফুলিঙ্গের আতস-বাজি।' মোহিতলালের শর *শেষপ্রশ্ন*-প্রেমিক কিছু বুদ্ধিজীবীর দিকেও ছুটেছিল। সেইসব 'তত্ত্ববিলাসী অরসিক' মানুষ কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় প্রচুর অবান্তর চিন্তা, তর্ক, মত-বিশ্লেষণ রসাল গদ্যে এই উপন্যাসে লাভ করে আমোদিত। শরৎচন্দ্রের বিচিত্র পরিণতিতে চমৎকৃত মোহিতলাল বললেন—কবি থেকে দার্শনিক পদবীতে শরৎচন্দ্র এত শীঘ্র 'ডবল প্রমোশন' পেলেন কি করে।! জীবনকে শরৎচন্দ্র কোনোদিনই সমগ্রভাবে দেখেন নি—নরনারীর হৃদয়রহস্যই তাঁর সাহিত্যরচনার প্রধান উপকরণ। সেই শক্তি যখন নিঃশোষিত, শরৎচন্দ্র তখন 'উপন্যাস-রচনার ছলে, জীবন-রহস্যের পরিবর্তে, মানুষের মানস-ব্যধির ঔষধ সন্ধানে' নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তারই ফল *শেষপ্রশ্ন*।

।। ৮ ।।

শ্রীকান্ত : 'এ কাহিনী আত্মকাহিনীই বটে'

সমালোচক-জীবনের উপান্তে মোহিতলালের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, *শ্রীকান্ত* শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী। তাঁর স্বীকারোক্তি : 'কিছুদিন হইল 'শ্রীকান্তে'র চারিটি খণ্ডই একসঙ্গে পড়িবার অবকাশ হইয়াছিল। তাহাতে সহসা ঐ গ্রন্থকার ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে যেন একটা নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম, সাহিত্য-শিল্পকলারও একটা অভিনব রূপ যেন চাক্ষুস করিলাম, এই অর্থে যে—কবি ও কাব্যের মধ্যে যে নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহার অনেক কথাই জানিতাম, কিন্তু একটা বড় তত্ত্ব যেন এইবার এই বইখানিতে স্পষ্ট হৃদয়গোচর করিলাম; কবি-মনীষীগণ, আধুনিক শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ যাহার একাধিক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার এমন দৃষ্টান্ত পূর্বে আর দেখি নাই।'

কথাগুলি নিঃসন্দেহে আবেগময়। কিন্তু আবেগের অন্তরালে যুক্তির সংযোজনা আছে। উপন্যাসের চরিত্র কিংবা কাহিনী-বিচারের রীতিমাফিক পথে মোহিতলাল যাননি। হেঁটেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের মূল ভাববস্তুর আলোকে শ্রীকান্ত-সহ অন্যান্য চরিত্রাবলী উজ্জ্বল—এই তাঁর বক্তব্য। মোহিতলালের ভাষায় : 'আমি মুখ্যতঃ শ্রীকান্ত-চরিত্রেরই পরিচয় করিয়াছি, গৌণতঃ—উপন্যাসের নয়—রচনার কাব্যগুণের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি; তাহারও মূলে আছে ঐ একটি অসাধারণ চরিত্র, কারণ, এখানে আর্ট ও জীবন, মানুষ ও কবি এক হইয়া গিয়াছে।' তাঁর এই ব্যাখ্যায় মৌলিকতার আভাস মেলে। *শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র* গ্রন্থে *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের চারটি পর্বের রসভাষ্য দান উপন্যাসটির নব উদ্‌ভাসন।

মোহিতলালের মূল প্রতিপাদ্য :

১. *শ্রীকান্ত* উপন্যাস ইংরেজি মতে Autobiographical Novel তো বটেই, এমন কি তারও বেশি। 'এইরূপ আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, ইহার নায়ক একাধারে 'আত্ম'ও বটে, 'পর'ও বটে। লেখক যেন আপনাকেই, বাহিরে একটু তফাতে ধরিয়া দেখিতেছেন; ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপ সংস্থান ও পশ্চাৎপট আবশ্যক তাহা উত্তমরূপে সংযোজন করিয়া লইয়াছেন।" নায়করূপী লেখকের আত্মপরিচয়দানের সজ্ঞান অভিপ্রায় না থাকায় তার আত্মপ্রকাশ আরো স্বাধীন, আরো অকপট। লেখক শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মধ্য দিয়ে নিজেকে 'চরিত্র-রূপে খাড়া' করার কোনো চেষ্টা করেন নি।

২. শ্রীকান্ত সংসার ও সমাজের বন্ধন ত্যাগ করেছে। সেই হিসাবে তার অন্তর 'স্বাধীন'।

৩. শ্রীকান্ত চরিত্রের দ্বন্দ্ব—নারীর প্রেম এবং উদাসীন পুরুষের বিমুখতার মধ্যে। 'সে আসলে বৈরাগী নয়; প্রেম তাহার জন্মগত স্বভাব-ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়, সেই সঙ্গে বাঙালী-সুলভ একটা বড় Idealism তাহার সেই বালক-হৃদয়ে অতি অল্প বয়সেই স্ফুরিত হইয়াছিল। এ-দুয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু অবস্থাচক্রে উহার একটিতে আঘাত লাগায় ঐ প্রেম একটা দুর্জ্জয় উদাসীন্যে পরিণত হয়; পরে দৈবচক্রে সেই Idealism অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ... অন্নদাদিদির সেই তপস্বিনী ভৈরবী-মূর্ত্তি শ্রীকান্তের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে নিদারুণ আঘাত করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণের সহজ ধারাটি বিপরীতমুখী হইয়াছিল।... অন্নদাদিদিই তাহাকে দাম্পত্য-প্রেমের সেই ভীষণ নিষ্ঠুর বন্ধন, এবং ঐরূপ প্রেমের ভয়ঙ্কর মোহ সম্বন্ধে, এমন এক প্রতীতির বশীভূত করিল যে, সে সম্বন্ধে আর কোন বিচার, কোন চিন্তাই সে মনে স্থান দিতে পারিল না। কিন্তু তাহাতেই দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হইল; প্রেমকে সে তাহার স্বভাব হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল না—তাহার অন্তশ্চৈতন্যে সে একটা ভয়ের মত বিরাজ করিতে লাগিল, সেই ভয়কে ভুলিবার জন্যই সে ইন্দ্রনাথকে সর্বদা তাহার রক্ষীরূপে তাহার শক্তিমন্ত্রের আদর্শরূপে খাড়া রাখিয়াছিল; ... এ দ্বন্দ্ব তাহার জীবনে কখনো ঘুচে নাই। ঐ প্রেমও যেমন তাহার জন্মগত সংস্কার; সতীত্বের ঐ আদর্শও তেমনই তাহার একটা অর্জিত সংস্কার; এই জন্যই সে ঐ অতিজীর্ণ, বহুপাপা জর্জ্জর প্রাচীন সমাজটাকে আধুনিকদের মত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।'

৪. এই আত্মকাহিনীতে কোনো ধর্মনীতি বা ধর্মবিশ্বাস, কোনো বৈষয়িক বা অন্যবিধ কর্ম, জীবনের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা কামনাসিদ্ধির প্রয়াস ইত্যাদির কথা নেই। আছে সংস্কারমুক্ত 'অনুভূতি'র পরিচয়।

৫. প্রচলিত উপন্যাসের আদিঅন্তযুক্ত প্লট *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে নেই। এটি নায়কের জীবনঘটিত বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকথার সংকলন। সেই ইতস্তত স্মৃতিগুলি একটি সূত্রে গ্রথিত। সে সূত্র শ্রীকান্ত স্বয়ং। মোহিতলালের মতে, 'বাহিরের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা এবং ভিতরের কতকগুলি ব্যক্তিগত সংস্কারের দ্বন্দ্বে, সেই যাত্রা—জীবনের রহস্য-সন্ধানে সেই যে দুঃসাহসিক অভিযান—তাহা ক্রমশ জটিল গভীর হইয়া উঠিতেছে; ইহাই ঐ কাহিনীকে একটি কেন্দ্রগত সৌষম্য দান করিয়াছে।'

৬. শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের সমাজ ও জীবনের গণ্ডিতে 'সর্ব্বসংস্কার মুক্তির সাধনা' করেছেন। সামাজিক সংস্কারবন্ধন অতিশয় দৃঢ় বলেই সেই সাধনায় শরৎচন্দ্রের শক্তি বিকশিত হতে পেরেছে। তিনি 'শবসাধক তান্ত্রিকের বংশধর'। কিন্তু তাঁর সাধনায় 'তান্ত্রিকের মনোভাব থাকিলেও তাহা প্রেমের সাধনা—জ্ঞানের সাধনা নয়; ... এই মানবতার সাধনা তাঁহার জীবনেই হইয়াছিল—ভাব বা কল্পনাযোগে নয়; সেইজন্যই তাঁহার সাধনাকে তান্ত্রিক সাধনা বলিয়াছি।'

৭. শরৎচন্দ্রের স্টাইল ভাষার রসনৈপুণ্যে। তাঁর 'ভাষা যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা, তেমনই

উহা কথ্য-ভাষারও অতিশয় নিকটবর্তী; একদিকে তাহা যেমন শিষ্ট ও সুমার্জিত, অপরদিকে তাহা জীবনের স্বাভাবিকতা ও সজীবতাকেও রক্ষা করিয়াছে। এক কথায়, সাধু ও চলিত ভাষার যে দ্বন্দ্ব, এবং যে সমতা-সাধন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শরৎচন্দ্রে তাহা শেষ সিদ্ধির কোটায় পৌঁছিয়াছে।"

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র গ্রন্থে মোহিতলালের দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনাযোগ্য। পূর্বনির্মিত তত্ত্বের ভিত্তিতে *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের আলোচনা তিনি করেছেন। প্রবল শক্তির প্রকাশ সেখানে আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বল। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসটির দুই মৌল লক্ষণের একটি আত্মজৈবনিকতা মোহিতলাল স্বীকার করেছেন। কিন্তু অপর লক্ষণ, উপন্যাসটি যে ভ্রমণকাহিনীধর্মী, তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অথচ *ভারতবর্ষ* পত্রিকার ১৩২২ মাঘে ধারাবাহিক প্রকাশের সূচনায় উপন্যাসের নাম ছিল *শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী*। চৈত্র থেকে নতুন নাম *শ্রীকান্ত*। গ্রন্থকার শরৎচন্দ্র স্বয়ং যে উপন্যাসটিকে ভ্রমণকাহিনী মনে করতেন, তা উপন্যাসের প্রথম কিস্তিতে ভ্রমণকাহিনীর চরিত্র উপস্থাপনার দ্বারা বুঝিয়েছেন—তিনি কোন্ ধরনের ভ্রমণসাহিত্য রচনা করতে যাচ্ছেন :

'দেখি, সবাই লেখে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—মেয়ে পুরুষ ইহার আর অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই। যে-কোনো একখানা মাসিকপত্র খুলিলেই চোখে পড়ে আছে রে, আছে আছে। ঐ যে! কে গিয়াছে কাশী, কে গিয়াছে খুলনা, কে গিয়াছে সিমলা-পাহাড়—অমনি ভ্রমণ-কাহিনী। যে পাহাড়ে পর্বতে উঠিয়াছে, তাহার তো কথা নাই। আর যে জলজাহাজে চড়িয়া সমুদ্র দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তো একেবারে অসাধ্য! ... হঠাৎ সেদিন বড় একটা ফন্দী মাথায় ঢুকিয়াছে! আচ্ছা, এক কাজ করিনা কেন? বড় বড় লোকের ভ্রমণকাহিনীগুলো পড়িয়া লই না কেন? ... কিন্তু একি নিদারুণ ব্যবধান! ... বড়লোক ক্রমাগত বলিতেছে—'আমি! আমি! আমি! ওগো তোমরা দেশের হতভাগা পাঁচজন চোখ চাহিয়া ইহার প্রতি অক্ষরটি পড়, হাঁ করিয়া আমার প্রতি শব্দটি শোন—আমি বিদেশে গিয়াছিলাম'।"

আবার ভ্রমণকাহিনী যে শরৎচন্দ্রেরই, তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তাঁর চিঠিতে। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে [আমার] কতকটা সম্বন্ধ তো থাকিবেই, তাছাড়া ওটা [আমার] ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।'[৩১] *শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী* পড়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানার বিষয়ে শরৎচন্দ্র বেশ আগ্রহী ছিলেন। পাঠকের মনোভাব না-শোনা পর্যন্ত তিনি কলম ধরতেও অরাজি। সেকথা বলার সময় শ্রীকান্তর সঙ্গে নিজ পার্থক্য পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখবে না।'[৩২] *শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী* কিংবা *শ্রীকান্ত* সম্পর্কে এইসব তথ্যাদি মোহিতলাল কেন এড়িয়ে গেছেন তা বলা মুশকিল যদিও শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা আমরা আগেই জেনেছি। তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, ভ্রমণকাহিনী ব্যক্তিচরিত্রেরই হয়, ঔপন্যাসিক চরিত্রের হয় না।

দ্বিতীয়ত, মোহিতলালের মতে বাঙালিসুলভ 'একটা বড় Idealism' শ্রীকান্তের বাল্যহৃদয়ে স্ফুরিত হয়েছিল। এই Idealism কথাটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত, তার কোনো ব্যাখ্যা মোহিতলাল দেননি। নিশ্চয় তা কর্মপথে নয়, কেননা শ্রীকান্তের মতো চরিত্র কর্মী হয় না। জ্ঞানপথেও নয়, কারণ শ্রীকান্তকে জ্ঞানী পুরুষ বলা চলে না। অনুমান করা যায় শ্রীকান্তর উদাসীন ভবঘুরে চরিত্রে সূক্ষ্ম সন্ন্যাসবোধ আইডিয়ালিজমের আকারে ছিল। মোহিতলাল একথা স্পষ্ট করেন নি। তিনি এও বলেছেন, শ্রীকান্তর জন্মগত প্রেম-সংস্কারের সঙ্গে আইডিয়ালিজমের 'বিরোধ ঘটিবার কোন কারণ

নাই'। মোহিতলালের এই কথাটি অসংলগ্ন বলে মনে হয়। কেননা প্রেমের সঙ্গে উদাসীন সন্ন্যাসী-মানসিকতার বিরোধ ঘটতেই পারে এবং সেটাই শ্রীকান্ত চরিত্রের ভিত্তি। একদিকে অন্নদাদিদির মধ্যে বিবাহবন্ধনের দুশ্ছেদ্য রূপ [প্রেম যেখানে অবলুপ্ত], অন্যদিকে ইন্দ্রনাথের বন্ধনহীন মন্— দু-ই শ্রীকান্তর চোখের সামনে ছিল। এরই ফলে শ্রীকান্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা দৃঢ় হয়েছে তার ভবঘুরে মনোবৃত্তির জন্য।

তৃতীয়ত, মোহিতলালের মতে শরৎচন্দ্রের সাধনায় তান্ত্রিকের মনোভাব থাকলেও তা প্রেমের সাধনা, 'জ্ঞানের সাধনা নয়'। মোহিতলালের এই কথাটিও সমালোচিত হবে। কেননা তান্ত্রিকের সাধনা দেহসাধনা। সেখানে জ্ঞানসাধনার স্থান নেই। উল্টোদিকে জ্ঞানসাধনা অদ্বৈত বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে জ্ঞানসাধনা বলতে মোহিতলাল কি অদ্বৈতসাধনার কথা ভেবেছেন? পুনশ্চ শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে বৈষ্ণব রসসাধনার যে-উল্লেখ আছে, মোহিতলালের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে একটি চিঠিতে তাঁর বৈষ্ণব আচরণের উল্লেখ করেছেন : 'আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্যন্ত খাইনা।'[৩৩] হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর অন্য একটি চিঠি : ''আপনি আমাকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন ..., এছাড়া আরো অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি [এমন কি রোজই প্রায় পড়ি] তা বলিতে পারিনা। ... বইগুলি বরং আমাকে দান করুন।'[৩৪] বর্মায় থাকার সময় কীর্তনে আবিষ্ট শরৎচন্দ্রের কথা বলেছেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার।[৩৫] শরৎচন্দ্রের বর্মার বাড়িতে তুলসীচারা দেখার কথা যোগেন্দ্রনাথ সরকারের স্মৃতিকথায় পাই।[৩৬] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে পাওয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্তি শরৎচন্দ্র নিত্যপূজা করতেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দিল্লি কংগ্রেসের অধিবেশন সেরে বৃন্দাবনে এসে গোবিন্দজীর মন্দিরে শরৎচন্দ্র সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন।[৩৭] শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের প্রতিবেশিনী রাধারানী দেবী (যাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিত্যসাক্ষাতের সম্পর্ক ছিল) লিখেছেন, 'তাঁর [শরৎচন্দ্রের] স্বাভাবিক মনঃপ্রকৃতির অনুকূল ছিল বৈষ্ণব ধর্মের রসসাধনা। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।'[৩৮] জীবনের পথে চলার সময় বৈষ্ণব ধর্মে নিষ্ণাত খাঁটি কয়েকজন মানুষকে শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন। তাদেরই তিনি এঁকেছেন *শ্রীকান্ত*-র চতুর্থ পর্বে দ্বারিকাদাস গোঁসাই, গহর গোঁসাই, কমললতার মতো চরিত্রের মধ্যে। বিস্ময়ের কথা এটাই, *শ্রীকান্ত* উপন্যাস আলোচনাকালে শরৎজীবন ও সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব এড়িয়ে মোহিতলাল কেবল তন্ত্রসাধক শরৎচন্দ্রের সন্ধান করেছেন।

।। ৯ ।।
'এমন পূণ্যবান সাহিত্যিক আমরা অল্পই দেখিয়াছি'

উপরের উদ্ধৃতি-বাক্যটি শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে মোহিতলালের। আমরা মোহিতলাল সম্পর্কে একই কথা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু কোন্ অর্থে তিনি 'পুণ্যবান'? অবশ্যই প্রচলিত পাপপুণ্যের বিচার এখানে আসবে না। কিন্তু একথা বলা যায়, জীবনে এবং সাহিত্যে এই মানুষটি ঋজুরেখা ধরে চলেছেন। কদাপি সত্যচ্যুত হননি। দ্বিচারিতা তাঁর স্বভাব বহির্ভূত। আদর্শের বাতিঘরের দিকে সদা লক্ষ্য ছিল তাঁর। সংগ্রামে তিনি একক। কিন্তু পেছিয়ে আসেন নি কখনো। আমরা অধিকন্তু যোগ করব, যে-মোহিতলাল অন্যের রচনায় তন্ত্রপ্রভাব খুঁজে ফিরেছেন, সেই তিনি স্বয়ং হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যের অমেয় তন্ত্রসাধক। শক্তির প্রবলতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় মোহিতলাল তাঁর সময়ের অনন্য সমালোচক। তাঁর কিছু কথা আজ হয়তো গ্রাহ্য হবেনা। কিন্তু তাঁর অনেক কথায় আছে

সত্যের উপলব্ধি—মৌলিক চিন্তার প্রকাশ সেখানে চোখে পড়ে।

কাল আসে, কাল চলে যায়। চলে যাবার পর দেখা যায় মহাকালের বুকে আঁকাবাঁকা রেখা রয়ে গেছে। মোহিতলাল তেমনই তরঙ্গরেখার স্রষ্টা যিনি কাল পেরিয়ে কালান্তরে যাত্রা করেছেন। তিনি সত্যই 'পুণ্যবান' সাহিত্যিক।

টীকা ও তথ্যপঞ্জি

১. কবিরূপে মোহিতলাল মজুমদারের প্রথম খ্যাতি অর্জন। তার উল্লেখ করে মোহিতলাল-জীবনীকার ভবতোষ দত্ত লিখেছেন : "সাহিত্য-সমালোচক রূপে মোহিতলাল মজুমদারের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই কবি হিসাবে তিনি বাঙালি পাঠকসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯২৭-এ রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন; তাতে মোহিতলালের কবিতার পৌরুষের সপ্রশংস উল্লেখ ছিল। তার আগে মোহিতলালের স্বপন-পসারী (১৩২৮) এবং বিস্মরণী [১৩৩৩] বেরিয়েছে।" [*মোহিতলাল মজুমদার : কবি ও সমালোচক*, ভবতোষ দত্ত, পৃ. ১২৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ২০০৫। অতঃপর 'ভবতোষ দত্ত']। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্যে নবত্ব* প্রবন্ধটির [প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ] বর্তমানে বর্জিত অংশে কবি মোহিতলালের বলিষ্ঠ কবিতার কথা আছে : "... মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।"

২. মোহিতলাল কর্তৃক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র [মোহিতলালের *পত্রগুচ্ছ*, আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত, পৃ. ৯১-৯২, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯, ১৯৬৯, অতঃপর 'মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ']।

৩. *Thy Hand, Great Anarch! India : 1921-1952*, Nirod Chandra Chowdhury, p. 148, Chatto & Windry Ltd., London, 1987.

৪. ভূমিকা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [মোহিতলাল মজুমদার লিখিত *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস*-এর ভূমিকা], কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫।

৫. ভবতোষ দত্ত, পৃ. ১৩১।

৬. *স্মরণে বিস্মরণে কবি মোহিতলাল*, অশ্রুকুমার শিকদার, *দেশ*, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৯।

৭. *পিতৃপ্রসঙ্গ*, মসসিজ মজুমদার, *দেশ*, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৯।

৮. *মোহিতলাল : বিষণ্ণ পানপাত্র ও কবোষ্ণ মদিরা*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৯৬ বৈশাখ।

৯. *শরৎ-পরিচয়*, মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য-বিতান*, পৃ. ৭৯-৮১, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় বিদ্যোদয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৪। অতঃপর '*শরৎ-পরিচয়*'। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে লেখা পত্রে মোহিতলাল দাবি করেছেন, তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর কবিতায় তন্ত্রভাবনা অনুসৃত হয়েছিল : "যতদিন আমি কাব্যচর্চা করিয়াছিলাম ততদিন আমি কোন philosophy বা বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিলাম না—আমার কাব্যে যদি একটা ভাব বা চিন্তাপদ্ধতি থাকে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেখা দিয়াছে। পরে আমি বাংলার সাধনা ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু চিন্তা ও গ্রন্থপাঠ করিয়াছি। তাহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি এই দেখিয়া যে, আমি আমার কাব্যে অতিশয় অজ্ঞাতসারে বাংলার তান্ত্রিক সাধনার

কয়েকটি মূল তত্ত্ব অনুসরণ করিয়াছি। এতদিন বৈষ্ণব ভাবধারাই বাংলা কাব্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব, কেবল আমিই নূতন যুগের নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় বাংলার সেই তান্ত্রিক সাধনার একটা মূল তত্ত্বকে নূতন ভাষায় ও নূতন ছন্দে রূপ দিয়াছি।" [*মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ*, পৃ. ৮৪]।

১০. *মোহিতলাল মজুমদার*, সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা গ্রন্থভুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৩৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, এপ্রিল ১৯৯৭, অতঃপর '*বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*'।

১১. মোহিতলাল মজুমদার কর্তৃক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখিত পত্র [*মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ*, পৃ. ৯৭]।

১২. *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, পৃ. ১৪১।

১৩. ভবতোষ দত্ত, পৃ. ১৩৯।

১৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত *মোহিতলাল : বিষণ্ণ পানপাত্র ও কবোষ্ণ মদিরা* দ্রষ্টব্য।

১৫. *শরৎ-পরিচয়*, পৃ. ৮২-৮৯।

১৬. *শরৎচন্দ্র*, মোহিতলাল মজুমদার, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য গ্রন্থভুক্ত*, পৃ. ১৯৫-১৯৬, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৩ কার্ত্তিক, অতঃপর '*শরৎচন্দ্র*'।

১৭. দিলীপকুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্র, গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত *শরৎচন্দ্র* [তৃতীয় খণ্ড], পৃ. ৩৫৪, সাহিত্যসদন, কলকাতা-১২, ১৩৬৯, অতঃপর 'গোপালচন্দ্র'।

১৮. *শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা*, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, পৃ. ৭০। শিল্পীসংস্থা প্রকাশনী বিভাগ, কলকাতা-৫, ফাল্গুন ১৩৭২।

১৯. ঐ, পৃ. ৯২।

২০. *আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র*, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষ* পত্রিকা, ১৩৪৪ ফাল্গুন।

২১. শরৎচন্দ্রের বঙ্কিম-বিরোধিতার প্রতিবাদে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন : "শরৎচন্দ্রের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি সেকেলে নন, কারণ শরৎচন্দ্রও একাধিক উপন্যাসে পাপের পরাজয় দেখাতে ছাড়েন নি, এবং তাঁর কোনো কোনো নায়িকা পাপের জন্য মৃত্যুর চেয়েও কঠিন দণ্ড ভোগ করেছে।" *যাঁদের দেখেছি*, হেমেন্দ্রকুমার রায়, পৃ. ১৯৫, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৮, বৈশাখ।

২২. *আত্মস্মৃতি* [প্রথম খণ্ড], সজনীকান্ত দাস, পৃ. ২৩৩-২৩৪, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, ১৩৬১ অগ্রহায়ণ, অতঃপর '*আত্মস্মৃতি*'।

২৩. আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে রণাঙ্গনে আহ্বান করেছিলেন সজনীকান্ত দাস। সেই চিঠির দু-একটি পংক্তি : "যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণত প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন।" সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এইসব লেখকদের অন্যতম নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, 'যুবনাশ্ব' [মনীশ ঘটক], নজরুল ইসলাম প্রমুখ [*কল্লোল যুগ*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১১৬-১১৭, এম সি সরকার এণ্ড মনস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৩৯৫ আশ্বিন]। বলা বাহুল্য সজনীকান্তর কথাগুলি রবীন্দ্রনাথকে সত্যই নাড়িয়েছিল।

২৪. ঐ, পৃ. ১১৭-১১৮।

২৫. *আত্মস্মৃতি*, প. ২৪৮-২৪৯।

২৬. *অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য* নামক অমল হোমের প্রবন্ধকে সমর্থন করে শরৎচন্দ্র অমল

হোমকে চিঠি দিয়েছিলেন : "তোমার 'অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' আমি সেইদিন পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।" [*গোপালচন্দ্র*, পৃ. ২৭২]।

২৭. বাজেয়াপ্ত *পথের দাবী*-কে সমর্থন না-করে রবীন্দ্রনাথের চিঠি শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ করেছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি *সাহিত্যের রীতি ও নীতি*-তে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। ব্যাপারটি গোপন না করে ১০ ভাদ্র ১৩৩৪-এ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লেখেন : "রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছা হয়না। এমন কি ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। ... রবিবাবুর [*পথের দাবী* প্রসঙ্গে লেখা] সে চিঠি আমি ভুলতে পারিনি, কোনোদিন পারব বলে ভরসাও হয়না।" ১০ অক্টোবর ১৯২৭-এ রাধারানী দেবীকে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি একই রকম : "আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতিনীতি' পড়ে তুমি ক্ষুন্ন হয়েছে লিখেছ। তোমার মনে হয়েছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে, লেখাটা আর একবার পড়েও তো আমি খুঁজে পেলাম না। ...পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন তো একটা কাজ হয় ...। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—'পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরেজ রাজশক্তির মতো সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই ...।' ... ঠিক বলতে পারিনে, হয়তো এই কথা মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন 'সাহিত্যের রীতিনীতি' লিখি। তাতেই বোধহয় কোথাও কোনো জায়গায় একটু আধটু তীব্রতা ঝাঁঝ এসে গেছে।" [*গোপালচন্দ্র*, পৃ. ৪১৬, ৩৮৪-৩৮৫]।

২৮. *ঐতিহ্য, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা*, দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস* গ্রন্থভুক্ত, করুণা প্রকাশনী কলকাতা-৯, ১৩৭৯।

২৯. *আমার যৌবন*, বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ২৮, এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, মার্চ ১৯৮৯।

৩০. *শরৎ-পরিচয়*, পৃ. ৭২। মোহিতলালের ধারণা *বিরাজ-বৌ* লিখে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। এটি তথ্যগত ভাবে ঠিক নয়। ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার *ভারতী*-তে *বড়দিদি*-র প্রকাশ সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপ্রেমী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে [যিনি *ভারতী*-তে গল্পটি প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা নেন] সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন : "বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী, অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে এঁকে তোমরা সাহিত্যের আসরে টেনে আনতে পারবে না?" [*শরৎচন্দ্র*, গোপালচন্দ্র রায়, পৃ. ৯৪-৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩]।

৩১. *গোপালচন্দ্র*, পৃ. ১৩২। *শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী*-র সঙ্গে অন্য ভ্রমণ-রচনার পার্থক্য শরৎচন্দ্র একাধিকবার দেখিয়েছেন। এ-জাতীয় অসার রচনাকে শরৎচন্দ্র চিঠিতেও ঠুকেছেন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'য়ুরোপে তিন মাস' সম্বন্ধে *ভারতবর্ষ* পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছেন : " 'তিন মাস' যে ত্রিশ বৎসরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল। অথচ কী নীরস! কী কটু! আপনি দুঃখিত হবেন না—এইটা শুধু আমার নয়, অনেকেরই মত।" [*গোপালচন্দ্র*, পৃ. ১৩২]।

৩২. ঐ, পৃ. ১৩৩।

৩৩. ঐ, পৃ. ১৫১।

৩৪. ঐ, পৃ. ১৩৪।

৩৫. *ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র*, গিরীন্দ্রনাথ সরকার, পৃ. ১৮-১৯, ৫৭এ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা, ১৯৩৯।

৩৬. *ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র*, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, পৃ. ৯, মিত্রালয়, কলকাতা-১২, ১৩৬৫ চৈত্র।

৩৭. *শরৎচন্দ্র* [প্রথম খণ্ড], গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬।

৩৮. *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প*, রাধারানী দেবী, পৃ. ১০৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, অক্টোবর ১৯৭৬।



কবিতার শব্দরূপ নিয়ে

• • • • • •

করুণাসিন্ধু দাস

১.

সতাং মনস্তামসপ্রভাকরঃ/সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতিভাস্বত্‌সকলপ্রভাকরঃ/সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ।।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকরের শিরোভূষণ-শ্লোকে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ এমনি করে চারটি চরণে চারবার 'প্রভাকর' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সচেতনভাবে। স্বরব্যঞ্জন-সংহতিতে এক হলেও চার ক্ষেত্রেই কিছুকিঞ্চিৎ অর্থভেদ থাকায় এখানে যমক অলঙ্কার শনাক্ত করবেন সংস্কৃত আলঙ্কারিকবর্গ। আর যদি মনে হয়, সবকটিতেই প্রভাকর শব্দ একার্থ হলেও তাৎপর্যে ভেদ ঘটেছে, তাহলে এখানে লাটানুপ্রাস মানবেন তাঁরা। এসব হল **শব্দালঙ্কার** কেননা শব্দবিশেষই তার ভরসাস্থল, সমার্থক অন্য কোন শব্দ বসালেই অলঙ্কারের গিল্‌টি পড়ে প্রকট হয়ে। শব্দই কবির প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। শব্দ থাকলে আনুষঙ্গিক ভাবে অর্থ তো থাকবেই। বড় মুখ করে কেউ যতই বলুন না—**শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্‌**, অর্থাৎ শব্দ-অর্থ দুয়ে মিলে কাব্য, মুখ্য ও সিনিয়র পার্টনার যে অর্থ নয়, শব্দই, জগন্নাথের রসগঙ্গাধরে তা স্বীকার করে বলতে দেখি—রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ **শব্দঃ কাব্যম্‌**। কাব্যের এই শব্দময় তনু নির্মাণে শব্দসজ্জার নিত্যনতুন কারিগরিকে শব্দ নিয়ে অকারণ খেলা বলব কোন্‌ আক্কেলে? ধ্বনিশৃঙ্খলার সঙ্গীতময় কলস্বন ছেড়েই দিলাম, শব্দস্থাপত্যের বিন্যাসকলা থেকে চোখ-কান ফেরানো কদাচ রসিকশোভন হতে পারে না। তাতে যদি কাব্যতাত্ত্বিকমহলে স্থূল দেহাত্মবাদী বলে নিন্দা রটে তো আমরা নাচার। 'যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর' এই সমে পৌঁছানোর আগে শব্দ নিয়ে আরও এক কার্যকর কৌশল অবশ্য দেখেছি আমরা। 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।' একবার উচ্চারণে অপ্রকট জগৎপিতা এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বোঝানোর এই কবিপদ্ধতি আলঙ্কারিক অভিধায় শ্লেষ নামে পরিচিত।

অবশ্য পুরো শব্দ নয়, শব্দের ভগ্নাংশমাত্র বর্ণ/অক্ষর নিয়ে পুনরুক্তিতে যে সাধারণ অনুপ্রাস, তাও কম আকর্ষণীয় নয়। কেশঃ কাশঃস্তবককবিকাশঃ/কায়ঃ প্রকটিতকরভবিলাসঃ

শক্তিমান্‌ কবির হাতে আরোপিত অলঙ্কার নয়, কিভাবে কাব্য-শরীর হয়ে ওঠে এসব, তার কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে। যেমন, রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুলাপ হিসেবে একটি শ্লোকে দেখা যাচ্ছে, চোখ দুটি চোখ নয়, জোড়াপদ্ম; গুঞ্জা গুঞ্জা নয়, বন্ধুক ফুলের রাশি; বাঁশির শব্দ বাঁশির শব্দ নয়, ভ্রমরগুঞ্জন; কৃষ্ণ কৃষ্ণ নয়, তমালগাছের কাণ্ড—এই মর্মে অপহ্নুতি আর নিশ্চয় স্থাপনের কৌশলে বলা হল :

নেত্রে নেত্রে নহি নহি পদ্মদ্বন্দ্বং
গুঞ্জা গুঞ্জা নহি বন্ধুকালী।

বেণুর্বেণুর্নহি ভৃঙ্গাদিঘোষ ঃ
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণো নহি নহি তপিঞ্ছোয়ম্।।

প্রলাপে অবশ্য অর্থহীন শব্দাংশ অনুবর্তনই চোখে পড়ে। রূপগোস্বামী দেখাচ্ছেন :

করোতি নাদং **মুরলী রলী রলী**
ব্রজাঙ্গনাহৃন্ম**থনং থনং থনম্**
ততো বিদূনা **ভজতে জতে জতে**
হরে ভবন্তং **ললিতা লিতা লিতা**।। [উজ্জ্বলনীলমণি]

বনে বনান্তরে গিরিকন্দরে শব্দ যেন এখানে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে আংশিক আকারে। এদিকে নলদময়ন্তীর বিয়ে উপলক্ষে বাদ্যবাজনের কথায় বাদ্যযন্ত্রের sound of music সুর-তাল-লয়ও ফুটিয়ে তোলেন নৈষধীয় চরিতের কবি শ্রীহর্ষ :

তদা নিমস্বানতমাং **ঘনং ঘনং**
ননাদ তস্মিন্নতিতরাং **ততং ততম্**।
অবাপুরুচ্চৈঃ সুষিরাণি বাণিতাম্
অমানম্ আনদ্ধম্ ইয়ত্তাম্ অধ্বনীত্।। [১৫/১৬]

আর কবি পুরুষোত্তমের হাতে ধ্বনিপুনরুক্তি বলরামের মদ্যপানজনিত স্খলিতবাক উচ্চারণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে :

ভভভ্রমতি মেদিনী, লললম্বতে চন্দ্রমাঃ
কৃকৃষ্ণ ববদ দ্রুতং হহহসন্তি কিং বৃষ্ণয়ঃ।
শিশীধু মুমুমুঞ্চ মে পপপপানপাত্রাস্থিতং—।।

শব্দগুণে এমনও হতে পারে, কথোপকথনের মধ্যে দ্ব্যর্থক শব্দে দুইপক্ষ দুটি পৃথক অর্থ ধরে কথা চালাচালি করতে থাকে। উজ্জ্বলনীলমণিতে রাধাকৃষ্ণের এমনি এক বাক্‌চাতুর্যময় সংলাপ উপস্থাপন করেছেন রূপগোস্বামী। কথাটুকু এইরকম :

কৃষ্ণ—আমার তরীতে ওঠ [তরৌ]।
রাধা—গাছে [তরুতে] ওঠার শক্তি নাই [তরৌ]।
কৃষ্ণ—আমি তরণির কথা বলছি।
রাধা—সূর্যের নামে আমার আগ্রহ নাই।
কৃষ্ণ—আমি নৌ [কা] প্রসঙ্গে বলছি। [নৌ]
রাধা—আমাদের সম্মিলনের কোনভাবে কোন কথা হতে পারে না। [ন + আবয়োঃ = নাবয়োঃ]।

কথার চালাকিতে কৃষ্ণকে হার মানিয়ে রাধা অপরাজিত এখানে। বলা বাহুল্য, জেনে বুঝেই রাধা কৃষ্ণের কথার অন্য অর্থ করেছেন।

উত্তিষ্ঠারাত্ তরৌ মে তরুণি।
মম তরোঃ শক্তিরারোহণে কা।
সাক্ষাদ্ আখ্যামি মুগ্ধে তরণিম্।
ইহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে।
বার্তেয়ং নৌপ্রসঙ্গে, কথমপি

ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা
বার্তাপীতি স্মিতাস্যং জিতগিরম্
অজিতং রাধয়ারাধয়ে।।

সাহিত্যদর্পণ [দশম পরিচ্ছেদ]-এ এমনি আর একটি সংলাপ—

কে যূযং? স্থলে এব সম্প্রতি বয়ম্।
... বামা যূয়ম্, ... কীদৃঙ্ স্মরো বর্ততে
যেনাস্মাসু বিবেকশূন্যমনসঃ পুংস্বেব যোষিদ্ভ্রমঃ।।

প্রশ্ন—তোমরা কে? ক-শব্দের অর্থ জল ধরে নিয়ে শ্রোতার জবাব—এখন আমরা স্থলে আছি। কথার বাঁকা অর্থ হচ্ছে দেখে বিরক্ত প্রশ্নকর্তার মন্তব্য—তোমরা বামা অর্থাৎ উলটো পথের পথিক। চটজলদি উত্তর এল—কীরকম কামগ্রস্ত হয়ে পড়েছ হে, যে আমরা পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞানহীন দশায় আমাদের বামা অর্থাৎ স্ত্রীলোক ভেবে বসেছ?

অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় এর নাম বক্রোক্তি।

এমনও হয়, কোথাও সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসছে। তাতে শ্লেষ-অনুপ্রাসের সুযোগ নেই বটে, তবে প্রাথমিকভাবে অর্থের পুনরুক্তির শঙ্কা থেকে যায় সেখানে। অতঃপর তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, দ্বিতীয় শব্দটি অন্য কিছু বোঝাচ্ছে। এ হল পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার। যেমন,

ভুজঙ্গকুণ্ডলীব্যক্তশশিশুভ্রাংশুশীতগুঃ।
জগন্ত্যপি সদা পায়াদ্ অধ্যাচ্চেতোহরঃ শিবঃ।।

শশী, শুভ্রাংশু,- শীতগু তিনটি চাঁদের প্রতিশব্দ হলেও এখানে আলাদা আলাদা অর্থে সার্থক হয়েছে। শিব এবং হর, কিংবা, ভুজঙ্গ এবং কুণ্ডলী সম্বন্ধেও একই কথা। বাক্‌চাতুরীর এই নিদর্শন অনেককেই হয়তো কৈশোরক মস্করা মনে করিয়ে দেবে—If যদি is হয় but কিন্তু what মানে কি! সমার্থক শব্দ এমনকি একই শব্দের পৌনঃপুনিক অবস্থানকে রসহীন নিরেট গাঁথুনি ভাবার তো কারণ নেই। বাচ্য অর্থের চাইতে ব্যঞ্জনাগম্য অর্থের বেশি গুরুত্ব থাকার সুবাদে ধ্বনিকাব্যের এত যে উৎকর্ষের প্রশংসা শুনতে পাই রসিকমহলে ধ্বনিবাদীর কণ্ঠে, সেখানেও বাচ্য অর্থ ক্বচিৎ চাপা পড়ে যায় [অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য], ক্বচিৎ আবার অন্য অর্থের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে [অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য]। সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে—কদলী কদলী করভঃ করভঃ করিরাজকরঃ করিরাজকরঃ—এমনিভাবে পুনরুক্তশব্দ মূল অর্থ ছড়িয়ে অর্থের একটু ভিন্ন স্বাদ সহজেই হাজির করে দিতে পারে [তুলনীয়ঃ দ্বিতীয়কদল্যাদিশব্দাঃ পৌনরুক্ত্যভিয়া সামান্যকদল্যাদিরূপে মুখার্থে বাধিতা জাড্যাদিগুণবিশিষ্ট-কদল্যাদিরূপম্ অর্থং বোধয়ন্তি—সাহিত্যদর্পণ] যমক-লাটানুপ্রাসের চাপ ঠেলে এখানে কাব্য হাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য, এমন অভিযোগ অতএব যুক্তিসহ নয়।

২.

অতএব রঘুবংশ মহাকাব্যের নবম সর্গে প্রথম চুয়ান্নটি শ্লোকের তৃতীয় বা চতুর্থ চরণ নির্মাণে কালিদাসের মতো কবিও অকুণ্ঠভাবে ধ্বনিশৃঙ্খলা বিন্যাসের কৌশলে মনোনিবেশ করেছেন। যেমন, শমরতে অমরতেজসি পার্থিবে [৯/৪], বিতমসা তমসাসরযূতটাঃ [৯/১০], ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব [৯/৪১], মধুমন্মধুমন্মথ সন্নিভঃ [৯/৪৮], কিংবা কুমারকল্পং সুষুবে কুমারম্ [রঘু. ৫/৩৬], নির্মমে নির্মমোর্থেষু মধুরাং মধুরাকৃতিঃ [রঘু. ১৫/২৮]।

ভারবির লেখায় চোখে পড়বে পৃথুকদম্বকদম্বকরাজিতং/গ্রথিতমালতমালবনাকুলম্ [কিরাতার্জুনীয় ৫/৯] ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি, যার অনুবর্তন মাঘকবির 'নবপলাশপলাশবনং পুরঃ / স্ফুটপরাগপরাগত পঙ্কজম্ [শিশুপালবধ ৬/২] ইত্যাকার শ্লোকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে বাক্‌সজ্জার শ্রেষ্ঠ কারিগর অবশ্যই ভট্টিকবি। তাঁর লেখায় যেন শব্দের ফুলঝুরি নানা রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে ছত্রে ছত্রে—

ক. অবসিতং হসিতং প্রসিতং মুদা/
বিলসিতং লসিতং স্মরভাসিতম্। [ভট্টি ১০/৬]

খ. ন গজা নগজা দয়িতা দয়িতা/
বিগতং বিগতং ললিতং ললিতম্।
প্রমদা প্রমদা মহতা মহতা।
মরণং মরণং সময়াত্ সময়াত্॥ [ভট্টি ১৩/৯]

এমনও হয়েছে যে কোন শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ প্রথমার্ধের অবিকল অনুবর্তন—

সমিদ্ধশরণা দীপ্তা দেহে লঙ্কামতেশ্বরা।
সমিদ্ধশরণাদীপ্তা দেহেলঙ্কামতেশ্বরা ॥ [ভট্টি ১০/৭]

অবশেষে এসেছে চার চরণে একটি পঙ্‌ক্তিরই চারবার উপস্থিতি—

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতসমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতসমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতসমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতসমুদ্রঃ॥

[ভট্টি. ১০/১৯]

ভারবিও একজায়গায় [কিরাত. ১৫/৫২] বিকাশমীযুজগদীশমার্গণাঃ পঙ্‌ক্তিটির চারবার ব্যবহার করেছেন, দেখা যায়।

খেলাচ্ছলে অতঃপর এমনও হয়েছে যে কয়েকটি আবার একবার অনুলোমক্রমে আর একবার প্রতিলোমক্রমে সাজিয়ে শ্লোকনির্মাণ ঘটল। যেমন,

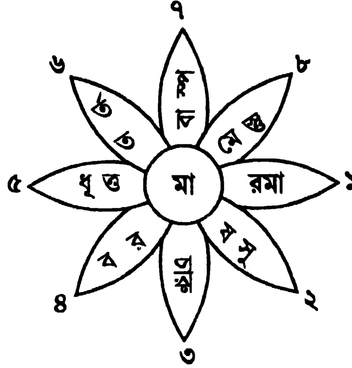
দেবাকানি নিকাবাদে বাহিকাস্ব-স্বকাহিবা।
কাকারেভভরেকাকা নিস্বভব্যব্যভস্বনি॥

[কিরাত. ১৪/২৫]

পরে মাঘকবি এক ধাপ এগিয়ে পরপর দুটি শ্লোকে এই বিন্যাস ঘটিয়েছেন যাতে তাঁর ১৯/৩৩ সংখ্যক শ্লোকটি শেষ থেকে উল্টোদিকে পড়ে এলেই ১৯/৩৪ সংখ্যক শ্লোক মেলে। সচেতন কৃত্রিমতার এ চমক কবিতার শত্রু কিনা কে বলবে?

কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা দেখতে অবশ্য চিত্র অলঙ্কারের নমুনা পরীক্ষা করাই সঙ্গত। পদ্ম, খড়্গ, মুরজ, চক্র ইত্যাদির রেখাচিত্র এঁকে সেই বরাবর অক্ষরবিন্যাস এতে করতে দেখা যায়। পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে বর্ণানাং চিত্রমুচ্যতে [সাহিত্যদর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ]। যেমন, অষ্টদল পদ্মের চিত্রে বিন্যাস করা একটি শ্লোক :

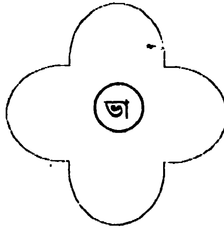
মারমা সুষমা চারুরুচা মারবধূত্তমা।
মাত্তধূর্ততমাবাসা সা বামা মে হস্তু মা রমা॥



৩, ৫, ৭ নং দলে অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে দুবার করে পাঠ আছে। কেন্দ্রে অবস্থিত [মা] যতবার দরকার ততবার যুক্ত হচ্ছে এক একটি দলের আদিতে কিংবা অন্তে।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের লেখা সারস্বতশতকম্ [১৯৬৫] নামে চিত্রকাব্যে স্বস্তিকা, শঙ্খ, ঘণ্টা পতাকা, ঘট, রথ, কঙ্কণ, পুস্তক, অক্ষমালা ইত্যাদি নানারকম চিত্রকবিতা স্থান পেয়েছে। চতুর্দল পদ্মের চিত্রে লেখা কবিতাটি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

ভারতে ভক্তিসুলভা ভালচন্দ্রজিতস্বভা।
ভাস্বদ্‌বীণাঢ্যকরভা ভারতী ভাতু হীরভা।।



কিংবা, পুস্তকচিত্রের কবিতা—

সা জয়ত্যচিদাকারা রাকাশশিশতৌজসা
সারদা ধৃতসংসারা রাসাত্মা পূর্ণচিদ্রসা।।

জ য় ত্য চি দা কা	কা শশি শ তৌ জ	
রা		সা
র দা ধৃত সংসা	সা ত্মা পূর্ণ চি দ্র	

ওপরের দুটি কবিতাতেই বর্ণের পুনরাবৃত্তিও লক্ষণীয়। প্রথমটির চার চরণেই আদি ও অন্তে

একই অক্ষর 'ভা', যা চিত্রে পদ্মের নাভিতে রেখে বারবার সেখানে ফিরে আসা হয়। দ্বিতীয় শ্লোকে 'সা' প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদি, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ। প্রথম চরণের শেষ দুটি অক্ষর [কারা] দ্বিতীয় চরণের আদিতে বিপরীতক্রমে [রাকা] বসেছে; তৃতীয় চরণের শেষ দুই অক্ষর [সারা] একইভাবে বিপরীতক্রমে চতুর্থ চরণের আদিতে [রাসা] বসেছে। এরকম শব্দবিন্যাস-বৈচিত্র্য সংস্কৃত কবিতায় প্রচুর মিলবে। ন্যায়তীর্থের লেখাতেই পাচ্ছি :

ন কবিত্বং ন বিত্তং বা ন যশো নয়শোভিতম্।
কাময়ে কামহানায় কামহং কামমাশ্রয়ে।।

গীতগোবিন্দের শব্দময় মূর্ছনা, 'কলোত্তালা পিকানাং গিরঃ' নিয়ে অতএব সঙ্কোচের বিহ্বলতা অনাবশ্যক। ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং...[১০/৩], স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং... [১০/৭], স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং [১০/৮] কি সত্যিই শ্রুতিনন্দন এবং মনোগ্রাহী নয়? কিংবা, নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্ [৪/২], মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ [২/১০], কামপি রময়তি রামাম্ [১/৪৬], বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ [৪/৮], রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং [১/১০], মধুকর-নিকরকরম্বিত- কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে [১/২৮] গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্ [১০/১৪] ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র পঙ্‌ক্তি?

শব্দেরা সজ্জিত, সরব কিংবা জোটবদ্ধ হলে কবিতার পাঠক হিসেবে আমাদের ক্রুদ্ধ হতে হবে, একথা বলা চলে না। কবিতাই শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কবি ছাড়া কে তা বেশি জানেন? স্থূল, দৃষ্টিকটু সাজ না হলেই হল। সার্থক কবিতায় শব্দরূপ কতদূর যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বলা বাহুল্য। তবু দেখা যাক জীবনানন্দের কবিতায় আর একবার।

ক. সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়।/
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়/
শূন্য মনে হয়/শূন্য মনে হয়। [বোধ, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

খ. নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী
[জনান্তিকে, সাতটি তারার তিমির]

গ. শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শেষে/
কোথায় সে চলে গেল তবে।
...শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি...
[মহাজিজ্ঞাসা]

ঘ. আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে
[নির্জন স্বাক্ষর, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

ঙ. একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা
[১৩৩৩, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

চ. সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে
[অস্তচাঁদে, ঝরাপালক]

'এ কী সুন্দর শোভা'। অর্থ যদি নাই বুঝি, শব্দ দেখেশুনেই বলা যায় অনায়াসে। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের চরণ তো সবখানে পাতা।

ছ. হাতের কাছে কোলের কাছে/যা আছে সেই অনেক আছে।

জ. দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী/তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয়হরণী।

ঝ. অভয় চরণ শরণ করে/বাহির হয়ে যা রে।

ঞ. মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেব না।

ট. তুমি যে সকলসহা সকলবহা মাতার মাতা।

ঠ. আমরা পথে পথে যাব সারে সারে।

ড. আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।

'শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা' বলে এমন সব বাঙ্ময় মূর্তি থেকে চোখ ফেরাবেন কেউ? আর একটি প্রসঙ্গ।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী/
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বলধরণি/জনকজননিজনন/
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল/অনিলবিকম্পিতশ্যামল অঞ্চল/...

কবিতাটি অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল/শুভ্রতুষারকিরীটিনী, কোন ভাষার রচনা বললে প্রশ্নকর্তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত স্বাভাবিক। কিন্তু একাধারে এটি যে সংস্কৃত ও বাংলা ইত্যাদি ভাষায় লেখা তা বলাও স্বাভাবিক। সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে একে ভাষাসম অলঙ্কার বলা হয়েছে। কেননা, একই ধ্বনিপরম্পরায় এতে নানা ভাষার ঐক্যরূপ ধরা পড়ে।

শব্দৈরেকবিধৈরেব ভাষাসু বিবিধাস্বপি।
বাক্যং যত্র ভবেৎ সোয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে।।

[সাহিত্যদর্পণ, দশম]

বিশ্বনাথ কবিরাজ উদাহরণ হিসেবে এখানে স্বরচিত যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—মঞ্জুলমণিমঞ্জীরে কলগম্ভীরে বিহার সরসীতীরে/বিরসাসি কেলিকীরে কিমালি। ধীরে চ গন্ধসারসমীরে।। তা তাঁর নিজের কথায় 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-শৌরসেনী-প্রাচ্যাবন্তী-নাগরাপভ্রংশেষু একবিধ এব।' স্থানীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও নানা প্রাকৃত, সংস্কৃত, অপভ্রংশের মধ্যে একই শব্দরূপ খুঁজে সর্বভাষামান্য কবিতা নির্মাণ চমৎকার উদ্যোগ সন্দেহ নেই। শব্দ নিয়ে খেলা বলে তাকে তুচ্ছ করা অযৌক্তিক। কবিতা লিখতে বসে ইডিয়ামই যদি খুঁজে না পাই, বলতেই হবে—নোদিতা কবিতা লোকে। অর্থাৎ,—'আমার লাগে নাই সে সুর আমার/বাঁধে নাই সে কথা/শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা।' নাট্যশাস্ত্রে ভরতমুনি এমনি এমনি তো বলেননি—

বাঙ্ময়ানীহ শাস্ত্রাণি বাঙ্‌নিষ্ঠানি তথৈব চ।
তস্মাদ্ বাচঃ পরং নাস্তি, বাগ্‌হি সর্বস্য কারণম্।।

[নাট্যশাস্ত্র ১৪/৩]

নট, নাট্যকার, কবি সবাইকে তাঁর পরামর্শ—বাচি যত্নস্তু কর্তব্যঃ [১৪/২]। শব্দ ব্যবহারে যত্নশীল হতেই হবে। নাটকে অবশ্যই বেশি সতর্কতা দরকার। ভরতের মতে— বিকৃতৈস্তু শব্দৈর্যুক্তো ন ভান্তি ললিতা ভরতপ্রয়োগাঃ [নাট্যশাস্ত্র ১৬/১২৮] সাহিত্যদর্পণে [নবম] বিশ্বনাথ সেকথার সূত্রে এমনকী রৌদ্ররসের নাটকেও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার নিষেধ করেছেন [নাটকাদৌ রৌদ্রেপি অভিনয়প্রতিকূলত্বেন ন দীর্ঘসমাসাদয়ঃ]। কাব্যকবিতায় সহজ সরল স্বভাবোক্তি কিন্তু সবার না-

পসন্দ। বরং ভামহ থেকে শুরু করে অনেকেই বলেছেন—সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ। এ হল বৈদগ্ধ্যভঙ্গি ভণিতির আদিরূপ।

তাই বলে বাক্‌সর্বস্ব ধাঁধা [প্রহেলিকা] সম্বন্ধে কোন উৎসাহ প্রত্যাশা করা যাবে না সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রীর কাছে। বিশ্বনাথের মন্তব্য—রসবোধে প্রহেলিকার কোন ভূমিকা নেই, সুতরাং তা অলঙ্কারই নয়। [রসস্য পরিপন্থিত্বান্নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা] যদিচ শব্দাংশ উহ্য রেখে, বাড়তি শব্দাংশ জুড়ে, ক্রিয়াপদ লুকিয়ে নানা কৌশলে প্রহেলিকা তৈরি হয়। একথা তিনি মানেন এবং এতে উক্তিবৈচিত্র্য ঘটে তাও তিনি জানেন [উক্তিবৈচিত্র্যমাত্রং সা চ্যুতদত্তাক্ষরাদিকা]। যেমন,

কূজন্তি কোকিলাঃ সালে/যৌবনে ফুল্লমম্বুজম্।
কিং করোতু কুরঙ্গাক্ষী/বদনেন নিপীড়িতা।।

শুনলে মনে হবে, কোকিল সালগাছে ডাকছে, যৌবনে পদ্ম ফুটেছে, এক সুন্দরী মহিলার মুখে ব্যথা হয়েছে! আসলে, সালে নয় রসালে, যৌবনে নয় বনে, বদনেন নয় মদনেন একথা জানলেই ধাঁধার সমাধান। তখন আমের মুকুল, কোকিলের ডাক, পদ্মবনে পদ্ম, রমণীর কামার্তি সব জলবত্ তরলং বোধবুদ্ধির বিষয়।

কিংবা, পাণ্ডবানাং সভামধ্যে দুর্যোধন উপাগতঃ।
তস্মৈ গাং চ হিরণ্যং চ সর্বাণ্যাভরণানি চ।।

পাণ্ডবসভায় দুর্যোধনের উপস্থিতি এবং তার হাতে গো, হিরণ্য, অলঙ্কার সম্প্রদানের খবর জেনে যে কোন পাঠকের ঘাবড়ে যাওয়ার কথা। আসলে, সভামধ্যে অদুঃ যোহ্‌ধন উপাগতঃ এইভাবে সভায় এক নির্ধনের উপস্থিতি তাকে ধনদৌলত দেওয়ার তাৎপর্যে সমাধান মিলবে। সাধারণত ধাঁধার প্রতিপাদ্য বিষয় নিশ্চয় তুচ্ছ। তবু শুধু কথার কথা বলে কবিতার রাজ্যে তার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি না হলেই ছিল ভাল। এরপর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাছাই করতে গেলে অনর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল এবং nonsense rhyme -এর সম্ভার সামনে থাকলে রসিক শাস্ত্রীকে বোধ করি পুনর্বিবেচনায় বসতেই হবে। 'শুনছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে' এমন শত শত বাক্যমাণিক্য হাতে পেলে রসিক-অরসিকের বর্ণভেদ বেশিক্ষণ জারি থাকার কথা নয়।

❑

সুকুমার রায় : একশ বছর পরের উদ্দেশে

• • • • • •

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

ছোটবেলার একটা অভিজ্ঞতার কথা হয়তো অনেকেরই অল্পবিস্তর মনে আছে। বহিরাগতকে খুশি করার জন্য, মা-বাবার আগ্রহে, ডাকা হয়েছে আমাদের; আর অস্বস্তির কুণ্ঠা ঝেড়ে মনে করতে হচ্ছে বিভিন্ন ছড়া বা কবিতার লাইন। পিছন ফিরে তাকালে বয়স্কের দলও বোধহয় বাল্যকালের ভাণ্ডার থেকে সেই লাজুক স্মৃতির টুক্‌রোগুলি হাতড়িয়ে খুঁজে পাবেন।

আর-একটু আঁতিপাতি করে খুঁজলেই মনে পড়বে যে, হাত-পা নেড়ে, মাথা দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে আওড়ানো সেই কবিতাগুলির প্রায় সবই অনিবার্যভাবে হয়ত রবীন্দ্রনাথের, নয়তো সুকুমার রায়ের লেখা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তো নতুন করে বলার কিছু নেই; কিন্তু 'আবোল তাবোল' ও 'খাই খাই'-এর ছড়াগুলির, বা নির্জন দুপুরে গো-গ্রাসে-গেলা 'হ য ব র ল'র কাহিনী বা 'পাগলা দাশু'র গল্পগুলির সঙ্গে, স্কুলে অভিনীত 'অবাক জলপান' বা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটিকার সঙ্গে, এমন কি, আর-একটু বড় হয়ে 'চলচিত্ত-চঞ্চরি' নাটকের সঙ্গে আমাদের যেমন আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল ও আছে, এদের রচয়িতাকে যেন আমরা, সাধারণ বাঙালি পাঠক তেমন করে জানি না।

সুকুমার প্রাথমিকভাবে কিশোরদের লেখক। অথচ বহুক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় একটা অন্য মাত্রা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, ছড়ায়-নাটকে-আজগুবি কাহিনীতে, বাচ্চাদের জন্য; যা লিখেছিলেন তিনি, তা আসলে কৌতুকী আবরণের উপহার,—বড়দের জন্যও কিছু লুকোনো কথা অন্তর্নিহিত রয়ে গেল। 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান'।

আসলে লেখক হিসাবে তাঁর যা ভূমিকা বা স্থান, তা যেন বৃহত্তরভাবে একটি রূপকের সন্ধান দেয় আমাদের। তাঁর 'চলচিত্ত চঞ্চরি' বা অন্যান্য লেখা পড়ে মাঝে-মাঝে আমাদের মনে হয়, এই জগৎটাই কি এক অর্থে চিরকিশোরদের? যাবতীয় বয়স্ক আচরণের ভিতরে চিরন্তন কিশোর-মনটি কি লুকিয়ে রয়েছে? যাকে সত্য অর্থে বালক বলে জানছি, সেই ভবদুলালই হয়তো এই রহস্যময় তথ্যটি ফাঁস করে দিয়েছে। বয়স্কের মুখোশ টেনে খুলে দিয়ে সে-ই হয়তো বার করে এনেছে তথাকথিত বড়দের অন্তর্নিহিত কিশোর-চরিত্রটিকে,—যা একই সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক আক্রমণাত্মক অথচ ভিতরে-ভিতরে অদূরদ্রষ্টা। তখন, এই কিশোর সমাজের মধ্যে একমাত্র বয়স্ক লোক বলে মনে হয় স্রষ্টাকে, শিল্পী ও দ্রষ্টা সুকুমার রায়কে। তিনি যেন উপর থেকে চারপাশের মানুষজনের কুস্তি করা ছায়ার সঙ্গে অমূলক ঝগড়া, হাস্যকর অসঙ্গতি ও বালসুলভ দেখানোপনা দেখে বয়স্কের মতো মজা পেয়েছেন।

ছোটদের ঝগড়া ছোটদের কাছে মজার আদপেই নয়। সম্পৃক্ত নন বলে, ওপর থেকে তাকে দেখে মজা পান অভিভাবক। স্থানগত দূরত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই এর কারণ। 'আবোল তাবোল'-এর শেষ ছড়াটি লক্ষ করুন। এটির শেষদিকে বিদায়ের বিষণ্ণ সুর বেজে উঠেছে। নইলে, জাগতিক বিশ্বের জীবনযাত্রায় যেটুকু অসঙ্গতি ও বাড়াবাড়ি, একটু দূর থেকে দেখে কবি তাদের নিয়েই

কৌতুক করেছেন। কারণ কে-না জানে, হাস্যরসের উপাদান ওই দুটি অসঙ্গতি ও অতিরেক; দূর থেকে না দেখলে যা অনুধাবন করা যায় না। এবং এই কারণেই হাস্যরসের মধ্যে বিস্ময়, মনের প্রাজ্ঞতা ও বিচারবোধ লুকিয়ে থাকে। এই ক্ষমতা থাকে বলে মানুষই হাসে, জন্তু হাসতে পারে না। 'আবোল-তাবোল'-এর শেষ কবিতায় 'মেঘমুলুকে' উঠে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সত্যকার বয়স্কের মতই ঈষৎ স্নেহে এই জগতের কর্মকাণ্ডকে দেখছেন লেখক : "মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত"।

বয়স্ক অথচ নবীন, প্রাজ্ঞ অথচ কৌতুকে পূর্ণ মনের অধিকারী এই মানুষটির সংক্ষিপ্ত জীবনী এইরকম : সুকুমার রায়ের প্রপিতামহ লোকনাথ রায়। মৈমনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রাম এঁদের আদি বাসস্থান। লোকনাথের পুত্র কালীনাথ সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; মুন্‌শী শ্যামসুন্দর নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় কামদারঞ্জনকে দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী দত্তক নিয়ে তাঁর নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর। এঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সারদারঞ্জন ও তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন বিখ্যাত অধ্যাপক ও ক্রীড়াবিদ্। চতুর্থ কুলদারঞ্জন শিশুসাহিত্যিক ও ফোটো আর্টিস্ট। ছোটভাই প্রমদারঞ্জন বনবিভাগের আধিকাবিক। 'বনের খবর' এঁর বিখ্যাত বই। এঁর কন্যা লীলা মজুমদার আমাদের প্রিয় লেখিকা।

উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ সন্তান কন্যা, সুখলতা। এঁর পরই সুকুমার। অন্য দুই বোন পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। 'ছোটবেলার দিনগুলি'র লেখিকা পুণ্যলতার দুই কন্যা শিশুসাহিত্যিক নলিনী দাশ ও শিক্ষাবিদ্ কল্যাণী কার্লেকার। সুকুমারের দুইভাই সুবিনয় ও সুবিমলও 'সন্দেশ'-এর পাতায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুকুমারের পুত্র সত্যজিৎ রায়।

বোঝাই যাচ্ছে, ঠাকুরবাড়ি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোন পরিবারকেই শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে এই রায়চৌধুরী পরিবারের মতো ব্যাপকভাবে ও সার্থকভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি।

সুকুমারও তাঁর বহুমুখী মনটি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। লেখক, চিত্রী, ছাপাখানা ও ছবি তোলার বিজ্ঞানে অগ্রদূত উপেন্দ্রকিশোর যে-পরিবারের কর্তা, সেখানে মনের দরজা ছোটবেলা থেকেই খুলে যায়। সৃষ্টির আনন্দে ও চিন্তায় বাড়িটা যেন সর্বদা হাসত।

এই আনন্দ বা হাসিই বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল সুকুমারের রচনায়। মানুষের ব্যক্তিত্বের ও সমাজের অসঙ্গতি নিয়ে তো শ্লেষমিশ্রিত ব্যঙ্গের ছড়াও রচিত হতে পারত, যেমন হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতায় বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। কিন্তু সুকুমার-সাহিত্যে তার থেকে যে নির্মল কৌতুকের জন্ম হল, তার মূল কারণ বাড়ির ওই আবহাওয়া।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, কেমন করে বালক সুকুমার উপেন্দ্রকিশোরের সংগ্রহজাত জীবজন্তু বিষয়ক প্রকাণ্ড বই থেকে 'ভবন্দোলা'র থপ্‌থপিয়ে চলার 'মন্তুপাইন'-এর সরু ও লম্বা গলার গিঁট পাকিয়ে রাখার বিচিত্র গল্প ভাইবোনদের বলতেন। 'আবোল তাবোল' ও 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'র অদ্ভুতুড়ে প্রাণীদের জন্মরহস্য সম্ভবত এখানেই। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্য দর্শন; সেকথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

আবার বিকেলবেলায় ছাদে বিভিন্ন মানুষ ও জন্তুর বিচিত্র মুখভঙ্গি করে, মজার ছড়া বেঁধে সুকুমার ছেলেবেলায় অভ্যাগতদের আনন্দ দিতেন। তখন নিশ্চয় কেউ কল্পনা করেন নি যে, মানুষের চরিত্রগত মুদ্রাদোষই পরবর্তী কালে অন্য রূপে, সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরে নাটক রচনার পটভূমি তৈরি করবে।

ছোটবেলায় মসুয়ার দেশের বাড়িতে কসাইয়ের রক্তমাখা হাত ও ছুরি দেখে তো ভাই-বোনেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ছোট্ট সুকুমার তখন সবাইকে আগলে বুক টান করে দাঁড়িয়েছিল। শিশু-বয়সের সেই সাহস তাঁর চরিত্রসঙ্গী ছিল। মনে রাখতে হবে যাবতীয় কৌতুকের পিছনে ছিল ওই

চারিত্র্য। তা যদি না থাকত, তবে তার লেখার হাসি ফাজলামিতে পরিণত হত। তাঁর লেখার হাস্যরসও যে আন্তরিক নির্মলতায় ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অগভীর ঠাট্টার মতো এলিয়ে যায় না, তা ওই চারিত্র্যের জন্য।

প্রথমে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ও পরে শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়ি ছেড়ে রায়চৌধুরী পরিবার ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যান, এবং এখানেই 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' ভারতবিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই সময়েই, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, 'ননসেন্স ক্লাব' ও তার মুখপত্র 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'র জন্ম।

ননসেন্স ক্লাবে, ব্রাহ্মসমাজের তরুণ মহলে বা আত্মীয় পরিজনের মধ্যে সুকুমার ছিলেন কেন্দ্রমণি। পুণ্যলতা চক্রবর্তী বলেছেন 'ছোটবেলা থেকেই দাদা যেমন আমাদের খেলাধূলা সবকিছুরই পাণ্ডা ছিল, তেমনি বন্ধুবান্ধব আর সহপাঠীদের মধ্যেও সে সর্দার হল।...তাকে সবাই ভালবাসত, প্রাণ খুলে তার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করত, কিন্তু তার সামনে দুষ্টুমি করতে কেউ সাহস পেত না।'

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে ডাবল অনার্স নিয়ে পাশ করার পর গুরুপ্রসাদ বৃত্তি পেয়ে সুকুমার রায় আলোকচিত্র ও ছাপাখানার প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯১১ সনের অক্টোবরে বিলাত যান ও ইংল্যাণ্ডের 'এল. সি. সি. স্কুল অব্ ফোটো-এনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি'তে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৩ সনে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৪ সনে ১০০ গড়পার রোডের নতুন বাড়িতে 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স' সপরিবারে উঠে আসেন। ১৯১৫ সনে ৫২ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর মারা যান। 'সন্দেশ'-এর সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব পড়ে সুকুমারের উপর। এর কিছু দিন পর 'ননসেন্স ক্লাব'-এর উত্তরসাধনে 'সান্‌ডে ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সনে পুত্র সত্যজিতের জন্মের কিছুদিন পর সুকুমার কালাজ্বরে আক্রান্ত হন ও আড়াই বছর রোগ ভোগের পর ১৯২৩ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

সুকুমার রায়ের রচনায় অদ্ভুত আচরণের মানুষ ও অদ্ভুতুড়ে প্রাণীদের লক্ষ করা যায়, তারা আসলে কারা? শুধুই কি কৌতুকের প্রয়োজনে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে সুকুমার-সাহিত্যে?

সাধারণভাবে মানুষের আচরণে বিভিন্ন গুণের ও বৃত্তির সুসমঞ্জস ভারসাম্য ও সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। যদি এর মধ্যে কোনটির বাড়াবাড়ি ঘটে, তখন সেই মানুষের আচরণে আমরা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাই। ব্যঙ্গচিত্রী এই অতিরেকটুকুকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করেন। এইভাবেই কার্টুনের জগতে চেম্বারলেনের ছাতা, দ্যগলের নাক বা স্টালিনের পাইপের অস্বাভাবিক আয়তনকে লক্ষ করি আমরা।

ব্যঙ্গচিত্রীর হাতে যেখানে তুলি, ব্যঙ্গছড়াদারের হাতে সেখানে কলম। মানুষের ওই শারীরিক ও মানসিক অতিরেকটুকুকে নিয়ে কলমের সাহায্যে তিনি এবার দুটি জগৎ নির্মাণ করেন। এক, চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত রেখেই শুধুমাত্র অতিরেকটুকুকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে সাধারণ হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং এভাবেই 'গানের গুঁতো'র ভীষ্মলোচন শর্মা বা 'লড়াই ক্ষ্যাপা'র পাগলা জগাই বা 'কাতুকুতু বুড়ো' বা 'গোঁফ চুরি'র হেড আপিসের বড়বাবুর সৃষ্টি হয়।

এবং দুই, কবি যখন উদ্ভট মনের মানবব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতার অংশটিকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করে নিয়ে, তাকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রাণ দেন। তখন আর ওই পৃথকীকৃত অস্তিত্বকে কোন স্বাভাবিক মনুষ্য-চেহারায় বা মনুষ্য-রূপের মধ্যে ধরা যায় না। তখনই সৃষ্টি হয় 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' বা 'রাম গরুড়ের ছানা' বা 'কুমড়ো পটাশ' বা 'গোমরা থেরিয়াম' বা 'হ্যাংলাথেরিয়াম' বা 'ল্যাগাবার্নিস'-এর দল। অর্থাৎ মূলে যা ছিল মনুষ্য স্বভাবের বা আচরণের অতিরেক, পরবর্তী ২য় স্তরে তারাই হয়ে দাঁড়াল সৃষ্টিছাড়া মানুষে। এবং আরও পরে ৩য় স্তরে মনুষ্যেতর অদ্ভুতুড়ে

প্রাণীতে পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র সঙ্গে পরিবর্তনের ওই প্রথম স্তরের এবং 'সে'র বিভিন্ন ছবি ও লেখার সঙ্গে পরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। মূলত তিনটি স্তরই একই বিন্দুতে অবস্থিত। প্রথম স্তরের অস্বাভাবিকতা আমরা নজর করি না বলেই পরবর্তী স্তরদুটির আয়োজন।

এবং এইখানেই অ্যাবসার্ড দর্শন ও রচনার সঙ্গে সুকুমার-সাহিত্যের আপাত যোগ। এই নির্বোধ, সন্তুষ্ট, চেতনাহীন পৃথিবীর বিকট রূপকে অ্যাবসার্ড শিল্পে বিকটতর করে দেখিয়ে পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা চলে, খানিকটা শক্-থেরাপির মতো। তখন সেই বিকটতর অংশকে অ্যাবসার্ড মনে হলেও, মূলত তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। ব্রহ্মচেতনায় বিশ্বস্ত আস্তিক সুকুমার রায় সেই অর্থে কখনোই নীট্‌শে কথিত জরথুষ্ট্রর মতো জাগতিক বৃত্তকে ঈশ্বরশূন্য বলে ভাবতে পারেন না। ফলে একটা স্তর পর্যন্ত পরিপার্শ্বকে উদ্দেশ্যহীন, অসঙ্গতির শিকার হিসাবে দেখলেও সুকুমারের মধ্যে জীবনের কেন্দ্রহীনতার কোনো ছাপ পড়ে নি।

কিন্তু একেবারেই কি পড়ে নি? শুধুই কি পারিপার্শ্বিক অসঙ্গতি ও ওইরূপ শিল্পরসের আপাত কৌতুককর মেজাজের জন্য সুকুমার-সাহিত্যের সঙ্গে অ্যাবসার্ডের মিল খুঁজে বেড়াতে হবে?

আমরা জানি, একটি বৃত্ত-পরিধির সমস্ত অংশই কেন্দ্র থেকে সমদূরত্বসম্পন্ন। ফলে কেন্দ্র যদি না থাকে, তবে একাংশের সঙ্গে অন্যাংশের কোন সম্বন্ধই থাকে না। সেইরূপ জীবনবৃত্তের যদি কেন্দ্র [একে লক্ষ্য বা ঈশ্বর রূপেও কল্পনা করা যায়] না থাকে, তবে আমাদের জীবন হয়ে পড়ে পরম্পরা-বিহীন, সূত্রহীন, স্খলিত। তখন না-থাকে কোন লক্ষ্য, না-গড়ে ওঠে একের সঙ্গে অন্যের কোন সম্বন্ধ,—কাউকেই আর সনাক্ত করা যায় না।

বাগাড়ম্বর না করে এবার 'হ য ব র ল' থেকে দুটি অংশ সাজিয়ে দেওয়া যাক।

এক. "কি মুশকিল! ছিল রুমাল হয়ে গেল একটা বেড়াল।" অমনি বেড়ালটা বলে উঠল "মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এতো হামেশাই হচ্ছে।" আমি খানিক ভেবে বললাম, "তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।" বেড়াল বলল "রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার"। অর্থাৎ কারুরই কোন স্থির সনাক্তকরণ ঘটছে না, সত্যি-সত্যি কেউই কিছু নয়।

দুই. 'কে যেন ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল "সাত দুগুণে কত হয়?" আমি বললাম "সাত দুগুণে চোদ্দ"। কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল "হয় নি, হয় নি, ফেল।" আমার ভয়নক রাগ হল। বললাম "নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ"। কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেন্সিল মুখে দিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর বলল "সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল। আমি বললাম "তবে যে বলেছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?" কাক বলল "তুমি যখন বলছিলে, তখনও পুরো চোদ্দ হয় নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই"।'

কৌতুকের কথা বাদ দিলে, এই কাহিনী-অংশের ভাবনাপ্রবাহের প্রতিটি স্তরে অসঙ্গতি [এরিক র‍্যাবকিন যাকে 'Ground rule' বলতে চান, তার অস্বীকৃতি] প্রত্যাশার জগৎ থেকে আমাদের ক্রমাগত দূরে ঠেলে দিচ্ছে। 'সাত দুগুণে চোদ্দ'র Ground rule তখন বৈপরীত্যের মতো হাজির থেকে অ্যাবসার্ডের উদ্দেশ্যকেই স্পষ্ট করে এবং এর কোন স্পষ্ট রূপকার্য বা সোজাসুজি আভ্যন্তর তাৎপর্য মেলে না। তখন শিল্পে সম্পাদিত 'The Dictionary of World Literary Terms'-এ

'অ্যাবসার্ড' সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল, তা মনে পড়ে যায় : 'In an absurd world without belief there are no ethical standard, no moral judgement, no perceptible or valid motives; one thing or one action is as good as another."

কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করা উদ্ধৃতাংশে দেখেছি যে সময়ের সামান্যতম হেরফেরে নিশ্চিত 'চোদ্দ' হয়ে যেতে পারে 'তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই' বা 'চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই'। এই ঘটনাটি কি প্রশ্ন তুলছে না, মানবজীবনের তাৎক্ষণিক জীবনযাপন সম্বন্ধে? এই মুহূর্তের আমি, আর কিছুক্ষণ পরের আমি কি একই লোক? এমন কোন স্থির উদ্দেশ্য বা নিশ্চিত বিশ্বাস কি আমার জীবনে আছে,—যা-কিনা জীবনযাপনের প্রতিটি সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টার সমবায়কে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? অর্থাৎ জীবনের প্রতি মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ?

আত্মজিজ্ঞাসার ও চারপাশের মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের পর, হতাশ, আমাদের মনে হয়; না, পারে না। আমাদের এই জীবনটাই যে এক অর্থে 'হ য ব র ল' হয়ে গেছে, তা ভেতরে-ভেতরে তখন আমরা টের পেতে থাকি।

শুধুমাত্র অ্যাবসার্ড অবশ্য নয়, সুকুমার-সাহিত্যে ফ্যানটাসির কল্পনা ননসেন্সের উদ্দাম মজা, রূপকের রহস্য, মানবচরিত্র ও সমাজের অসঙ্গতি ও অতিরেক জাত-সচেতন কৌতুক সবকিছুই প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু কি জীবনে, কি শিল্পে যা তাঁর সর্বাপেক্ষা অসহ্য ছিল, তা হল ভণ্ডামি। কবিতায়, কাহিনীতে, নাটকে সর্বত্র তিনি অন্যায়ের সাধুবেশী মুখোশকে টেনে খুলে দিয়েছেন। নির্ভেজাল ভালমানুষের মতো লেখক যখন সমাজের ও ব্যক্তি চরিত্রের যাবতীয় অসঙ্গতি ও অতিরেকগুলি প্রকাশ করে দিয়েছেন, তখন কৌতুকে অবিন্যস্ত হওয়ার মুহূর্তেও সতর্ক পাঠক ধরতে পারেন যে পাঠক নিজেও অনেকখানি ধরা পড়ে গেলেন এই উন্মোচনের মাধ্যমে। অথচ এই মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য সুকুমারকে একবারও তাঁর ক্রুদ্ধ মুখটি দেখাতে হয়নি। শিল্প হিসাবে এখানেই তারা বেঁচে গেছে ও আজও বেঁচে আছে।

নাটকের কাহিনীতে বিবদমান প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বের মুহূর্তে যে বিস্ফোরণটি ঘটছে, সেটি রাগের নয়, কৌতুকের, অট্টহাসির। এই বিস্ফোরণটি যে সব থেকে সার্থকভাবে ঘটিয়েছে সে 'চলচিত্তচঞ্চরি'র ভবদুলাল। ভবদুলাল আসলে সুকুমার রায়ের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিরই অন্য নাম।

'চলচ্চিত্তচঞ্চরি', 'শব্দকল্পদ্রুম' ও অন্যত্র দেখি আন্তরিক শূন্যতাকে কীভাবে গালভরা শব্দের বিকটতায় ঢেকে রাখি আমরা। ভবদুলালের আপাত-নিরীহ প্রশ্নের খোঁচায় সেই ভাবের শূন্য বেলুনটি ফেটে গেছে। যেকোন প্রকার ভূমিহীন ভূমাকল্পনারই তিনি ছিলেন বিপক্ষে। 'কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়' এই জরুরি তথ্যটি কখনো ভোলেন নি তিনি, ভুলতে দেননি আমাদেরও। 'চলচিত্তচঞ্চরি' নাটকের বিবদমান, বয়স্ক দুই পক্ষের ফাঁকি ও উন্মার্গগামী চিন্তা ও হাস্যকর প্রচেষ্টার মধ্যখানে এইভাবেই তিনি অসাধারণভাবে বসিয়ে দিয়েছেন 'আলাভোলা বাবাজীর চেলা' ভবদুলালকে। কারণ ছেলেমানুষী ও যাবতীয় আপাত-নিরীহ ঐহিক প্রশ্নমুখর বোকামির আড়ালে সেই তো সার্থক তৃতীয় পক্ষ ঃ সুকুমার রায়ের একক ও স্বতন্ত্র চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি। যাবতীয় সম্পৃক্ত ব্যস্ততার মধ্যেও যে খুঁজে পায় অসঙ্গতিকে, ফাঁক ও ফাঁকিকে।

আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, 'গোরা'র অসঙ্গতিকে যদি সুকুমার শিল্পায়িত করতেন, তবে তারও রস হত কৌতুকের। গোরার অন্বেষণজনিত প্রত্যাশা ও তারপর ভুল ঠিকানায় পৌঁছনোর অপচয়-জনিত হতাশার জন্য যে দুঃখবোধ হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরকার অসঙ্গতি সম্বন্ধে প্রথম থেকেই পাঠককে সচেতন করলে তা হত না, জন্মাত কৌতুক।

প্রাথমিক প্রয়োজনের ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে ঘোর ইনটেলেকচুয়াল সাজলে যে কী-ভীষণ বিপদ হতে পারে, 'আবোল তাবোল'-এর 'কি মুশকিল' কবিতাটিতেও তার পরিচয় পাই। পাঠে-মত্ত লোকটি যখন ষাঁড়ে তাড়া করার প্রতিরোধ পন্থা খুঁজছে কেতাবের আড়ালে, ছবিতে দেখছি যে ক্রুদ্ধ ষাঁড় ততক্ষণে ঠিক তার পিছনেই উপস্থিত।

এই ব্যাপারটিকেই 'অবাক জলপান' নাটিকায় অন্যভাবে ধরা হয়েছে। তৃষ্ণার্ত পথিকের জল চাওয়ার মতো সামান্য ইচ্ছাকে যখন কেউ ব্যঞ্জনার্থে, কেউ বিজ্ঞানের পরিভাষায়, কেউ বুৎপত্তিগত অর্থে বিশ্লেষণে মত্ত, তখনও আসলে ওই প্রাথমিক প্রয়োজনটিকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর একটা কথা। ঠাণ্ডা দর্শন বা তত্ত্বের তর্জনী ধরে শিল্প রচিত হয় না, বরং প্রাণবন্ত শিল্পকে ধরে বেঁধে আমরাই বিভিন্ন তক্‌মা লাগিয়ে দিই। বিশেষত সুকুমার রায়ের চরিত্রের স্বভাবে-নির্ভার শিল্পস্বভাবকে 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তে'র কাঁটাতারে বাঁধলে 'সবে না, সবে না, সবে না'। তাকে চিনতে গিয়ে বুঝতে গিয়ে কষ্টকল্পনার অস্বস্তিকর মুকুট পরিয়ে যেন না দিই আমরা। ওইভাবে কি একশ বছরের দামাল ও প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত ও তেজী, সরল ও কৌতুকে পূর্ণ নিষ্পাপ অথচ ঘোরতর রহস্যময় অমর বালকটিকে বাঁধা যায়? এতটা পথ ছুটে এসেও গা-ঝাড়া দিয়ে, কালের শিকল খুলে, সে তখনই ছুটে পালাতে চায় ১০০ বছর পরের উদ্দেশে।



রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাণী বিচার

• • • • • •

সুরেন মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

সর্বশিল্পের অধিগম্য অধরা মাধুরীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ছন্দবন্ধনে ধরতে যত্নবান হয়েছিলেন। গান তাঁর হৃদয় ও মনের এক অবিমিশ্র ফসল। অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সুখ, দুঃখ, বেদনা নানা বৈচিত্র ও রসাস্বাদে সম্পৃক্ত রবীন্দ্রনাথের মন গানের মধ্য দিয়েই বারবার মুক্তি খুঁজেছে। আর কবিত্বই যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মুখ্য প্রেরণা, তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের হীরকদ্যুতি। গীতবিতানের গানগুলি শুধু সঙ্গীত হিসাবেই অতুলনীয় নয়, কবিতা হিসাবেও তুলনাহীন। কেন কবিতা পাঠকের কাছে গীতবিতান গ্রহণযোগ্য, এই প্রসঙ্গে গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্য এই সংস্করণে ভাবের অনুসঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজান হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।" প্রকৃতপক্ষে গানের বাণীই সুর তাল ছন্দ সমন্বিত হয়ে আভিধানিক অর্থ পরিহার করে এক অনির্বচনীয় রসলোকে নিয়ে যায়। গানে কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"কথাকে সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দি গানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুর সংযোগ গৌণ। এই সকল কারণে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা গান।" ["ছন্দ"—বাংলা শব্দ ও ছন্দ]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন অন্যান্য রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরাও, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন—'গানের কাব্যাংশ বাংলা গানে উপেক্ষিত নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম ব্যঞ্জনা হচ্ছে গানের কথার সঙ্গে গানের সুরের অনুপম মিলনে। গানের কথাগুলি যে রস সৃষ্টি করছে সুর সেই কথার না বলা অনির্বচনীয়ত্ব সুরের অনির্বচনীয় আকৃতির মধ্যে মুক্তি দিচ্ছে, মেলে ধরছে। গানের কথাগুলিকে গানের সুর অবজ্ঞা করে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করছে না, কিংবা কথাগুলি নিজেদের প্রাধান্য তাচ্ছিল্য করছে না। কথার ভাব ধ্বনি ও ছন্দ, সুরের ভাব ও তার ছন্দের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে....সুরের মন্দাকিনী সুরের অলঙ্ঘ ঢেউ নিয়ে কথাগুলিকে ঘিরে বয়ে চলেছে। কবিতার রস ও সুরের রস আলাদা হলেও রবীন্দ্রনাথের গানে এই দুই রসের মিলন ঘটেছে। গানের কথা ও সুর এক হয়ে গেছে অসামান্য সৃষ্টিরসের রসায়নে।'

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রথম পঁচিশ বছরের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এই পর্বের গানের অধিকাংশই সরাসরি কবিতা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন—বাঁশরি বাজাতে চাই বাঁশরি বাজিল কই, কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান, আমি নিশিনিশি কত রচিব শয়ন, ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা, হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা, আজি শরৎ তপনে প্রভাতস্বপনে, তুমি কোন কাননের ফুল, ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে, আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি, এ শুধু অলস মায়া, কেন চেয়ে আছ গো মা, আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না ইত্যাদি। এর মধ্যে 'আমি ধরা দিয়েছি গো' প্রধানত একটি সনেট। 'এ শুধু অলস মায়া' তানপ্রধান ছন্দে অষ্টমাত্রিক ও দ্বিপার্বিক চরণে রচিত দীর্ঘ কবিতা। রবীন্দ্র-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে কবিতা ও গানের যৌগরূপ তাঁর রচনায় শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মানসী কাব্যে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' অত্যন্ত সুপরিচিত একটি বর্ষাসঙ্গীত, এবং সম্ভবত এটিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসঙ্গীত যা কবিতা থেকে গানের রূপান্তরিত। এ গানের সুরের জন্য কবিতাকে এতটুকু পরিবর্তন করতে হয় নি। পরবর্তীকালে চিত্রা, সোনার তরী বেয়ে ক্ষণিকার অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা সুরারোপিত হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে। পরবর্তীকালে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের সৃষ্টিও কবি রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন অনুপ্রাণিত মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। এই পর্বে আত্মকথনের চেয়ে আত্মমননেরই প্রাধান্য। সুর ছাড়াই রবীন্দ্র পাঠকরা এই কবিতাগুলিকে নিজের মতো করে বোঝেন, ব্যাখ্যা করেন এবং সেইমত রস উপভোগ করেন। এই লিরিকগুলি পূজা বা প্রেমের কবিতা বলে পঠিত হলেও এগুলির মৌলিক প্রেরণা যে পূজা বা প্রেম হবেই এমন কোন কথা নেই। হয়তো রবীন্দ্রনাথের মননবাহী চেতনা থেকেই এগুলির সৃষ্টি। কিন্তু সুর কোনভাবেই রসাস্বাদের অন্যতম অবলম্বন নয়, বরং সুর ও পরিবেশন রীতি ভুলে শুধু কবিতা হিসাবেই এগুলি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কবি নরেশ গুহ সুরের যাদু ব্যতিরেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় প্রথম শ্রেণীতে পড়বে সেইসব গান যা সুরছাড়াও সুসংবদ্ধ কবিতা। গীতাঞ্জলির 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' গানের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন—'এই কবিতা আমি অন্তহীনভাবে মনের মধ্যে আবৃত্তি করতে পারি। মানসীর যুগ থেকে প্রেম এবং প্রকৃতি পূজার অভিমুখে যাত্রা করেছিল তারই আশ্চর্য পরিণতি এই গীতিকাব্য। একদিকে তা বৈষ্ণব কাব্যের অনুরণনের প্রতি আমাদের সচেতন করে তোলে যে, বিশ শতকের একজন অসামান্য আধুনিক কবির পক্ষেই সম্ভব ছিল এ কবিতার রচনা।'

এই বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্বে তিনি বিভাজন করেছেন যেসব গান, তার স্থিতি অনেকটাই নির্ভর করে সুর ও কণ্ঠের ওপর। নীলাঞ্জন ছায়া, বন্ধু রহো রহো সাথে ইত্যাদি, আর তৃতীয় পর্বে তিনি বলেছেন যেগুলি নিছক কবিতা হিসাবেই রচিত হয়েছিল। খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, নহ মাতা নহ কন্যা এই শ্রেণীর গান, নরেশ গুহ জানিয়েছেন—'এ সব রচনা কবিতা হিসাবে পড়েই খুশি থাকতে চাই, এদের মধ্যে এমন কোন সাঙ্গীতিক সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, যা সুর বিহনে উপভোগ করা যাবে না। এসব রচনায় কবিতারই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত।'

সুরের ধারায় স্নাত না হয়ে শুধু শব্দসমুদ্রে অবগাহন করে রবীন্দ্রনাথের গান যে কত মানুষের মানবিক সুস্থিতির উপাদান হতে পারে দুটি বিদেশী উদাহরণের সাহায্যে সে সত্য তুলে ধরা যেতে পারে। একজন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবি 'উইলফ্রেড ওয়েন'। যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর ওয়েনের যে ডায়েরিটি তাঁর মায়ের হাতে আসে তাতে লিপিবদ্ধ ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের অংশ—'When

I go from hence, Let this be my parting word that what I have seen is unsurpassable'

অন্যজন হলেন হিটলারের মর্ম সহচর ড. গোয়েবল্‌স। মানসিক উন্মাদনায় অস্থির পর্বে রবীন্দ্রনাথ পড়ে এক বন্ধুকে তিনি জানাচ্ছেন : 'To night I mean to read Rabindranath Tagore's Gardener, a wonderful collection of love-songs, which I can commend to you most heartily.'

এঁদের কারুর প্রাণেই রবীন্দ্রনাথ সুরের আগুন লাগিয়ে দেননি। শুধু শব্দের মন্ত্রে এঁদের মতো বিশ্বের নানা প্রান্তের কত মানুষ আজও বিহ্বল হয়ে আছেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়—তাও তো অনুবাদে। বুঝে নিতে অসুবিধা নেই সুর ভুলে যদি গীতবিতান পড়া যায়, তাতে রবীন্দ্রগানের সব সম্ভোগের পথই নির্দেশিত হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতসমুদ্র থেকে এভাবেও মাণিক্য আহরণ করা যেতে পারে, তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হবে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় সুরসৃষ্টি-কালে অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়োজিত করতেন কেবল পলাতক সুরগুলিকে বেঁধে রাখবার তাগিদে নয়, বরং 'জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন' করবার জন্য। প্রথম থেকেই সুরের কল্পনাবিলাসের চেয়ে বাণীর মূল্য ও গঠনের মর্যাদা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সুর বাদ দিয়ে গীতবিতানের কাব্যসুধা পান তাই অরসিকের কুস্তি লড়া নয়।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন গাইবার জন্য, সুর দিয়েছেন নিজেও গেয়েছেন, তবুও রবীন্দ্রনাথের গান সর্ব অর্থেই সার্থক কবিতা। কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমার বিস্তর গান আছে তা কাব্য, বাইরে থেকে সুর যোজনা না করলেও সুর আছে তার অন্তর্নিহিত। আমার নিজের বিশ্বাস কাব্য হিসাবে আমার অধিকাংশ কবিতার চেয়ে সেগুলি শ্রেষ্ঠ। বারো ঘণ্টা ধরে যাত্রা দেখার রুচি আমাদের, দশ-বারো লাইনের পাত্রে কাব্যরস প্রচুর পরিমাণেই ধরতে পারে একথাটা আমাদের মন মানে না।'—রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করছেন গীতবিতান কাব্যগ্রন্থ হিসাবে উৎকৃষ্টতর। অর্থাৎ তাঁর গানে কাব্যের মৌলিক আবেদন ভরপুর। ভাবে ব্যঞ্জনায়, অনুভূতি, স্পর্শময়তায় গীতবিতানকে বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছাড়া আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, আজ তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে, ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, প্রভৃতি গানের মধ্যে যে আকুল ও রহস্যময় আবেদন রয়েছে তার মননশীলতা সমস্ত কাব্যপাঠককেই স্পর্শ করবে। এইজন্যেই সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রবীন্দ্রনাথের গানের আবেদন নিরন্তর প্রাণে বাজতে থাকে, সুরের রেশ মিলিয়ে গেলেও ভাবের গ্রন্থি ছিন্ন হয় না। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের পাশাপাশিই বয়ে চলেছে গান সৃষ্টির ধারা। গীতাঞ্জলি-গীতালি পর্বের কবিতায় গীতিময়তা ও কাব্যচর্চা একাকার, অর্থাৎ এগুলি গীতি-কবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতা প্রবন্ধে স্পষ্টতই গানকে কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীকে কীর্তনের আসরের বাইরে এনে কাব্যপাঠের মতো করেই সাহিত্যরস আস্বাদন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। কবিতা পড়বার সময় শব্দ, শব্দ-বিন্যাস, চিত্রকল্প, ছন্দ ও মিল পাঠকের বিবেচনার বিষয় হয়। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রেও এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। সুরের স্রোতে যদি শব্দব্রহ্ম ভেসে যায়, তবে গানের জগৎ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে জানি না, তবে বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে বড় কিছু হারাবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাক্‌শিল্পে মিলের শৈলীর একটি তালিকা নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন কবি বুদ্ধদেব

বসু। শব্দ, পদ, ছন্দ, স্তবক পঙ্‌ক্তিতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ সহযোগে মিল, মাত্রা, সম-অসম মাত্রিক অনুলাপ বৈচিত্র্য, মিলহীনতার বৈচিত্র্য, একান্তর মিল, ক্রমিক পঙ্‌ক্তিতে তিন মিলের শিল্প, শব্দ ধ্বনির মিলে ভাবানুষঙ্গ ইত্যাদি। বাংলাভাষার বিচিত্র বর্ণাঢ্য মিলের আবিষ্কর্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—'এর আগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে বাংলাভাষা তার তৎসম, তদ্ভব, দৈশিক ও বিদেশী শব্দের সম্ভার নিয়ে মিল বিষয়ে কতবড় প্রতিভাশালী। কি গভীর সেই মিলের রহস্য, কি উদার সম্ভাবনায় ভরপুর।' প্রকৃতপক্ষে অক্ষর ও শব্দের মিল ও ছন্দতান ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ঝংকার তুলে দিয়েছেন। সুর ছাড়াই সেখানে অন্তর্লীন সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আবৃত্তি করতে করতে কবিতা হয়ে উঠছে অনির্বচন। এরকমই কয়েকটি উদাহরণ :

১. তালের বনের করতালি কিসের তালে
২. অতি মঞ্জুল শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে
   শুনিরে শুনি পল্লব পুঞ্জে।
৩. হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল, বিশাল, নিরাল, পিয়াল, তমাল বিতানে
৪. মম জল ছলো ছলো আঁখি মেঘে মেঘে
৫. কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি

এমন ঋজু ও গম্ভীর শব্দের মধ্যে মিলের মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণ রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানে মিশে আছে। কেবল দু-একটি পঙ্‌ক্তিতে নয়, কোন কোন সম্পূর্ণ গানই এই গুরুতর ধ্বনি গাম্ভীর্যে ও মিলের ঝংকারে রঙিন। চিরকুমার সভার একটি হাসির গানে শব্দানুপ্রাস ও শব্দধ্বনির অফুরন্ত মিল আমাদের বিস্মিত করে। গানটি হল :

মনোমন্দির সুন্দরী মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদাঞ্চলা চল চঞ্চলা অয়ি মঞ্জুলা-মুঞ্জরী
রোষারুণ রাগ রঞ্জিতা বঙ্কিমভুরু ভঙ্গিতা
গোপন হাস্য কুটিল আস্য কপট কলহ গঞ্জিতা।
সঙ্কোচনত অঙ্গিনী ভয় ভঙ্গুরভঙ্গিনী
চকিতচপল নব কুরঙ্গ যৌবনরণ রঙ্গিনী
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা মধুকরভর কুণ্ঠিতা
লুব্ধ পবন ক্ষুব্ধ লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বনধন বঞ্চিনী দুরূহগর্বমঞ্চিনী।
রুদ্ধ কোরক সঞ্চিত মধু কঠিনকনককঞ্জিনী।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা নির্মিতির এই কুহক আমাদের বিহ্বল করে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রয়োগ তাঁর সহজ কাব্যসংস্কারপ্রসূত; কবির স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধের দ্বারা কাব্যের বিশেষ আবহ উপযোগী ও তাঁর কবি মেজাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরূপে মৃদু ছন্দঃস্পন্দিত কোমল ও ছায়াস্নিগ্ধ ভাববাহী ভাষার প্রয়োগ। এ ভাষা নির্বাচনের পিছনে কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।' [রবীন্দ্রকাব্য রূপের বিবর্তন রেখা, ড: গুণময় মান্না, ভূমিকা পৃ. ২০]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাক্‌রূপের মৌল প্রকরণই আমাদের মুগ্ধ করে না, উপমা ও চিত্রকল্পের বহুবর্ণী সমারোহ এবং কাব্যছন্দের রসভঙ্গিমাও আমাদের মুগ্ধ করে। উপমাদি অলংকার রবীন্দ্রগানের ভাষায় ও ভাবের সঙ্গে এমনই একাত্ম হয়ে আছে যে আলাদাভাবে এদের দেখতে পাওয়া যথেষ্ট

কঠিন। রবীন্দ্রসঙ্গীত উপমা ও রূপকাদি অলংকারের সহজ দীপ্তিতে উজ্জ্বল, সমাসোক্তি অলংকারে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। গানের ভাষাকে কাব্যের চেয়েও বেশি মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গীতের বিষয় ভাব ও পরিসর যেখানে সীমায়িত সেখানে কী অসামান্য দক্ষতায় তিনি ভাষা-স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপমা অদ্বিতীয় চিত্রালেখ্য হিসাবে বিকশিতই শুধু নয়, গানে নির্দিষ্ট পরিসর থাকায় অলংকারের পরিমাণ ও অবস্থিতি রবীন্দ্রগানে অনেক বেশি সার্থক। যেমন : বাহির হল জোয়ার স্রোতে/শুক্ল রাতে চাঁদের তরণি—চাঁদ ও তরণীর মধ্যে নিবিড় এক উপমা। তেমনি—চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে/মালা হয়ে জড়িয়ে আছে— চন্দ্রসূর্যকে ফুলের মালার সঙ্গে উপমা। রবীন্দ্রগানের আরও একটি অনবদ্য বাক্‌রূপের নাম সমাসোক্তি, উপমা-রূপকের মতোই সমাসোক্তি এত বিপুল গৌরবে রবীন্দ্রগানে উপস্থিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করলে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মোপলব্ধি ও তার প্রকাশ বহির্প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হয়ত এইজন্যই প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতে সমাসোক্তি এবং সমগোত্রীয় অলংকার এত প্রভাব বিস্তার করেছে। এইরকম কয়েকটি সার্থক পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

১. আকাশ কাঁদে হতাশ সম
২. অধীর হয়ে মাতলো কেন পূর্ণিমার ওই চাঁদ
৩. দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলে চায়
৪. বাদল বাউল বাজায় রে একতারা
৫. আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে ডাক দিয়ে যায়
৬. প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরিষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি এসেছে কি?
৭. আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে।

সমগ্র গীতবিতান থেকে এ সামান্য কিছু নমুনা। এছাড়া অজস্র অনুপ্রাস, শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা মিশে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরতে পরতে। মিশে আছে ধ্বনি-দৃশ্য-ভাব-মিশ্রপ্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ। এসবের জন্যেও গীতবিতান শাশ্বত হয়ে থাকবে ভাবীকালের জন্য।

শুধু এটুকুও নয়, আরও অনেক ভাবনার সূত্র মিলতে পারে একটি গান থেকে। যেমন 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে গানে' গ্রীষ্ম প্রকৃতির অনুষঙ্গ আছে, কিন্তু গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের অগ্নিবাণের দহনজ্বালা নেই। বৈশাখী ঝড়ের কোন তীব্র রূপ নেই, বরং এই গানে পেয়ে যাই এক নিবিড় ছায়াঘন মধ্যাহ্ন আবেশ। এখানে কৈশোরের প্রথম প্রেমের বাণী গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়ায় বনে মর্মর ধ্বনি তুলছে আর প্রণয়-সুরভিত স্মৃতি 'সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়' প্রতি মুহূর্তেই গুঞ্জরিত হচ্ছে। কাব্যপ্রতিমা-পাঠ ব্যতীত গানের মূল ভাবসম্পদকে উপলব্ধি করা এবং কবির মানসিকতাকে স্পর্শ করা একেবারেই অসম্ভব। বাণীর বিশুদ্ধ সংযোগেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে অসামান্যতা দান করেছে। গানকে বারবার পাঠ করে ছন্দোবদ্ধ শব্দাশ্রয়ী রচনারূপে আস্বাদনের চেষ্টা করলে রবীন্দ্রগানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এইসব ভাবনার বীজ আমার মনে গেঁথে দিয়েছেন পরমপূজ্য শিক্ষক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের গানের শিল্পিত অনুসন্ধানে তিনি যত্নবান হয়েছেন। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের মতই রবীন্দ্র সৃষ্টি ভাণ্ডারে তাঁর অপার আকর্ষণ আছে, হয়ত একটু বেশিই আছে, তাই দিয়ে তিনি খুলে দিতে আগ্রহী হয়েছেন সমালোচনা সাহিত্যের নতুন ধারা। তিনি বলেছেন—'প্রকৃতপক্ষে গত সোয়াশ' বছর ধরে বৈষ্ণবপদের কবিতা রূপে যত ব্যাখ্যান হয়েছে, যত নতুন নতুন দরজা খুলে গেছে তার কাব্যোপভোগের, গান রূপে তার দশমাংশও হয়নি। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব

পদাবলী ও অন্যান্য পদসাহিত্যের স্থান সম্পর্কে কারুর মনে কোনো প্রশ্ন নেই। তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কবিতারূপে পাঠ করার ব্যাপারে সংকোচ কেন?'—আসলে অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও যুক্তিবিস্তান থেকেই এই নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছেন। তবে সেই ভাবনাকে তিনি রসিক পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু নিজের বোধকে পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেননি। তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত : শব্দের মন্ত্র' গ্রন্থটি আমাকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাঁর ভাবনার পাশে। হয়ত তাঁর হাত ধরে আমার মত অর্বাচীনও একদিন স্নাত হবে রবীন্দ্রগানের মুক্তধারায়।



মহাজ্ঞানের সন্ধানে : বাংলাদেশের একটি নাটক

• • • • • •

পল্লব সেনগুপ্ত

পূর্বভাষ

বাংলা সাহিত্যকে সুনির্দিষ্ট একটি বিদ্যাশৃঙ্খলা হিশেবে ধার্য করে, তার পঠন-পাঠন-গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কী, এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে এক কথায় তার উত্তর হবে 'বাংলাদেশের সাহিত্য'-কে অন্যনিরপেক্ষ একটি বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের গোড়ার দিকে ক্ষেত্রদার নেতৃত্বে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ঐ বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ একটি বিশেষ পত্র হিশেবে প্রবর্তন করা হয়, তখন বিভিন্ন মহল থেকেই বহুবিধ প্রশ্ন, অনিচ্ছা, আপত্তি এবং প্রতিবাদ ওঠে; মৃদু প্রতিরোধ করার চেষ্টাও যে হয়নি, এমনও নয়! কিন্তু সে-সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে এমন একটি অভাবিতপূর্ব উপশৃঙ্খলারূপে বাংলাদেশের সাহিত্যকে স্বমহিম গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল মূলত তাঁরই দৃঢ়তায়। ঠিক এই কারণেই, আজ যখন তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য একটি সংবর্ধনা-গ্রন্থ সঙ্কলিত হচ্ছে, তাঁর সুদীর্ঘকালের অনুজ-সহকর্মী হিশেবে এই অকৃতী লেখকের মনে হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কেই যদি কিছু লেখা যায় তাহলে বোধ হয় তাঁর ভাবনা এবং প্রয়াসের প্রতি যথা-অর্থে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে! বহু বছর ধরে তাঁর সুপ্রীত-আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে আসছি, তাই এই কথাটা বলার হয়ত একটা অধিকারও অর্জন করতে পেরেছি। আর ঠিক সেই কারণেই এই নিবন্ধের উপস্থাপনা।।

১

সেলিম আল-দীন সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশে অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যকার। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক 'ঢাকা থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষও বটেন। মধ্যযুগ থেকে লোকায়ত যে-নাট্যধারা বাঙালির সংস্কৃতিতে অবারণভাবে বহে চলেছে, সেটাই যে আধুনিক বাংলার নাট্যকলার উৎসমুখ—সুদীর্ঘকালের গবেষণা এবং নাট্য অভিকরণের সমন্বয়ে সচকিত করে তোলার মতো এই তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেই তিনি ব্রতী।

'প্রাচ্য' আল-দীনের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সাড়া-জাগানো নাটক। এই বাংলাতেও সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী 'স্বপ্নসন্ধানী' এ-নাটকের একাধিক মঞ্চ-উপস্থাপনা করেছেন।

২

'প্রাচ্য' একটি বিচিত্র ভাবরূপের নাটক। একদিকে এর মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিচার করতে গিয়ে নাট্যকার এক ধরনের ধ্রুবপদী দর্শনভাবনাকে ব্যঞ্জিত করেছেন। জীবন এবং মরণের মধ্যে একই সঙ্গে পরস্পরের অনুপূরক অথচ প্রতিস্পর্ধী একই অবস্থা ও অনবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে যেমন, তেমনই আবার তাদের অনবচ্ছিন্ন ও পরস্পর-নির্ভর ভাবরূপও অনস্বীকার্য। প্রাচীন

ভারতীয় দর্শন ভাবনার এই তত্ত্বটিই আল-দীন তাঁর এ-নাটকের পরিণামে সুন্দর শৈলীদক্ষ ভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। 'প্রাচ্য'—এই শিরোনামটির অন্তর্গভীর তাৎপর্যও সেইটিই।

এই বিশিষ্ট ভাবনাটিকে অধ্যাত্মবাদীরা এক ধরণের মাত্রায় ব্যাখ্যা করে এসেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেই মাত্রাবিন্যাসে বাঁচা এবং না-বাঁচা, দুটোই একই অস্তিত্বের দ্বৈধ অভিব্যক্তি বলে অন্বিত করা হয়। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতা, কিংবা অতীন্দ্রিয়তা—যা-ই বলি না কেন, তার প্রতিকল্পে যত নিদর্শই উপস্থিত করা হোক, বস্তুত সম্পূর্ণ বিকল্প একটা বোধিও এই জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধের বন্ধন-অবন্ধন নিয়ে যে সঞ্জাত হতে পারে, আল-দীনের এ-নাটকে সেই কথাটাই ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

৩

'প্রাচ্য'-তে ঐ যে বিশিষ্ট তত্ত্বব্যাখ্যানটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে নাটকের দ্বিতীয়াংশে, বিশেষত চূড়ান্ত ওরফে সমাপ্তির মুহূর্তে সেটাকে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় অন্বিত বলেও মনে করা যায় হয়ত বা; তবে এর অবলম্বন হিশেবে যে-আখ্যানাংশ গড়েছেন আল-দীন, লৌকিক সংস্কৃতির উপর তার নির্ভরশীলতাও অপরিমিত। যে-কাহিনিটা বাংলাদেশের একান্তই গ্রামীণ পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, তার অন্তর্কাঠামোয় (সমালোচনার পরিভাষায় যাকে বলতে পারেন ডীপ-স্ট্রাকচার/ইন্‌ফ্রা-স্ট্রাকচার) আছে মনসামঙ্গলের মিথকথা, যদিও ঐ প্রত্নপ্রতিমা এখানে বিপ্রতীপ প্রতিবিম্বনে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, 'রিভার্স আর্কিটাইপ'। নাটকের মধ্য পর্বে যিনি এ-কাহিনির "প্রগাঢ় পিতামহী", সেই দাদির আর্ত কণ্ঠস্বরে সেইটাই যেন ব্যক্ত হয়েছে : "উল্টা লখিন্দার, হাই গো উলট বাসর।।" এমন কথা পরেও শুনি : "কুমারীগণ এক বিপরীত পুরাণ দেখে।... তাইলে বাসরে লখিন্দারকেই ডংশায় না, বেউল্যাও যায়।।"

কিন্তু এ-সব কথাগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এই নাট্যকৃতির কাহিনিটার সারাৎসারটুকু একটু লিখে দেওয়া দরকার সবার আগে, কারণ পশ্চিম বাংলায় এখনও এ-নাটক সুপ্রাপ্য নয়। এ-নাট্যকাহিনি অবশ্য বেশি বিস্তৃত কিংবা বহুচবিত্রময় নয়। মূল চরিত্র বলতে গেলে মাত্র দুটিই : নায়ক সয়ফর এবং একটি বিশালকায় গোখরো সাপ, প্রকৃত প্রস্তাবে যে হল এই নাটকের প্রতিনায়ক। সয়ফরের দাদি এবং তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী, যে প্রথম রাত্রেই ঐ গোখরোর ছোবলে প্রাণ হারায়—এই দুজন ঠিক-পরবর্তী দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। দরিদ্র জনমজুর সয়ফর। জমি বেচে বিয়েব খরচ জুটিয়ে সে ভিন্ গাঁ থেকে বিয়ে করে আনে পঞ্চদশী কিশোরী নোলককে। সন্ধ্যায় বউকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর হাসি-গল্প-আনন্দ-খাওয়াদাওয়া চলে আত্মীয় বন্ধু পড়শিরা মিলে। তারপর ফুলশয্যার সময় স্বামী-স্ত্রীর প্রথম নিবিড়তার মুহূর্তেই অন্ধকার ঘরের গর্ত থেকে উঠে এসে গোখরো হঠাৎই ছোবল মারে নোলকের পায়ের পাতায়। সয়ফর সেটা বুঝতে পারে অনেক বাদে। ও ভেবেছিল, জীবনে এই প্রথমবার পুরুষের আশ্লেষের প্রতিক্রিয়া হিশেবেই কিশোরী মেয়েটা বুঝি সংকোচে, ভয়ে, লজ্জায় সিঁটিয়ে রয়েছে! কিছুক্ষণ পরে সেই ভুল ভাঙলে, মরিয়া হয়ে বাড়ির লোক, পড়শি-বন্ধু সবাই মিলে গ্রামীণ সব বিশ্বাস-সংস্কারমাফিক সাপের বিষ নামানোর চেষ্টা শুরু করে; আসে ওঝা, চলে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রবন্ধন; তারপরে উপস্থিতি ঘটে বিষবৈদ্যের, তিনি নানা কথা কন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, অবশেষে হাল ছাড়েন; আবও পরে আসে ভাসান যাত্রার দল, মনসার পালা গাওয়া হয় দীর্ঘসময় ধরে।

আর কিছু করে সান্ত্বনা পাবার, বা আশা সঞ্চয় করার যখন কোনও উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না, তখন নোলকের দেহ বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ের কাছে সমাহিত করার ব্যবস্থা শুরু করেন

শোকগ্রস্ত দাদি, হতবাক আত্মীয়-স্বজন, বিমূঢ় পাড়া-পড়শিরা। কাফন-দাফন-জানাজা সবই হয় যথাবিধি। নোলক সমাধিস্থ হয়। সয়ফর তার ঐ উদ্‌ভ্রান্তির ঘোরেই হঠাৎ একটা শাবল নিয়ে নিজের ঘরের মেঝে খুঁড়তে শুরু করে! সাপটাকে সে খুঁজে বার করবে; তাকে মেরে ফেলে প্রতিশোধ নেবে!

সমস্ত রাত্রি ধরে নিস্ফল, কিন্তু নিরলস প্রতিহিংসার প্রবল তাগিদে সয়ফর খুঁজে চলে সেই খুনি সাপটাকে...মেঝে, দেওয়াল, ঘরের কোণ, খুঁড়ে-ভেঙে-খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ব্যর্থ হয়ে ক্লান্তি, হতাশা এবং নিরুপায়তারই বোঝা বাড়ে শুধু তার...সাপের সন্ধান মেলে না। যে-ক্রোধ, দুঃখ এবং প্রতিহিংসার বশে সে তার সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুঁজতে শুরু করেছিল সেটাই ধীরে-ধীরে ভাবান্তরিত হতে থাকে এক অনির্দেশ্য অন্বেষণে : এক বিচিত্র, জিজ্ঞাসু অনুভবে : "নিসর্গের সঙ্গে মৃত্যুকে সাপকে এক অনিবার্য অঙ্কে লীন করে ফেলে সয়ফর।"

সুদীর্ঘ এই সময়টার মধ্যে সে সাপের উপস্থিতির হ্যালুসিনেশ্যন দেখেছে; অনেকবারই অনুভব করেছে ভয়াল গোক্ষুরের অস্তিত্ব। অথচ কোনওবারই প্রত্যক্ষ করতে পারেনি তাকে সমস্ত রাত্রের মধ্যে। ...সাপটাকে সে অবশেষে প্রত্যক্ষ করল সত্যিই যখন, তখন ভোর হয়ে গেছে : বিশাল ফণাবিস্তার করে নোলকের কবরের পাশে যেন নাগরাজের মতোই হিংস্র-সৌন্দর্যে অর্ধদণ্ডায়মান হয়ে হিশ্‌-শ্‌ শব্দে সে সচকিত করে তুলছে চারিদিক। চরম শত্রুকে এইভাবে নাগালের মধ্যে দেখতে পেয়ে হাতের ধারালো ছেনিটা নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় সয়ফরজান। সাপও দেড়হাত উঁচু, বিস্তীর্ণ ফণার বর্ণবৈভবকে ভোরের রৌদ্রের আলোয় ঝিলিক্ দিতে-দিতে সয়ফরকে প্রতি-আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। দুজনেই একবার করে হামলা করে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয়বার হানার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।...ঠিক তখনই দুই প্রতিজিঘাংসু জৈব-অস্তিত্বের মাঝে এসে দাঁড়ান দাদি। পিছনে আত্মীয়-বন্ধু-পড়শিরা। দাদির অমোঘ শাসনে সাপ এবং মানুষ দুজনেই 'অস্ত্র' নামায়। "নোলকের নতুন কবরের ওপর দিয়ে শ্লথ গতিতে বন্য-অন্ধকারে চলে যায়" সর্পরাজ।... "সৌন্দর্য ভয় ও রহস্য সবার অন্তরে শ্রদ্ধা জাগায়। হত্যা ভুলে যায় তারা।"

৪

এই নাটকের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে সেলিম আল-দীন লিখেছেন এর মুখবন্ধে : "১৯৯৫ কি '৯৬ সালের শীতান্তে...শ্বশুরবাড়ির সুউচ্চ ভিটায় খড়ের পালা থেকে পালানে একটি অতিশয় দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা একরৈখিক কর্ষিত ভূমি দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি। তাতে সে বাড়ির আশপাশের কৃষিজীবীগণ মাটি খুঁড়ে একটি বিশালকায় গোখরো সাপের নিধন পর্বের উত্তেজক বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে। ...এই দৃশ্যে হঠাৎ আমার মনে হল, জীবনের অনিবার্য খনন কি আমরাও করে চলেছি না? ...১৯৮৪-৮৫ সালে মানিকগঞ্জের চামশা অঞ্চলে বিবাহ পরবর্তী রাত্রে এক বরের ডঙ্কজনিত মৃত্যুর বাস্তব কাহিনী শুনে ভেবেছিলাম, মনসাপুরাণের উল্টা দিকটা তবে কি রকম। ...'প্রাচ্য'-র কাহিনীসূত্রের প্রেরণা এটুকুই।"

কোন্-কোন্ অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে 'প্রাচ্য' নাটকের ভাবরূপগত প্রত্নপ্রতিমাটা গড়ে ওঠেছে সেটা নির্দেশ করার পর, আল-দীন সেই ভাবনার দার্শনিক প্রতীতির সম্পর্কেও কিছু সঙ্কেত নির্দেশ করেছেন ঐ মুখবন্ধ তথা কথাপুচ্ছেই : "এর নামের মধ্য দিয়ে একটা বিষয়াতিরিক্ত অর্থবিস্তারের প্রয়াস আছে। আমার মনে হয়েছে, জীবনের তীব্রমুহূর্তে আমাদের ক্রোধ প্রতিহিংসা শেষ অবধি প্রকৃতি-সংলগ্ন হয়ে যায়। আবার 'প্রাচ্য'-কে খুব কেউ সরলভাবে চরম ভাঙনের মুখে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের কাহিনী রূপেও গণ্য করতে পারেন। ...ভয়ঙ্করী সাপটিকে ক্ষমা করা হয়েছে এ উপাখ্যানের

অন্তে, কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। সে প্রকৃতির সৌন্দর্য, হিংস্রতা ও স্বাভাবিকতার আপন অধিকারে বিবরে চলে যায়। অত্র উপাখ্যানের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যাও বোধ হয় সম্ভব। কিন্তু সে দায় পাঠক ও সমালোচকের।"

সমালোচকের/পাঠকের "দায়" হিশেবে আল-দীন যেটা বলেছেন, তার অতিরেকেও আরও কিছু দায়িত্ব কিন্তু তাঁদের থেকে যায়। এ নাটকের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাখ্যা হয়ত হতেই পারে—অন্তত একটা সময় পর্যন্ত—ধরুন, ১৯৪৭-৪৮ থেকে পরবর্তী ২½/৩ দশক পর্যন্ত, যখন সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং এখনকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত লেখারই সামাজিক এবং (বিশেষভাবে) রাজনৈতিক একটা মাত্রা ছিল, যেটা তার পর থেকে ধীরে-ধীরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বহুলাংশেই। কিন্তু ১৯৯৯-এর শেষে লেখা এই নাটকের ভাবরূপে সমাজ কিংবা রাজনীতির আভাস থাকতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি, ঢের বেশি অভিঘাত এতে পড়েছে মানুষের জীবনের চিরন্তন কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্নের, যার উৎস হল গভীর কিছু দার্শনিক ভাবনা, জীবন এবং মৃত্যুর দোলাচল অস্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা দুর্জ্ঞেয় কিছু অনুভব। সেই দার্শনিক প্রমাগুলি এখানে হয়ত সোচ্চার নয়, কিন্তু তাদের প্রতীতিগুলি এই নাটকে ব্যঞ্জিত হয়েছে। লোকপুরাণ এবং লোক নাট্যের কিছু প্রকরণ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক কতকগুলি জটিলতারও বিন্যাস ঘটেছে এর মধ্যে ; কিন্তু পরিণামে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একদিকে, আর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে অন্যদিকে নির্দেশ্য এবং অনির্দেশ্য ভাবে যে-দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধটা সর্বদাই থাকে, সেলিম আল-দীন সেই ভাবনামাত্রায় পৌঁছে গেছেন। আর সেখানেই পৌঁছতে হয় পাঠক এবং সমালোচককেও, কারণ তা নইলে এর আকাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের গভীরে যাওয়া অসম্ভব।

৬

এই নাটকের অবয়বে যে-সব লোকনাট্যভঙ্গীর প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলোর সম্পর্কে আগে বরং একটু বলে নিই। তাঁর নিজের কথাতেই : "প্রাচ্য'-র আঙ্গিক আমার অন্য উপাখ্যান 'বনপাংশুল'র মতই পাঁচালির প্রেরণাজাত। তবে প্রেরণাজাত বললে বোধ হয় সত্যভ্রষ্টতা ঘটে। দুটি রচনাতেই আমি পাঁচালির মহাকাব্যিক আঙ্গিকের শক্তিকে একালের পাশ্চাত্যনিবিষ্ট শিল্পরীতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছি, এবং এ প্রত্যয়ে দৃঢ় যে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালীর সুনির্দিষ্ট এপিক না-থাকলেও মঙ্গল পাঁচালি অর্থাৎ পাঁচালির কাঠামোতে আমাদের দেশজ রুচির অনুকূলে 'কাঠামোগত-মহাকাব্য' বা 'স্ট্রাকচারাল-এপিক' আছে।"

মহাকাব্যিক কাঠামোর ব্যাপারটা প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও, পাঁচালি-প্রতিম রূপটা অবশ্যই অনস্বীকার্য। কথা-পদ-শিকলি-নাচাড়ি-বোলাম-নাটগীত ইত্যাদি লৌকিক সাহিত্য এবং সঙ্গীত, নাট্য-জাতীয় অভিকরণকলা থেকে সঙ্কলিত নামগুলি এ কাহিনির ছোটবড় অংশগুলির শিরোনাম বিন্যাস করেছে। কোনও পর্ব-পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই, দৃশ্য-অঙ্কের বিভক্তি নেই—গদ্যবর্ণনা, গদ্যময় সংলাপ, কবিতা-গানের অবিরল উপস্থিতি—সবটা মিলিয়ে কিছু পরিমাণে গদ্য-পদ্যময় চম্পূর মতো, অথচ আগাগোড়া মিলে কিছুটা নাটক, আর কিছুটা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত এই বই!

নিঃসন্দেহে ফর্মগত এই নিরুপম নিরীক্ষা এর চরিত্রলক্ষণে আশ্চর্য হবার মতন কিছু বৈশিষ্ট্য বিহিত করেছে। এরই মধ্যে-মধ্যে মূল কাহিনির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই কখনও ইউসুফ-জোলেখার প্রাচীন কাব্যাংশ, কখনও বা মনসামঙ্গলের পাঁচালির ছিন্নাংশ, কোনও সময়ে মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার থেকে প্রায় হুবহু উৎকলন, এমনকি চর্যার পদ থেকেও সংক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষও মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলত, সবটুকু মিলিয়ে এর মধ্যে এমনই একটা অননুমেয় গ্রামীণ

বাঙালিয়ানার সোঁদা গন্ধ ভরপুর হয়ে আছে যে, 'প্রাচ্য' নামের এই কাহিনিটি পড়তে গেলে, নিজের অজান্তেই একটা সময়ে একে নির্ভেজাল লোকসংস্কৃতির কোনও এক অভিনব প্রকরণ বলেই অনুভূত হয়। সেই অনুভবকে আরও বাড়িয়ে তোলে, গাঢ়তর করে দেয় এর কুশীলবদের অতীতচারণ, বর্তমানের কৃত্যকরণ ইত্যাদির সঙ্গে নিবিড়-হয়ে-জড়িয়ে-থাকা অজস্র আচার-অভিচার-বিশ্বাস-সংস্কার-অভিব্যক্তি যাদের সব কিছুই সঞ্জাত হয়েছে গ্রাম বাংলার লোকজীবনের চিরাচরিত সংস্কৃতির পরম্পরা থেকে। "উলট পুরাণ" হবার জন্য এর প্রত্নপ্রতিমাটি বিপ্রতীপভাবে পাঠকের বা দর্শকের মনে প্রতিফলিত হলেও, সেটা যে সম্পূর্ণতই প্রচলিত মনসা মিথকথার লৌকিক পরিকাঠামোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত তা তো আগেই বলেছি।

লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস এই নাটকের পরিণতির পথনির্দেশে যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, দুটি বা তিনটি প্রতীকী ঘটনাকে উপলক্ষ করেই সেটা বোঝা যায়। এইসব ঘটনা এর অবলীন ট্র্যাজিক ভাবানুযঙ্গের পূর্বসঙ্কেত বলেই বুঝতে হবে। এদের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য হল, নোলকের শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় খেলাচ্ছলে তার সহযাত্রী ছোট ভাই-কর্তৃক একটা বিশালকায় সাপের খোলস মাঠ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেটি ভগ্নীপতির গলায় পরিয়ে দেওয়া। সয়ফরের জীবনের যেটা চরম ট্র্যাজেডি—সদ্য-বিয়ে হওয়া বউয়ের অপঘাতে মৃত্যু, সেটা তার গলায় অচ্ছেদ্য একটা ফাঁস হয়ে উঠবে অচিরেই যে তারই পূর্বসঙ্কেত যেন ঐ সাপের খোলসটা গলায় পেঁচিয়ে যাওয়া। কুসংস্কারের বশে তেমন কথাটা নোলকের ভাই ইস্রাফিলও কাঁদতে-কাঁদতে বলেছে অপঘাতে দিদির মৃত্যুর পর। কুসংস্কার হোক বা না-হোক এই ব্যাপারটা অবশ্যই একটা ধরনের নাটকীয় পূর্বসঙ্কেত বা ড্রামাটিক আয়রনি। লোকপ্রতীতিই কিন্তু সেটা সৃষ্টি করিয়েছে নাট্যকারকে দিয়ে।

নাটকের শেষ অংশে আরও একবার সাপের খোলসের উপলক্ষ এসেছে। অর্ধোন্মত্ত, প্রতিজিঘাংসু সয়ফর সাপের খোঁজে মেঝেতে শাবল চালাতে-চালাতে আকস্মিকভাবে গর্ত থেকে খুঁজে পায় একটা "ছোলঙ", অর্থাৎ সাপের খোলস। নোলুকের শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে এবং তার সর্পদংশনে মৃত্যুর কারণে সমাধিস্থ হবার পরে—দু-বারের সাপের খোলস-সংক্রান্ত এই উপলক্ষ দুটি যেন একটা প্রতীক সঙ্কেতের বৃত্তকেই সম্পূর্ণ করল।

'প্রাচ্য'-র মধ্যে একাধিকবার হ্যালুসিনেশ্যনের ঘটনাও ঘটেছে। বউ নিয়ে ফেরার পথে সয়ফরের মনে হয়েছিল, অনেকদিন আগে মৃত জিতু মাতব্বরের প্রেতমূর্তি যেন সাঁঝের অস্বচ্ছ আলো-আঁধারিতে পথের মাঝে এসে দাঁড়াল। জিতু মাতব্বরের কবলেই সয়ফরদের সামান্য জমিজমা যেটুকু ছিল, সেটা গেছে। ফলত, জিতু মাতব্বরের স্মৃতিটাও ছিল সয়ফরের কাছে অস্বস্তিকর, তার অবচেতনে একটা প্রতিহিংসাও জমা হয়েছিল জমি খোয়ানোর কারণে এবং বিয়ে করার খরচ জোটাতে শেষ দশ ডিসিম জমিও তাকে বেচে দিতে হল ঐ জিতুর পরিবারকেই—এই সমস্ত কারণে ঐ সুখের মুহূর্তেও তার অনুভূতির অন্তঃস্থলে নিরস্তিত্ব-জিতুর কল্পিত-প্রেতচ্ছায়া উপস্থিত হয়ে হ্যালুসিনেশনের সৃষ্টি করেছে। আল-দীন খুব কুশলী শৈলীতে এই ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন। এই প্রেতমূর্তির বিভ্রম, সূক্ষ্ম সঙ্কেতে সমাসন্ন একটা মৃত্যুর প্রতিভাসকেই ইঙ্গিত করে। এও এক ধরনের (সমালোচনার পরিভাষায়) নাটকীয় পূর্বাভাস, তথা ড্রামাটিক আয়রনি। এই ধরনের ব্যাপার অর্থাৎ এই মৃত্যুর অলক্ষ্যসঞ্চারী বিষণ্ণ আগমনীর ইঙ্গিত, আরও কয়েকবার ঘটেছে। সেই কথাগুলোতে পরে আসছি। তার আগে অন্যতর হ্যালুসিনেশনের প্রসঙ্গ।

উন্মাদ হিংস্রতায় সয়ফর যখন শাবল মেরে, ছেনি চালিয়ে খুনি সাপটাকে খুঁজছে সর্বত্র এবং সর্বত্রই যেন সেটার অস্তিত্ব অনুভব করছে, ঠিক তখনই একবার সাপটাকে সে 'প্রত্যক্ষ' করল! ক্রুদ্ধ আক্রোশে ছেনি চালিয়ে 'তার' ফণাকে 'দ্বিখণ্ডিত' করার পরও সয়ফর দেখল কিছুই নেই!

আবার তাকালেই ঘরের অন্য কোণে 'সেই' সাপ! এবারে সেও যেন হিশ্-শ্ শব্দে নিজের আক্রোশ জাহির করছে—সয়ফর ছেনি তুলতেই ফের মিলিয়ে যায় ছায়া-সর্প (বা, মায়া-সর্প!)—উত্তপ্ত মস্তিষ্ক এবং আরক্তিম চক্ষু নিয়ে তাকে কোথাও খুঁজে পায় না সয়ফরজান। সে নেই। এবং আছে!

আসলে সয়ফরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভব, বোধ এবং উৎকণ্ঠা সাপটার সন্ধানে একাগ্র হয়ে থাকায়, এবং শোকগ্রস্ত, ক্লান্ত ও ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের বিমিশ্র যোগফলে বিভ্রান্তি ঘটায়, সে ঐ 'হ্যালুসিনেশ্যন'-এর সম্মুখীন হয়েছে। হত্যাকারী কালনাগ তখন তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বিরাজমান। এমন একটা পরিস্থিতিতে অমন বিভ্রান্তি খুবই সম্ভবপর। সাপটাকে 'নাগালে' পেয়েও যে, বাস্তবত তার কোনও হানি করা সম্ভব হবে না সয়ফরের পক্ষে—এই বিভ্রান্তির ফলে উৎসর্জিত হ্যালুসিনেশ্যনের উপলক্ষ রচনা করে আল-দীন সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন খুব সম্ভবত।

৮

মৃত্যুর বিপর্যয় যে সমাসন্ন, তার অন্যান্য পূর্বসঙ্কেত পাবার যে-কথা একটু আগে লিখেছি, এবারে সেগুলির প্রসঙ্গে আসছি। সয়ফররা নোলককে নিয়ে শামুকভাঙা গাঁয়ে ফিরে আসার সময়ে ওর বন্ধু সুরুতালি আর সাইদল ইয়ার্কি করে যে কথা বলেছিল—"তর বউটা কি হরণ করব কেউ?"—এমন সঙ্কেত সেখান থেকেই শুরু। মৃত্যুই যে অপ্রতিরোধ্য অপহারক হয়ে নোলককে নিয়ে চলে যাবে, এটা তখন বোঝা না গেলেও নাটকের ক্লাইম্যাক্সে প্রথম মিলনের মুহূর্তেই নোলকের মৃত্যু ঘটলে খেয়াল-রাখা পাঠক/দর্শকের মনে কিন্তু ঐ কথাটা ফিরে আসে। ঐ রকমই আর একটা কথা কিছু পরেই বলেছিল সয়ফরের মামা, বরকর্তা সোমেজ মিয়া : "বিবাহযাত্রা আর শ্যাযযাত্রায় আকাশপাতাল মিল।" এরই অনুষঙ্গে সয়ফরের অবচেতন থেকে একটা অস্ফুট বোধ ধাক্কা মারতে থাকে : "তবে কি সে শবানুগমন করছে? কোন এক মৃত নারীকে বহন করছে?" ...আনুষঙ্গিক কাব্যাংশগুলির মধ্যেও মৃত্যুর শীতল সঙ্কেত বারবার বিন্যস্ত হয়েছে : "মৃতের রাজ্য" : "কবরের নিচে পোঁতা ছাওনি", "মৃতের পুরীর কোন রহস্য"; "ভূমিভেদী মৃতলোক"; "অতিলৌকিক বাঁশঝাড়" ... ইত্যাদি শব্দ বিভিন্ন সময়ে পদগুলির মধ্যে কীভাবে যেন একান্ত অপরিহার্য হয়ে-হয়ে, ধীরে-ধীরে আমাদের অজ্ঞাতেই মরণের পূর্বসঙ্কেত দিয়ে গেছে!

৯

রূপকথা পরণকথার "সবুজ পরী"-র কল্পনাকে জীবনের বাস্তবতায় কখন্য পাওয়া যায় না—এটা সয়ফরের অজানা ছিল না। তবু আশৈশব দাদির সেই বায়না-ভোলানো প্রতিশ্রুতি "তরে বিয়া করামু একখানা সোবুজ নিশাপরী" সেটা তার চেতন মনেরই এক কোণে লুকানো ছিল। নোলককে প্রথমবার কোনও ভাসানযাত্রার ভিড়ের মধ্যে দেখেই মজে যাবার সময়ে তার সীমাবদ্ধ আকাশকুসুম-কল্পনায় ঐ পরীর চিত্রকল্পই উঁকি মেরে গেছে! বউকে দেখে পড়শি মেয়েরাও ঠাট্টা করেছে সয়ফরকে : "সয়ফর ভাই এই আপনের সোবুজ নিশাপরী।" ...কিন্তু বাস্তবের এই ভেবে-নেওয়া পরীও অচিরেই রূপকথার পরীদের মতোই কোথাও হারিয়ে যেতে পারে—হারিয়ে যাবেই—সেটা সয়ফর থেকে শুরু করে অন্য কেউই বুঝতে পারেনি! ইউসুফ-জোলেখার কিংবা নদ্যার চাঁদ-মহুয়ার প্রেমকাহিনির প্রসঙ্গও দু-চার বার পদ-শিকলি-বোলাম ইত্যাদিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে, কিন্তু সেও তাদের মিলনের ইঙ্গিতেই, বিচ্ছেদের নয়। তবে হয়ত নাট্যকারের অভীপ্সাই ছিল বিচ্ছেদের ইঙ্গিত করা। তাই পরিণামে নায়িকার মরণে, 'মহুয়া' পালার অভিঘাতটাই বেশি হয়েছে, বিচ্ছেদ শেষে জোলেখা ও ইউসুফের মিলনের প্রতিভাস হয়ে গেছে নির্মূল। রূপকথার "সোবুজ পরী" হারিয়ে গেছে

লোকপুরাণকাহিনির "মনসার অনুচরীর" দংশনে—কনেযাত্রার পাল্‌কি থেকে, বাসরশয্যার খাটের নকশা অবধি, সর্বত্রই মনসা কিংবা বাসুকীর অলঙ্করণও বোধ হয় এ-নাটকের সর্পসঙ্কুল বিপন্নতার সূচক। নোলক যে কাজ্‌লাকান্দা গ্রাম থেকে শামুকভাঙা গ্রামে বধূ হয়ে এল—সেটাও বোধ হয় নাট্যকারের ভাবনার দিশারি : স্থানীয় বিভাষায় 'শামুকভাঙা' শব্দের অর্থ কিন্তু কেউটে সাপ যে, সেটা একাধিকবারই নাটকের মধ্যে উল্লেখিত। তা হলে কি, শামুকভা ঙা গাঁয়ে বউ হয়ে নোলকের আসা প্রকৃত-প্রস্তাবে তার মৃত্যুপুরীতে আগমনী এবং বিজয়া দুয়েরই ইঙ্গিত?

পালকিতে নতুন বউয়ের গা থেকে ভেসে-আসা প্রসাধনের সুরভিগুলো যেমন সয়ফরের কাছে চকিতে প্রতিভাত হয়েছিল অনির্দেশ্য অথচ সুনিশ্চিত "গন্ধসখি"-রূপা কয়েকটি নারীসত্তার ক্ষণিক আবির্ভাব এবং (অচিরেই) অন্তর্ধান হিশেবে, তেমনটা ঘটবে স্বয়ং নোলকের ক্ষেত্রেও, এই পরোক্ষ পূর্বাভাসও নাটকের একটা সময়ে লেখক দিয়েছেন। এই ব্যাপারটাকে যদি রূপকথাধর্মী বলি, হয়ত অসঙ্গত হবে না। এক অর্থে একে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মও বলা চলে হয়ত বা।

আসলে বলার কথা এইটাই যে, 'প্রাচ্য'-তে সেলিম আল-দীন প্রায় প্রথম থেকেই নোলকের সমাসন্ন মৃত্যুকে এইসব ড্রামাটিক আয়রনির অনুষঙ্গে অনুভব করাতে চেয়েছেন। সেখানে রূপকথা, লোকগীতিকা, লোকপুরাণ, সংস্কার, প্রেতপ্রতীতি, হ্যালুসিনেশ্যন, ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম, অবচেতনের দুর্নিরীক্ষ্য কিছু অনুভব...এবং আরও কিছু-কিছু ব্যাপারকে তাঁর অভিপ্রেত কাহিনিবিন্যাসের উপকরণ হিশেবে তিনি ব্যবহার করেছেন। অবশ্যই এ এক বিচিত্র অন্বেষণ।

জীবন এবং মৃত্যুর সীমানা-বৈতরণী ঠিক কতখানি বিস্তারে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সেই অনির্দিষ্ট অন্বেষণ বিশ্বসাহিত্যে বহুবারই ঘটেছে। ইস্তার-তাম্মুজ কিংবা ভেনাস-অ্যাডোনিসের পশ্চিমি মিথকথা কিংবা সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, বেহুলা-লখিন্দরের এদেশি ধ্রুবপদী বা লৌকিক পুরাণবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে ভার্জিলের 'ওভিদ' মহাকাব্যে, দান্তের 'দিভাইনা কোম্মেদিয়া'-তে, মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এ এই অন্বেষণ করা হয়েছে। ভারতের উপনিষদ কথায় আছে নচিকেতা স্বয়ং মৃত্যুদেবতার সম্মুখীন হয়ে জীবন-মৃত্যুর মহাজ্ঞান কী, কী তার সত্যস্বরূপ —সেই প্রশ্ন করেছেন। মৃত্যুর দেবতা পুরাণকথা-মিথকথায় মৃতের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন : পুনর্জীবন লাভ করেছেন তাম্মুজ অ্যাডোনিস-সত্যবান-নল-লখিন্দর। কিন্তু মৃত্যুর রহস্য দেবায়ত্তই থেকে গেছে সর্বক্ষেত্রে। শুধু নচিকেতাই ধ্রুবপদী কাহিনিবৃত্তে মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবৃত সত্যস্বরূপের হদিশ পেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে যম অবশ্য মৃত্যুর তত্ত্ব নিরাসক্ত দার্শনিকতার মাধ্যমে প্রতিবেদন করেছেন (যা, খুব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও তরু দত্তের দীর্ঘ কবিতা 'সাবিত্রী'-র মধ্যেও কিছুটা মেলে)। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের পরস্পর-সাপেক্ষতার তত্ত্বটি বরং তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের শেষ অংশে খুব গভীর ব্যঞ্জনাবহ করে অন্বিত করা হয়েছে।

আসলে, ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনায় অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব দুইই পরস্পরসাপেক্ষ এবং অনবচ্ছিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ থাকায় যে-সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, সেটিই নতুন পরিপ্রেক্ষায় পুনর্বিচার করেছেন আল-দীন তাঁর নাটকে। মৃত জীবনসাথীকে পুনর্জীবিত করে ফিরিয়ে আনার মিথীয় কল্পভাবনা এখানে নেই; যম দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর কাছ থেকে মহাজ্ঞান আহরণের পুরাতন পরম্পরার পুনরাবর্তন—তাও নেই। এখানে আল-দীন জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব সন্ধান করেছেন সম্পূর্ণ নতুন এক ভাবনায় প্রবুদ্ধ হয়ে। সয়ফরজান এখানে মৃতা দয়িতাকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবার জন্য মরণপণ প্রয়াসে সংগ্রাম করছে না, সেটা সে করছে তার স্ত্রীর হত্যাকারীকে শাস্তি দিয়ে প্রতিজিঘাংসা চরিতার্থ করতেই। ঐ হিংস্র সরীসৃপ এবং সে, তারা দুজনে হল বিশ্বপ্রকৃতির দুই বিপ্রতীপ শক্তির প্রতীকী চরিত্র : গোখরো সাপটা মৃত্যুর এবং সয়ফর নিজে জীবনের প্রতিভূস্বরূপ। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ

এটাই যে, ঠিক যে সময়ে সয়ফর নোলককে নিয়ে সৃজনের সাধনা করতে শুরু করেছে, তখনই ঐ সাপটা নোলকের দেহে ঢেলে দিয়েছে মৃত্যুর হলাহল!

১১

সমস্ত জীবন প্রাচীন সংস্কৃতিবলয়েই সাপ একই সঙ্গে মৃত্যু এবং প্রজননের প্রতীক বলে ধার্য হয়েছে : সাপের স্বপ্নও এক ধরনের প্রায়-প্রত্যক্ষ যৌন-অভীপ্সা বলেই মনে করেন মনোবিজ্ঞানীরা। লৌকিক সংস্কারও এই ভাবনারই পরিপোষক। তাই এখানে রমণ এবং মরণ একই সঙ্গে গ্রাস করেছে একটি নারীর শরীরকে, আর মরণই জিতেছে। ফলত, সয়ফর এবং গোখরো সাপ এখানে যেন একে অন্যের যৌন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেও প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে এবং তাই জীবন-মৃত্যুর অবস্থান-অনবস্থানের দ্বান্দ্বিকতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সমান্তরালতায় মনস্তাত্ত্বিক একটা তীব্র সংঘাতও সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে এখানে।

কাহিনির অন্তিম দৃশ্যে দুই হিংস্র সত্তা যখন একে অন্যকে মরিয়া আক্রমণে নিকেশ করতে সমুদ্যত, তখন দাদি—যাঁকে প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন আধ্যাত্মিক বোধির সুস্থিত প্রতিমা হিশেবেও ধার্য করতে পারি, দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে স্তব্ধ করিয়ে দেন যে উভয়কে, সেটিই হল জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের শেষ লব্ধফল। প্রভাতসূর্যের আলোয় স্তম্ভিত পুরুষটি দাঁড়িয়ে থাকে;আরণ্যক অন্ধকারে ধীরে-ধীরে আত্মগোপন করে সাপটা : "যে যার স্থানে থাকে।"

এইটাই হল এ-নাটকের দর্শন-প্রমা : জীবন আর মৃত্যু উভয়েই স্ব-স্ব স্থানের অধীশ্বর। শেষ পর্যন্ত কেউই অন্যকে চূড়ান্ত পরাভবে গ্রাস করতে পারে না। ফলে একটা অবধারিত সহাবস্থানে আবর্তিত হয় তারা। জয়-পরাজয়, অধিকার-অনধিকার—সবই তখন নিরর্থ।

১২

এ-নাটকের প্রথমার্ধে মৃত্যুর যে পূর্ব-প্রতিভাসগুলি কাহিনিকে অস্বস্তিতে আচ্ছন্ন করেছে, মৃত্যুর ঘটনাটা ঘটে যাবার পরে সেগুলোর আর কোনও অভিঘাত ছিল না। আবার দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সবটা জুড়েই সয়ফরের যে-ভূমিচ্ছেদী প্রয়াসে মৃত্যুর প্রতিভূকে খুঁজে পাবার নিরন্তরতা, সেটাও বিলীন হয়ে গেল সেই মৃত্যুদূতকে সকালবেলায় নাগালে পাবার পর। তার ঐ রাতভর মাটি খুঁড়ে-যাওয়া তো বস্তুতপক্ষে মানুষের চিরকালীন মহাজ্ঞান-অন্বেষণেরই রূপক। সেই জ্ঞান শেষ অবধি তার প্রায় আয়ত্ত হয় যখন, ঠিক তখনই মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয়তা রূপান্তরিত হয়ে যায় অজ্ঞেয়তায়। শেষ রহস্যটুকু আর ভেদ করা যায় না কোনওভাবেই।

প্রাচ্যের দর্শনপ্রতীতির এই চরম ও পরম সত্যটাই সেলিম আল-দীন তাঁর নাটকে নতুন বিন্যাস, বিশ্লেষণে সুস্থিত করেছেন।।



উৎপল দত্তের পথনাটক

• • • • • •

দর্শন চৌধুরী

'আমতার মাঠে বারো হাজার জনতা,
কিন্তু নিশ্ছিদ্র আঁধারে ডোবা।
কমরেড, এমন আলো জ্বেলেছেন,
আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।
দেখতে পাচ্ছি না জনতার মুখ
ক্রোধ, কৌতুক, বিদ্রোহের মানচিত্র।
জনতার ওপর আলো ফেলুন, কমরেড,
মাঠভর্তি ব্যাঘ্রচক্ষু জুলজুল করুক।
নইলে আমরাই যে আঁধারে পথ হারাই।
পথনাটিকার নায়করা বসে থাকবে
আলোর ওধারে?'

['পথ নাটিকা' ---উৎপল দত্ত : 'দিনবদলের কবিতা'। প্রমা প্রথম সংস্করণ, আগস্ট,১৯৯৮।

'প্রতিবাদ তাঁর কাছে রণনীতি, নাটক তাঁর কাছে রণকৌশল।'

গণনাট্য সঙ্ঘে যোগদান এবং পথনাটকে অংশগ্রহণ উৎপল দত্তের নাট্যভাবনার জগতে এনেছিল বিপ্লবী থিয়েটারের রসদ। যে কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতার চেয়ে উৎপল দত্তের পথনাটকের অভিনয়ে ভিড় হতো বেশি। ফলে তাঁকে এক-একদিন তিন চার জায়গায় এইসব পথনাটকের অভিনয় করতে হয়েছিল। উৎপল দত্ত বলতেন'চরিত্র বিশ্লেষণ-টিশ্লেষণ করবার জায়গা পথনাটিকা নয়। এটা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জায়গা।'

গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে পানুপালের লেখা 'ভোটের ভেট' পথনাটকে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্তের পথনাটকে অংশগ্রহণের শুরু। সেখান থেকেই তিনি পথনাটক অভিনয় ও পরিচালনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি নিজেই পথনাটক রচনা শুরু করেন এবং সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয়ও করতে থাকেন। বল যায়, বাংলাতে তিনিই প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে নিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করতে থাকেন। এইভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা এবং সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির তিনি শুধু ব্যাখ্যাতা নন, বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং গভীরতার মাধ্যমে প্রকৃত এবং উৎকৃষ্ট পথনাটক রচনা করেন। এই ব্যাপারে উৎপল দত্তের মতবাদ পরিষ্কার : 'মানুষকে শিল্পের মাধ্যমে আনন্দ দাও, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত করো। উদ্বুদ্ধ করো।' পথে নেমে নাটকাভিনয় পথের মানুষকে যে বাঁচার পথ দেখাতে পারে, উৎপল দত্ত সেই পথের দিশারী।

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে উৎপল দত্তের নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। সে একধরণের নাট্যপ্রয়োজনার অভিজ্ঞতা। গণনাট্যসঙ্ঘে এসে তিনি পথনাটকে অভিনয়ের নবতর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। যখন কোনও মানুষের বা দলের কোনও বিশেষ কথা মানুষের কাছে বলবার বা প্রচার করবার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক আগ্রহ কিংবা তাগিদ দেখা দেয়, তখনই নিজের গরজেই বা দলের প্রয়োজনে মানুষের কাছে ছুটে যেতে হয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাটক তৈরি করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মঞ্চ সাজিয়ে নাট্যাভিনয় করতে হয় এবং স্বভাবতই দর্শকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু পথনাটকে মঞ্চ নেই, স্থানিকবদ্ধ কোনও 'থিয়েটার হল' নেই। দর্শকের জন্য অপেক্ষা করে থাকবারও অবসর নেই। যেখানে দর্শক মিলতে পারে, সেখানেই নাটক নিয়ে গিয়ে হাজির হও। চৌরাস্তার মোড়ে, কারখানার গেটে, পার্কে, গ্রামে, ক্ষেতের ধারে, মন্দিরের চাতালে কিংবা কোনও প্রশস্ত আঙ্গিনায় নাটক এবং নাট্যদল নিয়ে হাজির হয়ে, সেখানকার পথচলতি জনতাকে দর্শকে পরিণত করে নিয়ে, তাদের সামনেই নাটক শুরু করে দেওয়া যায়। সেখানেই যে কোনও একটা দিকে চেয়ার-টেবিল পেতে কিংবা বেঞ্চ সাজিয়ে, কিছু না পেলে এমনিই, সামনে দর্শক রেখে অভিনয় করা যেতে পারে। এখানে থাকবে না নানান আলোর কারসাজি, সাজপোষাকের দেখনদারি, মেকআপের কারিকুরি। ইতিহাসের কোনও আখ্যান, সমসাময়িক কোনও ঘটনা কিংবা সমকালের সমাজদ্বন্দ্বের কোনও নমুনা, নাট্যবিষয়ের মধ্যে গেঁথে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে অথবা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো কিংবা পেট্রোম্যাক্সের আলোতে অভিনয় শুরু হয়ে যায়। এখানে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরতের পর পরতে চরিত্র বিশ্লেষণ নয়, ঘটনার ক্রমঅগ্রগতির মধ্য দিয়ে তার ট্রাজিক কি কমিক পরিণতি পায়। চরিত্রের বিশেষ কিছু টাইপকে তুলে এনে সমাজশোষণ, রাজনৈতিক শোষণ দেখিয়ে দেওয়া হয়। যে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য এই পথনাটক, ক্রমে সেই রাজনৈতিক ভাবনার কাছে দর্শককে এনে হাজির করিয়ে দেওয়া হয়।

'পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।' [উৎপল দত্ত —'সাদা পোষাক কালো হাত'; গণনাট্য পত্রিকা,১৯৮০]।

থিয়েটার বিপ্লব করে না। কিন্তু বিপ্লব করে যে জনগণ, তাদের চেতনার বিকাশ ঘটায় থিয়েটার। দর্শক তথা জনগণের মনে এই সমাজব্যবস্থা রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং ক্ষোভ ও ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। সাধারণ মানুষের মনে যে ভাবনাগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে সঞ্চরমান ছিল, পথনাটক সেইখানটায় আঘাত হেনে সেই বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলিকে একমুখীন করে তোলার চেষ্টা করে। তাদের এই ভাবনায় ভাবিত করে তোলার চেষ্টা করে। এইভাবে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার এক রাজনৈতিক একাত্মতার ভিত্তি গড়ে ওঠে। বিষম উদাহরণ হলেও অনেকটা রসবাদের 'সহিতত্ত্ব'-এর মতো। জনতা ও পথনাটিকার অভিনেতৃকুল একই সংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠে। উৎপল দত্তের মতে, এইভাবে দর্শকের মনের এলোমেলো প্রশ্নগুলিকে সুসংবদ্ধ করে তুলে, তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ঝোড়ো বিক্ষোভকে সচেতন প্রতিবাদে মুখর করে তোলা। এইভাবে 'বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড দর্শককে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ফৌজ- এ পরিণত করা যায়' [পথনাটিকা]।

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ঐকান্তিক আগ্রহের কারণেই নাট্যদল প্রসেনিয়ামের গণ্ডি ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশতলে জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতূহলের মাঝে গিয়ে হাজির হয়। পথচলতি জনতাকে দর্শকে পরিণত করে, সেই দর্শককে নাটকের মাধ্যমে নাট্যদলের ভাবনায় ভাবিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যায়। উৎপল দত্ত মনে করতেন, বাঁধামঞ্চে পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয়ের চেয়ে পথনাটিকার অভিনয় অনেকগুণ কঠিন। মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা, আলো, পোষাক, সাজগোছ, রঙ —

কোনও কিছুরই সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল অভিনেতৃকুলের ব্যক্তিত্বের জোরে আদায় করতে হবে সহস্র দর্শকের আগ্রহ ও মনোযোগ।

শ্রমজীবী, মেহনতি সাধারণ মানুষকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্যই নাট্য শিল্পের এই নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। মেহনতি মানুষের উজ্জীবনের বাস্তব তাগিদেই পথনাটিকার উদ্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশে বহুরূপীর দল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, বাড়ির উঠোনে—চাতালে তাদের ধর্মীয় কথা-কাহিনী শুনিয়ে বেড়াত। বিধর্মীর আঘাতের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত ও সাহসী করে তুলতে শ্রীচৈতন্যদেব মন্দিরের চাতালে বসে না থেকে, দল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে নামসঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় প্রত্যাঘাত হেনে ছিলেন। আজকের যুগে পথনাটক আর ধর্মীয় কথা শোনাতে পথে নেমে পড়ে না, বরং ধর্মকে নিয়ে যারা ব্যবসা বা রাজনীতি করে তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে জনগণকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা শোনায়। আর মূলত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই পথনাটক পথে পথে অভিনয় করে চলে। আর উৎপল দত্তের এই রাজনীতি ছিল মার্কসবাদের রাজনীতি। সমাজশোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি।

বলা যায়, পথনাটিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য। সেকথা উৎপল দত্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে 'রাজনীতিকে নাটকের বিষয়বস্তু করতে বাধাটা কোথায়? সমাজের সব সমস্যাই নাটকের এক্তিয়ারভুক্ত। আধুনিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনীতি। তাই রাজনীতিও নাটকের এক্তিয়ারভুক্ত' ['পথনাটিকা']।

উৎপল দত্ত লিখিত, নির্দেশিত এবং [বেশ কয়েকটিতে] অভিনীত পথনাটিকা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পাশপোর্ট[১৯৫১], নয়া তুঘলক [১৯৫৫], সমাজতন্ত্র [১৯৫৭], দৈনিক সন্দেশ [১৯৫৫], স্পেশাল ট্রেন [১৯৬১], গেরিলা [১৯৬৪], সমাজতান্ত্রিক চাল [১৯৬৫], জনতার কল্লোল [১৯৬৫-৬৬], মৃত্যুর অতীত [১৯৬৬], দিনবদলের পালা [১৯৬৭], ময়না তদন্ত [১৯৬৮], বর্গী এলো দেশে [১৯৭১], অস্ত্র [১৯৭৬], দিনবদলের দ্বিতীয় পালা [১৯৭৭], চক্রান্ত [১৯৭৯], কালোহাত [১৯৭৯], পেট্রল বোমা [১৯৮২], মালোপাড়ার মা [১৯৮৩], তিলজলার জল [১৯৮৩], মুমূর্ষু বাংলা [১৯৮৫], মুমূর্ষু নগরী [১৯৮৫], কাচের ঘর [১৯৮৭], হমে দ্যাখনা হ্যায় [১৯৮৯], মায়ের চোখে জল [১৯৯১],সত্তরের দশক [১৯৯২]।

এরমধ্যে 'পাশপোর্ট' থেকে 'ময়নাতদন্ত' পর্যন্ত পথনাটিকাগুলি 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' প্রযোজিত এবং 'বর্গী এলো দেশে' থেকে 'মায়ের চোখে জল' পর্যন্ত পথনাটিকাগুলি 'পিপলস লিটল থিয়েটার' প্রযোজিত। যদিও অভিনয়ের সব স্থলেই 'উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায়' নামটি ব্যবহৃত হতো।

উৎপল দত্ত পথনাটিকাগুলি শুধু রচনা নয়, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে সেইসব পথনাটকের পরিচালনা এবং তাতে অভিনয়ে অংশগ্রহণও করেছেন।

পথনাটকের ক্ষেত্রে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রেরণা উৎপল দত্ত পরবর্তীকালে 'সগর্বে' স্বীকার করেছিলেন :

'সঙ্ঘের যেদিকটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল—সেটি হল খোলা আকাশের নীচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে বিনা আড়ম্বরে রাস্তার পথচরীদের জড়ো করে তাদের সামনে অভিনয়। এর মধ্যে দেখলাম নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবার সম্ভাবনা, বিশেষকরে আমাদের মত দরিদ্র,

অশিক্ষিত দেশে মুকুন্দ দাস যাত্রাকে সর্বোপদেশের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন, এ তারই আধুনিক পকেট সংস্করণ।'

'নাটককে রাজনৈতিক প্রচারকার্যে ব্যবহার করা অন্যায়' ইত্যকার কথাবার্তা যখন চালু হয়েছিল, তখন উৎপল দত্তের সাফ জবাব,'নাটক রাজনীতি প্রচার করতে পারবে না এহেন তথ্য আপনারা কোত্থেকে পেলেন?' তাঁর ধারণাই ছিল এবং সঠিক ধারণাই ছিল, 'রাজনীতিভীতি — ও হল গণতন্ত্র নিধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। অভিনেতা, ছাত্র, উদ্বাস্তু, ডাক্তার, লেখক শিল্পী — সবাই রাজনীতি ছেড়ে সরে দাঁড়াল, তাহলেই কিছু পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ আয়েস করে ব্যবসা ফাঁদতে পারেন।' তাই কিছুতেই এটাকে তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর মত :

> 'নিশ্চয় ক্লাসিক নাটক, বিদেশের শ্রেষ্ঠ নাটকের অনুবাদ, সমসাময়িক কালোত্তর নাটক সবই করতে হবে। কিন্তু তার পাশে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথাগুলি কি প্রত্যক্ষভাবে বলার প্রয়োজন নেই? রাজনীতির আসরটাকে গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে পড়ব নাকি ?'

১৯৫২- এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৫৩-এর মহেশতলা উপনির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সুধীর ভাণ্ডারির সমর্থনে পানু পালের 'ভোটের ভেট' পথনাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, নেতৃত্বে পানু পাল। গণনাট্যসঙ্ঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ উৎপল দত্ত সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। সঙ্গী ছিলেন ঋত্বিক ঘটক, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখেরা। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে [মিনার্ভায় রীতিমত অভিনয় শুরুর পূর্ব পর্যন্ত] উৎপল দত্ত তাঁর নিজস্ব দল নিয়ে অসংখ্যবার পথনাটিকায় অংশ নিয়েছিলেন। তখন তাঁর দলের সঙ্গী ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিন্দী সেন, রাধা প্রমুখ। নানা ইস্যুতে তখন নানা জায়গায় এইসব পথনাটক অভিনয় করে এসেছেন। বেশির ভাগ নাটকের নাম থাকত না, পথনাটক হিসেবেই উল্লিখিত হত। স্পষ্ট জোরালো একটা গল্পের আদল রাখতে হবে, তার পুষ্টি ও চরম মুহূর্তও নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশি নয়। এই কাঠামোর উপরে রং-রেখার প্রলেপ দিতে হবে স্থানকাল বুঝে। বিভিন্ন এলাকার নিজস্ব সমস্যা, দাবি দাওয়া, প্রশ্ন-বক্তব্য অনায়াস দক্ষতায় অভিনেতারা নাটকের কাঠামোটির ওপরে কাহিনী গেঁথে চলবেন। বক্তব্য একই থাকলেও এলাকা থেকে এলাকায় পথনাটকের প্রকাশভঙ্গি বদলে যেতে পারে। অনেক পথনাটকের লিখিতরূপও ছিল না। বিষয়ও আগে ভাবা থাকত না। যখন যেখানে যেতেন সেখানকার মানুষের সমস্যা জেনে তখনই প্লট তৈরি করে নিয়ে মুখে মুখে রিহার্সাল দিয়ে অভিনয় শুরু করে দেওয়া হতো। এইভাবে তখন চন্দননগর, এন্টালির উপনির্বাচন, কৃষ্ণনগর লোকসভা উপনির্বাচন, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি, ভারত-পাকিস্তান দু-দেশের মধ্যে পাশপোর্ট চালু হওয়ার প্রতিবাদ, বাংলা-বিহার সংযুক্তি করণের বিরোধী আন্দোলন, সুতাকল ধর্মঘট ইত্যাদি উপলক্ষে তিনি তখন পথনাটকগুলি করে গেছেন। এর সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনগুলিতো ছিলই। তার জন্য শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরেও কতো জায়গায় গিয়েছেন। বজবজ-মহেশতলা থেকে কৃষ্ণনগর করিমপুর পর্যন্ত দক্ষিণ-উত্তরের পশ্চিমবাংলার অনেক অঞ্চলেই তাঁকে পথনাটক করতে হয়েছে। পথনাটক যে কতবড় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার, সে কথা পঞ্চাশের দশকের সেইসময়কার অনেক রাজনৈতিক সংগঠকের ধারণা ছিল না।

গণনাট্যসঙ্ঘ তাঁকে পথনাটক অভিনয়ে আকৃষ্ট ও উৎসাহী করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিভিন্ন জনতা তথা দর্শকগোষ্ঠী তাঁকে

জীবনবোধের অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশক থেকেই উৎপল দত্তের পথনাটক রচনা ও পরিচালনা ও অভিনয়ে জোয়ার এলো। পথনাটককে তিনি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মতো ব্যবহার করে, রাজনৈতিক বক্তব্যকে তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ, উপহাস এবং শাণিত প্রতিঘাতে প্রচারিত করে বাংলা পথনাটকের ঐতিহ্য ও ধারাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

পাশপোর্ট [১৯৫১-৫২] পথনাটিকাটি লেখা হয়েছিল একটি বিশেষ ইস্যু উপলক্ষে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলা দুটো আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়ে গেল। ১৯৫০-এর পর দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির ফলে দুইবঙ্গের মানুষদের এক বঙ্গ থেকে অন্য বঙ্গে যেতে গেলে'পাশপোর্ট' লাগবে ফলে আইন ঘোষিত হলো। তখনও একবঙ্গের মানুষ অন্যবঙ্গকে নিজের দেশের বাইরে বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়নি। বাঙালির প্রাণের বেদনার কেন্দ্রে এই পাশপোর্ট প্রথা তীব্রভাবে আঘাত সৃষ্টি করল। অনেকেই নিজের দেশ ছেড়ে উদ্বস্তু হয়ে চলে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। পাশপোর্ট প্রথা তাদের অনায়াস যাতায়াতের পথে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের প্রতিবন্ধকতা বলে প্রতিভাত হলো। সেদিন বাঙালি এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। পাশপোর্ট নাটিকা এই বিরোধিতারই পক্ষে প্রচারমূলক নাটক। নাটকটির রচনা, পরিচালন ও অভিনয়ে উৎপল দত্ত মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেন।

নয়া তুঘলক [১৯৫৫] নাটিকাটিও একটি বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক রচনা। স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হওয়ার [১৯৫০] পরে পরেই পশ্চিবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় বিহার প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় বাংলা-বিহার প্রদেশের সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব সে সময়ে বাঙালির কাছে আত্মহত্যারই শামিল বলে মনে হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নানা সংগঠনের তরফ থেকে এই সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি এই বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসি শাসকদলের রাজনৈতিক চক্রান্তের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। জনমানসের এই তীব্র বিরোধী প্রতিক্রিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগত মোকাবিলার প্রেক্ষিতেই 'নয়াতুঘলক' নাটিকা রচিত। এই নাটক ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলে দেয়। স্বাধীনদেশের কংগ্রেসি শাসকদলের ঘৃণ্য চক্রান্তের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছিল সেদিনের এই পথনাটিকায়। রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে উৎপল দত্ত।

১৯৬২-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে উৎপল দত্ত লিখলেন **স্পেশাল ট্রেন** [১৯৬১] সে সময়ে হুগলি জেলার হিন্দমোটর কারখানায় ছয় হাজার শ্রমিক তাদের মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। শ্রমিকদের দাবিতে বিড়লাগোষ্ঠীর মালিকপক্ষ কোনও রকম সাড়া না দেওয়ায় ১৯৬১-তে শ্রমিকেরা ধর্মঘট ডেকে কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করে দেয়।

শান্তিপূর্ণভাবে এই ধর্মঘট চলতে থাকলে মালিকপক্ষ মুনাফা হারানোর ভয়ে নানাভাবে এই ধর্মঘট বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, শাস্তির এবং বরখাস্তের পরোয়ানা জারি করেও শ্রমিকদের অনমনীয় মনোবল ভাঙা গেল না। তখন প্রশাসনের সহায়তায় বিড়লা গোষ্ঠীর মালিক পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্য নিল। পুলিশ অফিসার বলে: '১৯৬১ সালটা দুই কারণে গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত এটা রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী, দ্বিতীয়ত এটা পুলিশের শতবার্ষিকী। এটা বিড়লাজীর কারখানা। বিড়লাজীর হুকুমে খোদ পুলিশমন্ত্রী পর্যন্ত এখানে এসে হাজির হবেনখন।'

ধর্মঘটী শ্রমিকদের ক্যাম্প-অফিস লন্ডভন্ড করে দিয়েও তারা শান্ত হলো না। ধর্মঘটের যারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাদের মারধোর করা হলো, গ্রেপ্তার করা হলো। এইসব করেও, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও যখন ধর্মঘটের আন্দোলন থামানো গেল না, তখন শুরু হলো সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার। হিন্দমোটর কারখানার আশেপাশে যেসব শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুব-বৃদ্ধ-নারী ছিল তাদের সকলের ওপরেই নিপীড়ন করা হতে লাগলো। গুণ্ডাবাহিনী দোকানপাট লুঠ করল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের যাতে কেউ কোনওভাবে সাহায্য না করে, সেই নির্দেশের ফতোয়া দিয়ে সাধারণ মানুষের ওপরেও দমন-পীড়ন অব্যাহত রইল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহুরে এলাকাও রেহাই পেল না। এর ওপরে 'কম্যুনিস্ট এম.এল.এ. মনোরঞ্জন হাজরাকে অবধি ধরে কয়েকটা বুটের লাথি' মারা হয়েছে।

এতো করেও ধর্মঘট ওঠানো গেল না। তখন কৌশল করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে লাগল। হাওড়া-ব্যান্ডেল ট্রেন লাইনে তখন হিন্দমোটর একটি হল্ট স্টেশন। সব গাড়ি সেখানে দাঁড়ায় না। বিড়লার স্বার্থে এবার কংগ্রেসি সরকার বিশেষ অনুমতি দিল যাতে হিন্দমোটর হল্ট স্টেশনে বাড়তি অনেক ট্রেন দাঁড়ায়। সেইসব ট্রেনে বাইরে থেকে প্রচুর লোক নিয়ে এসে, দালাল-গুণ্ডা নিয়ে এসে, কারখানাটিকে চালু রাখার চেষ্টা করতে লাগল। বিড়লার সাহায্যের জন্য কংগ্রেসি সরকার যে বিশেষ 'স্পেশাল ট্রেন'-এর ব্যবস্থা করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরোধীভূমিকা পালন করেছিল সেইসময়ে, তাকে অবলম্বন করেই উৎপল দত্ত লিখলেন 'স্পেশাল ট্রেন' নাটিকাটি।

লেবার অফিসার বলে : 'কলকাতার রাধাবাজার স্ট্রিটে এক অফিস খুলেছি, সেখানে দালাল জড়ো করে স্পেশাল ট্রেনে নিয়ে আসছি হিন্দমোটরস-এ। .... বিড়লাজীর এক টেলিফোনে সরকার একেবারে তটস্থ হয়ে স্পেশাল ট্রেন দিয়ে বসেছে। বোঝাই হয়ে আসছে। দালালে বোঝাই। আজ রাত্রেই কারখানা চালু হবে।'

হিন্দমোটরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর মালিকপক্ষের নির্যাতন এবং নানা উপায়ে ধর্মঘট বানচাল করে দেওয়ার কৌশল —এই সমস্ত কোনও খবরই তখন কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

তাই সংবেদনশীল শিল্পী হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উৎপল দত্ত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দমোটর অঞ্চলে যান, সেখানকার ধর্মঘট-আন্দোলনের সব খবরাখবর নেন। মালিকপক্ষের অত্যাচার-পীড়ন, ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন তিনি দেখে আসেন, তখনই ঠিক করেন শিল্পীর হাতিয়ার যে নাটক সেই নাটক দিয়েই তিনি মালিকপক্ষের অত্যাচার, কারখানার শ্রমিক ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের ওপর নির্যাতন—এইসব সংবাদ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে শিল্পী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা করারও আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

'স্পেশাল ট্রেন' নাটিকার প্রথম অভিনয় হলো ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬১, গড়িয়াহাটের মোড়ে। তারপরে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সকালে বিকেলে-সন্ধ্যেয় অভিনয় হয়ে চলল নাটকটির। মনুমেন্টের তলায়, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে, ডালহৌসি চত্বরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে এই পথনাটিকা অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে চলল। সবচেয়ে সাড়া ফেলল হিন্দমোটর কারখানার গেটে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

প্রথমদিকে এই নাটিকায় অভিনয় করতেন :

বিধান মুখোপাধ্যায় — লেবার অফিসার; উৎপল দত্ত — পুলিশ ইনসপেক্টর; রমাবন্ধু চৌধুরী — পুলিশ কনস্টেবল নুনিয়া; কমল মুখোপাধ্যায় — শংকর দালাল; দেবেশ চক্রবর্তী — নাগরিক; শেখর চট্টোপাধ্যায় ও সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় — ধর্মঘটী শ্রমিক।

এইসময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নিয়ে 'অঙ্গার' নাটকাভিনয়ের

মাধ্যমে জনমানসে অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন। 'ফেরারী ফৌজ' অভিনীত হচ্ছে। লিটল থিয়েটার গ্রুপ তথা উৎপল দত্তের তখন জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। অভিনয়, মঞ্চকৌশল, মঞ্চমায়া এবং বিপ্লবের বাণী উদ্গীরণে মির্নাভা তখন জনকল্লোলে পরিণত। এইসময়েই একেবারে নিরাভরণ, মঞ্চমায়া ও কৌশলবিহীন উন্মুক্ত পথের মোড়ে উৎপল দত্তের এই পথনাটিকা জনসমাবেশকে আরো নতুনভাবে প্রাণিত ও উদ্দীপিত করে তুলল। মঞ্চের বিরাট সমারোহের বাইরে একেবারে খোলা পরিবেশে মঞ্চমায়ার সুযোগ না নিয়েও এই যে নাটকের অভিনয়, দর্শককে আবার তা নতুন করে সচকিত ও আন্দোলিত করে তুলল। পথনাটিকার ক্ষেত্রেও উৎপল দত্ত সবার সেরা হয়ে উঠলেন।

পথনাটিকার ভাবনা ও ধরন প্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার উদাহরণ 'স্পেশাল ট্রেন' নাটিকা থেকে দেওয়া যায়। প্রথম দিকে নাটিকাটি তৈরি হয়েছিল পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো। তাতে প্রাধান্য ছিল হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিকদের বোনাসের দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট এবং মালিকপক্ষের চক্রান্ত-কৌশল-পীড়ন-নির্যাতন। দৃঢ়বদ্ধ শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সমর্থন জানাল এ ধর্মঘটকে। সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র হয়ে গেল ধর্মঘটী শ্রমিকদের আন্দোলন। সঙ্গে এদেশের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষ সমর্থন জানাতে থাকল এই আন্দোলনকে। দালালদের সঙ্গে কথা বলে লেবার অফিসারের সংলাপ :'কোত্থেকে সব গাঁটকাটা বদমাশ ধরে আনেন!' উত্তরে পুলিশ অফিসার জানায়: 'তা স্যার, গাঁটকাটা ছাড়া কে মজুরদের ভাত মারতে দালাল হতে আসবে? ভদ্রসন্তান এদিকে মাড়াবেন ভেবেছেন?' ১৯৬১ শেষ হবার পরে পরেই ১৯৬২-তে দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হলো। নির্বাচন উপলক্ষে 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটিকার গুণগত ও ভাবনাগত পরিবর্তন করে নেওয়া হলো। পঁয়ত্রিশ মিনিটের নাটক হয়ে দাঁড়াল একঘন্টা দশ মিনিটের। হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিকদের বোনাসের দাবি পূরণের ধর্মঘট হয়ে দাঁড়াল শেষপর্যন্ত মতাদর্শের সংগ্রামের আন্দোলন। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করলে সে ছেড়ে কথা কইবে না। তার সব নখদন্ত নিয়ে সে হাজির হবে। আর অন্যদিকে ধনতন্ত্রের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের লড়াই চলবে নিরন্তর। অনির্বাণ সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঘনিয়ে আসবে ধনতন্ত্রের সঙ্কট, পুঁজিবাদের সবরকম শোষণ ব্যবস্থার সঙ্কট। এ লড়াই শুধুমাত্র একটি কারখানার মজদুরদের সংগ্রাম নয়, সারাদেশেই শ্রমিক-কৃষকের এই লড়াই অব্যাহত। তার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে পুঁজিবাদের সঙ্কটের কঙ্কাল।

পথনাটিকায় প্রথমে একটি অঞ্চলের একটি কারখানার নিজস্ব একটি সমস্যার গোটা ছবিটা ফুটে উঠেছিল। ক্রমে তা পরিণত হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক-মালিক সমস্যায়। ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিকাশ ও সঙ্কট এবং দুনিয়ার মজদুরদের নিরন্তর সংগ্রামে। যতদিন পুঁজিবাদের শোষণ ও ষড়যন্ত্র থাকবে, ততদিন চলবে এই লড়াই।

তাই 'স্পেশাল ট্রেন'-এর জনপ্রিয়তা যেমন ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছে, তেমনি ১৯৬২-এর নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের কাছে। নাটিকায় শ্রমিককে এক পুলিশ অফিসার বলে : 'না! পেটাবে না! তোরা এক অনুগত শ্রমিকের নাক-কান কেটেছিস। এত বড় অমানুষ তোরা।' উত্তরে দৃপ্ত শ্রমিক বলে ওঠে : 'নাক-কান কাটিনি এখনো, তবে কাটবো খুব শিগগির। বিড়লার দালাল কংগ্রেসী সরকারের নাক-কান কেটে গঙ্গাযাত্রা করাবো।'

উৎপল দত্ত তখন মিনার্ভায় সপ্তাহে রীতিমতো চারটি করে 'শো' করছেন। তারই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে নানা অঞ্চলে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারে এই পথনাটিকার অভিনয় করে আসছেন। এক-একদিনে তিন-চারটি করেও অভিনয় করতে হয়েছে নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে। স্থানীয় কারখানার শ্রমিক-

মালিকের সমস্যার একটি ইস্যু ক্রমে নির্বাচনী প্রচারে সারাদেশ জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গক্রমে ভারত-চীন সংঘর্ষের প্রশ্নও এখানে উত্থাপিত হলো। ১৯৬২-এর ভারত-চীন যুদ্ধ এবং সেই প্রসঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং দেশিয় কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্তকে তুলে এনে তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে উৎপল দত্তের 'দিনবদলের পালা' ছাড়া আর কোনও পথনাটিকা পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে এতো উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৯৬১-এর 'স্পোশাল ট্রেন' ধর্মঘটী শ্রমিক ও জনসাধারণের মনে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। পরের বছর সাধারণ নির্বাচনের সময়েই এই 'স্পোশাল ট্রেন' আরো বিস্তৃত, তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে একটি স্থানীয় সমস্যাই ক্রমে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও তার সমাধানের দৃঢ় হাতিয়ার হয়ে গেল।

শেষ অবধি স্পেশাল ট্রেনটি স্টেশনে পৌছল না। আগের 'উত্তরপাড়া স্টেশনে নাকি হাজার লোক জমা হয়ে দালালদের টেনে নামাচ্ছিল। পুলিশ এসে বেদম লাঠি চালিয়েও পাবলিককে ঠাণ্ডা করতে পারে নি। তাই ট্রেনের ড্রাইভার ভয় পেয়ে হিন্দমোটরে না থেমেই পালিয়ে গেছে।

লেবার।। উত্তরপাড়ার পাবলিক জানলো কি করে যে স্পেশাল ট্রেনে দালাল আসছে?

নুনিয়া।। হুজুর, রেল মজদুররা হাওড়া থেকে জানিয়েছে উত্তরপাড়া স্টেশন কর্মচারিদের, তারা আবার জানিয়েছে পাবলিককে।

পুলিশ।। ষড়যন্ত্র ! সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র!'

শ্রমিক চিৎকার করে বলে ওঠে : 'কি হলো? এইবার? হুজুররা এইবার কি বলেন? সাধের স্পেশাল ট্রেন কোথায় গেল? মজদুর মধ্যবিত্তের ঐক্যের সামনে বিড়লা আর তার সরকারি চাকররা এইবার কি করবেন? হিন্দমোটরের হরতাল ভাঙবেন না? আসুন। বিড়লারা আসুন। কংগ্রেসী পুলিশ আসুন হাজারে হাজারে। ফৌজ আনুন। তবু এ হরতাল চলবে। মুখোশ খুলে কংগ্রেস তার নগ্ন বীভৎস চেহারা দেখিয়েছে। সেই কংগ্রেসকে আর তার প্রভু বিড়লার দলকে টান মেরে ধূলোয় ফেলে দেওয়ার দিন আসছে ! দেরী নেই, আর দেরী নেই।'

জনসমাদরের কারণে নাটিকাটি মাত্র ২৫ পয়সা মূল্যে বিক্রির জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল। [প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ বসাক, মোবাইল লাইব্রেবী,কলকাতা-৬]।

১৯৬৪-এর শেষ দিকে লিখিত ও অভিনীত পথনাটিকা **সমাজতান্ত্রিক চাল**-ও একটি ইস্যুভিত্তিক রচনা। পশ্চিমবঙ্গে তখন খাদ্যসঙ্কট ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। দিনে দিনে চালের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি খাদ্যসঙ্কট ও চালের অভাবের দিনে, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীকে কাঁচকলা খাওয়ার উপদেশ দিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছেন।

খাদ্যাভাবের এই দুর্দিনে মানুষ অনাহারে মরে যেতে লাগল। খিদের জ্বালায় মা তার কোলের সন্তানকে মেরে ফেলেছিল বলে সংবাদপত্রে খবর বেরচ্ছে। এইসব নিয়ে বিধানসভা তখন উত্তপ্ত, তোলপাড়। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানালেন পশ্চিমবঙ্গে অনাহারে কারও মৃত্যু হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে পথনাটিকাটি তৈরি করলেন উৎপল দত্ত। তারই পরিচালনায় অভিনীত হতে থাকল। অবশ্য ১৯৬৫-এর আগস্টে প্রথম অভিনয় এবং সেপ্টেম্বরে উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হন। তাই নয়-দশবারের বেশি নাটকটি অভিনয় করা যায়নি।

কমিউনিস্ট পার্টিরও তখন দুর্দিন। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে বিরোধের ফলে কমিউনিস্ট

পার্টি তখন কংগ্রেস সরকার-এর কাছে দেশদ্রোহী। তাদের ওপর পীড়ন-অত্যাচার এবং কারারুদ্ধ করে রাখার প্রয়াস চালিয়েছে কংগ্রেস সরকার। এইসময়েই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভেদ ও বিরোধের ফলে পার্টি ভেঙে দুভাগ হয়ে গেছে। একদল সাবেক কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবেই রয়ে গেল। আরেকদল সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কমিউনিস্ট মতাদর্শের দল গড়ে তুলল— মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এই নিয়েও দুই কমিউনিস্ট দলের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মতাদর্শের লড়াই এবং সংগঠনগত পরিনির্মাণের সংগ্রাম বেড়েই চলল। দেশে খাদ্যাভাব, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর কংগ্রেস সরকারের নিপীড়ন, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত হওয়া—দেশ ও পার্টির এই সঙ্কটের সময়েই উৎপল দত্ত লিখলেন নতুন পথনাটিকা 'সমাজতান্ত্রিক চাল'।

১৯৬৪-এর ৭ নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির [তখনও দল ভেঙে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হয়নি] সপ্তম কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গণনাট্যসঙ্ঘ নাটক পরিবেশনের সুযোগ পেল। তখন গণনাট্য সঙ্ঘের বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা। নাটক করার সুযোগ পেয়ে সেই অবস্থাতেই গণনাট্যসঙ্ঘ তার নাট্যকর্মী ও শিল্পীদের নিয়ে আবার নাটক করার জন্য প্রস্তুত হলো। যে কয়জনকে জড়ো করা গেল, তাদের নিয়ে সেখানে অভিনীত হলো উৎপল দত্তের এই 'সমাজতান্ত্রিক চাল'। সেইসঙ্গেই সেখানে অভিনীত হয়েছিল অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস'। উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র [২] -এর পরিশিষ্টে নাটিকাটির প্রথম অভিনয়ের খবর দেওয়া হয়েছে ১৯৬৫-এর আগস্ট মাসে, হুগলির চুঁচুড়া কোর্টের সামনে কৃষক জমায়েতে।

'সমাজতান্ত্রিক চাল' নাটিকা নিয়ে কমিউনিস্ট দলের কর্মী ও সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ প্রকট হয়ে পড়ল। চীনের সমাজতন্ত্র এবং তার মতাদর্শ হলো একটি শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী পন্থা— এইরকম ধারণা নাটিকাটির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত বলতে চেয়েছিলেন। তারই ফলে চীনপন্থী ও রাশিয়াপন্থী দুই কমিউনিস্ট দলের মতাদর্শগত বিভেদের স্তূপে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করল। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন উঠতে লাগল। তখন থেকেই উৎপল দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বিতর্কিত চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হতে থাকেন।

অন্যদিকে কংগ্রেসি সরকার 'সমাজতান্ত্রিক চাল' নাটিকাটিকে বাজেয়াপ্ত করে। নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। নাটিকাটি 'গণশিল্পী সংস্থা'র প্রথম প্রকাশনা। জোছন দস্তিদার ছিলেন প্রকাশক। উৎপল দত্ত ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পরেই জোছন দস্তিদারও কারারুদ্ধ হন।

দেশের খাদ্যাভাবকে নিয়ে গড়ে উঠলেও, শাসকপক্ষ কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থান, তাদের সঙ্গে দেশের জোতদার, জমিদার ও শিল্পপতিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নাটকে দেখানো হয়েছে। তারফলে গোটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ছবিটাও উঠে এসেছে।

প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন—নির্মল ঘোষ [হৃদয়রঞ্জন মাইতি], কংগ্রেস M.L.A. গৌরহরিবাবুর চরিত্রে পরেশ গোস্বামী। এছাড়া চালের আড়তদার নটবর বাবুর ভূমিকায় উৎপল দত্ত, কমিউনিস্ট নেতার চরিত্রে শান্তনু ঘোষ এবং পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবল-এর চরিত্রে যথাক্রমে দেবেশ চক্রবর্তী ও মৃণাল ঘোষ।

এখানে 'চাল' শব্দটি দুই অর্থেই ব্যবহৃত। প্রথমত খাদ্যবস্তু 'চাল' এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক আচরণ বা 'চাল'।

যুবক হৃদয় মাইতির পিতা পরাধীন ভারতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের হাতে মার খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পড়াশুনা তার হয়নি, এখন বেকার। স্বাধীন দেশে সে নিজের রক্ত বেচে সেই পয়সায় মাকে নিয়ে বেঁচে আছে। কংগ্রেসি নেতা গৌরহরিবাবুর হয়ে সে কাজ শুরু

করে। 'নির্বাচনে আমার গণতান্ত্রিক কাজ ছিল কমিউনিস্ট ঠেঙানো'। নির্বাচনে জিতে গৌরহরিবাবু M.L.A. হলেন, হৃদয়ের কোন সুরাহা হলো না। অসুস্থ মাকে বাঁচাতে গৌরহরির শরণাপন্ন হয়ে সে দেখল, তিনি তাকে চিনতেই পারছেন না। তাছাড়া চীন-ভারত আক্রমণ করেছে, এখন সেটাই রুখতে হবে, তাহলেই দেশে সমাজতন্ত্র এসে যাবে। বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার্থে হৃদয়ের কাজ হলো আবার কমিউনিস্ট ঠেঙানো। মা মারা গেল, বিধবা বোন তিন বাচ্চা সহ হৃদয়ের কাছে এলো। হৃদয় বলে 'আমার আজকাল খেতে না পেলে বিশেষ কষ্ট হয় না। প্র্যাকটিশটা খুব পাকা হয়েছে কিনা। কিন্তু ঐ বাচ্চাগুলোর কান্নায় দিনরাত আমার ঘর প্রকম্পিত।' কিন্তু সমাজতন্ত্র আসে না, গৌরহরি বলে, 'দেশের মুসলমানগুলো সমাজেতন্ত্র ঠেকিয়ে রেখেছে। তাই হৃদয়ের কাজ হলো মুসলমান ঠেঙানো। আমি দেখছি সমাজতন্ত্র মানেই হচ্ছে কাউকে না কাউকে খুব একচোট ঠেঙানো।' হৃদয়ের প্রশ্ন, 'চাল, তেল, মাছ, নুন যে পাওয়া যাচ্ছে না এর জন্যে কাকে ঠেঙাতে হবে বলুন?'

কিন্তু দেখা গেল চালের আড়তদার তথা কালোবাজারি নটবরবাবুর সঙ্গে হাত মেলানো রয়েছে কংগ্রেসি M.L.A.- এর। তাদের কথোপকথন—

নটবর।। ঐ আমার চাল আর কি !

গৌরহরি।। আপনার চালচলন আমায় ধরে বোঝাচ্ছেন কেন?

নটবর।। সে চাল নয়, সে চাল নয়, আমার চাল।

গৌরহরি।। ঘরের চাল? উড়ে গেছে ঝড়ে? ফুটো হয়ে বৃষ্টি পড়ছে?

নটবর।। আজ্ঞে না, সে চাল নয়। আমার চাল ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

গৌরহরি।। কাকে চাল মেরেছিলেন? চাল মারতে গিয়ে ধরা পড়েছেন তো আমি কী করবো?

নটবর।।আরে ধেত্তেরি, মশাই, এসেম্বলি মেম্বার, অথচ ক'অক্ষর গোমাংস দেখছি। চাল--রাইস-ধান থেকে যা হয়।

এখন নটবরের মজুত চাল রক্ষার জন্য সেগুলি জমা রাখতে হবে গৌরহরিকে। তার বাড়িতে। নটবর তার নির্বাচনে টাকা দিয়েছে, বড়ো নেতাদের সঙ্গে তার যোগ-সাজস-গৌরহরি রাজি হন।

হৃদয় চাল চায়। তাকে রেশনকার্ডের ভড়কি দেখিয়ে নিরস্ত করা হয়। ভাতের বদলে রুটি খাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু গমেরও আকাল। তাই শেষ প্রস্তাব—মুক্ত বায়ু খাও। তবুও মজুত চাল থেকে একটি দানাও দেওয়া চলবে না।

ওদিকে বাইরে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিলের চিৎকার শোনা যায়। কমিউনিস্ট নেতা গণেশ বাগচির নেতৃত্বে মিছিল এগিয়ে আসে। গণেশের দাবি— 'সস্তাদরে চাল দাও, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্য চালু করো, চোরাকারবারী মজুতদারদের শাস্তি চাই, আর মজুত চাল উদ্ধার করতে হবে।' কোনটাই মানা সম্ভব নয় গৌরহরির। তাই পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু গণেশ জানিয়েছেন মিছিলে হাজার লোকের হাতে হাজার ঝাণ্ডার ডাণ্ডা রয়েছে, অতএব সাবধান। গৌরহরি বলে —'কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রকে আপনি ভাঁওতা মনে করেন?' উত্তরে গণেশ বাগচি— 'নিশ্চয়ই। সতেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিন তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার পর আজ যখন দেখি দুর্ভিক্ষের ছায়া, তখন আপনাদের সমাজতন্ত্রকে ভাঁওতা ছাড়া আর কী বলবো?' এরপরেই গণেশ বাগচি পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, জাতীয় আয় বাড়লেও টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, মাথাপিছু আয় কমেছে। 'এ এমন এক সমাজতান্ত্রিক দেশ যে, এখানকার লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র দশজনের হাতে অর্থাৎ ধনীদের হাতে' জাতীয় আয়ের সিংহভাগ জমা হয়। 'এ এমন

এক সমাজতান্ত্রিক দেশ যে বৃটিশ শাসনের দু-শ বৎসরে পুঁজিপতিরা যা আয় করেছিল, মাত্র সতেরো বৎসরের স্বাধীনতায় আয় করেছে তার চারগুণ।' প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৬২-এর জুনমাসে লোকসভায় একথা ঘোষণা করেছেন। এবং এও বলে গেলেন যে,'তাঁর সরকার বড় বড় পুঁজিপতিদের দালাল।' গণেশ বাগচির ঘোষণা,' আপনারা হলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনেদী দালাল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উঠতি দালাল। দেশকে অনেকদিন আগেই বেচেছেন বৃটিশ প্রভুদের পায়ে, আর এখন নূতন করে বেচছেন মার্কিন প্রভুদের পায়ে।' গৌরহরি এসব মানেন না, তার সাফ জবাব, 'এসব টিপিক্যাল চীনা কথাবার্তা। কোন্ চীনের দালাল এসব কথা বলছে?'

জনসংখ্যা বৃদ্ধিই ভারতের দুরবস্থার কারণ— এমনতর বক্তব্যকেও উড়িয়ে দেয় গণেশ বাগচি। গণেশের বক্তব্য—'ভারতের সমস্যা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বন্টনের বৈষম্য।' খাদ্যাভাবের জন্য দায়ি কংগ্রেস প্রভুরা, মজুতদারেরা। চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে না। সেখানে নতুন সুস্থ সমাজে প্রাচুর্যের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্যে বলা হচ্ছে —হোক লক্ষ শিশুর জন্ম।' আমাদের শিশুদের জন্যই এই সমাজ, আপনাদের প্রভু ঐ পেটমোটা যৌনব্যাধিগ্রস্ত মুনাফাবাজদের নয়।

গৌরহরি এসব বুঝতে চান না। তার ঐ একই কথা, এসবের জন্য দায়ী চীন—ওই নাক-খ্যাঁদারাই দায়ী। চীনা বর্বরদের সমর্থনে কোনো কথা বললে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করা হবে। গণেশ বলে—'যখনই দেশের লোক খেতে না পেয়ে আপনাদের ঠেঙাতে উদ্যত হয়, তখুনি এই চীন চীন রব তোলেন'।

এইসব তর্কাতর্কির মাঝে উৎপল নাটকটিকে এক নাটকীয়তার মোড়ে বেঁধে ফেলেন। খবর আসে এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে জলে ফেলে দিয়ে মারতে গিয়েছিল। লোকে বলছে খিদের জ্বালায় শিশুসন্তান কাঁদছিল, আর সহ্য করতে না পেরে মা তার সন্তানের খিদেকে চিরকালের মতো জুড়োতে চেয়েছিল। পুলিশ জানায়,'মেয়েটি পাগলি, এসব পাগলের কাণ্ড।' কিন্তু মা তার সন্তানকে মারে কেন, খিদের জ্বালা কি, এসব বোঝবার ক্ষমতা কংগ্রেসিদের নেই।

এইসময়েই জানা গেল, মা আর শিশু সন্তান শিবু—এরা হৃদয় মাইতিরই বোন এবং ভাগনে। হৃদয় উন্মাদবৎ হয়ে যায়। সেই এবার জানিয়ে দেয় নটবরের দারোয়ান গৌরহরি —নটবরের মজুত চাল জমা হচ্ছে গৌরহরির বাড়িতে। গণেশ তখন ঘোষণা করে : 'মালতী নামে বাংলাদেশের এক লাঞ্ছিতা অপমানিতা মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আসুন দূর করি এই জঞ্জাল। এই দেশকে মালতীর সন্তানের বাসযোগ্য করে রেখে যাবো এই প্রতিজ্ঞা করি'। নাটক শেষ হয়।

কংগ্রেসের সতেরো বছরের শাসনের ভাঁওতাবাজি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মিথ্যে বুজরুকি এবং ক্রমে জোতদার-জমিদার-শিল্পপতির দালাল সরকারে পরিণত হওয়া — খোলাখুলি এই নাটকে উৎপল দত্ত বলেছিলেন। দেশব্যপী খাদ্যাভাবের কারণ যে মজুতদার কালোবাজারীদের চক্রান্ত এবং কংগ্রেসের সেবাদাসবৃত্তি, দারোয়ানে পরিণত হওয়া, তা-ও বলে দিয়েছেন পরিসংখ্যান দিয়ে। চীনা আক্রমণের ধুয়া তুলে দেশের কমিউনিস্টদের ওপর পীড়ন করার এক কৌশল। যুদ্ধের জিগির তুলে দেশবাসীর খাদ্যসমস্যার চিৎকারকে চাপা দেওয়ার অভিনব কায়দা।

প্রবীন নাট্যব্যক্তিত্ব কুমার রায়ের মনে হয়েছে, 'এ যেন 'মানুষের অধিকারে'র আর এক ছোট সংস্করণ'; [সূত্রঃ উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র - ২, ভূমিকা]।

গেরিলা : ভারতের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর হাতে প্রমাণ রয়েছে, সি.পি.এম. গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। বক্তব্যের প্রতিবাদে উৎপল দত্ত লিখলেন গেরিলা পথনাটিকা।

সে সময়ে গুলজারিলাল নন্দা বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে সি.পি.এম.-এর নানা দপ্তর খানা তল্লাসি করে পাওয়া গেছে গোপনে চীন থেকে আনা পাণ্ডুলিপি, তাতে মাও-ৎসে-তুঙ ও চে-গুয়েভারা-র লেখা গেরিলা যুদ্ধের প্রবন্ধ রয়েছে।

নাটিকায় দেখানো হত, থলে থেকে বের করা হত ছাপা একটি বই, লণ্ডনের ক্যাসেল কোম্পানী থেকে প্রকাশিত 'গেরিলা ওয়ার ফেয়ার'। লেখক মাও এবং চে-গুয়েভারা। ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যাত যুদ্ধবিশারদ ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট। সারা পৃথিবীর সব জায়গাতেই এই বইটি বিক্রি হচ্ছে। কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে কিংবা পার্ক স্ট্রিটে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। তাহলে গোপনে চীন থেকে সেই বইয়ের পান্ডুলিপির আনার প্রয়োজনটা কী?

এই নিয়ে নাটিকার মজা জমে ওঠে। নদীয়ার তেহট্টে নাটিকার অভিনয় শেষ না হতেই স্থানীয় পুলিশ সাদা পোষাকে কিছু সমাজবিরোধীকে সঙ্গে নিয়ে নাটক এবং মিটিং আক্রমণ করে। পরে রঞ্জি স্টেডিয়ামে সি.পি.আই-এর যুব উৎসবের মঞ্চে জোর করে গেরিলা ও অন্যান্য পথনাটিকা অভিনয় করা হয়।

১৯৬৭-তে এসে উৎপল দত্তের আরেকটি অসাধারণ নাট্যকর্মের উল্লেখ করতেই হবে। দিনবদলের পালা [১৯৬৭]। মিনার্ভার প্রসেনিয়াম মঞ্চে পেশাদারিভাবে এই নাটকটির অভিনয় করেছেন। আবার বাংলার নানা অঞ্চলে একই নাটকের অভিনয় করে গেছেন পথনাটক কিংবা পোস্টারড্রামা হিসেবে। মিনার্ভায় পেশাদারি ভাবে অভিনীত হওয়ার চেয়ে, বাংলা প্রান্তরে প্রান্তরে, মাঠে ময়দানে এই নাটকের অভিনয়ই অসম্ভব রকমের সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কোনও নাটক যে এইভাবে একই সঙ্গে প্রসেনিয়ামের ঘেরাটোপের মধ্যে এবং উন্মুক্ত প্রান্তরের খোলা মঞ্চে এতোখানি জনসমাদর লাভ করতে পারে, কেবল তার রাজনৈতিক বক্তব্য, ভাবনা ও চরিত্রের জন্য, তা 'দিনবদলের পালা' নাটকটির সাফল্য জানা না থাকলে কল্পনাই করা যেত না। উৎপল দত্ত অভিনয় করতেন মিঃ ধরের চরিত্রে।

১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং সেই উপলক্ষে এটি লেখা। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো এটি প্রায় তিনঘন্টা ধরে অভিনয় হতো। প্রথম দিকে নাটিকাটি দেড়ঘন্টার একটু বেশি সময় ধরে অভিনয় হতো। পরে এটি আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টায় এসে দাঁড়ায়। উৎপল দত্ত এই প্রসঙ্গে মজা করে বলেছিলেন, কী করা যাবে ! শাসকশ্রেণী পরপর এমনসব ঘটনা ঘটিয়ে চলে যে, তার বিবরণ, পরিচয় ও প্রতিবাদ পরপর করতে গেলে নাটক বেড়ে যায়। আরেকটি নাটক নতুন করে লেখার ফুরসৎই শাসকশ্রেণী দেয় না।

তবে একথা ঠিক, 'পথনাটিকার ফর্মকে তার চরম পরিণতিতে নিয়ে গেছে' 'দিন বদলের পালা'। ১৯৬৫-৬৬-এর ভয়ঙ্করতম খাদ্যসঙ্কটের দিনে সারা দেশে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পুলিশের গুলি চলে। আন্দোলনকারীদের মৃত্যু হয়। তা নিয়ে দেশব্যাপী হৈ-চৈ পড়ে যায়। খাদ্য আন্দোলনের কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শুরু হয়ে যায়। বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন একই সঙ্গে হবে। কংগ্রেসি অপশাসন এবং তার বিরুদ্ধে মেহনতি জনতা, শ্রমিক, মজদুর, মধ্যবিত্তের লড়াই তখন তীব্র হয়ে ওঠে।

তখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি শাসনের বিদায় আসন্ন। কংগ্রেস উঠে পড়ে লেগেছে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতি দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে নিজেদের সঙ্গে লড়ছে। বামপন্থী সংশোধনবাদী সি.পি.আই. আপোষপন্থী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসের দোসর। বড়শত্রু কংগ্রেস এবং আপোষপন্থী সি.পি.আই. এই দুইয়ের বিরুদ্ধে সি.পি.আই [এম] দলকে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নেমে নির্বাচনী আসরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

১৯৬৭-এর অবশ্যম্ভাবী নির্বাচনেব মুখে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান ও চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'দিন বদলের পালা'। সেই সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বিশ্লেষণ, কংগ্রেস-সি.পি.আই.-এর আপোষকামী মনোভাব এবং শাসক-শোষকের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন দিন যে সমাগত, তারই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিত্র 'দিন বদলের পালা।'

বিষয় সম্পর্কে উৎপল দত্ত জানাচ্ছেন,'একটি খুনের মামলা অবলম্বন করে আমরা নেহরুর লোকসভা-বক্তৃতা উদ্ধৃত করে দেখাতাম ভারতই প্রথম সীমান্ত লঙ্ঘন করে চীনা সীমান্তরক্ষীদের আক্রমণ শুরু করে সেই '৫৭ সাল থেকে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসি রাজত্বের স্বরূপ ধরার চেষ্টা করতাম, শোষণবাদীদের [সি.পি.আই.] নির্বাচনী ইস্তাহার উদ্ধৃত করে দেখাতাম তারা আসলে কংগ্রেসের বি-টিম এবং সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের কারণ প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভার জালিয়াতি ও প্রবল অত্যাচারের খতিয়ান হাজির করতাম' [সূত্র : 'লিটল থিয়েটার ও আমি']।

মিনার্ভা থেকে নাটকের 'শো' -এর পর পথনাটকের দল বেড়িয়ে পড়ে। মিনার্ভায় 'শো' না থাকলে দুটো তিনটেও 'শো' করতে হয় এই পথনাটিকার। 'দিনবদলের পালা' নাটকের মধ্য দিয়ে জনগণের সেই সময়ের চাহিদার প্রকাশ এতোই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে, মঞ্চের এবং মঞ্চের ঘেরাটোপের বাইরেও এই নাটকের জনপ্রিয়তা কমেনি।নির্বাচনের মাঠে-ময়দানে নেমে পড়ে, রাজনৈতিক মিটিং-এর পরে এই নাটকের অভিনয় অদ্ভুত সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পোস্টার নাটক ও প্রসেনিয়াম নাটকের ভেদ সেদিন ঘুচে গিয়েছিল। মঞ্চের ঘেরাটোপের নাটককে অবলীলায় তিনি রাস্তায়, পার্কে, মাঠে জনতার সামনে নিয়ে এলেন, আবার রাস্তায় অভিনয় করা নাটককে উৎপল দত্ত অতি সাবলীলভাবে মঞ্চে তুলে আনলেন। সবসময়ে সঙ্গে রইলো জনসমর্থন। মুগ্ধ বিস্ময়ে দর্শক উদগ্রীব হয়ে নাটকটি দেখে যেত মধ্যরাত পর্যন্ত।

এই নাটক সেদিন জনমানসে কী প্রচণ্ড রকমের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেইসময়কার বিরুদ্ধ-রাজনীতির এক নেতার কথায়। তিনি বলেছিলেন, বামপন্থীদের রাজনৈতিক সভার শেষে যখন 'দিনবদলের পালা' অভিনয় হতো। তখন তিনি আত্মগোপন করে গিয়ে সেই নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন এবং সেই মুগ্ধতা তার এখনো কাটেনি। যদিও সেবার নির্বাচনে সেই নেতার রাজনৈতিক দল পরাজিত হয়েছিল।

১৯৬৭-তে, স্বাধীনতার প্রাপ্তির কুড়ি বছর ধরে একটানা ভারতবর্ষ শাসন করার পর, কংগ্রেস দলের পতন ঘটল। এবং পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলি মিলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। সেদিনই বদলের পালা ঘটে গিয়েছিল।

এরপরে জল অনেক গড়িয়েছে। ১৯৭২-এ আবার সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতা লাভ করে। বামপন্থীরা এই নির্বাচনের প্রতিবাদ জানায় এবং বিধানসভা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ বয়কট করে। পূর্ণ ক্ষমতায় পশ্চিমবঙ্গ দখল করে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস দল রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও বিভীষিকা তৈরি করে সবরকমের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইল। অন্যদিকে দ্বিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আবার ভেঙে সি.পি.আই. [এম-এল] দল তৈরি হয়েছে এবং তাদের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হানাহানি, মারামারি, গুপ্ত হত্যা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। কংগ্রেস তার প্রশাসনের মদতে সবরকমের বামপন্থী দলগুলির কাজকর্ম স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। হত্যা, নির্যাতন, ঘরছাড়া, জেলেবন্দী, বিনাবিচারে আটক নির্বিচারে চলল। সে-এক বিভীষিকার দিন পশ্চিমবঙ্গে। এরইমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। ফলে ১৯৭৫-এর জুন মাসে সারা

ভারতে ঘোষিত হয় এমার্জেন্সি বা জরুরী অবস্থা। রাজনৈতিক সন্ত্রাস তখন তুঙ্গে। তারই মধ্যে শুরু হলো ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচন। দেশের মধ্যেকার আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক চাপে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা তুলে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন সাধারণ নির্বাচন।

উৎপল দত্ত লিখলেন 'দিনবদলের দ্বিতীয় পালা [১৯৭৭]। প্রথম পালার দশবছর পরে দ্বিতীয় পালা। দুটিই অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির পালা। 'পালা' বদলের আগমনী 'পালা'। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে এবং অত্যাচার ও অত্যাচারির স্বরূপ বিশ্লেষণে পালাটি অনেক গভীর। ফেলে আসা সন্ত্রাসের ছবিগুলি মানুষকে স্বভাবতই উত্তেজিত করে তোলে। পুলিশ-প্রশাসন এবং কংগ্রেস দলের মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিন কি বীভৎস ও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছিল তার বিবরণ এতোই জীবন্ত ও বাস্তব ছিল যে, এই পথনাটক দেখতে দেখতে জনতা যেমন পিছন ফিরে ইতিহাসকে দেখতে পেত তেমনি ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অত্যাচারির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারত। দর্শকের মানসিক চেতনার স্তরে এই উত্তেজনা সৃষ্টি করাই তো পথ নাটকের প্রধানতম দায় ও কর্তব্য। তাই শুধু অত্যাচার, শুধুই সন্ত্রাস, শুধুই নিপীড়ন জ্বালার ছবি এই দ্বিতীয় পালা নয়। শত অত্যাচারের শেষে অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষই যে শেষ কথা বলবে— তারই ইঙ্গিত এই পথনাটিকায়।

এই নাটকটি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পি.এল.টি. নাট্যদল এবং উৎপল দত্ত পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। দ্বিতীয় পালায় যে বন্ধনমুক্তির আবাহন গাওয়া হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের নেতৃত্বেই এই পালাবদল ঘটবে বলা হয়েছিল, ১৯৭৭-এর নির্বাচনের ফলাফলই সে-কথা সত্য বলে প্রমাণ করেছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি একসঙ্গে মিলে গড়ে তুলল বামফ্রন্ট [এবার আর যুক্তফ্রন্ট নয়]। কংগ্রেসকে পরাজিত করে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতায় এলো বামফ্রন্ট। শুরু হলো নতুনতর পালাকীর্তন।

১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি সন্ত্রাস এবং প্রশাসনের নির্বিকার মনোভঙ্গি প্রতিফলিত 'বর্গী এলো দেশে' পথনাটিকায়। গোপনে প্রশাসনের মদত এবং নির্বিকার অত্যাচারের মুখোশ খুলে ধরা হয়েছে এই নাটিকায়। এই নাটকটিও উৎপল দত্ত এমনভাবে গেঁথেছিলেন যাতে এটিকে প্রসেনিয়াম মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে পথনাটিকা হিসেবেও অভিনয় করা যায়। উৎপল দত্ত অভিনয় করেছিলেন হারাধন উকিল-এর চরিত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০-এর দশকের গোড়াকার বিপর্যস্ত রাজনীতির কাহিনী এতে রয়েছে। উৎপল দত্ত তীব্রভাবে কংগ্রেসি রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও প্রশাসনিক হামলাকে আক্রমণ করে তার নগ্ন চিত্র তুলে ধরলেন এই নাটকে। সি.পি.এম. সদস্য অমিতাভ তার নিহত ভাই গৌতমের মৃত্যুর বিচার চেয়েছিল। উকিল হারাধন সওয়াল করতে উঠেছেন। সেই নিহত বিপ্লবী কিশোরের মৃত্যুর তদন্ত কমিশনের সামনে সরকারী পক্ষের সাক্ষীর কাছে তিনি একটি বই থেকে পড়ে শোনান : তাতে রয়েছে রক্তাক্ত বিপ্লব, সশস্ত্র সংগ্রাম, বহু মানুষের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতালাভের কথা। মানুষের মুক্তির কথা।

বইয়ের মলাট দেখে সরকারি সাক্ষীর বক্তব্য : 'মাও-এর লেখা বই এটি। এসব বিশ্রী রক্তাক্ত কথা আর কোন আহাম্মকের বইতে থাকবে?'

হারাধন উকিল মলাটের কাগজটি খুলে ফেললেন, দেখালেন এবং দর্শক দেখল, বইটি সুভাষচন্দ্রের লেখা। সুভাষচন্দ্র ও বিবেকানন্দকে প্রাসঙ্গিক করে তুলে উকিল হারাধন প্রশ্ন তোলেন : ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই দুই মনীষীই যদি এইসব কথা বলেন ও সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেন, তবে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা দোষ করল কোথায়?

কমিশনের চেয়ারম্যান, তার চেয়ারের পেছনের দেওয়ালে মাথার ওপরে রয়েছে 'সত্যমেব জয়তে' মহাত্মা গান্ধীর ছবি। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন: 'গান্ধী ছাড়া সবাই দেশের শত্রু।' হেসে ওঠে নাটকের জনতা এবং দর্শক জনতা। হারাধন উকিল চিৎকার করে বলে ওঠেন : 'মনে রাখবেন, এটা সুভাষের দেশ, সূর্য সেনের দেশ। এখানে জীবনে গান্ধীপূজা হয়নি, হবেও না।'

কমিউনিস্ট রাজনীতি বিচারে তৎকালীন কংগ্রেসি নেতা ও প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তার হুবহু ছবি এখানে ফুটে ওঠে। আবার দেখি, পুলিশ-প্রশাসনের কাছে সব কমিউনিস্টই এক। কে কোন সংগঠনের তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। অন্ততঃ উচ্চপক্ষ থেকে তেমন কোনও ফারাকের নির্দেশ নেই। অমিতাভ বলে : 'থানার মধ্যে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মারার সময় কি, কে কোন পার্টির কার্ড দেখে নেয় কলকাতার পুলিশ। তাদের কাছে সব 'শালা কমিউনিস্ট'।

কিন্তু একদিন যে দেশের সব 'শালাই' কমিউনিস্ট হয়ে উঠবে সে প্রত্যয় যেন নাটকের ছত্রে ছত্রে।

অষ্টাদশ শতকে আলিবর্দীর শাসনকালে বঙ্গদেশে নিরন্তর বর্গীর হাঙ্গামা হতো এবং সেই আক্রমণ ও অত্যাচারে বাঙালির জনজীবন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?'

সেদিন দেশের সব খোকা ঘুমিয়েছিল, পাড়া শান্ত হয়ে জুড়িয়েছিল, তাই বর্গী এসে দেশকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করে দিয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকে আবার যেন সেই বর্গীর হাঙ্গামা, বর্গী যেন নতুন বেশে এসেছে দেশে।

কিন্তু এবার 'খোকা জাগল পাড়া রাগল'— তাই বর্গী বিতাড়িত হলো অবশেষে। মানুষের জেগে ওঠা, তাদের জাগিয়ে তোলা এবং বর্গীর মোকাবিলা করে বর্গীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার সম্ভাবনার কথা এই নাটকে এবং পথনাটকে উৎপল দত্ত বলতে চেয়েছেন।

মালোপাড়ার মা লেখা হয় ১৯৮৪-এর সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে। উত্তরবঙ্গের মালোপাড়ায় সেদিন যে অত্যাচার হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। মালদহ জেলার রতুয়া থানার অন্তর্গত মালোপাড়া গ্রামে কংগ্রেসি গুণ্ডারা এখানকার মালো বা জেলেদের ওপর অত্যাচার চালায়। শুধু অত্যাচার নয়, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, বৃদ্ধ শিশু-নারী অবাধে সকলের ওপরই আক্রমণ করে। এরফলে বেশ কয়েকজন মারাও যায়। কংগ্রেসি গুণ্ডাদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সারাদেশে হৈ চৈ ফেলে দেয়। সেই বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নাটকটি লেখা হয়েছিল প্রথমে প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয়ের জন্য। ১৯৮৩-তে সেইভাবে 'মালোপাড়ার মা' অ্যাকাডেমি মঞ্চে অভিনীতও হলো। প্রথম অভিনয় ১৩ অক্টোবর।

পরের বছরই দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। উৎপল দত্ত এই নাটকটিকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে পথনাটকের আঙ্গিকে তৈরি করে নেন। পি.এল.টি.-র সঙ্গী সাথীদের নিয়ে এই পথনাটক তিনি বেশ কিছু স্থানে রীতিমত অভিনয় করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলেন ১৯৮৪-এর ৩১ অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধী কেন্দ্রিয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইসময় ও তারপরে উৎপল দত্তের বেশ কয়েকটি পথনাটক পশ্চিমবঙ্গবাসীকে মাতিয়ে দিয়েছিল। যেমন '**মুমূর্ষু বাংলা, মুমূর্ষু নগরী**, তার কিছু পরে **কাঁচের ঘর**। ইন্দিরাগান্ধীর পর প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাজীব গান্ধী প্রথমে যে লোকসভা নির্বাচন করেন [ডিসেম্বর,১৯৮৪]। সেই উপলক্ষে উৎপল দত্ত লেখেন **মুমূর্ষু নগরী** এবং **মুমূর্ষু বাংলা**। ১৯৮৭-তে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে তৈরি করেন **কাঁচের ঘর**। কাঁচের ঘর-এ উৎপল দত্ত অভিনয় করেছেন রতনলাল চরিত্রে।

'মুমূর্ষু বাংলা' মূলত তৈরি করা হয়েছিল বোলপুরে উপনির্বাচন উপলক্ষে। সেখানে সি.পি.আই. [এম] প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর সমর্থনে ডাকবাংলো মাঠে প্রথম পথনাটিকা হিসেবে অভিনীত হয়, ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫। 'কাঁচের ঘর' লেখা হয়েছিল ১৯৮৭-এর সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে। দুটি পথনাটকেই তীব্র ব্যঙ্গ, কৌতুক ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেসি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন।

১৯৫৫-তে পোস্টার নাটক করেছিলেন **'দৈনিক সন্দেশ'** [উৎপল অভিনয় করেন মিঃ ভড়-এর চরিত্রে]। এবার সরাসরি করলেন **দৈনিক বাজার পত্রিকা**। দুটিরই বিষয় অসুস্থ ও নীতিহীন সাংবাদিকতা। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির নষ্টচরিত্রের কার্যকলাপ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক পথনাটক 'দৈনিক বাজার পত্রিকা' প্রকারান্তরে অনেক সময়েই পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষায় প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের প্রতি তীব্র আক্রমণ। এই পথ নাটিকাটি কনস্টানটিন সিমনভ-এর 'দ্য রাশিয়ান কোয়েশ্চেন' নাটকের বাংলা রূপান্তর [সরোজ দত্ত ও উৎপল দত্ত] হিসেবে অনেক আগেই উৎপল দত্ত অভিনয় করেছিলেন। এখন আরো পরিবর্তন করে পথনাটিকা হিসেবে অভিনয় করতে থাকেন।

১৯৮৯-এর সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনক্ষমতা অব্যাহত বেগে চালিয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি নানাভাবে তাদের লেখায় ও সংবাদ পরিবেশনে বামপন্থী শাসন ও শাসকদল বামফ্রন্টকে আক্রমণ করতে থাকে। এই জাতীয় সংবাদপত্রকে সেদিন উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে আক্রমণ করেন এবং অতি নিপুণভাবে এই জাতীয় সংবাদপত্রের স্বরূপ ও চরিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন।

নাটকটি প্রথমে প্রসেনিয়াম মঞ্চ অ্যাকাডেমিতে ১১ ফেব্রুয়ারি,১৯৮৯ অভিনীত হয়। পরে নাটকটিকেই কিছু পরিবর্তন করে পথনাটিকা হিসেবে অভিনীত হয়। এই নাটকটি মঞ্চে কিংবা পথে, কোথাও তেমন ভালো চলেনি। নাটকটি তেমন জমেও নি।

১৯৮৯-এর ৭ নভেম্বর প্রথম অভিনয় করেন **হমে দেখনা হ্যায়** পথনাটকটি। কলকাতার সল্টলেক অঞ্চলে। এইসময়ে রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মা ইন্দিরা গান্ধীর আদুরে ছেলে রাজীব পাইলটের চাকরি ছেড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না, বিশেষ করে হিন্দিভাষায়। তাঁর হিন্দিভাষায় বক্তৃতার সময়ে প্রায়ই বলতেন হমে দেখনা হ্যায.। তাঁর শব্দ ব্যবহারের এই মুদ্রাদোষটিকে কাজে লাগিয়ে উৎপল দত্ত পথনাটকটি লিখেছেন। রাজীব গান্ধীর কথা বলার এই ধরনকে ব্যঙ্গ করতে করতে নাট্যকার উৎপল দত্ত রাজীব গান্ধীর তথা কংগ্রেসি সরকারের অপদার্থতা এবং ফাঁকা আওয়াজের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। রাজীবের কথা বলার রীতিকে ব্যঙ্গ করতে করতে উৎপল দত্ত তাঁর দল এবং সরকারের দিকে সেই ব্যঙ্গকে টেনে এনেছেন এবং ক্রমে ব্যক্তির অপদার্থতাকে দেশশাসনের অপদার্থতার বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তারিত করে দিয়েছেন।

১৯৯২-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে উৎপল দত্ত লেখেন **সত্তরের দশক** পথনাটক এবং ১৯৯১-এর শেষদিকে অভিনয় শুরু করেন। নতুন প্রজন্মের কাছে কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার সত্তরের দশকের ভয়াবহ পরিবেশ ও কংগ্রেসি অত্যাচারের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি জাগিয়ে তুলে তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা উসকে দিতে চেয়েছেন। বামফ্রন্টের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের নিশ্চিন্ত সুখ ও নিরাপত্তার কথাও বলে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের রাজ্যের সুখ-শান্তির প্রেক্ষাপটে পেছনে ফিরে উৎপল দত্ত ফেলে আসা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি সন্ত্রাস তথা সত্তরের দশকের রাজনীতির বিভীষিকার ছবি তুলে ধরেছেন। বিগত এই সত্তরের দশকের বিভীষিকা ও শাসকের অপকীর্তিকে অবলম্বন করে উৎপল

দত্ত সমসময়ে 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' কিংবা 'এবার রাজার পালা' লিখেছিলেন। বাইশ বছর পরেও তিনি সে বিভীষিকা ভুলতে পারেন নি। যে প্রজন্ম এসব খবর জানে না তাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন সেই বিভীষিকার বীভৎস স্মৃতি।



প্লে-রাইট শেকস্‌পীয়ার : 'কালের রাখাল'

• • • • • •

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালজয়ী লেখকের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, তাঁর সৃষ্টির সব দিকগুলি সমকালের চাহিদা পূরণ করে চিরকালীন সমাজ সত্য হয়ে ওঠে। ইংরাজী সাহিত্যে চসারের 'ক্যান্টারবারি টেলস', সুইপ্‌টের 'গালিভার ট্রাভেলস', ফরাসী সাহিত্যে এমিল জোলার 'জারমিনাল', স্তাঁদালের 'মাদাম বোভারি'। রুশ সাহিত্যে টলস্টয়ের 'রেজারেকশন', গোর্কির 'মাদার', চেকভের 'চেরী আর্চার্ড'। এগুলি অনেক সফল সৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'রক্তকরবী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'। আবার কালজয়ী শিল্পস্রষ্টাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে কালিদাস-শূদ্রক-শেকস্‌পীয়ার-রবীন্দ্রনাথের মত নাম খুব কম, আঙুলে গোনা যায়।

শেকস্‌পীয়ারের মত ব্যক্তিত্বের শত শত বছর ধরে পাঠক-দর্শকের হৃদয় জয় করার চাবিকাঠির অনুসন্ধান কম হয়নি। সারা বিশ্বের সব প্রধান ভাষায় শেকস্‌পীয়ার-চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। হবেও। তাঁর উপর লেখা সমালোচনামূলক গ্রন্থের সংখ্যাও প্রভূত—বিশ্বের আর কোনও নাট্যকার নিয়ে এতো আলোচনা হয়নি। তাঁর সব নাটকই যে সর্বাঙ্গসুন্দর এমন দাবি কোনও সমালোচকই করেন নি।

শেকস্‌পীয়ারের নাট্যভাষা আসলে মধ্যযুগীয় ইংরাজি শব্দসম্বলিত, একালে যার অনেকই অচল। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে যে আদব-কায়দা, দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ—আজকের যুগে তা পুরাতন। তাঁর বিশ্ববন্দিত নাটকগুলির পাশাপাশি বিশ্ব-উপেক্ষিত নাটকও রয়েছে, যেমন, Timon of Athenes, Pericles, Cymbeline, The two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew. শেকস্‌পীয়ারের অনেক অন্ধভক্তও এমন নাটকের ব্যাপারে যে বিশেষ কিছু জানেন না, তার কারণ এ নয় যে, তাঁরা পাঠক বা দর্শক হিসেবে সাধারণ স্তরের—আসলে এগুলিতে নাট্যকারের শিল্পমনন বিশেষ দানা বাঁধতে পারেনি। এই সীমাবদ্ধতাগুলি অবশ্য তাঁর স্বকৃত নয়—যখনই একটানা লিখেছেন, বিশেষত ১৫৯৮, ১৬০৪, ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে—তখনই তিনি কিছুটা বিভ্রান্ত; ফলত তাঁর সৃষ্টি সেক্ষেত্রে অপরিণত। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। শেকস্‌পীয়ারের চিরায়ত সৃষ্টিগুলি সম্পর্কে একটাই বক্তব্য, তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে মাটির যোগ রয়েছে, তা সে চরিত্র অভিজাতই হোক বা অনভিজাতই হোক।

মার্লো বনাম শেকস্‌পীয়ার :

শেকস্‌পীয়ার ষোড়শ শতাব্দীর নাট্যজগতে একক নাট্যকার নন; টমাস কিড, জর্জ পিল, রবার্ট গ্রীণ, টমাস ন্যাশ নামক তাঁর সমকালীন চার নাট্যকার এমনকি একই বছর জন্মেছিলেন ১৫৫৮ সালে।

ব্রাডলে শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজেডি-সম্পর্কিত আলোচনায় নায়কের পতনের জন্য কোনও না কোনও 'flaw'-এর কথা বলেছিলেন। এ কথা মার্লোর নায়কদের সম্পর্কে আরও বেশি করে বলা যায়। আর তাই মার্লোর নায়ক তাতার টেমারলেন, ড. ফস্টাস, বারাবাস প্রমুখরা পরবর্তীকালে

বিশেষ পরিচিত রইল না। শেকস্‌পীয়ারের নাট্যচরিত্রগুলির ভ্রান্তিই তাদের ট্রাজেডির মূল—কিন্তু সেই ত্রুটিগুলি মৃদু উচ্চারিত। দর্শকদেব ভাবনার উপর মার্লো আস্থা রাখতে পারেননি, শেকস্‌পীয়ার পেরেছিলেন।

শেকস্‌পীয়ার মার্লোর সমকালীন—কেউ কেউ বলেন, তিনি নাকি মার্লোর সাকরেদিও করেছিলেন। কিন্তু মার্লো তো মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে একটি সরাইখানায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান! তাহলে শেকস্‌পীয়ার সে সুযোগ পাবেন কি করে?

আসলে মার্লো ও শেকস্‌পীয়ারের জীবন এত বৈচিত্র্যময়. যে তাঁদের নিয়ে অনেক গালগল্প ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে সব প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলিই তাঁর নাট্যকার জীবনকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট। মার্লো জন্মেছিলেন মুচির ঘরে, অস্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছিলেন। শেকস্‌পীয়ার ঠিক তার বিপরীত। তিনি জন্মেছিলেন এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে; কিন্তু তাঁর জীবন-চর্যা ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মতো। তাই অনন্তকাল ধরে সাধারণ মানুষ তাঁর নাটক পড়ছেন-দেখছেন। তেমনি পড়বেন ও দেখবেন আরও বহু শতাব্দী।

সব দেশের সব লেখকের জীবন-যাপন ও জীবনাদর্শ তাঁদের সাহিত্যের উপর ছাপ ফেলে যায়। ভাববাদী বা বস্তুবাদী উভয় গোত্রের লেখকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। তবু সকলেই যে কালজয়ী হন না, কেউ কেউ হতে পারেন, তার কারণ প্রকৃত স্রষ্টার রচনা-কর্মে প্রেম, ভালবাসা, ঈর্ষা, হিংসা, মহত্ত্ব, দীনতা, কুশ্রীতা, সৌন্দর্য প্রভৃতির চিরায়ত রূপ ধরা পড়ে। শেকস্‌পীয়ারের ক্ষেত্রে এ কথা নিশ্চিত সত্য। তাঁর নাটকাবলি পড়লে সর্বস্তরের মানুষের বহু বিচিত্র মানসিকতার সর্বাঙ্গীণ ছবি আমরা পেয়ে যাই। সম্রাট, সেনাপতি, ভাঁড়, প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে মুচি পর্যন্ত—তাঁর অঙ্কিত সর্বশ্রেণীর চরিত্রই জীবন্ত, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই রকম আছে, কখনোই পুরোনো হবে না।

কিন্তু শেকস্‌পীয়ার যদি শুধুই হেনরী বা রিচার্ড রাজপরিবারের নাটকগুলিই লিখতেন তাহলে তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে যেত। তাঁর সমকালীন চার্চ, রাজপুরুষ ও পার্লামেন্টের সংঘাতের কথা তাঁর নাটকে আছে। তবুও সে নাটকগুলি ইতিহাসের জ্ঞানলাভের জন্য অবশ্য-দ্রষ্টব্য নয়—তা জানার জন্য তো স্টুয়ার্ট, মিল, ওয়েলস, মার্কস প্রমুখের গ্রন্থগুলিই যথেষ্ট। তবে কেন সেই শেকস্‌পীয়ার আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার?

সাদামাটা জীবন ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, মাত্র আঠারো বছর বয়সে এক ছাব্বিশ বছরের রমণীকে বিবাহ করা ছাড়া শেকস্‌পীয়ারের জীবন খুব কিছু বৈচিত্র্যময় নয়। গ্রীক সামান্য পড়েছিলেন তার চেয়ে একটু বেশি ল্যাটিন। মার্লোর মতো দুঃসাহসী মোটেই ছিলেন না। তিন পুত্র-কন্যার পিতা। মাত্র ২৮ বছর বয়সে [১৫৯২] তিনি কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি আগে উদ্ধার করছি ঃ

এক. ১৫৯১—১৫৯৬ সালে তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলি লেখা হয়ে যায়।

দুই. ১৫৯২ সালে তরুণ অভিনেতা রূপে তাঁর পরিচিতি—১৫৯৪ সালে Lord Chamberlain's Company নামক নাট্যদলের তিনি একজন অংশীদার হন।

তিন. বেন জনসনের 'Every man in his humour' নাটকের অভিনয় [১৫৯৮]-এর ক্ষেত্রে তালিকায় অভিনেতা হিসেবে তাঁর নাম প্রথম। এ সময় তিনি নাটক লিখে ও অভিনয় করে প্রভূত সম্পত্তি করেছেন।

চার. ১৫৯৭ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি এবং সনেটগুলি লেখা

হয়। ১৬০১ থেকে ১৬০৮ সালের ব্যবধানে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ট্রাজিডি নাটকগুলি তিনি লিখে ফেললেন। ১৬১৬ সালে, মৃত্যুর ক'বছর আগে থেকেই তাঁর নাট্যরচনা বন্ধ হয়ে যায় এবং কর্তব্যপরায়ণ পিতা ও স্বামীর ভূমিকামাত্র পালন করেন।

লক্ষণীয়, এর চেয়ে অনেক চমকপ্রদ ও বৈচিত্র্যময় জীবন বাংলায় নাট্যকার মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের। তুলনা করে দেখলে আরও অনেকেরই। তবু এঁরা কেউই তাঁর মত অতলান্ত জীবনাবেগ ও চিরস্মরণীয় নাট্যচরিত্র সৃষ্টিতে অপারগ কেন বুঝে দেখতে হয়।

আর একটি কথা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শেকস্‌পীয়ারের অপার ঈশ্বরবিশ্বাসও অচল। ১৬১৬ সালের মার্চ মাসে তিনি যে উইল করে যান এবং এখনও যে কেউ সামারসেট হাউস-এ রক্ষিত সে তিন-পৃষ্ঠার উইলটি দেখতে পারেন, তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

First, I Commend my soul into the hands of God, my creator, hoping and assuredly believing, Though the only merit of Jesus christ my saviour, to be made partaker of life everlasting.

এমন ঈশ্বরবিশ্বাসীর তো Mythological Drama লেখার কথা ছিল? কিন্তু তা না লিখে তিনি ডুব দিলেন চিরন্তন মানব-অন্তরের গভীরে। যাঁর জীবন ছিল ছা-পোষা সংসারীর, যিনি ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীল, নাটকের অঙ্ক-দৃশ্যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তাঁর সাফল্যের চাবিটির সন্ধান পেয়েছিলেন কবি কীটস্‌। বন্ধু রেনল্ডসকে একটি চিঠিতে তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরও সেখান থেকেই বুঝে নেওয়া যায়। কীটসের কথায় :

Which is the best of Shakespeare's plays? I mean in what mood and with What accompaniment do you like the sea best?

শেকস্‌পীয়ারের নাট্যসাহিত্যের সমুদ্র মন্থনের শেষ নেই। কীটস্‌ ঠিকই বুঝেছিলেন।

প্রেম যুগে যুগে

শেকস্‌পীয়ারের কমেডি-ট্রাজেডির চিরপরিচিতির পিছনে রয়েছে মানব প্রেমের বহুধা-বিভক্ত রূপের নাট্যচিত্রণ। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বড় প্রেম কেবল কাছেই টানে না, তা দূরেও সরিয়ে দেয়। 'অ্যান্টনি এ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' দিয়েই শুরু করা যাক। নাটকের প্রথম অঙ্কে, প্রথম দৃশ্যে স্বয়ং নাট্যকার নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে বলেছেন 'Such a mutual pair'। এদের রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই প্লুটার্কের কাছে ঋণী। রহস্যময়ী অপার সৌন্দর্যময়ী তো চিরকালের পাঠক-দর্শকের আদর্শ। ক্লিওপেট্রা যে লন্ডনের বিভিন্ন নাট্যশালায় বহু অভিনেত্রী দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অভিনীত তার কারণ তো একটাই, এই নারী, চির আকর্ষণীয়া। তার ও অ্যান্টনির ট্রাজিক মৃত্যুতে কোনো terror বা horror নেই, আছে কাব্যিক ব্যঞ্জনা।

কেন এই নাটকের মতোই, দর্শকরা আজও বারবার ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো পড়তে ও দেখতে চান, তারও উত্তর একই—প্রেমের নানা বর্ণচ্ছটার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, ১৬০৪ সালে 'ওথেলো' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তারপর চারশ' বছর পেরিয়ে গেছে। প্রেমের অন্তহীন আবেগ অনেক মানুষকে ওথেলোর মত, তার আগে পরে, ক্রোধান্ধ করে তুলেছে—ডেসডিমোনার মত কত নারী প্রিয়জনের হাতে প্রাণ দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। ওথেলোর আগে ও পরেও অনেক ট্রাজেডি লেখা হয়েছে, কিন্তু ডেসডিমোনার মত মর্মন্তুদ উক্তি, হত্যায় উদ্যত স্বামীর প্রতি, ক'জন নারী করতে পেরেছে? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওথেলোর কাছে তার করুণ প্রার্থনা :

O, banish me, my lord, but kill me not...kill me
tomorrow; let me live to-night!...But half an hour.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শকুন্তলা মিরান্দা ও ডেসডিমোনা' প্রবন্ধে ডেসডিমোনাকে শকুন্তলার চেয়ে অনেক উন্নত চরিত্র বলে দাবি করেছেন। উনিশ শতকে কলকাতার বুকে বিদেশী রঙ্গালয়ে যখন ওথেলো অভিনীত হতো তখন দর্শকদের মধ্যে কি তীব্র সাড়া! হতে পারে নাটকটির তীব্র dramatic action, সুতীব্র climax ইত্যাদি সেই সাফল্যের ক্ষেত্রে সহায়ক, কিন্তু প্রধানত প্রেমের নেশায় পারিবারিক বিপর্যয়ই এর মূলবিন্দু।

'হ্যামলেট'ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শকদের ভাবাচ্ছে। চরিত্রটি একটু বেশি মাত্রায় অস্থির হলেও ক্লডিয়াসকে হত্যা করতে সে দীর্ঘ সময় নিল। কিন্তু এ কথা তো মানতেই হবে, ডোভার উইলসনের মতোই, নাট্যকার শেকস্‌পীয়ার 'creates this supreme illusion of a great and mysterious character!' গণনাট্যের নেতৃস্থানীয় যখন হ্যামলেটের নাট্যরূপ দেন তখন বুঝে নিতে হয় কালের কষ্টিপাথরে হ্যামলেটের উক্তি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হ্যামলেটের স্বগতোক্তি :

How weary, Stale, flat and unprofitable
Seem to me all the uses of this world! [Act I, Scene II]

আর দর্শক মনে রাখে ওফেলিয়াকে। নায়ক-নায়িকার রজনীগন্ধাসম প্রেমসৌরভ দম্‌কা হাওয়ায় ভেসে গেল। এ দুঃখ তো চিরকালের দর্শকের।

শেকস্‌পীয়ারের মজা

অর্থাৎ শেকস্‌পীয়ারের কমেডিগুলি। সংখ্যায় তাও কম নয়। ট্র্যাজেডি অবশ্যই উন্নততর সৃষ্টি, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের হাতে পড়লে সে কমেডিও শাশ্বত মঞ্চসাফল্য পেতে পারে তার প্রমাণ উৎপল দত্তের 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' ['Mid Summer Nights' dream'] প্রযোজনায়। এলিজাবেথ শেকস্‌পীয়ারের নানা নাট্যাভিনয় দেখতেন। 'মেরী ওয়াইভস্‌ অব উইন্ডসর' নাটকের ফলস্টাফ চরিত্র তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে তাঁর কাছে সে 'Hero' হিসেবে অভিনন্দিত। একালে 'ভিলেন' আঁকতে গিয়ে নাট্যকাররা তার শঠতার দিকই আঁকেন, অনেকেই হাস্যরসাত্মক চরিত্রকে ভাঁড়ের চেয়ে বিশেষ কিছু গড়তে পারেন না। এঁরা যদি শেকস্‌পীয়ার চর্চা করতেন, তাহলে বাংলার মঞ্চপ্রেমিকরা কিছু নির্মল হাসির উপাদান পেতো।

শেকস্‌পীয়ারকে অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই, কেননা কমেডি রচনার ক্ষেত্রে তিনিও নানা উৎস বেছে নিয়েছেন :

শেকস্‌পীয়ারের হাসির নাটক	উৎস
ক. কমেডি অব এররস্‌	প্লটাসের 'মেনাচিনি'
খ. অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল	বোকাচ্চিও ও পেইন্টর-এর রচনা
গ. এ মিডসামার নাইটস্‌ ড্রিম	ওবিদ ও চসারের কাব্য
ঘ. মাচ এডো অ্যাবাউট নাথিং	অ্যারিয়োস্টো ও বান্দেল্লোর রচনা
ঙ. মেজার ফর মেজার	সিনথিও ও হোয়েটস্টোন-এর রচনা
চ. মিডল টেম্পল	বারনাবে রিক-অনূদিত বান্দেল্লোর কাহিনী

শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি নাট্যকাহিনীগুলিরও নানা উৎস আছে। কিন্তু তাঁর নিজস্বতার ছোঁয়ার সে কাহিনীগুলি নতুন। শেকস্‌পীয়ারের নাট্যাঙ্গিক অনুসরণের চেষ্টাই সেখানে বাঙালি নাট্যকাররা

প্রায় দেড়শ বছর চালিয়ে গেলেন, কিন্তু মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলালের মতো ক'জন তাঁর হাস্যরসকে অনুধাবন ও অনুসরণ করেছেন?

শেকস্‌পীয়ারের ভাষা

মধ্যযুগীয় ইংরাজি শেকস্‌পীয়ারের নাট্যসংলাপ ও নাট্যসঙ্গীতের আদর্শ। কিন্তু বড় শিল্পী সমকালের ভাষাকে চিরকালের ভাষারূপ দান করেন। ভারতচন্দ্রের প্রবাদ-প্রবচনগুলি, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ', দীনবন্ধুর আদুরী কিংবা নিমচাঁদের সংলাপ, বিজন ভট্টাচার্যের 'জোর লড়াই' আজও জীবন্ত। শেকস্‌পীয়ারের ক্ষেত্রে তা আরও সত্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই—

এক. 'ওথেলো' নাটক শেষ প্রান্তে পৌঁছুলো। ওথেলো স্ত্রী ডেসডিমোনাকে 'গণিকা' বলে ব্যঙ্গ করে। ডেসডিমোনা উত্তর দেয়—

No, As I am a christian, If to
preserve this vellel for my lord
from any other foul unlawful touch
be not to be a trumpet
I am none...... [Act IV, Scene II]

এই একটি উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা নায়িকার বংশ পরিচয়ের প্রায় সমগ্র দিক জানতে পারলাম।

দুই. 'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট' বা 'হ্যামলেট' নাটকে প্রণয়-প্রণয়ীর সংলাপ উত্তরকালে বিভিন্ন দেশের নাট্যকারদের লিরিক সংলাপের আদর্শ হয়ে ওঠে। ভালবাসার অত্যাশ্চর্য রূপ রোমিও ও জুলিয়েটের সংলাপে যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তার উদাহরণ—

Juliet–Wilt thou be gone? It is not yet near day; It was the Nightingale, and not the lark, that piered the fearful hollow of thine ear; Nightly she sings on you pome-grante tree. Believe me, love, it was the Nightingale.

Romeo–It was the lark, the herald of the morn, No nightingale, Low, love, what envious streaks. [Act III, Scene-V]

হরচন্দ্র ঘোষের মতো একাধিক নাট্যকার তাঁর ভাষার ভাবানুবাদ না করে আক্ষরিক অনুবাদ করলে শেকস্‌পীয়ারের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাতে পারতেন। বাংলা সাহিত্যে প্রণয় নাটক তো কম হয়নি! কিন্তু দ্বিতীয় 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' যে পাওয়া যায়নি তা শেকস্‌পীয়ারের নাট্যসংলাপ আয়ত্তের অভাবেই।

তিন. 'ম্যাকবেথ' নাটকের নায়ক স্ত্রীর প্ররোচনায় হত্যালীলায় মেতে ওঠে। এখন সে ক্লান্ত। তার মানস-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে লেডি ম্যাকবেথ। উভয়ের কথাবার্তায় দুই চরিত্রের ভিন্নমনের নিখুঁত উপস্থাপনা—

Lady Macbeth–My husband!
Macbeth– I have done the deed,–Didst thou not hear a noise?
Lady Macbeth–I heard he owl scream, and crickets the cry.
Did not you speak?
Macbeth– This is a sorry sight [Looking on his hands]
Lady Macbeth–A foolish thought to say a sorry sight. [Act II, Scene-II]

এই দম্পতির দুই ধরনের আচরণ ও উপলব্ধি। নাট্যকার অপক্ষপাত দৃষ্টি দিয়ে বিপরীতধর্মী সংলাপ সৃষ্টি করলেন। সর্বকালের নাট্যকারের কাছে সংলাপ রচনার আদর্শ শেকস্‌পীয়ার।

শেকস্‌পীয়ারের কোন কোন নাট্য-উক্তি বহুযুগের ওপার থেকে আজকের কালে এসে পৌঁছোয়।

লোক-প্রবাদের মত সেগুলিও প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে—মদ্যপানের প্রয়োজন বিষয়ে ফলস্টাফের উক্তির সঙ্গে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের সুরাপানের উপকারিতা-সম্পর্কিত উক্তির কি আশ্চর্য মিল! অনেকেই জানেন, ১৫৯২ সাল থেকে শেকস্‌পীয়ার নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে লন্ডন শহরে বহুল পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর নানা সংলাপে নাটক, মঞ্চ, অভিনেতা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে, যা আজকের প্রেক্ষিতেও সত্য। সেইসব উক্তির মধ্যে এক জায়গায় দেখি, নানা রকমের নাটক তাঁর ভাবনায় এসেছে—যেমনটি আমাদের ভাবনাতেও আসে।—

Hamlet–Then came each actor......

Polonious–The best actors in the world, either for tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral; tragical-historical, tragical-comical, pastoral. scene individable or poem unlimited.

নাটকের এই জগাখিচুড়ি উনিশ শতকে বাংলাদেশেই চলেছিল। শেকস্‌পীয়ার তৎকালীন পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে যে ব্যঙ্গ করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি করেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'তিলতর্পণ' নাটকে।

দেবেন্দ্র।। ওখানা Tragedy না Comedy মহাশয়?

গ্রন্থকার।। আজ্ঞে Tragedy-ও না Comedy-ও না। আমি মহাশয় বড় নকলের দিকে যাই না, আমার নিজের Original Thoughts নিয়ে কাজ করি। এতে সব আছে। এখানি হচ্ছে Farcial Tragi Comedy de Pantomimic operetta.

৩য় অভিনেতা।। এ যে নূতন নাম, এর plot কি মহাশয়?

গ্রন্থকার।। plot যদি বল্লেন, তবে plot-এর বড় একটা নাই। Plot নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর। এতে wit আছে, Humour আছে, Blank Verse আছে, নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা, কালিওড়ান, চেতনাবান, চিতোর, সাহেবমারা, সব আছে, অশ্লীল নাই।

দেবেন্দ্র।। চিতোরের সঙ্গে সাহেব, সে কি?

শেকস্‌পীয়ার ও অমৃতলাল যদি একালের মানুষ হতেন তা হলে কলকাতার পেশাদারী মঞ্চে এখনও যে সব জগাখিচুড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একইভাবে অভিনীত হচ্ছে, তা দেখে অবাক হতেন।

শেকস্‌পীয়ারের As you like it নাটকে Jaques-এর উক্তি—

All the worlds' a stage,
And all the men and women merely players

আমরা বাল্যকাল থেকে শুনেছি, সত্য বলেই মনে করেছি।

শেকস্‌পীয়ারের নাটকে সাধারণ মানুষ

রাজপরিবারের সঙ্গে শেকস্‌পীয়ারের নৈকট্য যথেষ্ট থাকলেও বাল্যকাল থেকে লন্ডন শহরের পথঘাট ও মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে তাঁর নাটকে গণজীবনের চিত্র ও চরিত্রের বহুল ব্যবহার। যুবক শেকস্‌পীয়ার লন্ডন শহরের হৈ-চৈ, পথেঘাটে হাতাহাতি, হোটেলে রাত্রিবাস, নানা দেশের জাহাজের বাণিজ্যসূত্রে আনাগোনা ইত্যাদি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। ট্যাভার্নের পানশালায় মাঝে মধ্যে নিজে গিয়ে 'বেসামাল মাতালদের'ও চিনেছিলেন। ইংল্যান্ডের চোর-ডাকাত-পাহারাদারদের মানসিকতা তাঁর জানা ছিল। তাই তাঁর নাটকে রাজা হেনরির বংশ-পরম্পরা যেমন আছে তেমনি

আছে অবজ্ঞাত এক গয়লানী ['দি উনইটার্স টেল']। লন্ডন শহরের ধনী যেমন আছে, তেমনি আছে রোম নগরীর মুচি [জুলিয়াস সীজার]। তিনি যেমন Courtly Life-এর স্বরূপ দেখেন নিবিষ্ট মনে, তেমনি খুঁটিয়ে দেখে নাটকে ফুটিয়ে তোলেন মেষপালকের চরিত্র ['অ্যাজ ইউ লাইক ইট']। বাংলা নাটকে 'জনতা' চরিত্রের অনুপ্রেরণা নাট্যকারগণ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন বলে আমার স্পষ্ট অভিমত। ইংরাজি সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন :

'সৎ-অসৎ, সংকীর্ণ-উদার, উচ্চ-নীচ সকলের প্রতি তাঁহার একই প্রকারের ক্ষমাসুন্দর স্নেহ-দৃষ্টি—কেহই তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত নয়। সকলেরই মনের কথা তিনি বুঝিয়াছেন, সকলেরই অন্তরে তিনি মানবিকতার সন্ধান পান। তিনি সকলের সঙ্গে এক সমতলভূমিতে বিচরণ করেন; নীতিবিদদের উচ্চ মঞ্চ হইতে তিনি কাহাকেও সমালোচনা করেন নাই, বিচারাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ পুণ্য অনুসারে দন্ড পুরস্কার বিতরণের স্পর্ধিত মনোভাবও শেকস্‌পীয়ারে নাই।'

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে এনোবারবাস মেসেনাসকে বিচিত্রময়ী ক্লিওপেট্রার অপার রহস্য সম্পর্কে বলেছিলেন :

> Age cannot withers her, nor
> custom state
> Her infinite variety......

শেকস্‌পীয়ারের নাটকাবলি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। মৃত্যুর আগে ক্লিওপেট্রাও বলেছিল 'I have immortal longings in me.' শেকস্‌পীয়ারের নাট্যবিষয় ও নাট্যচরিত্রও immortal longing! যিনি playwrite, যুগপৎ নাট্যকার ও অভিনেতা, তাঁর নাটক দর্শকদের হৃদস্পন্দন শুনেই সৃষ্ট হয়। সেই সুযোগ শেকস্‌পীয়ারের ছিল। তাই তিনি চির আধুনিক, চির রহস্যময় স্রষ্টা।



চিত্রনাট্য : চিত্রে নাট্য, নাট্যের চিত্র

• • • • • •

ধীমান দাশগুপ্ত

'চলচ্চিত্র হল চিত্রনির্মাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা রচনা ও সেই পরিকল্পনার রূপায়ণ। পরিকল্পনার অংশটুকু সাধারণত লিখিত হয় এবং তাকেই চিত্রনাট্য বলে।'—গাস্তঁ রোবের্জ।

তাহলে কোনো নির্মীয়মাণ ছবির বিস্তৃত প্রকল্পনা [ব্লু প্রিন্ট] হিসেবে কাজ করে যে রচনাটি সেটাই চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য যেন বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। যে সাহিত্যেরও ঘনিষ্ঠ, চলচ্চিত্রেরও আত্মীয়। তার অবস্থান দুয়ের মাঝামাঝি। ভালো চিত্রনাট্য রচনা ও সঠিক চিত্রনাট্য বিশ্লেষণের জন্য তিনটে গুণ অপরিহার্য—সাহিত্যবোধ, চলচ্চিত্রবোধ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি। ভালো গল্প বা উপন্যাস লিখতে শেখার যেমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম বা সহজপাঠ নেই, চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো শর্টকাট রাস্তা বাতলে দেওয়া অসম্ভব। প্রস্তুতি, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তা ক্রমে ক্রমে শিখে ওঠা যেতে পারে। সাহিত্যের তুলনায় চিত্রনাট্য অনেক বেশি ব্যবহারিক বলে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একে আয়ত্ত করতে পারার সম্ভাবনা অনেক বেশি সুনিশ্চিত। সাঁতার শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় যেমন জলে নেমে পড়া, চিত্রনাট্যে হাত পাকাবার সবচেয়ে ভালো উপায় তেমনি চিত্রনাট্য লিখে হাত পাকানো।

সিনেমায় সাহিত্যের মূল ভূমিকা এই তিনটি : সামান্যতার মাধ্যমে অর্থব্যঞ্জনা, ঘটনা ও চরিত্রের প্রকৃতি অভিব্যক্তি ও অনুভূতির প্রকাশ, এবং বিমূর্তের মূর্তায়ন। আর সাহিত্যের চিত্রধর্মী রীতির বৈশিষ্ট্য হল : 'পরিবেশ সৃষ্টি, অপ্রধান ঘটনার সঙ্গে প্রধান ঘটনার সংযোগ, এবং খণ্ড খণ্ড পরস্পর বিযুক্ত বিষয়কে প্রধানত পরম্পরার সাহায্যে একটি অর্থসূত্রে গেঁথে তোলা।' চিত্রনাট্য রচনার কাজে এরা সমভাবে সাহায্য করে।

নির্বাচিত কাহিনি থেকে এমনভাবে চিত্রনাট্য গড়ে তুলতে হয় যাতে উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে দর্শকের মনে সর্বাধিক খোরাক দেওয়া সম্ভব। সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি ভাব সবচেয়ে সরস ও অভিঘাতী ভাবে প্রকাশ। বিষয় বিন্যাসেও শৈলীর উল্লেখে চিহ্নিত হয় এই চিত্রনাট্য। বলেছি চিত্রনাট্যের প্রথম কাজ সামান্যতার মাধ্যমে অর্থব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত করে ঘটনার প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঘটনা ও চরিত্র প্রকাশিত ও ক্রমবিকশিত করা। যদিও বিদেশে চিত্রনাট্য ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, অনেক পরিচালকই ধরাবাঁধা চিত্রনাট্য হাতের কাছে তৈরি রাখেন না, কেউ কেউ সুটিংয়ের বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগে তা তৈরি করে নেন, একাধিক পরিচালক ঠিক করে রাখেন কী করবেন কিন্তু লোকেশনে না যাওয়া পর্যন্ত কীভাবে করবেন তা জানেন না, দু-একজন একটা ভাবনাচিন্তা মনে রেখে দেন, লিখিত একটা খসড়া থেকে কাজ করলেও সংলাপ ইত্যাদি ছবি তোলার মাত্র কিছুক্ষণ আগে ঠিক হয়, তবু আমাদের দেশে তৈরি চিত্রনাট্য [যা একই সঙ্গে বর্ণনাত্মক ও ভাবাত্মক] নিয়েই কাজ করা হয় সাধারণত। প্রাথমিক চিত্রনাট্য ঠিক করে দিচ্ছে কী কী দেখানো হবে, সুতরাং চূড়ান্ত চিত্রনাট্যে

ভাবতে হচ্ছে কেমনভাবে দেখানো হবে না হবে তাই নিয়ে। ছবির নির্দিষ্ট গঠন-কাঠামো নিরূপণ করা ও মূল কাহিনির বিভিন্ন অংশের ন্যারেটিভকে সমগ্র ছবির গঠন-কাঠামোর অঙ্গীভূত করে তোলার দিক থেকে চিত্রনাট্য সাহিত্যের বিষয়। কিন্তু এই কাজটা চিত্রনাট্যকে করতে হয় চলচ্চিত্রের ভাষায়। তাই চিত্রভাষা হল চিত্রনাট্যের প্রকাশ মাধ্যম। ফলে বিশেষ কোনো চিত্রপ্রতিমা বা চলচ্চিত্রসম্মত টেকনিক বা চিত্রভাষার সমৃদ্ধ প্রয়োগ অনেক ব্যঞ্জনাময় করে ফুটিয়ে তুলতে পারে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা বিশেষ মুহূর্তের মানসিকতা। চিত্রভাষার মাধ্যমে আইডিয়া ও ইমেজের সংগ্রাহক চিত্রনাট্যের সূত্রপাত পরিচালকের কল্পনায়, ছবি তৈরি শেষ হলে তার দায়িত্বের সমাপ্তি। চিত্রনাট্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত পরিমার্জিত হতে পারে। কেননা ঘরে বসে চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে যা ভাবা হয়েছিল তাকে আঁকড়ে ধরে না থেকে প্রয়োজন মতো নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই ভালো।

চিত্রনাট্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর প্রসঙ্গে বলতে হয়, চিত্রনাট্যে যা লেখা থাকে চলচ্চিত্রে তাকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার মূল দায়িত্ব ক্যামেরা, সম্পাদনা ও আবহসংগীতের। বলেছি, বুদ্ধিদীপ্ত দৃশ্যগ্রহণ অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে সফল। সেটা স্বাভাবিক কেননা ক্যামেরাই হল চলচ্চিত্রের বাহন। তেমনি সম্পাদনা হল চলচ্চিত্রের ধারক। সম্পাদনার কাজটা সব শিল্পেই আছে, সিনেমায় তার কাজ প্রাথমিক সৃষ্টির পর। একটা ছবিকে প্রাথমিক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে তুলে আনার জন্য সম্পাদনা অপরিহার্য। তা ছবিটিকে নিয়ন্ত্রিত করে, সুবিন্যস্ত করে, সুশৃঙ্খলভাবে ধরে রাখে। ছবির ক্রমবিকাশের গতি ও প্রবাহকে বিচার করে দেখে। ছবিতে সম্পাদকের প্রধান কাজ ছবির গতিকে আয়ত্তে রাখা, ছবির সুর ছন্দ ও তাল ঠিক-ঠিক সৃষ্টি করে দেয়া, এবং কোন্ দৃশ্য কতক্ষণ পর্দায় থাকলে গতি-সুর-ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে ঠিক করা। ছবিতে আবহসংগীতের ব্যবহারও প্রাথমিক সৃষ্টি হয়ে যাবার পর। তবু, সম্পাদনার কথা মাথায় রেখে যেমন, তেমনি সংগীতকে ছবিতে ফিল্ম মিউজিক হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা মনে রেখেই চিত্রনাট্য লেখা দরকার। আবহসংগীতের একাধিক দিক, যেমন, ক্ষেত্র প্রস্তুতি ও পরিবেশ সৃষ্টি, চরিত্রের মনের বিশেষ অবস্থা বা অনুভূতির প্রকাশ, কোনো বিশেষ ঘটনার উপর গুরুত্ব বা তাৎপর্য আরোপ, বিশেষ সংলাপ বা ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থ ও প্রয়োজনীয় বক্তব্য তুলে ধরা ইত্যাদি চিত্রনাট্যকর্মের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত।

সংগীতকর্মে স্বরলিপির ভূমিকা যা চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যের ভূমিকা তাই, ফলে চিত্রনাট্য না বলে যেন বলা যায় চিত্রলিপি।'—চিদানন্দ দাশগুপ্ত।

চিত্রনাট্যরীতি হল মোজাইক টালিতে দেয়ালচিত্র তৈরির পদ্ধতির মতো। অসংখ্য টালি একত্র করে দেয়ালচিত্রটি গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেকটা টালিতে থাকে এক টুকরো খণ্ড, অসম্পূর্ণ, প্রায়শ অবোধ্য অঙ্কন। কিন্তু টালিগুলি ঠিক-ঠিক স্থানে বসিয়ে যেই দেয়ালচিত্রটি গড়া শেষ হয় তখনই দৃশ্যপ্রতিমা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও অর্থযুক্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'vision complete when viewed in full.' চলচ্চিত্রেও তেমনি খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যাংশ যখন একত্রে ও সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয় তখন ছবির বিষয়, বক্তব্য ও অনুভবগত ব্যঞ্জনা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও অর্থযুক্ত হয়ে ওঠে।

আলোকচিত্র সম্পর্কে যে-কথা বলা হয় যে তা হল 'charged with content and framed by the form' সেকথা চলচ্চিত্র সম্পর্কে আরও বেশি প্রযোজ্য। এই আঙ্গিক, শৈলী বা রীতিই বিভিন্ন পরিচালকের একই বিষয়ের ছবিকে বিভিন্ন রূপ দেয়। ছবির চিত্রনাট্যের প্রতিটি দৃশ্যের নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থাকে, তার একটা দৃশ্যের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, অন্যটা সমগ্র উদ্দেশ্যের

পরিপ্রেক্ষিতে তার ভূমিকা। প্রতিটি দৃশ্যের দুই প্রকার মূল্যমানও থাকে, একটা ওই দৃশ্যের একক physical value, অন্যটি সমগ্র কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে তার structural value; প্রতিটি দৃশ্য একদিকে বিষয়ের কিছুটা প্রয়োজন মেটায়, অন্যদিকে রসের দাবি কিছুটা পূরণ করে। চিত্রনাট্যের দৃশ্যপর্যায় হতে পারে উন্মুক্ত দৃশ্যপর্যায় বা বদ্ধ দৃশ্যপর্যায় বা এই দুই প্রকারের কোনো সম্মেলন। উন্মুক্ত দৃশ্যপর্যায় কোনো তথ্য সরবরাহ করে [তথ্যচিত্র তথ্য উদঘাটিত করে, কাহিনীচিত্রও নানাবিধ উপায়ের মধ্য দিয়ে তথ্যই সরবরাহ করে থাকে, তবে তথ্যচিত্রের তথ্যের থাকে টপিকালিটি, কাহিনীচিত্রের তথ্য সেই তুলনায় অনেক বেশি পারসোনালাইজড, তা সামগ্রিকও নয় সম্পূর্ণও নয়। কাহিনীচিত্রের তথ্যমূলকতা ভাবমূলকতা ও বোধমূলকতার সঙ্গে মিলে কাজ করে], কোনো ইঙ্গিত রেখে যায়, ধারাবাহিকতার দাবি মেটায়। বদ্ধ দৃশ্যপর্যায় কোনো কিছুকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, মন্তব্য বা ঘটনাগত স্বীকৃতি অস্বীকৃতিকে সম্পূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে যায়, ক্লাইম্যাক্স তৈরি করে।

বিষয় বা কাহিনী বাছাইয়ের সময় চলচ্চিত্র মাধ্যমে তা কতটা গ্রহণযোগ্য ও অনুবাদযোগ্য, তার দৃশ্যগত ও ধ্বনিগত সম্ভাবনা কতখানি, এবং প্রযোজনাগত ভাবে কাহিনীটির সুবিধা অসুবিধা কী কী ইত্যাদি বিচার করে দেখতে হবে। কোন্ সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্র-সম্ভাবনা কীরকম ও চলচ্চিত্রায়ণের জন্য কোন্ সাহিত্যকর্ম বা কাহিনী নির্বাচন করা হবে তা পরিচালকের বিভিন্ন বিবেচনার এবং অভ্যাস ও রুচির বিষয়। তবু সাধারণভাবে কাহিনী প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায় যে পুরোনো ভাবনা, চিত্রপ্রতিমা ও অনুভূতিকে আঁকড়ে ধরে রাখার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই, এদের পরিমার্জনার চাইতে নতুন কিছু আনার চেষ্টা করা অনেক যুগোপযোগী, যেহেতু নতুনত্বের একটা আকর্ষণ আমরা সব সময়েই বোধ করি, তা গঠনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শুধু অলংকরণের জন্যই হোক আর ছবির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়েই হোক। সার্থক চলচ্চিত্রের কাজ হল জীবন জগৎ শিল্প ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের ভাবনা ও ধারণাগুলোকে প্রকাশ করা। এমন একটি আধার বানানো যেখানে আমাদের তাৎক্ষণিক ও চিরন্তন অনুভূতিগুলোকে আমরা আরও সুন্দর করে ও আরও বিন্যস্ত করে রাখতে পারব। কাহিনী নির্বাচনের সময় এ-কথা মনে রাখা দরকার। সদাপরিবর্তনশীল জগৎকে ও মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রামকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ও নতুন প্রকাশ ভঙ্গিতে প্রতিফলিত করার কাজে কাহিনী নির্বাচনের অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে বাস্তববাদী ও স্বাভাবিকতাবাদী কাহিনীই কি শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, না তা মহত্তম হতে পারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিনা সেটা নির্ভর করবে আঙ্গিক ও অন্যান্য বিবেচনার ওপর—এই বিতর্ক উঠতে পারে, যা, রুচি ও অভ্যাস অনুসারে, সমাধানের দায়িত্ব পরিচালকের। আপাতত এটুকু বলা যায় যে, যে-কাহিনী জীবন ও জগতের উপর ছক বাঁধা প্লট চাপিয়ে দিতে চায় তা অবান্তর ও মিথ্যে। সুতরাং এই মাত্রিকতা ও কাহিনীর থিমেটিক গুণাত্মকতার দিকে কাহিনী নির্বাচনের সময় নজর দিতে হবেই। আবেগধর্মী প্লট সম্পর্কে এটুকুই বলা ভালো যে যদি তা মূল চরিত্র ও দৃষ্টিকোণের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তবে দৃষ্টিকটু নয়। তবু কাহিনী বেছে নেওয়ার কাজে বিনাটকীয়তার কথাটা মনে রাখাই ভালো। বুনুয়েল বলেছিলেন আধুনিক পৃথিবীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা, আত্মকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব এসব সেকেলে হয়ে যাবে। ছবিতে জোর পড়বে সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব, যৌথ সমস্যা ও সংকট প্রভৃতির উপর। তাও চিত্রনাট্যের বিবর্তনেরই অংশ।

কাহিনীর ধারা ধরণ ও নীতি চলচ্চিত্র-সম্ভাবনার একটি দিক সম্পর্কে রায় দেয়, কোনো সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্র-সম্ভাবনার আরেকটি দিক, সাংগঠনিক দিকটা, নির্ভরশীল প্রথমত কাহিনীর দৃশ্যগত সম্ভাবনা আর দৃশ্যরূপের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির ওপর এবং দ্বিতীয়ত বহির্গঠনতলের ওপর অন্তর্বিন্যাসের রেখাচিত্রটির সুষম স্থাপনযোগ্যতার ওপর। অন্তর্বিন্যাস হল কাহিনীগত, বিষয়বস্তুর

ক্রমবিকাশ আর ঘটনাসংস্থান ও পরিণতিজনিত এবং বহির্বিন্যাস স্পট ও স্পট-সম্মেলনের স্তরভেদজানত।

যে-কোনো সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্রগত বিশ্লেষণ করার সময়ে এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, কোনো একটি কবিতা গল্প বা উপন্যাসের যে চলচ্চিত্র-সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, চিন্তাশীল পরিচালকের হাতে যখনই তার চিত্রণ হবে, পার্থক্য আসবে বিস্তর; সাহিত্যের সম্পূর্ণ তো নয়ই, হয়তো যথেষ্ট অনুসরণও হবে না। চলচ্চিত্র তার প্রয়োজনে মূল সাহিত্যের অংশ- বিশেষ, তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, এবং প্রেক্ষিত, চারিত্র, প্রকৃতি ও প্রতিমাপুঞ্জকে কাজে লাগাবে।

নির্বাচিত যে-কোনো কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনায় সাধারণত তিনটে স্তর থাকে। প্রথম সিনপ্‌সিস : মূল কাহিনীর অপরিহার্য তথ্য, উপাদান ও উপকরণের অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অনতিদীর্ঘ সারাংশ, দ্বিতীয় ট্রিটমেন্ট : কলাকৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে বিস্তারিত বিবৃতি, সিনপ্‌সিসকে মূল কাহিনী অবলম্বনে প্রসারিত করা, তৃতীয় শুটিং স্ক্রিপ্ট : চিত্রনাট্যের চূড়ান্ত রূপ, ছবি তোলা সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ থাকে এতে। এই শুটিং স্ক্রিপ্টে পরিচালকের প্রতিন্যাস, অভিনেতা নির্বাচন সম্পর্কে নির্দেশ, শট ও ক্যামেরা মুভমেন্টের উল্লেখ, লোকেশনের ও ছবি তোলার সময়ের কথা, সেট ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং লাইটিংয়ের ধরন সবকিছু সম্পর্কে নির্দেশ আর আবহসংগীত ও ইফেক্ট ধ্বনির উল্লেখ সমস্তই থাকে। থাকে শুটিংয়ের সময় যেসব কারিগরি ও শৈল্পিক সমস্যার দেখা মিলতে পারে তারও উল্লেখ। প্রতিটি শট ও ক্যামেরা মুভমেন্ট, বিচার করে দেখতে হবে, যা করতে ও বলতে চাই তা বলার ক্ষেত্রে ও করার কাজে ওটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি কিনা, এবং তা এককভাবে সর্বোত্তম হলেই চলবে না, সামগ্রিকতার বিচারেও তাকে যোগ্যতম হতে হবে। এ-ছাড়াও ওই শট বা ক্যামেরা মুভমেন্ট যেন সমৃদ্ধ দৃশ্যরস, পর্যাপ্ত ও মৌলিক অ্যাকশন ও অভিব্যক্তি, এবং যথেষ্ট ব্যঞ্জনার সুযোগ দিতে পারে। মনে রাখা ভালো, মূল চিত্রনাট্যের ৮০%-এর বেশি সাধারণত চিত্রায়িত করে ওঠা যায় না, ফলে মূল চিত্রনাট্যের মান এমন হওয়া উচিত যে ব্যবহারিক কারণে তা কিছুটা নেমে গেলেও যথেষ্ট উন্নত থাকে।

* * * * * *

'চিত্রনাট্য মূলত চিত্রের মধ্যে নাট্য, চিত্রের সাহায্যে নাট্য, এমনকি নাট্যচিত্রও। নাট্য-উপাদানের চিত্র বা চিত্র-উপাদানের নাট্য হলেও চিত্রনাট্যের চিত্রই যেন বাহন, নাট্য যা বাহিত। চিত্র তার রূপ, নাট্য তার রস। চিত্র তার শরীর, নাট্য তার প্রাণ। চিত্র তার ঘোষ উপস্থিতি, নাট্য তার অঘোষ ক্রিয়া। চিত্র তার প্রতিকৃতি, নাট্য তার অনুভূতি। চিত্রেই তার ভাষা, নাট্যে তার ভাব। চিত্রে যে মূর্ত, নাট্যে সে বিমূর্ত। চিত্রে তার আবদ্ধতা, নাট্যে তার মুক্তি।'—ঈশ্বর চক্রবর্তী।

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া চিত্রনাট্যকারকে সাহায্য করে থাকে। চলচ্চিত্রের ভাষা সাহিত্যের ভাষা থেকে মূলগতভাবে আলাদা হলেও, গল্পের কাছ থেকে কাহিনীচিত্র পায় ও নেয় নানান ধরনের বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও ধারণা, নতুন ধরনের ও কল্পনা- সমৃদ্ধ ঘটনা বা সিচুয়েশন, সংলাপরীতি ও সমৃদ্ধ সংলাপ, এবং কাঠামো ও বিকাশ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা। গল্পে বক্তব্য বা কাহিনীর যে একমুখীনতা থাকে তা চলচ্চিত্রের পক্ষে লাভজনক। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, উপাদান বা সূত্র কোনো ছোটগল্পে কী মানে ও কী পরিমাণে উপস্থিত তাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

উপন্যাসের কাছ থেকে কাহিনীচিত্র পায় ও নেয় থিম ও থিমেটিক দৃষ্টিকোণ, চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব এবং সংবিধান বিষয়ে এক উন্নত নান্দনিক ধারণা যার জোরে নির্দিষ্ট বিন্যাস, নকশা বা গঠনের

মধ্য দিয়ে প্লট কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। উপন্যাসে কাহিনী ও বক্তব্যের সাধারণত যে বহুমুখীনতা থাকে তা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ফলপ্রদ হতে পারে। তাই উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্যকার শেখেন এমনভাবে দৃশ্য গড়তে ও দৃশ্যগুলি সাজাতে যাতে কাহিনীর বিকাশ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি দৃশ্যে ও সমগ্র ছবিতে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ, গঠন ও ছন্দ সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে।

কবিতার কাছ থেকে কাহিনীচিত্র পায় ও নেয় প্রতিমা নির্মাণ বিষয়ে ধারণা, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি, পরিমিতির সঙ্গে অমোঘতার—উপকরণ-পরিমিতির সঙ্গে প্রকরণ-অমোঘতার—মিলনের পদ্ধতি এবং লিরিক বিষয়ে ধারণা ও লিরিকাল প্রকাশভঙ্গি। অনেক পরিচালকেরই থাকে কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি, কেউ কেউ বস্তুসত্য থেকে যান কাব্যসত্যের দিকে, কেউ হয়তো নেন কবিতার কাব্যময়তা থেকে, কেউ কবিতার সংগীতময়তা থেকে।

সাহিত্যের ভাষা ও চলচ্চিত্রের ভাষার মিথস্ক্রিয়ার আলোচনায় আমরা দেখি, যে-সমস্ত সাহিত্যিক প্রসঙ্গের সঙ্গে চলচ্চিত্র মিথস্ক্রিয়া করে থাকে তা হল বিষয়বস্তু, বর্ণনা, প্রতিন্যাস, ভাববস্তু, প্রতিমা, ঘটনা, চরিত্র, দৃশ্যকল্পনা, এবং গঠন ও শৈলীর বিবিধ বৈশিষ্ট্য।

অ্যাকশনের পরিণতির জন্য, কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতিপাদনের জন্য, চরিত্রের বিকাশের জন্য, নিয়তির অনিবার্যতার জন্য উপন্যাসে যত সময় অতিবাহিত হয় নাটকে ও সিনেমায় হয় তার চেয়ে সাধারণত কম, অনেক কম। এইভাবে সিনেমা যতটা বিবরণাত্মক তার চাইতে বেশি নাট্যাত্মক।

সাহিত্য, নাটক ও চিত্রকলার সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বিষয়ে একটি ভয়ংকর সাবধানবাণী করেছিলেন বার্গম্যান যখন তিনি বলেন, সিনেমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক তিনটি খাদ হল এক. সাহিত্যধর্মিতা, দুই. চিত্রময়তা ও তিন. নাটকীয়তা। যার অর্থ এই হতে পারে যে—সিনেমা যেন নিছক গল্পকথন না হয়, নিতান্ত দর্শনদারি না হয়, না হয় শুধুই নাটকীয়। গল্পরস, দৃশ্যগুণ ও নাটকীয়তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সিনেমা সিনেমা হয়ে ওঠে।

কাব্যভাষা ও চিত্রভাষার তুলনায় চলচ্চিত্রের ভাষা অধিক এক্সট্রোভার্ট হতে পারে। সাহিত্যে যা ইঙ্গিতময় ও চিত্রকলায় যা প্রতিনিধিত্বকারী বা রিপ্রেজেন্টেশনাল, চলচ্চিত্রে তা একেবারে প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করতে পারে। যেন কবিতার স্থির স্থানাঙ্ক ও চিত্রকলার স্পন্দমান স্থানাঙ্ক থেকে চলচ্চিত্রে আমরা আসি চল স্থানাঙ্কে। বা ভিন্ন অনুষঙ্গ টেনে বলা যায়, যেন বীজগণিত থেকে জ্যামিতি হয়ে আসা হল জ্যোতিষে। চলচ্চিত্রকার এইভাবে আবেগ ও অনুভূতিকে আরও অভিঘাতী ও প্রভাবশালী রূপ দিতে পারেন। এই কাজে চিত্রনাট্যকারও অংশভাক্।

কবিতার চলচ্চিত্রায়ণের সময় চিত্রনাট্যকার যা করেন তা হল ফিল্ম কাব্যের রূপরেখা সৃষ্টি। ভাষার বিভিন্ন উপাদান যেখানে স্রষ্টা বা পাত্র-পাত্রীর অভিব্যক্তি ও অনুভূতিকে ওতপ্রোতভাবে সাহায্য ও প্রকাশ করে তাকে লিরিক কাব্য বলা হয়। এটি ফিল্ম কাব্যেরও লক্ষ্য ও লক্ষণ, অবশ্যই মাধ্যমজনিত পরিবর্তন ও রূপান্তরের কথাটি মনে রেখে।

চিত্রনাট্যের অনুশীলনে চিত্রনাট্যকারকে ছোটগল্পের উপর প্রাধান্য দিতে হবেই। চিত্রোপযোগী গল্পে থাকবে নতুন ধরনের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা, অভিনব ও কল্পনাসমৃদ্ধ চিত্রপ্রতিমা চরিত্র বা ঘটনা, স্নিগ্ধ প্রসাদগুণ, তীক্ষ্ণ রসবোধ, তির্যক মনস্তত্ত্ব বা গভীর মননশীলতা, এবং তৎপর সংলাপ বা বিমূর্তায়নের সম্ভাবনা ইত্যাদি। ছোট কোনো গল্প থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্যের একটি চিত্রনাট্য লেখা হলে চিত্রনাট্যের নিজস্ব সুযোগ ও সম্ভাবনা সেখানে খুব বেশি। আবার চরিত্র ঘটনা ও সংলাপের প্রায় সবটাই চিত্রনাট্যকারকে নিজে কল্পনা করে লিখতে হচ্ছে বলে তার ব্যর্থতার আশঙ্কাও এখানে বেশি।

ছোটগল্প থেকে চিত্রনাট্য করার সময় চিত্রনাট্যকারের মূল কাজ যদি হয় কল্পনা ও পরিবর্ধন, তবে উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য করার সময় মূল কাজ হল পরিকল্পনা নির্বাচন ও পরিবর্তন। স্বাভাবিক, কোনো পূর্ণদৈর্ঘ্যের উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য লেখা হলে চিত্রনাট্যকার মূল কাহিনীকে চরিত্র ঘটনা ও সংলাপের এক বিরাট ভাণ্ডার হিসেবে পেয়ে যান। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সমস্যা ঝাড়াই-বাছাইয়ের—কী রাখব ও কতটা রাখব, কী বাদ দেব ও কেন বাদ দেব, কী পাল্টাব ও কীভাবে পাল্টাব। উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের সময় তাকে রূপান্তরিত করতে হয় নাট্যাত্মক ভাবে। এটা ন্যারেটিভের দিক থেকে। আর সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে যে-কথা বলতে হয় তা হল, উপন্যাসের জীবন তার লেখকের জীবন, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবন, নায়ক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত বহু মানব-মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, এবং জীবনের বৃহত্তম পটভূমি জাগতিক ব্যাপার বা রিয়ালিটি নিয়ে সম্পূর্ণ। এটা চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্রকারকে মাথায় রাখতে হবে।

প্রেরণা ও পরিশ্রম যেমন, যে-কোনো শিল্পকর্মে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিও তেমনি সাহিত্যের বাক্য এবং অর্থের মতো পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে মিলে আছে। নান্দনিকতা অনুসারে শিল্পের থাকে দুটি দিক : ভাব ও রূপ। যে-কোনো শিল্পমাধ্যমেও থাকে দুটি দিক : প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি। আর যে-কোনো শিল্পসৃষ্টিরও দুটি দিক থাকে : বিষয় ও আঙ্গিক। এই সম্পর্ক ও সম্বন্ধ, কোনো সূত্রের আকারে, ধাপে ধাপে দেখলে, যথাক্রমে হল—

৩. ভাব বনাম রূপ

২. প্রসঙ্গ বনাম পদ্ধতি

১. বিষয় বনাম আঙ্গিক।

আইজেনস্টাইন দেখিয়েছেন, ছবিতে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় নাট্যরস সৃষ্টির জন্য ছবির সাংগঠনিক কাঠামো কী রকম অপরিহার্য। সুসংবদ্ধ শিল্পকর্ম তৈরি করা ও উপভোক্তার মনে যে সম্পর্কে অনুভূতি জাগানো সম্ভব কেবল তখনই যখন সেই সৃষ্টির নির্মাণসূত্রগুলি [অর্থাৎ সরল করে বললে, পদ্ধতি] সুসংবদ্ধ প্রাকৃতিক ও মানবিক ঘটনাবলীর বিন্যাসসূত্রের [অর্থাৎ সরল করে বললে, প্রসঙ্গের] সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর জন্য আমাদের আসতে হবে আলোচনার পরবর্তী অংশে।

* * * * * * *

সিনেমার কোনো উপাদানকে পৃথক করে চিহ্নিত করা ও চিহ্নিত উপাদানকে যথাযথ ভাবে বিকশিত করা—এই কাজ দুটি সম্ভব, একমাত্র, চলচ্চিত্রের মৌল প্রতীতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনের মাধ্যমেই। আর এই সমস্ত উপাদানের প্রতিটিরই উৎস রয়েছে অন্য কোনো শিল্প-শাখায়।

মিজঁসেনের রীতিনীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করে, মনতাজ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব।

থিয়েটারের অভিনয়রীতি সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি—এমন অভিনেতার পক্ষে চলচ্চিত্রাভিনয়ে সম্পূর্ণ সফল হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

চিত্রকলার শিল্প-রূপ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পরই একজন ক্যামেরাম্যানের পক্ষে সম্ভব শটের কম্পোজিশনগত ভিত্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা।

আর নাট্যাত্মকতা, মহাকাব্যিকতা, ও গীতিধর্মিতায় সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ সাহিত্যচেতনার ভিত্তি-ভূমিতে দাঁড়িয়েই কোনো চিত্রনাট্যকারের পক্ষে সম্ভব সাহিত্যের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাখা—চিত্রনাট্য রচনার কাজে—সফল হওয়া। চলচ্চিত্র যেমন সমস্ত শিল্পরূপের এক সংশ্লেষণ, চিত্রনাট্যরচনা তেমনি বিভিন্ন সাহিত্যরীতির এক সংশ্লেষণ।'—সের্গেই আইজেনস্টাইন।

সিনেমা যে বিভিন্ন শিল্পরূপের এক সংশ্লেষণ, কেমন সেই সংশ্লেষণের ধারা ও ধরন?

গ্রীক সভ্যতার চূড়ান্ত সাফল্যের পর, শিল্পরূপের যে অবনমন ঘটেছিল, সেইসব শৈল্পিক প্রকাশরূপের এক প্রকৃত ও চূড়ান্ত সংশ্লেষণ সিনেমায়। দিদেরো অপেরায়, ভাগনার মিউজিক-ড্রামায়, স্ক্রিয়াবিন কালার কনসার্টে সীমাবদ্ধভাবে যেসব চেষ্টা করেছিলেন, সিনেমায় তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

শিল্পের প্রতিটি শাখার সম্ভাবনা ও লক্ষ্যের চূড়ান্ত প্রকাশই যেন ঘটে সিনেমার শিল্প- রূপের মধ্য দিয়ে।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে—সিনেমা হল দৃশ্যরূপের সেই পরিবর্তনশীলতা, যা অবশেষে, স্থিতির বাঁধন কাটিয়ে ওঠে।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে—সিনেমা শুধু চিত্রকল্পে গতিময়তার—সমস্যার সমাধানই নয়, উপরন্তু সেই সাফল্যও যা গ্রাফিক আর্টের এক নতুন ও অতুলনীয় রূপকে সম্ভব করে তোলে। এমন এক নিত্য প্রবহমান শিল্পরূপ, যে-প্রবহমানতা এতদিন শুধু সংগীতেই সম্ভব ছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে—সিনেমা হল গদ্য ও কবিতার কথনক্রিয়ার সেই প্রসারণ যার ফলে প্রতিমায়ন সরাসরি ঘটানো যায় দৃশ্য-শ্রাব্য অনুভূতির প্রেক্ষিতে ও জগতে।

এবং সবশেষে, স্পেক্ট্যাকলের ভিন্ন-ভিন্ন উপাদানগুলি, যা সংস্কৃতির আদিপর্বে অবিচ্ছিন্ন ছিল, এবং যাদের বিভিন্ন সময়ে থিয়েটার আবার সমন্বিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, তারা সিনেমার মধ্য দিয়ে এক প্রকৃত সমন্বয়ে এল।

শিল্পের প্রধান কাজ যদি হয় বাস্তবের প্রতিফলন এবং এই বাস্তবের প্রধান রূপকার মানুষের প্রতিফলন—তাহলে এই কাজে শিল্পের কোন্ শাখা কতটা সফল সেই অনুসারে সাজালে দেখা যাবে সিনেমার ভাষার সাফল্যই বারবার ঘোষিত হচ্ছে।

ভাস্কর্যের ভাষা কতই না সংকীর্ণ—তাতে শব্দ নেই, রঙ নেই, গতি নেই, নাট্যমুহূর্তের পরিবর্তন নেই, ঘটনার বিকাশ নেই।

সুনির্দিষ্ট কল্পমূর্তিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সংগীতের ভাষার প্রয়োগ—এ-কাজে সংগীতশিল্পীরা কত না সমস্যায় পড়েন।

সাহিত্য যদিও বাইরের ঘটনাকে যেমন প্রকাশ করতে পারে, তেমনি মানুষের চেতনাতেও প্রবেশ করতে পারে, আর তার শৈলীগত পদ্ধতিগুলিও বিচিত্র ও ব্যাপক, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৃষ্টি করতে পারে না।

এ-কাজে থিয়েটারের ক্ষমতাও সীমিত ও অসম্পূর্ণ। তাকে লেখকের ও পাত্রপাত্রীর ভেতরের জগৎ, ভেতরের চেতনা, ও তার ভেতরের সত্যকে প্রকাশ করতে হয় বাইরের 'ভৌত অ্যাক্‌শন [ক্রিয়াকলাপ]' ও আচার-আচরণের দ্বারা।

বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের উপকরণগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর ভিত্তি করে, শিল্পের এক-একটি শাখার মূল পদ্ধতিকে আমরা এইভাবে বর্ণনা করতে পারি :

ভাস্কর্যের রীতি—মানবদেহের গঠন-কাঠামোর অনুসারী।

চিত্রকলার রীতি—বস্তু তথা প্রাণীর অবস্থান-অনুসারী এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক-জনিত।

সাহিত্যের রীতি বা পদ্ধতি : বাস্তবের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার অনুসারী।

থিয়েটারের রীতি বা পদ্ধতি : বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রেষণার দ্বারা চালিত কুশীলবের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ ভিত্তিক।

সংগীতের রীতি বা পদ্ধতি : আবেগানুভূতিতে অভিষিক্ত ভাব বা ধারণার অভ্যন্তরে যে ভারসাম্য ও সুসঙ্গতি রয়েছে তার নিয়মবিধি ও সূত্রের অনুসারী।

কোনো-না-কোনো ভাবে, প্রতিটি রীতি বা পদ্ধতিই—তা সে বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ, দীর্ঘস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী, মূর্ত বা বিমূর্ত—যাই হোক না কেন, তার সমস্ত কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে একটা উদ্দেশ্যই সাধন করে থাকে। তা হল : তাদের কাঠামো ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাস্তবকে পুনর্নির্মাণ করা, বাস্তবকে প্রতিফলিত করা, এবং সর্বোপরি মানুষের অনুভূতি ও চেতনাকে তুলে ধরা। 'পুরনো' শিল্পমাধ্যমগুলির কোনোটাই এ-কাজ পুরোপুরি করে উঠতে পারেনি।

কারণ একটির সীমা—মানুষের শরীর।

আর একটির সীমা—মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণ।

তৃতীয়টির সীমা—সেই বিমূর্ত আবেগগত সুসঙ্গতি যা শরীর, কর্ম ও আচরণের পেছনে সক্রিয়।

একই সঙ্গে মানুষের অন্তর্জগতের পুরোটার ও বহির্জগতের সম্পূর্ণ প্রকাশ শিল্পের কোনো একক শাখার দ্বারা সম্ভব নয়।

কোনো শিল্পমাধ্যম যখন তার নিজস্ব রূপরেখা ছাড়িয়ে এই কাজ করতে যায় তখনই সেই মাধ্যমের শিল্পগত ভিত্তিভূমি নড়ে যায়।

শিল্প, আঙ্গিকগত ও প্রকাশ রূপের দিক থেকে, তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে একমাত্র শিল্পরূপের উন্নততর এক রূপভেদে—সিনেমার মধ্য দিয়ে।

কেননা একমাত্র সিনেমাই তার রূপরীতির নান্দনিক ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে মানবশরীরের স্থিতিরূপ এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণের গতীয়তাকে যেমন, তেমনই তার অনুভূতি ও চিন্তার বহুমুখী ও পরিবর্তনক্ষম মানসিক আন্দোলনকে। এ-শুধু পর্দায় মানুষ ও তার কার্যকলাপকে তুলে ধরার উপকরণ হিসেবে নয়, জগৎ ও বাস্তবের সচেতন প্রতিফলনের গঠনগত রূপরেখা হিসেবেও প্রাসঙ্গিক।

কাব্য, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য প্রতিটি শিল্পমাধ্যমেরই কোনো-না-কোনো প্রত্যক্ষ বহিঃসত্তা থাকে—কাব্যের ধ্বনি, সংগীতের ধ্বনি ও সুর, চিত্রকলার রেখা, রঙ ও টোন, নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি। শিল্পমাধ্যমে প্রথাগতভাবে রসানুভূতির সৃষ্টি হয় তার অন্তর্গত উপাদানগুলির সমগ্রসন্ধির মধ্য দিয়ে। এর জন্য বিশেষ সমাহারের প্রয়োজন। ধ্বনিসমগ্র হলেই কাব্য হয় না, কাব্যের জন্যই চাই বিষয় ধ্বনি অলংকার অর্থের সবিশেষ সমন্বয়। সুরসমষ্টি হলেই সংগীত হয় না, সংগীতের জন্য চাই ধ্বনি বাণী তাল লয় সুরমূর্চ্ছনার নির্দিষ্ট সংশ্লেষ। তেমনি অঙ্গভঙ্গি মাত্রই নৃত্য নয়, নৃত্যের জন্য দরকার গতি ছন্দ ভাব ও অঙ্গভঙ্গির সমন্বিত সমাহার। যেমন চিত্রকলার জন্য রেখা রঙ টোন ও রূপবন্ধের সুষম সংস্থান ইত্যাদি। এই জাতীয় সমস্ত সমাহার, সমন্বয়, সংস্থান ও সংশ্লেষণেরই চূড়ান্ত রূপ চলচ্চিত্রে। যেজন্য আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে আইজেনস্টাইন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে এখন থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা চলচ্চিত্রে ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা চলচ্চিত্রের লিখিত রূপ চিত্রনাট্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

'চিত্রনাট্য ভালো না হলে কিছুই হবে না।'—সত্যজিৎ রায়

চিত্রনাট্য রচনা প্রসঙ্গে বারবার আসে কাহিনী প্রেক্ষিত চরিত্র ঘটনা ও সংলাপের কথা। চলচ্চিত্রের কাহিনী প্রধানত চরিত্র ও ঘটনাকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলে। কাহিনী যতই সমৃদ্ধ জটিল ও নতুন ধরনের হোক না কেন তা দর্শকের কাছে বোধগম্য হওয়া চাই। কাহিনীর যে বিষয়বস্তু তার মিলিউ বা প্রেক্ষিতের উপস্থাপন, চরিত্রের ইমোশন ও অনুভব, আর ঘটনার প্রকৃতি শুধু বোধগম্য হলেই

চলে না, তাদের মোটামুটি সম্ভাব্য হওয়াও দরকার [কমেডি বা ফ্যান্টাসি চিত্র ছাড়া]। ছবিতে যে জগৎ দেখানো হচ্ছে দর্শক হয় তার প্রতি বিশ্বাস নিয়ে নতুবা অবিশ্বাস সত্ত্বেও শিল্পের খাতিরে আপাত-বিশ্বাস নিয়ে ছবি দেখেন, ফলে কাহিনী-চরিত্র-ঘটনা বিশেষ ভৌগোলিক/সামাজিক/মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে ও পরিবেশে সম্ভাব্য কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

চরিত্রের অ্যাক্শন, তার মানসিকতা ও চরিত্রের অপরিহার্য ব্যবহারিক দিক—এগুলি নিয়ে চরিত্রচিত্রণ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। চরিত্রের ব্যবহারিকতার মধ্যে পড়ছে তার লিঙ্গ-বয়স-দৈহিকরূপ-শিক্ষা-পেশা-ব্যসন-পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি। চরিত্রের অ্যাক্শন ছবিতে ঘটনার ও কখনো ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে রূপ পায়। সংলাপের কিয়দংশ ও ইমোশন-অনুভব অনেকটাই চরিত্রের মানসিকতার দিক।

কাহিনীচিত্রের চিত্রনাট্যে সংলাপের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, কখনো-কখনো সংলাপের মাধ্যমে যতটুকু প্রকাশ করা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি প্রকাশ করা যায় ও চলচ্চিত্রসম্মতভাবে প্রকাশ করা যায় চিত্রভাষার প্রয়োগে। তাই ফেলিনি বলেছিলেন : পাতার পর পাতা সংলাপ লিখলেন, তারপর সেট-নির্দেশকের সাহায্যে এমন একটা ঘর বানালেন যার মধ্য দিয়ে সব বলা যায়, তখন পাতাগুলো ফেলে দিলেন।

চলচ্চিত্রের বর্ণনা, বক্তব্য, বিশ্লেষণ সব কিছুতেই আর যার অবদান অনস্বীকার্য তা হল ঘটনা। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া, মাত্রা ও অভিঘাত স্থান, কাল ও বস্তু বা পদার্থ বা পাত্রপাত্রীর উপর বিশেষ নির্ভরশীল। ঘটনা প্রসঙ্গে চরিত্রের কথা এসে যায় অঙ্গাঙ্গীভাবে। একদিকে ঘটনা যেমন চরিত্রকে আধার করে গড়ে ওঠে, অপরদিকে চরিত্রও আবার ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্থ, ব্যঞ্জনা ও পরিণতি পায়। ছবির বিষয়বস্তু কী, আঙ্গিক কী রকম ও কোন্ ধরনের ছবি—তিনটের ওপরই ঘটনার ধারা ও ধরন নির্ভর করে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের তারতম্যের দরুনও ঘটনার তারতম্য ঘটে থাকে। স্থান, কাল ও ঘটনা তিনের সংমিশ্রণে ও সংশ্লেষণে ইমেজ বা চিত্রপ্রতিমা গড়ে ওঠে এবং বিকাশের মধ্য দিয়ে দৃশ্যাংশ, দৃশ্য ও দৃশ্যপর্যায়ের রূপ পায়।

কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা সবকিছুর মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্য তথা কাহিনীচিত্র অগ্রগতির দিকে এগোবে। এই অগ্রগতি কাহিনীর প্রতিটি পর্ব প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে প্রযোজ্য। প্রত্যেকটা চরিত্র ক্রমে পরিণতির দিকে এগোবে, প্রতিটি ইমোশন ও অনুভব ধীরে ধীরে আরও অমোঘ হয়ে উঠবে, প্রতিটি সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে আরও প্রাসঙ্গিক, প্রত্যেকটা পরবর্তী ঘটনা হবে আরও অভিঘাতী। যে জাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে গুটিয়ে নেওয়া হবে। দ্রবণে যে সুতো রাখা হয়েছিল তা ঘিরে দানা বেঁধে উঠবে ঘনাঢ্য পলকাটা কেলাস।

কোনো প্রস্তাবিত ছবির চিত্রনাট্য পরখ করে দেখে প্লটের ও নির্মিত ছবির চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ করে দেখায় ছবির গঠন, ক্রমবিকাশ ও সুষমতাকে। তাই বলে চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ কিন্তু চিত্রসমালোচনা নয়। চিত্রনাট্য যদি বলে নির্মীয়মাণ ছবিটি কীভাবে তৈরি করতে হবে, চিত্রসমালোচনা তবে বলে নির্মিত ছবিটি কীভাবে ও কেমন তৈরি হয়েছে, আর চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ হল ছবি কেন এভাবে ও এমন তৈরি হল তা দেখানো। অর্থাৎ চিত্র সমালোচনার একটা অন্যতম অংশ হল চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ। সাহিত্য থেকে চিত্রনাট্য রচনা থেকে চিত্রনির্মাণ থেকে চলচ্চিত্রের রসাস্বাদন ও সমালোচনা পর্যন্ত একটা সামগ্রিক প্রকল্প।

বলেছি, চিত্রনাট্য রচনার মোটামুটি তিনটে স্তর থাকে—সিনপ্সিস, ট্রিট্মেন্ট, শুটিং স্ক্রিপ্ট। সিনপ্সিসে সমৃদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত রূপের জন্য মূল কাহিনীকে যথাযথ মনে হতে পারে। কিন্তু তাকে যতই ক্রমবিকশিত করা হচ্ছে ততই দেখা যেতে পারে বহু অবাঞ্ছিত বিকাশ ও অগ্রগতির উৎস

রয়ে গেছিল তার মধ্যে। ফলে মূল কাহিনীকে চলচিত্রের প্রয়োজনে পরিবর্তনের কথা উঠছে। কাহিনীতে যে বিন্যাসে ঘটনা সাজানো হয়েছিল চিত্রনাট্যে তার চেয়ে ভিন্ন বিন্যাসে দৃশ্য সাজানো না হলে যে বিশেষ কোনো দৃশ্য যুক্তিযুক্ত, সত্য ও কার্যকরী হয়ে উঠবে না তা হয়তো ট্রিট্মেন্টে এসেই ধরা পড়ল। সেই ট্রিট্মেন্টকে আবার শুটিং স্ক্রিপ্টের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল। সিনপ্সিস থেকে শুটিং স্ক্রিপ্ট—এক কথায় এই হল চিত্রনাট্য রচনা। আবার শুটিং স্ক্রিপ্টের প্রসারিত ও সম্পূর্ণ আঙ্গিকে কোনো কোনো দৃশ্য, দৃশ্যকল্প, প্রয়োগ ও মোটিফকে খুবই কার্যকরী ও আকর্ষণীয় মনে হতে পারে কিন্তু ওই শুটিং স্ক্রিপ্টকে যদি এবার সংহত করে আনা যায় আরেকটি সিন্‌পসিসে তাহলে হয়তো দেখা যাবে যাকে মনে করা হচ্ছিল অবশ্য প্রয়োজন তা আসলে নিছক প্রলোভন। শুটিং স্ক্রিপ্ট থেকে আবার সিনপ্সিস—বলা যায় এ হল চিত্রনাট্য বিশ্লেষণের একটা উপায়।

তা হলে এই চিত্রনাট্যবিদ্যার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা—যে চিত্রনাট্য কিনা 'বর্ণমালায় চিত্রমালা'। দেশ-বিদেশের চিত্রনাট্য ভাবনার নতুন দিগন্তের আলোচনায় আমরা দেখি চলচ্চিত্রের বিবর্তন যেভাবে হয়েছে চিত্রনাট্যের বিবর্তনও হয়েছে সেইভাবে। কেননা চিত্রনাট্য যা, চলচ্চিত্রও তা-ই; চলচ্চিত্র যেরকম, চিত্রনাট্যও সেরকম।

পরিচালক যেমন, চিত্রনাট্যও তেমন, তাই—

'দ গ্রেট ডিক্টেটর'-এর আগে চ্যাপলিনের কোনো শট বিভাজনসহ চিত্রনাট্য ছিল না। তার আগে যা থাকত তা অনেকটা মুখে-মুখে বলা চিত্রনাট্য। যখন চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে তখনও চিত্রনাট্যকে যতটা পারা যায় সহজ রাখার চেষ্টা হত।

বিপরীতে, আইজেনস্টাইনের চিত্রনাট্য একটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুপরিকল্পিত।

বুনুয়েলের কাছে চিত্রনাট্য কখনো 'সাহিত্য বা আলগা আইডিয়া হিসেবে যা ভালো লাগেনি তাকে ভালো লাগায় রূপান্তরিত করার মানসে সিনেমাকে ব্যবহার করার' উপায়।

বার্গম্যানের কাছে চিত্রনাট্য মূলত, যে সাহিত্য ও ভাবনা মনের মতো তাকে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী চিত্ররূপ দেওয়ার উপায়।

ফেলিনির মতে : 'গল্প বলার পদ্ধতি নয়, ছবিতে আমার আগ্রহ ছিল কেবল গল্পাংশে। এমনকী পরেও আমি সিনেমার ক্লাসিক সম্বন্ধে কিছু জানি না। চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রথম দিকে আমাকে অনেক অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যের আরম্ভ থেকে সামগ্রিক চেহারাটা আমার চিন্তায় থাকত। এক কথায় বলতে হয়—কল্পনায় আমার চিত্রনাট্যের সূত্রপাত এবং ছবির প্রথম কপি এমনকী প্রথম প্রদর্শনে তার সমাপ্তি।'

আন্তনিওনির ভাষায় : 'সকলেই জানেন, শুটিং স্ক্রিপ্ট আগের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে, ক্রমেই আরও সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। কলাকৌশলগত নির্দেশ এখন আর প্রায় থাকেই না, সংলাপও প্রায় তাই। আমার নিজের চিত্রনাট্যে আমি এমনকি দৃশ্য সংখ্যাও বাদ দিচ্ছি। কেন না শুটিংয়ের সময় কোনো দৃশ্যকে যেভাবে তুলছি সেই ভাবেই দৃশ্যকে ভাগ করা আমার কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ইম্প্রোভাইজেশনের আর একটা সুযোগ।'

তারকোভ্স্কির মতে : 'সিনেমার চরম পর্যায়ে তার স্থান সংগীত ও কবিতার মাঝামাঝি।' চিত্রনাট্য তাই হল চিত্রকাব্যনাট্য।

আবার গদারের ভাষায় : 'ছবিতে গল্প : ওটা আমার ধাতে সয় না। গল্প বলার কায়দাটাই আমি জানি না। সমগ্র ব্যাপারটিকে আমি উন্মোচিত করতে চাই প্রত্যেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে আবার

একসঙ্গে সব বলে ফেলা আমার প্রবৃত্তি। নিজেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে ভালো লাগে : আমি একজন পেইন্টার ইন লেটার্স, যেমন বলা হয় ম্যান অব লেটার্স। ছবিতে আপনারা আমার সরব মনন শুনতে পান। আমার অনেক ছবিই, প্রকৃত প্রস্তাবে, ঠিক ফিল্ম নয়, ফিল্ম সম্বন্ধীয় নিবন্ধ।'

বাংলায় চিত্রনাট্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন নরেন্দ্র দেব, সত্যজিৎ রায়, গুরুদাস ভট্টাচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, গাস্তঁ রোবের্জ প্রমুখ। এই প্রবন্ধ যাঁর প্রতি নিবেদিত, তিনি, অর্থাৎ অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-ও, চিত্রনাট্য বিষয়ে, বিশেষত সত্যজিতের চিত্রনাট্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। বর্তমান লেখকেরও চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ বিষয়ে একটি বই আছে। এইভাবে বাঙালির চিত্রনাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ আরেকটি পদক্ষেপ রূপে গৃহীত হোক।



শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : সঙ্ঘাত ও সমন্বয়

• • • • • •

কাননবিহারী গোস্বামী

১ক. পূর্বভাষ :

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক ও কৃতী অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ৭৬ বছরে পদার্পণ করলেন। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, কিংবা দেখেন নি---শুধুই তাঁর লেখা পড়েছেন, সকলের পক্ষেই এটি আনন্দের বিষয়।

সাম্মানিক শ্রেণীতে এবং এম. এ. শ্রেণীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনার সময় থেকে তাঁর সাহিত্য সমালোচনা-গ্রন্থাদির সঙ্গে আমার পরিচয়। সে-সময় তাঁর যে নিজস্ব ভাবনাদীপ্ত বইটি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল সেটি হল—'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন'। এতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আস্বাদন ও মূল্যায়নে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা, রসগ্রাহিতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত বিচারবোধ, আর সর্বোপরি এর নির্মেদ অথচ লাবণ্যের ছোঁয়ালাগা গদ্যশৈলী বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের কাছে বিশেষ উপভোগের বস্তু। আমার আক্ষেপ এই যে, এ গ্রন্থের সাম্প্রতিক পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণেও লেখক মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ মূল্যবান শাখা 'শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্য' সম্পর্কে একটি ছত্রও লিখলেন না।

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিই। ১৯৮০ সাল থেকে হই স্থায়ী শিক্ষক। সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ক্রমে আমাদের সহকর্মী কাছের মানুষ 'ক্ষেত্রদা' হয়ে ওঠেন। আমার অনুযোগ ছিল, ক্ষেত্রদার শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্য সম্পর্কে কিছু না লেখার। এখন তাঁর জীবনের 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি'তে তাঁকে সম্মাননা জানাবার উপায় হিসাবে আমি নির্বাচন করেছি তাঁর অস্পর্শিত শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত।

আমার নির্বাচিত বিষয় হল—'শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : সঙ্ঘাত ও সমন্বয়'। আমি মনে করি, বর্তমানকালে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সঙ্ঘাত এবং জাতিগত বৈষম্য ও বিরোধের পটভূমিকায় বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষত, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং গোধরার নরমেধ কাণ্ডের পর। আমি বর্তমান প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি—ষোড়শ শতকের প্রথম দশক থেকেই উদার মানবতাবাদী শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরদের সহযোগিতায় পূর্ব ভারতে হিন্দু-মুসলমানের প্রারম্ভিক জাতিগত সঙ্ঘাত সত্ত্বেও পরে কাঙ্ক্ষিত সমন্বয় এবং মিলনের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। সর্বোত্তম দুটি বাংলা শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এর অভিঘাত এবং ইতিহাস ধরা আছে। ভারতবর্ষের 'সামাজিক-

ধর্মীয় ইতিহাসে' ['Socio-Religious History'] এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

১খ. কথামুখ :

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায়, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তুরকি সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলজীর অভিযানে প্রাচীন বঙ্গে যোদ্ধা মুসলমান ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব। তারপর থেকে নানা সঙ্ঘাত, সমন্বয় ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে সাতশো বছর ধরে মধ্য ও আধুনিকযুগে প্রসারিত কালখণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান জাতি এদেশে পাশাপাশি বাস করছে। এজন্যই কবি নজরুল ইসলাম গেয়েছেন— "মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম—হিন্দু-মুসলমান।" হিন্দু ও মুসলমানের দীর্ঘচলিত বিভেদ ও মিলনের সম্পর্ক বঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের [Social and Cultureal History-র] গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের "তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়" মুক্ত মানসিকতা ও সর্বপ্লাবী প্রেমধর্মে বঙ্গবাসীর জীবনচর্চায় নবজাগৃতির আলোকপ্লাবন আনল। ঐতিহাসিক প্রবর ড. যদুনাথ সরকার 'History of Bengal' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একে বলেছেন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুল্য 'Chaitanya Renaissance'। শ্রীচৈতন্যের মর্ত্যে প্রকটকাল মাত্র ৪৮ বছর [২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৪৮৬ খ্রি. থেকে ২৯ জুন বা জুলাই, ১৪৩৩ খ্রি.]। কিন্তু এর মধ্যেই দিব্যজীবনের একটি বড়ো অংশে তিনি আপন প্রেমপ্রভাবে তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান-জাতির সামাজিক ভেদাভেদ ও প্রশাসনিক ব্যবধান অনেকটাই বিদূরিত করেছিলেন। এর ইতিহাস ধরা আছে মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণ্য বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' [রচনাকাল ১৫৪৮ খ্রি.] এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' [রচনাকাল ১৬১৫ খ্রি.]। আমরা মূলত এই দুটি কাব্যে প্রতিফলিত শ্রীচৈতন্যসমকালীন হিন্দু ও মুসলমান জাতির পারস্পরিক সঙ্ঘাত, সমন্বয় ও সম্প্রীতির রূপটি দেখতে পারি।

২. 'চৈতন্যভাগবত'-এ যবন হরিদাস ও যবন মুলুকপতির সম্পর্ক :

যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রিয় লীলাপার্ষদ এবং তাঁর হরিনাম-মহামন্ত্র-প্রচারের এক মুখ্য ঋত্বিক। সম্ভবত যবনবংশে তাঁর জন্ম। অবশ্য জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-অনুসারে হরিদাস হিন্দু সন্তান, কিন্তু বাল্য-কৈশোরে যবনগৃহে প্রতিপালিত। হরিনামে অপূর্ব ও সুদৃঢ় অনুরাগের জন্য নাম হয়—হরিদাস। ইনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নেতৃত্বে একটি হরিনামভক্ত বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে জেনে পিতৃভূমি যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রাম থেকে সেখানে চলে আসেন। প্রকাশ্যে হরিনামকীর্তন ও নামপ্রেম প্রচার নিয়ে মুসলমান মুলুকপতির সঙ্গে হরিদাসের বিরোধ বাধে। এর বিস্তৃত ও অত্যাশ্চর্য বিবরণ পাই বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর আদি খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে।

সেখানে দেখি—হরিদাস নবদ্বীপে আসার আগে শান্তিপুর-ফুলিয়ায় এসে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে নামপ্রেমে মত্ত হন—

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চস্বরে।।"

তখন নদীয়ার কাজি তাঁর যবন মুলুকপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাছে গিয়ে হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।"

হরিদাসকে মুলুকপতির কাছে ধরে আনা হল। মুলুকপতি তাঁকে "পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান"। তারপর হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"কেনে ভাই, কিরূপ তোমার দেখি মতি।।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন।। ... ...
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার।"

এর উত্তরে হরিদাস মুলুকপতিকে যা বললেন, তা বর্তমানেও মাঝে-মাঝে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদক্লিষ্ট ভারতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষণীয়—

"শুন বাপ, সভারই একই ঈশ্বর।।
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে।। ... ...
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র-মতে।। "

মুলুকপতি কোনো সদ্‌যুক্তি শুনলেন না। হরিদাস প্রাণান্তেও হরিনাম ছাড়তে রাজি না হওয়ায় বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত ক'রে ঐ নামসাধকের প্রাণ নেবার আদেশ দিলেন। কিন্তু বাইশ বাজারে প্রচণ্ড বেত্রাঘাতেও হরিদাসকে জীবিত দেখে প্রহারকারীরা ভীত হল। তাদের অনুরোধে হরিদাস মহাসমাধিতে বসলেন। এবার তাঁকে মৃত-জ্ঞানে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হল। গঙ্গাজলস্পর্শে সমাধিভঙ্গে হরিদাস চৈতন্য পেয়ে তীরে উঠে ফুলিয়া নগরে রইলেন। তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে—

"পীর জ্ঞান করি সভে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।। "

মুলুকপতিও হরিদাসের কাছে এসে বললেন—"সত্য সত্য জানিলাঙ তুমি মহা পীর।" তারপর জানালেন—

"আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা-তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাহি করহ সর্বথা।। "

দেখা গেল, সেই ষোড়শ শতকেও হরিদাসের মতো সাধকরা কোরান-পুরাণে ঈশ্বরের অভেদত্ব জানতেন। হরিদাসের হরিনাম-কীর্তনে প্রথমে যবন কাজি ও শাসকের বাধাদান, হরিদাসের প্রাণহরণের চেষ্টা এবং পরিণামে তাঁর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য মেনে তাঁকে স্বধর্মাচরণে সানন্দে অনুমতি দান—এইসব ঘটনায় প্রথমে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ এবং পরে সৌহার্দ্য-মিলনে তার অবসান, তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

৩. শ্রীচৈতন্যের কাজি-দলন ও তার তাৎপর্য :

১৪০৮ খ্রিস্টাব্দে গয়ায় পিতৃকৃত্য সাধন করে নবদ্বীপে ফেরার পর শ্রীচৈতন্য স্ব-গণ-সহ কীর্তনানন্দে বিভোর থাকতেন। তিনি নবদ্বীপবাসীদেরও দিবাভাগে প্রকাশ্য কীর্তন করতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের যবন কাজি মৌলানা সিরাজুদ্দীন পাষণ্ডীদের প্ররোচনায় কীর্তন-নিষেধাজ্ঞা জারি করল। তার ফরমান, যে কীর্তন করবে—"সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।" বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'

অনুসারে জানা যায়, সিংহবীর্য গণনায়ক শ্রীচৈতন্য এই 'অবিধির বিধি' বা 'Lawless Law'-এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করেন। এ ঘটনা ১৪৩১ শক, বা ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের। বিকেলে অসংখ্য নবদ্বীপবাসী সজ্জিত দীপ ও তৈলভাণ্ড নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে এল। সকলের মুখে হরিনাম। খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-মন্দিরাসহ কীর্তনিয়াদের মহাপ্রভু চার সম্প্রদায়ে সাজালেন। এক-একটির পুরোবর্তী হলেন অদ্বৈত আচার্য, যবন হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ পাশাপাশি। বাদ্য-কোলাহল ও কীর্তনধ্বনি-সহ মিছিল কাজীর বাড়ি পৌঁছল। বহুকণ্ঠে ধ্বনি উঠল—'কাজি মার'। তখন—

"শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ-সহ ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য/১৩

উদ্ধত লোকেরা কাজির ঘর-দ্বার ভাঙল। কেউ কেউ কাজির বাগান তছনছ করে দিল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা মহাপ্রভু কাজির বাড়িতে আগুন লাগাতে আদেশ দিলেন। ভক্তগণের অনুরোধে মহাপ্রভুর ক্রোধ শান্ত হল। তিনি কাজিকে দণ্ডিত করে সঙ্কীর্তনদল নিয়ে ফিরে গেলেন—

"কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্বলোকরায়।
সঙ্কীর্তনরসে সর্বগণে নাচি যায়।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য/১৩

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলায় ঘটনাটি একটু অন্যরকম। সেখানে মহাপ্রভুর রূপ ও আচরণ অনেক শান্ত। মহাপ্রভু কীর্তনদলসহ কাজির বাড়ি গেলে—"কীর্তনের ধ্বনিতে কাজি লুকাইল ঘরে।" মহাপ্রভু 'ভব্যলোক' পাঠিয়ে কাজিকে ডেকে আনলেন। উভয়ের গ্রাম-সম্বন্ধে আত্মীয়তার কথা হ'ল। এবার মহাপ্রভু কাজির কাছে কীর্তন-নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অনুরোধ জানালেন—

"প্রভু কহে—'এক দান মাগি হে তোমায়।
সংকীর্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়।"

'চৈতন্যচরিতামৃত', আদি/১৭

কাজি এই অনুরাধে সাড়া দিলেন—

"কাজি কহে—'মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহারে তালাক দিব, কীর্তন না বাধিবে।। "

চৈ. চ., আদি/১৭

একেবারে বংশ-পরম্পরায় 'Standing Order' বা স্থায়ী আদেশ।

ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ। এটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম গণ-সত্যাগ্রহ, যার উত্তরাধিকার বিশ শতকে পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বর্তেছিল। ড. সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন—"It was perhaps the first act of civil disobedience in the history of India." ['History of Bengali Literature'. P. 81]।

শ্রীচৈতন্যের এই কাজি-দলন ঘটনাটিতেও দেখি—প্রথমে হিন্দু-মুসলমানে সঙ্ঘাত, পরে সম্প্রীতি ও সমন্বয়।

৪. গদাধর দাস ও কাজির মিলন :

'চৈতন্যভাগবত'-এর অন্ত্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গদাধর দাসের সঙ্গে আর এক কাজির মিলনকাহিনী

বর্ণিত। গদাধর দাসের গ্রামে এক যবন কাজি ছিলেন। তিনি "কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার।" গদাধর দাস নিশাকালে নির্ভয়ে তার বাড়ি গেলেন। বললেন—"তোমাকে 'হরিনাম' বলাতে এলাম।" তখন—

"হাসি বোলে কাজি 'শুন দাস গদাধর।
কালি বলিবাঙ হরি, আজি যাহ ঘর।।"

চৈ. ভা. অন্ত্য/৫

তখন হরিনামপ্রেমী—

"গদাধর দাস বোলে 'আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে।।"

চৈ. ভা. অন্ত্য/৫

যবন কাজি ও হিন্দু বৈষ্ণবের 'amicable settlement' হয়ে গেল। এর পর থেকে কাজি বৈষ্ণববিদ্বেষ ত্যাগ করে হরিনামাশ্রয় নিলেন।

৫. শ্রীচৈতন্য ও হোসেন শাহ প্রসঙ্গ :

১৪৩৫ শক বা ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে বৃন্দাবন-যাত্রাপথে গৌড় নগরের কাছে রামকেলি গ্রামে এলেন। তাঁর অপূর্ব প্রেমপ্রভাব ও দিব্যদেহকান্তিতে প্রভূত 'লোকসংঘট্ট' হল। রামকেলিতে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের একটি প্রাসাদ ছিল। হোসেন শাহ কোতোয়ালের মুখে এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর অপূর্ব প্রেমপ্রভাব ও লোক-আকর্ষণের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনে প্রাসাদশীর্ষ থেকে শ্রীচৈতন্যকে দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। তিনি পদস্থ হিন্দু কর্মচারী কেশব ছত্রীকে ডেকে ঐ সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে চাইলেন। শ্রীচৈতন্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে কেশব ছত্রী আসল কথা গোপন করে নবাবকে জানালেন—

"......... এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরীব—বৃক্ষের তলবাসী।।

চৈ. ভা. অন্ত্য/৪

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান হোসেন শাহ বললেন—'ওঁকে গরীব বোলো না' :

"হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ', খোদায় যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে।।"

চৈ. ভা. অন্ত্য/৪

তাঁর বক্তব্য—"আমি ছয়মাস বেতন বা জীবিকা না দিলে আমার সেবকরা আমার অনিষ্ট করার চক্রান্ত করবে। আর এতলোক বিনা অর্থে, নিজেরা খেয়ে-না খেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানে এই সন্ন্যাসীর সেবা করছে।" অতএব "তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'।" এরপর নবাব হোসেন শাহ রাজাজ্ঞা জারি করলেন—

"এই মুঞি বলিলুঁ সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।।
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন।।

কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জন।
কিছু বলিলেই তাঁর লইমু জীবন।। ”

চৈ. ভা. অন্ত্য/৪

যে হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে হিন্দুদের মন্দির, প্রতিমা, দেউল-দেহারা ভেঙেছিলেন, তাঁর এই উদার রাজাজ্ঞা প্রচার! এ বড়ো আশ্চর্য! শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক দৈবী প্রভাবেই যবন নবাবের এই উদার পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং হিন্দু সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভব হয়েছিল। ঘটনাটি সত্য। কারণ এর সমর্থন আছে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-এর অনুরূপ বিবরণে।

৬. শ্রীচৈতন্য ও পাঠান এবং রাজকুমার বিজুলি খানের প্রসঙ্গ :

১৪৩৬ শক বা ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে শ্রীচৈতন্য বনপথ দিয়ে ঝাড়িখণ্ড পেরিয়ে বৃন্দাবন ও মথুরায় এলেন। সেখানে পরিক্রমা ও লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধারের পর শীতকালে চললেন প্রয়াগের দিকে। মথুরা থেকে ফেরার পথে পথক্লান্তিতে এক বৃক্ষতলে বসলেন। সেখানে অনেক গোরু দেখে ও এক গোপের বাঁশির স্বর শুনে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ-লীলা মনে পড়ল। ভাবাবেশে মহাপ্রভু অচেতন হয়ে পড়লেন—"মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ।" এই সময় সেখানে দশজন পাঠান ঘোড়সওয়ার সৈন্য উপস্থিত। মহাপ্রভুর অবস্থা দেখে তারা মনে করল—এই যতির কাছে সোনা আছে। এঁর কাছে যারা আছে তারা 'বাটোয়ার' বা বাটপাড়। সোনার লোভে যতিকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছে। তারা মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে বেঁধে ফেলল। কৃষ্ণদাস জানালেন, তাঁরা 'বাটোয়ার' নন, যতির রক্ষক। যতির মূর্ছা-ব্যাধি আছে। মূর্ছাভঙ্গে সত্যকথা জানা যাবে। উচ্চ কৃষ্ণনাম-কীর্তনে শ্রীচৈতন্যের মূর্ছাভঙ্গ হ'ল। তখন পাঠানদের উদ্দেশ্যে—

"প্রভু কহেন,—'ঠক নহে মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, মোর নাহি কিছু ধন।"

চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্য/১৮

সেই ম্লেচ্ছ পাঠানদের মধ্যে একজন কালো বস্ত্রধারী গম্ভীর 'পীর' ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর কাছে ঈশ্বর-বিষয়ক শাস্ত্রবিচারে পরাভব মেনে 'কৃষ্ণ' নামে শরণ নিলেন। একেশ্বরবাদী পাঠান ভক্তিবাদী বৈষ্ণব হয়ে গেলেন। বিজুলি খান নামে আর এক পাঠান রাজকুমারও তাঁর সঙ্গী ঘোড়সওয়ারদের সাথে নিয়ে " 'কৃষ্ণ' বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।" মহাপ্রভুর দিব্য করুণা-প্রভাবে—"সেই ত পাঠান-সব বৈরাগী হইলা।"

এ-ও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সে যুগে হিন্দুরা যবনশাসন ভয়ে, নিরাপত্তার অভাবে, রাজকর্মলোভে ধর্মান্তরিত মুসলমান হচ্ছিল। মহাপ্রভু স্রোতের মুখ ফেরালেন। কোনো ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে নয়, কৃষ্ণপ্রেমে ও শাস্ত্রযুক্তিতে তিনি যবন বা মুসলমানদের স্বেচ্ছায় হিন্দু বৈষ্ণব করলেন। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও যখন জোর করে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত, তখন শ্রীচৈতন্যের এই প্রেমে রূপান্তরের শিক্ষাটি আমাদের দিশারী আলোকবর্তিকা হোক।

৭. শ্রীচৈতন্য ও যবন হরিদাসের নির্যাণ-উৎসব :

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-বাসের শেষপর্বে যবন হরিদাস বুঝেছিলেন, প্রভুর মর্ত্যলীলা-সংবরণ আসন্ন। সে ঘোর শোক-দুঃখ সহ্য হবে না ভেবে হরিদাস প্রভুর আগে মৃত্যু-কামনা করলেন। মহাপ্রভু পূরণ

করলেন ভক্তবাঞ্ছা। হরিদাস মহাপ্রভুকে সামনে বসিয়ে, নিজ বুকে তাঁর দুটি শ্রীচরণ ধরে, ভক্তবৃন্দের পদরেণু মাথায় নিয়ে, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম কীর্তন করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন। মহাপ্রভু-সহ বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তরা মিছিল করে হরিদাসের মরদেহ নিয়ে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতীরে এলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে হরিদাসের দেহকে সমুদ্রজলে স্নান করলেন। তারপর হরিদাস-অঙ্গে প্রসাদচন্দন মাখানো হল, জগন্নাথদেবের প্রসাদী পট্টডোরী ও প্রসাদী বস্ত্র দিয়ে সাজানো হল। এর পরে সমুদ্রতীরে গর্ত করে ঐ দেহকে বালুশয্যা দেওয়া হল। এরপর 'হরি বোল, হরি বোল' উচ্চারণ করতে করতে মহাপ্রভু :

"আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়।।
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল।। "

চৈ. চ. অন্ত্য/১১

পুরীতে স্বর্গদ্বারে হরিদাসের সেই সমাধি আজো মহাপ্রভুর যবনপ্রীতির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মহাপ্রভু শুধু হরিদাসকে যথোচিত সমাধিই দেন নি তাঁর তিরোভাব-মহোৎসবও পালন করেছিলেন। যে নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী কখনো কারো কাছে কিছু চান নি তিনি জগন্নাথ-মন্দিরে, প্রসাদ-পসারীদের কাছে গেরুয়া আঁচল পেতে প্রসাদ-ভিক্ষা চাইলেন। সাশ্রুনয়নে বললেন—

"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহ ত আমারে।। "

চৈ. চ., অন্ত্য/১১

হিন্দু পসারীরা সেদিন মুসলমান ভক্তের তিরোভাব-মহোৎসবের জন্য প্রচুর প্রসাদ দিতে দ্বিধা বা কার্পণ্য করেন নি :

"শুনিয়া পসারী সব চাঙ্গরা উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।। "

চৈ. চ., অন্ত্য/১১

চারজন বাহককে দিয়ে প্রচুর প্রসাদ আনিয়ে যবন হরিদাসের সমাধিস্থলে মহাসমারোহে হরিদাসের নির্যাণ-মহোৎসব পালিত হল। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর সম্প্রীতির এর চেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে!

৮. শ্রীচৈতন্য সুবুদ্ধি রায় ও সনাতন-প্রসঙ্গ :

হোসেন শাহ গৌড়ের নবাব হবার আগে ছিলেন সুবুদ্ধি রায়ের কর্মচারী। কাজে গাফিলতির জন্য রায় তাঁকে কোড়া বা চাবুকের আঘাত করিয়েছিলেন। সেই চাবুক প্রহারের দাগ হোসেন শাহের দেহে ছিল আজীবন। নবাব হবার পর তাঁর বেগম ঐ দাগের বৃত্তান্ত জেনে সুবুদ্ধির প্রাণনাশ দাবি করেন। পূর্ব প্রভুর প্রাণনাশ না করে হোসেন শাহ তাঁর মুখে নিজের 'করোয়ার পানি' ঢেলে তাঁর জাতিনাশ করেন। এর প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ গোঁড়া স্মার্ত ব্রাহ্মণরা সুবুদ্ধিকে তপ্ত ঘৃত পান করে মৃত্যুবরণ করতে বললেন। মহাপ্রভু তাঁকে রক্ষা করে বললেন, হরিনামে সর্বপাপ নাশ হয়। বৃন্দাবনে গিয়ে সুবুদ্ধি হরিনাম করুন—"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন" [চৈ. চ., মধ্য/১৫]। সুবুদ্ধি মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করে প্রাণরক্ষা করলেন।

সনাতন ছিলেন হোসেন শাহের 'সাকর মল্লিক' বা ছোটকর্তা, অর্থাৎ 'লেফটেন্যান্ট গভর্ণর। যবন-সংসর্গে নিজ দেহকে দূষিত মনে করে তিনি পুরীতে জগন্নাথদেবের রথচক্রতলে দেহকে পিষ্ট

করে মৃত্যুবরণের সংকল্প করেন। অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্য তা জানতে পেরে সনাতনকে নিবৃত্ত করেন। তিনি সনাতনকে বৈষ্ণব সাধনা ও বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুশীলনের জন্য বৃন্দাবনে পাঠান। সেদিন মহাপ্রভু না রক্ষা করলে আমরা বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর মুখ্য পাত্র সনাতন গোস্বামীকে পেতাম না। এই দুটি ঘটনায় মহাপ্রভু দেখালেন, যবন-সংসর্গে কেউ অশুচি হয় না, বা কারো জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না।

৯. কথা-সমাপন :

'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ বর্ণিত উপরের ঘটনাগুলি থেকে দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রেম ও উদার মানবিকতার প্রভাবে ষোড়শ শতকে এ-দেশে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ অনেকটা কমে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাখিডোর বাঁধা হয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষা আজো আমাদের অনুসরণীয়।।



গৌড়ীয় ও অসমীয় বৈষ্ণব পদাবলী : তুলনার নিরিখে

• • • • • •

সত্য গিরি

দুটি পৃথক বিষয়—গৌড়-বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের অনুশীলিত কৃষ্ণলীলার পদাবলী ও আসামের শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষ্ণকথাকোবিদ্‌গণের পদাবলীকে তুলনার আলোকে দেখার আগ্রহ থেকেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। বাংলা ও আসাম—পূর্বভারতে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পৃথক আঞ্চলিক ভাষার রাজ্য, যা আজ স্বতন্ত্র সংস্কৃতিতেও সুচিহ্নিত। তবে এই স্বাতন্ত্র্য-সূচকতা সত্ত্বেও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বহু উপাদানে ও জীবন-চর্যার বিচিত্র বিষয়ে উভয় প্রদেশের মানুষের সাদৃশ্য, চেষ্টা করে বুঝতে হয় না—স্বাভাবিক ভাবেই তা অনুভবগম্য হয়ে ওঠে।

উভয় প্রদেশে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবধর্মান্দোলনও উদ্বোধিত হয়েছিল একই সময়ে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সময় কাল ১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ। আর শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কাল ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এই উভয় প্রদেশের বৈষ্ণব ধর্মগুরুদ্বয় প্রবর্তিত ভক্তিবাদের প্রধান অবলম্বন ছিল ভাগবতপুরাণ। কিন্তু ভাগবতকে গ্রহণের ক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায় স্বকীয় পথে চালিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। আমাদের আগ্রহ, সেই পার্থক্যের ক্ষেত্রকে সনাক্ত করা এবং তার ফল হিসেবে সাহিত্যের রসাবেদনই-বা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা অনুধাবন করা। তাছাড়া ভারতীয় পুরাণকথার একই মূল থেকে উদ্‌গত দুই প্রদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ কৃষ্ণকথা, বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়েও একটি ঐক্যে যে বিধৃত, তাও অনুধাবন করা আমাদের লক্ষ্য।

প্রসারিত এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে অবলোকনের জন্য সম-সময়ের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটিকেও আমাদের স্মরণে রাখা নিতান্তই জরুরি। নতুবা মনেই হতে পারে, পূর্বভারতীয় এই প্রান্তিক অঞ্চলের বৈষ্ণবধর্মান্দোলন ছিল সে-সময়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। একাদশ-দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারতীয় জনজীবনে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে শুরু করে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে সমগ্র ভারতবর্ষেই হিন্দুধর্ম এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। এই পরিবর্তনকে অনেকে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন। এ-সময়ে ভারতের পূর্ব-প্রচলিত প্রতাপান্বিত অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনা থেকে সরে এসে মানুষ একেশ্বরবাদে আস্থাশীল হয়ে ওঠে এবং সেই এক ঈশ্বরের অবতারদেরই তাঁরা পূজা-আর্চা শুরু করেন। অর্চিত দেবতাদের মধ্যে কৃষ্ণ ও রামই বিশেষ করে প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্ব-প্রচলিত বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কাণ্ড ইত্যাদির ধর্মীয় পথ থেকে এক নতুন পথে ধর্মচর্চা শুরু হয়েছে। এ-পথকে বলা যায় হৃদয়ের আবেগ-অনুভবময় ভক্তির পথ।

'ভক্তি' শব্দের সাধারণ অর্থ সেবা বা শ্রদ্ধা বা আরাধনা বা ভজন করা বোঝায়। 'ভক্তি' পদটির মূল 'ভজ'-ধাতু, যার অর্থ 'সেবা করা'। শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র মতে 'সা [ভক্তিঃ] পরানুরক্তিরীশ্বরে'। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগের পরতর আর কিছুই নেই এমন চিত্তবৃত্তিই ভক্তি। এ-যেন এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় সাধনার পথ। এ-পথের বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত থাকে এক অলৌকিকতা। আগের ধর্মীয় দর্শন বদলে যেতে থাকে। ধর্মাচরণের প্রকাশও রূপান্তরিত হতে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার

গান গাওয়া শুরু হয়। ভগবল্লীলাপ্রিয় লীলাশুকবৃত্তি সাধকদের সাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। বহু মানুষ [ভক্ত] একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে ঈশ্বর-প্রেমের গান করা অর্থাৎ কীর্তন করা একটা জনপ্রিয় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। লক্ষ্য করার বিষয়, এ-কেবল বাংলাদেশের শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রবর্তিত সংকীর্তনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষেই ধর্মসাধনার এই পথান্তর লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠেছিল।

এই কীর্তন আন্দোলনের প্রভাবে পুরোনো সব দেবতারা সাধারণ মানুষের অর্চনার জগৎ থেকে হটে যেতে থাকেন। দেবতাদের প্রতি মানুষের পুরোনো মনোভাব দূর হয়ে যেতে থাকে। সাংস্কৃতিক বিকাশগুলিরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই নব-আন্দোলনের প্রভাবে শাস্ত্র-ভাষা সংস্কৃতও পিছু হটতে থাকে—পণ্ডিতদের স্মৃতিতে, আর মঠ-মন্দিরের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দিতে সংস্কৃত ভাষা কোনোরকমে টিকে থাকে মাত্র। নতুন ধর্মান্দোলন শুরু হওয়ার প্রথম শতকগুলিতে দেখা গেল আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি, যেমন বর্ষাগমের অনুকূল আবহে শষ্পাঙ্কুর উদ্‌গত হয়ে ওঠে, তেমনি বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠছে। আবার তার ওপর এই নব-ভক্তিধর্মান্দোলনের প্রবল প্রভাব নব-বর্ষার সিঞ্চনের মতো এই সব নব্যভারতীয় ভাষাগুলিকে শাখায়-পল্লবে বহুধা বিস্তৃতও করে দিয়েছে। সাহিত্য হয়ে উঠছে জনসাধারণের সাহিত্য। সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির ওপর থেকে পুরোনো ব্রাহ্মণদের পদ্ধতিগত কর্তৃত্ব খারিজ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ব্রাহ্মণদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মণতন্ত্র যে সমাজে তার আধ্যাত্মিক মালিকানা হারিয়ে ফেলছিল, এ-কথাও ঠিক। এই মালিকানা তখন চলে যাচ্ছিল সাধু-সন্ত-গুরুদের হাতে। এঁদের রচনা করা গান ও এঁদের জীবনী অবলম্বনে যে সাহিত্য-সম্ভার রচিত হল, তা কিন্তু সাবেকী হিন্দুর স্মৃতি-শাসিত সমাজ-কাঠামোকে নস্যাৎ করলো না; তবে সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যভাবের এক নতুন আবহ রচনা করলো।

আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগীয় ভক্তিধর্ম ইস্‌লামধর্মের প্রভাবে উত্তরভারত অথবা দক্ষিণভারতের কোথাও উদ্ভূত হয়। কিন্তু এই মত ধোপে টেকেনি। কারণ তামিল ভক্তি-সাহিত্যের পদাবলী ভারতে ইস্‌লাম আগমনের আগেই রচিত হয়েছে। ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভাগবতের মধ্যেই এর সাক্ষ্য-প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ৩৮-৪০ শ্লোকে তাঁরা বর্ণিত দেখেছেন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মানুষরা পুনরায় কলিকালে জন্মগ্রহণে অভিলাষী, কারণ কলিযুগে অনেক 'নারায়ণ-পরায়ণাঃ' ভক্তের আবির্ভাব ঘটবে। এই আবির্ভাব স্থান হবে—'তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।। /কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।' এই নদীসমূহের জলপান করে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হবেন। ভাণ্ডারকর প্রমুখের ধারণা এই ভক্তগোষ্ঠী ভাগবতপুরাণের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হন, যাঁরা 'আলবার' বা 'আলোয়ার' নামে পরিচিত। সময়ের হিসেবে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে এক প্রবল ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে এঁদের নেতৃত্বে। এঁদের বচিত তামিলভাষার পদাবলী, যা এক লোকায়ত প্রবল শৃঙ্গারাত্মক রোমাণ্টিক প্রেমের ঐতিহ্যে লালিত হয়। ভক্তিভাবনার উৎস হয়তো সেখানেই। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ভাগবত-মাহাত্ম্য-বর্ণনায়ও ভক্তি যে দক্ষিণ দেশেই উৎপন্ন, তার সমর্থন রয়েছে—

উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
স্থিতা কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাংগতা।।
বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনের সুরূপিনী।
জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপা তু সাম্প্রতম্।।

মোটকথা ইস্‌লামের প্রভাবে ভক্তিধর্মের আবির্ভাব ঘটেনি, অবশ্য সূফী ধর্মভাবনার প্রভাব পরবর্তী কালে অনুভূত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় কালের সূচনার কাছাকাছি সময়ে কৃষ্ণের ওপর দেবত্ব আরোপিত হতে শুরু করে—পরে রামের ওপরও দেবত্ব আরোপিত হয়। যার সঙ্গে প্রাচীন ভক্তিবাদের যোগ ছিল। ভক্ত তাঁর ভালবাসার ঈশ্বরকে শান্ত-সমাহিত মনে ভালবাসবে—যে ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা পাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়। উত্তরকালের পুরাণ সাহিত্যের কৃষ্ণকথায় ঘটেছে গভীর পরিবর্তন। মহাকাব্যের কৃষ্ণ যেন পুরাণকথায় কেন্দ্রীয় গুরুত্ব থেকে পটভূমিতে সরে গেছেন। পুরাণ-কথায় গুরুত্ব পেয়েছে কৃষ্ণের জন্মলীলা, শৈশবলীলা, অসুরবিনাশী বীরত্বের কাহিনী এবং সর্বোপরি গোকুলের গোপ-গোপীর মধ্যে তাঁর প্রেমলীলা। পৌরাণিক কৃষ্ণকথার মধ্যে যে এই পরিবর্তন ঘটলো, তা ভক্তিভাবুকতার ধারায়ও এক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দেখা দিল। হয়তো এই পরিবর্তন খুবই মন্থর গতিতে ঘটেছে। তবে নব-ভক্তিভাবুকতার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখলাম তামিল পদাবলীতে। ব্যাকুল আবেগ-অনুরাগময় ভালবাসার ছবি প্রায়ক্ষেত্রে সংরাগতপ্ত চিত্রকল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তামিল সাহিত্যের পূর্বোল্লেখিত 'আলবার' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গানে। আলবারদের গান রচনার সূচনাকাল ঐতিহাসিকেরা স্থির করেছেন সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত তামিল ভাষায় প্রচুর ভক্তিমূলক পদাবলী রচিত হয়েছে। এই সব পদের সংগ্রহ অত্যন্ত মূল্যবান। তামিলদের কাছে এই হলো প্রধান শাস্ত্র এবং অনেক ধর্মাচার্যের কাছে এটি দ্বিতীয় বেদ হিসেবে গ্রাহ্য।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই নতুন ভক্তি-চেতনা দক্ষিণভারত থেকে মহারাষ্ট্র, পূর্বভারত ও উত্তরভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার লাভ করলো। তামিল ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিশ্চয়ই এ-কাজটি হয়নি। সংস্কৃতকেই এই নব-ভক্তিভাবনার বাহন হতে হয়েছিল। যে-সব সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বৈষ্ণবধর্মে ভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরাই আনুমানিক নবম-দশম শতাব্দীতে সংকলিত ভাগবতপুরাণের মধ্যে এই নতুন ভাবনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সংস্কৃতভাষাবাহিত ভাগবতপুরাণের রাজপথ ধরেই এই নতুন ভক্তিচেতনা বিস্তার লাভ করে এবং অনতিকালের মধ্যেই ভাগবত সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে এই ভাগবতপুরাণই একটা প্রধান মোড় হিসেবে চিহ্নিত। ভাগবত-পুরাণের বিভিন্ন স্কন্ধ আমাদের প্রাচীন পুরাণগুলির ঐতিহ্যকে প্রধানভাবে অনুসরণ করলেও দশম স্কন্ধের মধ্যে নব-ভক্তিভাবনাই রূপায়িত হয়েছে। কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও যৌবন-লীলা বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের ধর্ম-গ্রন্থাদির মধ্যে ভাগবত সত্যই খুব উচ্চ-মর্যাদার পুরাণ। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ভাগবতের অসংখ্য অনুবাদই এই পুরাণের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। কেবল বাংলা ভাষাতেই আমরা অন্তত চল্লিশটির মতো বিভিন্ন মাত্রার ভাগবত অনুবাদ দেখতে পাই। ভাগবতের মধ্যে আমরা যে কৃষ্ণচরিত্রকে পাই, তিনি কখনো শিশু, কখনো প্রেমিক, কখনো চক্রী—কিন্তু সব সময়ই বিস্ময়ে বিমুগ্ধকারী, আনন্দোদ্বেলকারী তাঁর উপস্থিতি। এমনকি সংকটজনক কোনো পরিস্থিতির মধ্যে অসীম সাহসিকতার পরিচয়ও তাঁকে যখন দিতে হয়েছে তখনও তিনি সহাস্য প্রসন্নবদন আনন্দমূর্তি।

এই যে নব-ভক্তিভাবনার পৌরাণিক বিকাশ, এতে ধর্মশাস্ত্রগুলিও প্রভাবিত হয়েছে। এই শাস্ত্রগুলিতে যে ধর্মীয় নীতি প্রণীত হয়েছে, সাধু-সন্তগণ সেইসব ধর্মের বাণী সারাভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হন মিস্টিক বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজাচার্য [জন্ম ১০১৬/১০১৮—১১৩৭ খ্রি:]। ইনি শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কর্ণাটকী ব্রাহ্মণ মাধবদেব [১১৯৭-১২৭৬ খ্রি:] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মধ্ব-সম্প্রদায়ের। তেলুগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্ক [ত্রয়োদশ শতাব্দী] মথুরার কাছে কৃষ্ণ আর রাধার গুণকীর্তনে মগ্ন হয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বল্লভাচার্য [১৪৭৯-১৫৩১ খ্রি:] জন্মসূত্রে তেলুগু হলেও কাশীতে বসবাস করতেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্ম-সম্প্রদায়ের

প্রবল প্রভাব গড়ে উঠেছিল গুজরাট ও রাজপুতানায়।

সর্বভারতীয় এই পরিস্থিতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও আসামে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নেতৃত্বাধীন বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ। ভক্তিশাস্ত্র হিসেবে ভাগবতের যে প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল সর্বভারতীয় স্তরে, এই দুই প্রদেশের বৈষ্ণবধর্মান্দোলনে তারও ব্যত্যয় ঘটেনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে ভাগবতের গুরুত্বের যে অসীম প্রভাব, তার অনুমান পাই শ্রীজীব গোস্বামীর 'উত্তর গোপালচম্পূ'তে বৃন্দাদেবীর হারের মধ্যমণি হিসেবে ভাগবত-গ্রন্থকে স্থাপনায়—"ইদং পুস্তকং নায়কমিব হারবিন্যস্তং করোমিতি।" শ্রীমন্ত শঙ্করদেবও তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ভাগবতপুরাণকে 'সর্ববেদান্তসার' বলে মনে করেছেন—

'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্বাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ॥'

শুধু ধর্ম-দর্শনেই নয়, পূর্বভারতের সর্বত্র,—আসাম, ত্রিপুরা, গৌড়-বঙ্গ এবং উড়িষ্যায় ভাগবতের সাংস্কৃতিক প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ধর্মাচরণেও বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতের ওপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপাস্য দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ মহাভারত-সূত্রধার নন, ভাগবতেরই শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা, কীর্তন দ্বারা ধর্মপ্রচার ও ভক্তিমার্গের সাধনা—এগুলি হল সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধারণ বিষয়, যা পূর্বভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও—বিশেষ করে গৌড়বঙ্গে ও আসামে দেখা যায়।

এবার আমরা গৌড়-বঙ্গের ও আসামের বিশেষিত কৃষ্ণকথাকাব্যের সরাসরি তুলনায় আসতে পারি। এই দুই প্রদেশের বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করলেও ধর্মদর্শনগত পার্থক্য দুই অঞ্চলের পদাবলী সাহিত্যের আস্বাদনেও এনে দিয়েছে বিপুল পার্থক্য। চৈতন্যদেবের জীবৎকাল ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। আর আসামের নব-বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শঙ্করদেবের জীবৎকাল ১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ। ইতিহাসের বিচারে দেখা গেছে লোকপ্রচলিত চৈতন্য-শঙ্কর সাক্ষাৎকারের কাহিনী সত্য নয়। তাঁদের ধর্মমত স্বাধীন ভাবেই ভাগবতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। শঙ্করদেবের 'একশরণ নামধর্মে'র একমাত্র উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। মার্গ—জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। ভাব—দাস্য। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে উপাস্য—রাধা-কৃষ্ণ। মার্গ—রাগানুগা ভক্তি তথা প্রেমভক্তি। ভাব চারটি—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতত্ত্ব বিবর্ত ও পরিণামবাদের মিশ্রণ। কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্ম বিশুদ্ধ পরিণামবাদী। আচার্য শঙ্কর বিবর্তবাদী—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তন মাত্র। রামানুজাচার্য ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—জীব ও জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেছেন—কেউ মিথ্যা নয়, যদিও সকলই ব্রহ্মের অন্তর্গত। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতত্ত্বে এই দুই মতেরই ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্মমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। এ-মতে স্বরূপকোটি ও জীবকোটির পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—তাঁতেই নিখিল জগতের অবস্থান।

এই দর্শন-প্রস্থানগত পার্থক্যের কারণে ভাগবত-ভিত্তিক হয়েও উভয় প্রদেশের পদাবলীর আস্বাদনে এসেছে বিপুল পার্থক্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধা সাধ্যশিরোমণি। ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ তিনি। তাঁর কাজ কৃষ্ণকে আনন্দদান [ভগবৎকোটি বা স্বরূপকোটির কাজ] করা; সেই সঙ্গে জীবজগতকে—পূত ভক্তহৃদয়কেও আনন্দিত করা। এই শক্তিই প্রেমের সার—আবার প্রেমের ভাব মহাভাব—রাধাই মহাভাবময়ী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই রাধার অবিসংবাদী প্রাধান্য।

কিন্তু শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মে এবং তাঁর রচিত সাহিত্যে রাধার স্থান নেই। B. K. Barua তাঁর 'History of Assamese—Literature' [Sahitya Akademy, New Delhi, 1964, P. 24] গ্রন্থে কথাটা খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন—"It should however be noted that, unlike as in

the Vaishnavite literature of other provinces, Radha does not appear, nor does she find a place in the whole of Shankarite Literature."

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র', 'গোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনাগুলিতে রাধার উল্লেখ থাকলেও কোনো প্রাচীন উল্লেখে রাধার নাম নেই। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে যে 'অনয়ারাধিতো' পদ পাওয়া যায়, তাতেও রাধা উদ্দিষ্ট নন। সুতরাং শঙ্করদেবের প্রবর্তিত একান্ত ভাগবতাশ্রিত 'একশরণ নামধর্মে'ও রাধার কোনো স্থান হয়নি। অবশ্য শঙ্করদেবের 'কেলিগোপাল' নাটকে একবার রাধার নাম ব্যবহৃত হয়েছে—'রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রহযোষিতঃ'। কিন্তু এই 'রাধা' নামটি প্রক্ষিপ্ত হতে পারে বলে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যের পণ্ডিত কালীরাম মেধির ধারণা।

ফলে আমাদের ধারণা, অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারায় ষোড়শ শতাব্দীতে রাধার স্থান হয়তো হয়নি—একথা সত্য, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে রাধার আসন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি শ্রীরাম আতা কিংবা তাঁর পুত্র রামানন্দ দ্বিজের কিছু কিছু গানে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার উপাদান গৃহীত হয়েছিল। যেমন রামানন্দ দ্বিজের একটি মানপর্যায়ের পদে মানিনী রাধার রাত্রিযাপন বর্ণিত হয়েছে—

মৃগমদ সৌরভ মলয়া-চন্দন
রঞ্জিত মল্লিক-তল্পং।
খনো উপবসতি পথি পুনু গচ্ছতি
ক্ষণমপি যুগ-শত-কল্পং॥
তব কর-কমল পরশ-সুখ-সম্ভোগ
চিন্তন্তি মনে অনুবারং।
লিখতি চ নখ ভূমি বিলাপতি রোদতি
তেজতি গজমতি-হারং॥
যুবতী-জনন্তর মানসি মুরারু
পততি চ মদন-আপারং।
রামানন্দ কহ আনন্দ পঙ্কজ
দরশিয়ে তাহে নিবারং॥

[সঞ্চয়ন—সম্পাদক : মহেশ্বর নেওগ]

শঙ্করদেবের সমকালীন কোচ-রাজসভার দুই কবি রাম সরস্বতী ও তাঁর ছেলে কলাপচন্দ্র রাধাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিছুটা ভিন্নভাবে। রামসরস্বতী গীতগোবিন্দের ভাষানুবাদ করেছিলেন, আর কলাপচন্দ্র লিখেছিলেন 'রাধাচরিত'। অসমীয়া ভক্তিবাদের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে রাম সরস্বতীর রাধা নীলশাড়ী পরিহিতা নন, তাঁর অঙ্গে ভক্তির শুভ্র বাস। জয়দেবের বিলাসকলাও বর্জিত হয়েছে—কেবল 'হরিস্মরণ' টুকুই গৃহীত হয়েছে ভক্তিরসাপ্লুত করে। কলাপচন্দ্রের 'রাধাচরিত'-এর রাধাও মনেপ্রাণে কৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণা এবং আত্মনিবেদনের মূর্তিমতী বিগ্রহ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। ভোগবিলাসবিহীন আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা হিসেবে রাধা চিত্রিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, উদ্ধব-সংবাদ অংশে কলাপচন্দ্রের বিরহিণী রাধার বাক্য গৌড়ীয় পদকর্তাদের নায়িকার ভাষার মতো বাণবর্ষী হয়ে ওঠেনি।

উদ্ধবর বাণী শুনি রাধিকা সুন্দরী।
তেজিলন্ত বিরহ-নিশ্বাস দীর্ঘ করি।।
অধোমুখ করি দেবী মাথা চপরাইলা।
উদ্ধবক প্রতি পাছে বুলিলা বচন।
মোর ইষ্টদেব প্রাণবন্ধু নারায়ণ।।
কুশলে কি আছে বন্ধুজন সমন্বিত।
আমি দুখুনীক কিবা স্মরে কদাচিত।।

[সঞ্চয়ন—সম্পাদক : মহেশ্বর নেওগ]

শঙ্করদেবের পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে রাধার যে ক্রমবিকাশ অসমীয়া সাহিত্যে ঘটেছে, তার পেছনে নিশ্চয় জনরুচির চাপই সর্বাধিক কাজ করেছে বলে আমরা অনুমান করি। বৈষ্ণবীয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কঠোর আদর্শবাদ অপেক্ষা পৌরাণিক শৃঙ্গারাত্মক প্রেমকাহিনীর আকর্ষণ জনমানসে অনেক বেশি। একারণে দেখা যায়, আসামে উত্তরকালে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনূদিত হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে বাংলা ও আসামের সন্নিহিত অবস্থানের কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মহাভাবস্বরূপিণী রাধার প্রভাবও অস্বীকার করা যাবে না। বাংলার কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে ভাগবতেরই কবিত্বময় ভাষ্য। তার প্রভাবও অসামের কবিগণ অস্বীকার করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত জয়দেবের হাত ধরেই শ্রীরাধা অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ভূ-খণ্ডে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন।

গোলোক থেকে বিষ্ণুর কৃষ্ণ হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বিষয়েও দুই প্রদেশের বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের দুই প্রধান পুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যটিও লক্ষ্য করার বিষয়। শঙ্করদেবের 'বড়গীতে' [স্তুতিগান] কৃষ্ণাবির্ভাবের কারণ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—'জীবের তারণ হেতু নারায়ণ/বৈকুণ্ঠ তেজি' আসি'। কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌতুকের অনুস্মৃতিতে তাঁর যশরাশি শ্রবণ-কীর্তন করে জীব ত্রিতাপ হতে এবং ত্রিগুণ হতে মুক্ত হয়ে যায়—'কহয় মাধব নানাবিধ রসে/প্রচারিল যশ রাশি'। শঙ্করদেবের মতে মোহাচ্ছন্ন জীবের কাছে হরিভক্তিই ধ্রুবতারা। সেই হরিই গোয়ালীর ঘরে প্রকাশমান হয়েছেন। শঙ্করদেব 'বড়গীতে'র একটি পদে সে-কথাই বর্ণনা করেছেন—"তিনি গুণময় বেদ বন পরিহরা।/গোয়ালীর ঘরে গৈয়া ব্রহ্ম চিনি ধরা।।" তাঁর আরও কথা—"অবিদ্যা মোহিত হয়া জীব যত তরিতে পথ ন পারে।/মোর যশ [কৃষ্ণের] শুনি সুখে নিস্তারোক নাচতু অমন ভাবে।।"

বাংলা পদাবলীর একটি বিষয়ের সঙ্গে অসমীয়া পদাবলীর ঐক্যের কথা এখানে স্বীকার করতেই হয়। শঙ্করদেবের বড়গীতসমূহে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় ঐশ্বরিক সত্তা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের চিরশিশুরূপের কল্পনায় চমৎকার মানবিকলীলাও চিত্রিত হয়েছে। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে সচ্চিদানন্দ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বাৎসল্যের বা সখ্যের সূত্রেও মানবলীলায় বৃত হয়েছেন। বড়গীতের একটি পদে সদামঙ্গলময় ভগবান জীবের উদ্ধারকল্পে ব্রজবালকদের সঙ্গে কৌতুক-নৃত্যাদি করছেন দেখা যায়—

ব্রজের বালক সঙ্গে রঙ্গ মনে নাচতু এ সদাশিব।
ওহি অবতারে নিজ যশচয় প্রচারি তারিলা জীব।।

নৃত্যপর বালগোপালের বর্ণনা ভাগবতেও আছে—'গোপীভিঃ স্তোভিতো হনৃত্যদ্ভগবান বালবৎ কচিৎ'। [ভা. ১০/১১/৭] শুকদেবের মুখে এই বর্ণনা—এখানে 'ভগবান'-কে আমরা করতালির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কখনো বালবৎ নৃত্য করতে দেখছি। সন্দেহ নেই শঙ্করদেবের বর্ণনায় বালগোপালকে 'সদাশিব' এবং ভাগবতের বর্ণনায় 'ভগবান' শব্দের ঐশ্বর্যদ্যোতকতা বাৎসল্যরসের হানি ঘটিয়েছে।

কিন্তু বাংলা পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কৌমার-পৌগণ্ড-কালোচিত বাৎসল্যলীলার বর্ণনায় কবিগণ বালগোপালের মোহন মূর্তিই অঙ্কন করেছেন। যেমন ব্রজবালক ও ব্রজাঙ্গনা সমবেত হয়ে নন্দদুলালের সঙ্গে নৃত্য করছেন—এমন দৃশ্য বহু পরিচিত। শ্যামানন্দ দাসের একটি পদে অনুরূপ এক দৃশ্য—

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল
মণিময় নূপুর কটিপর ঘাঘর
মোহন উর বনমাল।।
গোপিনি শত শত বালক যুথ যুথ
গাওত বোলত ভাল।

অনুরূপ আরও বহু পদ বাংলা পদাবলী সাহিত্যের সঞ্চয়ে আছে। পদকল্পতরুর ১১৫৪ সংখ্যক পদটি 'বংশি' ভণিতার সমভাবাত্মক পদ।

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে শুধু ব্রজেশ্বরীর প্রেমই নয়, সব রকম ব্রজপ্রেমই পদকর্তাদের হাতে রূপায়িত হয়েছে। এখানে আমরা বাল্যলীলার বিষয়টি অসমীয়া পদাবলীর সঙ্গে তুলনার আলোকে দেখার চেষ্টা করলাম।

অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণাবির্ভাবের কারণ অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মের অবিদ্যামোহিত জীবের উদ্ধারের লক্ষ্য থেকে ভিন্ন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন—(১) মুখ্য কারণ—পরকীয়া প্রেম ও বিরহের অনুভব যা বিষ্ণু গোলোকে আস্বাদনের সুযোগ পান নি, তা আস্বাদনের জন্য ও রাগানুগা সাধনার ধারা প্রবর্তনের জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন। (২) দ্বিতীয় কারণটি গৌণ কারণ—যুগধর্মের কারণে—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।।" যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি পুরাণে কৃষ্ণ অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে তৃণাবর্ত, পুতনা, কেশী ইত্যাদি দৈত্য বধ করেছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আর একটি অতিরিক্ত মাত্রা হল শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হল—(১) গৌণ—যুগধর্ম পালন, হরিনাম কীর্তন—জগাই, মাধাই, চাপাল-গোপাল উদ্ধার, কাজীদলন ইত্যাদির মাধ্যমে। (২) দ্বিতীয় মুখ্য কারণটি হল—কৃষ্ণ প্রেমের বিষয়, শ্রীরাধা আশ্রয়। আশ্রয় হিসেবে শ্রীরাধা যতটা কৃষ্ণকে আস্বাদন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ততট' পারেন নি। শ্রীরাধার প্রেমের সম্যক প্রতিদান কৃষ্ণ দিতে পারেন নি। গৌরাঙ্গ অবতারে বিষয় ও আশ্রয় একাধারে থেকে প্রেমকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করার সুযোগ ঘটেছিল। স্বরূপ দামোদরের কড়চা উদ্ধৃত করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—(১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কীরূপ; (২) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যই-বা কেমন; আর (৩) শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে রাধা কেমন আনন্দ অনুভব করতেন—এই তিন বাঞ্ছা পূরণের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম।

কিন্তু আসামের বৈষ্ণবগণ শঙ্করদেবকে বিষ্ণুবুদ্ধিসম্পন্ন গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন একথা ঠিক, এমনকী শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য শ্রীমাধবদেব তাঁর 'গুরুভঙ্গিমা'-তে লিখেছেন—

ত্রিভুবন-বন্দন দৈবকী-নন্দন, যে হরি মরাল কংস।
জগজন-তারণ দেব নারায়ণ, শঙ্কর তাকেরি অংশ।।

কিন্তু তবুও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে যেমন দেখেছিলেন—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হিসেবে, আসামের বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে ঠিক তেমনভাবে গ্রহণ করেন নি—করেছিলেন নারায়ণের অংশাবতার হিসেবে। আর শ্রীচৈতন্যলীলার মধ্য দিয়ে ভক্তগণ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধার ব্রজলীলার প্রেমরস সাধনার সর্বশেষ সীমা অনুভব করতে পেরেছিলেন। ফলে গৌড়ীয়

বৈষ্ণবপদাবলীতে ব্রজলীলার পালা-পর্যায় কীর্তন করার শুরুতে তদুচিত গৌরচন্দ্রিকার যে একটি অসাধারণ ভূমিকা সৃজিত হয়, আসামের বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারায় তেমন সুযোগ ঘটেনি। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মের মূল চারটি উপাদানের [চারিবস্তু] মধ্যে দেব, নাম ও ভক্তির সঙ্গেই গুরুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু উভয় প্রদেশের বৈষ্ণবধর্মের প্রধান প্রবর্তক দু'জনের একজন হিসেবে চৈতন্যদেব নিজে কোনো সাহিত্য রচনা না করেও পদাবলী সাহিত্যে গৌরচন্দ্রিকায় একটি স্থায়ী বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আর শঙ্করদেব নিজেই স্রষ্টা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে অনাবিল ভক্তির স্রোতধারায় ভক্তজনকে আপ্লুত করে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় স্থান অর্জন করেছেন।

রাগানুগা ভক্তির সাধনায় শ্রীমতী রাধাকে সাধ্যশিরোমণি হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে একাধারে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলীতে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ঐশ্বর্যদ্যোতকতার পরিবর্তে ব্রজের মাধুর্যপ্রধান বিষয়ই একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে। আগেই উল্লেখ করেছি, শুধু ব্রজেশ্বরীর প্রেমই নয়, ব্রজ-সম্পর্কিত সবরকম প্রেম-সম্পর্কই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। তাতে [শান্ত], দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— সব সম্পর্কই বিদ্যমান। তবুও তর-তম বিচারে উন্নত-উজ্জ্বল-মধুর রসেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সমধিক আগ্রহ। চৈতন্য-পূর্ব কালের জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে চৈতন্য সমকালীন ও চৈতন্যোত্তর জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস প্রমুখ কবিগণ যে-সমস্ত পদ রচনা করেছেন, তার মধ্যে রাস, মহারাস, বাসন্তীরাস, শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, খণ্ডিতা, রূপানুরাগ বাসকসজ্জা, ঝুলন, হোলিখেলা, নৌকাবিলাস, গোষ্ঠ, নিকুঞ্জমিলন, মান, দান, কলহান্তরিতা, আক্ষেপানুরাগ, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি বিচিত্র ব্রজলীলা- কেন্দ্রিক নব-নব-প্রেমভক্তির প্রসঙ্গ অসাধারণ ভাবাবেগে ও কাব্যরূপ সিদ্ধিতে বঙ্গসরস্বতীকে চিরকালীন ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ করেছে। এই সব পদাবলী কীর্তনাঙ্গনে উপস্থাপনায়ও নানা রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন—(১) শ্রীনরোত্তমঠাকুরের ঘরানা-গরাণহাটী; (২) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ঘরানা—রেণেটী; (৩) শ্রীনিবাস আচার্যের ঘরানা—মনোহরসাহী।

কিন্তু অসমীয়া বৈষ্ণবপদাবলীর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্রজলীলার প্রসঙ্গ অল্প; প্রাধান্য লাভ করেছে দ্বারকালীলার ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ। অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপী ভগবান্ এবং তাঁরই পদরেণু সেবা অথবা দাস্যপ্রেমই শ্রীশঙ্করদেব ও মাধবদেবের ধর্ম-জীবনের মূলভাব, যা তাঁদের 'বড়গীত', নাট এবং অন্য সকল সাহিত্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। গৌড়-বঙ্গের জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিদের পরকীয়া প্রেমচিত্র এখানে নেই। পরকীয়া বা অবৈধ প্রেম বলতে বোঝায়, যে-প্রেম বিধি বা শাসন বা নিয়মনীতির দ্বারা শাসিত নয়, অর্থাৎ পরমানন্দময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সুখময় সেবার প্রতি আত্মার স্বাভাবিক প্রেমগতি। এই গতি ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকা বা মথুরাতে সম্ভব নয়। একমাত্র ব্রজে, মধুর বৃন্দাবনেই সম্ভব। এ-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ে' বর্ণিত হয়েছে।

অন্যদিকে শঙ্করদেব ও তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব রচিত সাহিত্য কিংবা তাঁদের প্রভাবিত আসামের বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় লীলা বর্ণনাতে অধিক মনোযোগী। তার কারণও আছে। শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবগণ দাস্যভাবের সাধক। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্তার কাছেই তাঁদের দাস্য-সাধনা। তাই আসামের পদাবলী সাহিত্যে যাকে 'কীর্তন ঘোষা' বলে, অর্থাৎ বিবিধ কৃষ্ণলীলার পদসংকলন, সেখানে ভক্তিতত্ত্ব, কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণই প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। যেমন—পাষাণ্ডমর্দন, নামাপরাধ, [রচনা দুটিতে শঙ্করদেবের নব-বৈষ্ণবধর্ম বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে।] কংসবধ, বলিছলনা, অনাদিপাতন [বামনপুরাণ ভিত্তিক রচনা], জরাসন্ধ যুদ্ধ, কালযবন বধ, মুচুকুন্দ স্তুতি, স্যমন্তক হরণ, নারদ-কৃষ্ণ দর্শন, বিপ্রপুত্র আনয়ন, বেদস্তুতি, লীলামালা, রুক্মিণীর প্রেমকলহ, ভৃগুপরীক্ষা,

শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ, চতুর্বিংশতি অবতার বর্ণন ও তাৎপর্য। এগুলিকে ঠিক গীতিকবিতার সীমাভুক্ত করা যায় না। প্রধানত ভাগবতীয় কাহিনীর অসমীয় সংস্করণ এগুলি। বাংলাতে পাষাণ্ডমর্দনের অনুরূপ 'পাষণ্ডদলনে'র মতো গ্রন্থ অনেক রচিত হয়েছিল। যেমন রামাই গোস্বামীর 'পাষাণ্ডদলনে' বহু শাস্ত্রপুরাণ প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব, ভজনীয়ত্ব, হরির নিরন্তর স্মরণ বিধি, অহৈতুকী ভক্তিনিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণের দয়ালুতা, ভক্তি ও ভক্তমহিমা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আরো বহু লেখকের 'পাষণ্ডদলনে'র পুথি পাওয়া যায়। যেমন—কালীদাস অধিকারী, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণরাম, গোপাল দাস, গোবিন্দ নাথ, দুর্লভ দ্বিজ, রামানন্দ দাস, নিত্যানন্দ রায়, বলরাম দাস, বীরভদ্র দাস, বৃন্দাবন দাস প্রমুখের। এগুলির প্রধান লক্ষ্য বৈষ্ণবধর্মান্দোলন-বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন। এছাড়া অন্য কাহিনীগুলি ভাগবতকে প্রধানভাবে আশ্রয় করলেও অন্যান্য পুরাণ থেকেও কাহিনীর উপাদান আহরণ করেছে। বাংলার কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতেও ভাগবত ও ভাগবত-বহির্ভূত অন্যান্য পুরাণের কাহিনী আহৃত হয়ে একটা বাঙালি ঘরাণার পৌরাণিক আবহ মধ্যযুগেই গড়ে উঠেছিল। অসমীয়া ভাষায় যেমন কৃষ্ণকথার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বর্ণনামূলক কবিতার ধারা শঙ্করদেব ও মাধবদেব গড়ে তুলেছিলেন, বাংলাতে বহুজনে মিলে সে কাজটি করেছেন। বহু পালা রচয়িতা ভাগবতীয় ও অন্যান্য পুরাণ কথা নিয়ে পালা রচনা করেছেন। যেমন—কংসবধ [কবিচন্দ্র, গুণরাজ খান, চণ্ডী দ্বিজ, শুকদেব প্রমুখ], বলিছলন [দুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ, বিশ্বরূপ, বেচারাম দ্বিজ, কবিচন্দ্র] রুক্মিণীর অহঙ্কার ভঞ্জন [কবিচন্দ্র দ্বিজ], স্যমন্তক মণিহরণ [আদিত্যরাম, কৃষ্ণকিঙ্কর, গুণরাজ খান, রামদ্বিজ, রামেশ্বর দ্বিজ প্রভৃতি]। মোটকথা, পুথিপত্রের সাক্ষ্যে আমরা বলতেই পারি বাংলাদেশে ও আসামে পৌরাণিক কৃষ্ণকথার ধারা বহুচর্চিত হয়েছে। 'নামঘোষা'র বিষয় উপাস্য দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন। বাংলা ও অসমীয়া কাহিনী কবিতাগুলিতে বর্ণনা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, উভয় প্রদেশের পদাবলীতে ভক্ত-হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি ততটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ভক্তি কখনো কখনো ব্যক্তিগত অনুভবে সাঙ্গীকৃত হয়ে ভক্তি-স্তুতির রূপও নিয়েছে। Hymn বা স্তুতিকবিতাগুলিও গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। অসমীয়া বৈষ্ণবপদাবলীতে এধরনের গীতিগুণান্বিত কবিতা হিসেবে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পেয়েছে শঙ্করদেব এবং মাধবদেবের 'বড়গীত'-ভুক্ত কবিতাগুলি। উত্তরকালীন অসমীয় ভক্তকবিগণও শঙ্করদেব ও মাধবদেবের এই ধারা অনুসরণে আরও বহু পদ রচনা করেছেন। 'আসাম সাহিত্য সভা, গুয়াহাটি'র প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর 'Influence of Vaishnavism on Assamese Literature' শীর্ষক সাহিত্য অকাদেমি সংকলিত 'Follow the notes of the flute' সংকলনধৃত প্রবন্ধে আসামের বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে বৈষ্ণব গীতিকবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"Another notable literary contribution of vaishnavism is a class of highly devotional lyrics tuned to classical ragas. These sublime and highly devotional songs tinged with the vaishnavite philosophical view of life are called 'Bargita". According to the vaishnavite tradition Sankaradeva composed two hundred and forty songs of which only about thirty are extant now, the rest are supposed to have got destroyed in a fire. Similarly, Madhavadeva also composed 12 score songs, but now only about 180 are available. Later vaishnava poets, in imitation of 'Bargita" of the two saints, composed a few centuries of lytics, a part of which has come through the press during the last thirty years."

এই 'বড়গীতে'র পদগুলির ভাষা ব্রজবুলি অথবা বাংলা-অসমীয়ায় বিমিশ্রিত। অসমীয়া পদাবলীর আর বিষয়গুলি হল 'ভটিমা' বা 'ভাটিমা' [< ভাটিয়ালি] প্রশস্তি পদ; 'গুণমালা', ও কৃষ্ণলীলার ক্রম অনুসারে দীর্ঘপদ। এগুলিও চরিত্র ও ঘটনাপ্রধান; এগুলির গীতিধর্মিতাকেও স্বীকার করা যায় না।

মাধবদেবের সুখ্যাতি প্রধানত 'নামঘোষা'র কবি হিসেবে। কিন্তু ব্রজবুলি ও অসমীয়া ভাষার সুকবি ও সুগায়ক এই মাধবদেবের রচনাবলীর মধ্যে আমরা যা পাই তা হল—অর্জুনভঞ্জন, চোরধরা ঝুমুর, ভূমিলুটিয়া ঝুমুর, গোবর্ধন যাত্রা, জন্মরহস্য, দধিমন্থন প্রভৃতি। এগুলিও প্রধানত বর্ণনাধর্মী রচনা।

দাস্যভাবিত সাধনার অনুকূল দ্বারকালীলার সর্বৈশ্বর্যময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কৃষ্ণ যেখানে অসমীয় বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা, সেখানে ভাগবতের দ্বারকালীলার বর্ণনাধর্মী নাট্যগুণসম্পন্ন আখ্যানগুলির নায়ক কৃষ্ণের বীরত্বগাথাই কাব্য-সাহিত্যে প্রধান বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। স্তব-স্তুতি, মাহাত্ম্য-কথায় কৃষ্ণ বা নারায়ণ প্রভু; ভক্ত দাস—কৃষ্ণদাস। অসমীয় কৃষ্ণের জন্মলীলা ও বাৎসল্যলীলায়ও ভক্ত বাল-গোপালের ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হতে পারেন না। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অনুগত গৌড়ীয় ভক্তরা কৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সব সম্পর্ককেই একান্ত মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যে গ্রহণ করেছেন। একথা ঠিক যে, বৈষ্ণবধর্মে দাস্যভাব একটি মৌলিক উপাদান। ভাগবতে [৭.৫.২৩] নবতম ভক্তিলক্ষণের একতম হিসেবে দাস্যভাব অর্থাৎ কর্মার্পণকে বর্ণনা করা হয়েছে। অসমীয়া 'একশরণ নামধর্মে' এই ভাগবতানুসারী দাস্যভাব যেখানে একমাত্র বিষয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সেই মূল উপাদানটিকে কেন্দ্রে রেখে তার বিচিত্র বৈচিত্র্য সাধন করে মুখ্য পঞ্চরসের সাধনা। বৈষ্ণব ভক্তের শাশ্বত প্রার্থনা—'প্রার্থয়ে তব পদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে।' [হয়শীর্ষীয় নারায়ণব্যূহস্তব]। চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতাচার্য—'কৃষ্ণদাস হও—জীবে উপদেশ করে।' ভাগবতে [১০/৪৭/৬০-৬১] দেখি, নন্দ বলছেন—"হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক। আমাদের বাক্য-সকল তাঁর নাম কীর্তন করুক। আমাদের দেহ তাঁকে অভিবাদন করুক। কর্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে অবস্থাই হোক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে আমাদের রতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক।" অসমীয়া বাৎসল্য রসের পদে কৃষ্ণের গুরুস্থানীয়গণ তাই কখনো বালগোপালের ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরসত্তাকে বিস্মৃত হন না। কিন্তু গৌড়ীয় বাৎসল্য রসের পদে—"অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়। /তার সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়।।/শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার।/তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার।।" ঈশ্বর-জ্ঞান বর্জিত বাৎসল্যের মধ্যেই সন্তানের প্রতি সেবা-যত্নে গৌড়ীয় পদকর্তারা দাস্যের ধারাকে বহন করেও একান্ত মানবিক ও কাব্যরসানুগত হয়ে ওঠেন। ভাগবতে [১০/১৫/১৭] কৃষ্ণসখাদের দাস্যভাবিত সাধনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—"পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।" ভাগবত যাঁদের কাছে নিরঙ্কুশভাবে শরণ্য, তাঁরা সখ্য-সম্পর্ককে এর বেশি মানবিক সম্পর্কের গভীরে অগ্রবর্তী হতে দিতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ীয় তত্ত্বে সখ্যের জীবনানুগত সৌন্দর্যতত্ত্বটির পরিচয় দিয়েছেন—"শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।/ঐশ্বর্য-জ্ঞান-হীন, কেবল সখ্যময়।। /কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।/..." এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে দাস্যের সেবা—"তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন।।" ব্রজবধূদের দাস্য সম্পর্কে ভাগবতে [১০/৩১/৬] পাই—'ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ'।

শঙ্করদেব কিংবা মাধবদেবের পদে ব্রজগোপীরাও এই কিঙ্করীভাবেই কৃষ্ণভজনা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় রাগানুগাভক্তির অনুসারী এই ব্রজগোপীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—"কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।/যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন।। /যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।/তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান।।" রাধার কথা অসমীয়া বৈষ্ণবপদাবলীর মূল আলোচনায় যে অবান্তর, সে-কথা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু গৌড়ীয়দের বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধার স্থানই মুখ্য—তিনিই ব্রজেশ্বরী, মহাভাবময়ী, স্বয়ং ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি। তিনি—"সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা।।/তেহোঁ যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।/যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।।" এই রাধাও দাস্যভাবসাধনার মূল উপাদান বঞ্চিত নন।

এতক্ষণ আমরা গৌড়ীয় ও অসমীয় পদাবলীর যে-দিকগুলিকে তুলনার ক্ষেত্র হিসেবে সনাক্ত

করেছি, এবার দু-একটি অসমীয় বৈষ্ণব পদের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীকে পাশাপাশি রেখে আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে হয়তো উভয় পদাবলীর ঐক্য ও স্বাতন্ত্রসন্ধান আরও স্পষ্টতা লাভ করবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলীর সর্বাংশ না হলেও প্রায় সর্বাংশ জুড়ে আছেন শ্রীমতী রাধা—তিনিই কেন্দ্রীয় চরিত্র। গৌরচন্দ্রিকা—রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের কথা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ প্রসঙ্গেও নানাভাবে রাধার কথা এসেছে। এছাড়া পূর্বরাগ-অনুরাগ থেকে মাথুর-ভাবোল্লাস পর্যন্ত সর্বত্রই রাধারই পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, মান, দান, রাস, কুঞ্জলীলা, কুঞ্জভঙ্গ, প্রেমবৈচিত্ত্য-আক্ষেপানুরাগ, মাথুর বা ভাবোল্লাস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অসমীয়া বৈষ্ণবপদাবলীর মূল ধারায় রাধার নাম পর্যন্ত না থাকায় উভয় পদাবলীর মধ্যে এ-নিয়ে কোনো তুলনায় অবকাশ নেই। তুলনীয় কাছাকাছি বিষয় হিসেবে ব্রজগোপীদের সঙ্গে ব্রজরাজ কৃষ্ণের সম্পর্ক বিষয়টিকে তুলনার আলোকে নিয়ে আসা যায়।

ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে রাসান্তে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ বর্ণিত হয়েছে। শঙ্করদেব সেই ভাগবতীয় বিষয়কে 'গোপীর কৃষ্ণ অন্বেষণ'—শীর্ষক পদে অসমীয়া পয়ারে অনুবাদ করেছেন। শঙ্করদেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কীর্তন আরু দশম'-এর কীর্তন অংশ থেকে এই 'গোপীর কৃষ্ণ অন্বেষণ' অংশটি সংকলিত হয়েছে 'ভক্তি গীতপদ সঞ্চয়ন' নামক সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত সংকলনে। ঠিক গীত হিসেবে যে এটি রচিত হয়নি, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ গানের জন্য যে-সব পদ রচিত, সেগুলির রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকে অসমীয়া পদাবলীতে। আসলে এটি অনূদিত কাহিনী কাব্যের অংশ বলেই মনে করি। ফলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, গীতিধর্মী পদাবলীর সংকলনে এই অংশের অন্তর্ভুক্তি কতটা যৌক্তিক। 'ভক্তি গীতপদ সঞ্চয়ন'-এর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা মহাশয় লক্ষ্য করেছেন 'বর্ণনাত্মক কাব্যের অংশ হলেও গীতি-কবিতার সুর' এতে ধ্বনিত হয়েছে। আমরা এই মতের সঙ্গে সহমত হয়েই পদটিকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করছি।

শঙ্করদেব এই অনুবাদে আক্ষরিক না হলেও ভাগবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে :

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি।
র্ভূতেষু সন্তংপুরুষং বনস্পতীন্।।
দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থপ্লক্ষন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দ সূনুর্গতো হৃত্বাপ্রেমহাসাব লোকনৈঃ।।
কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ।।

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'আকাশ যেমন অন্তরে বাইরে ব্যাপ্ত, তেমনি সর্বজীবের অন্তরে বাইরে অবস্থিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কথা বনস্পতিগণকে [গোপীরা] জিজ্ঞাসা করলেন— হে অশ্বত্থ, হে বট, নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাসি ও বিলাস দৃষ্টি দিয়ে আমাদের চিত্ত হরণ করে চলে গেছেন, তোমরা কি তাঁকে দেখেছ? হে কুরুবক, অশোক, পুন্নাগ, চম্পক, যাঁর হাসি মানিনীদের মান হরণ করে, সেই রামানুজ [বলরামানুজ] কি এই পথ দিয়ে গিয়েছেন?' শঙ্করদেবের অনুবাদে ভাগবতের প্রায় যথাযথ অনুসরণই দেখা যাচ্ছে—

উচ্চ বৃক্ষ দেখি সোধে সাদরি।
শুনিয়ো অশ্বত্থ বট পাকড়ি।।

যাহাণ্ডে দেখিলা নন্দ-কুমার।
নেন্ত চুরি করি চিত্ত আমার।।
হে করবক অশোক চম্পা।
কহিয়ো কথা করা অনুকম্পা।।
মানিনীর দর্প করিয়া চুর।
না জানো কৃষ্ণ যান্ত কত দূর।।

বর্ণনার পরবর্তী অংশেও ভাগবতানুসরণের একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। এ-পদে 'গোবিন্দর চরণ-প্রিয়া' তুলসীকে যেমন কৃষ্ণের কথা গোপীরা জিজ্ঞাসা করেছে, ভাগবতেও তাই—'তুলসী কল্যাণী গোবিন্দচরণ প্রিয়ে'-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে 'দৃষ্টস্তেতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ'—তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুতকে কি দেখেছ? ভাগবতের বর্ণনা—"মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।/প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ।। " শঙ্করদেবের বর্ণনা—'হে জাই যূথী, সখী মালতী।/কৃষ্ণ পরশে কি লভিলা গতি।।' ভাগবতের বর্ণনা অনুরূপ [১০/৩০/৯] আম, জাম, বেল, বকুলকে গোপীরা কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেছে। ভাগবতের 'কেশবাঙ্ঘি-স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গ' ভূমিকে [ক্ষিতি] যেমন গোপীরা কৃষ্ণের উদ্দেশ জানতে চেয়েছে, শঙ্করদেবও বর্ণনায় তাই-ই করেছেন—'কিনো তপ ওবা করিলা ভূমি।/কৃষ্ণ চরণ-পরশে তুমি।। /মিলি আছে অতি আনন্দভাব।/ দেখ রোমঞ্চিত তোমার গাব।' ভাগবতের বর্ণনায় দেখি, গোপীরা হরিণপত্নীকে জিজ্ঞাসা করছে—"সখী হরিণপত্নি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার সঙ্গে নিজের মনোহর অঙ্গের দর্শন দ্বারা তোমাদের চোখের আনন্দ বিধান করে এই বনে এসেছেন কি? এখানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার অঙ্গস্পর্শে তার কুচলিপ্ত কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত কুন্দফুলে গাঁথা মালা থেকে গন্ধ বইছে।" শঙ্করদেবও ভাগবতেরই অনুসারী হয়ে বর্ণনা করেছেন—" মৃগপত্নী সখি দেখিলা হরি।/তোমার নেত্রর আনন্দকারী।।/যান্ত প্রিয়া-সমে গতি বিলাসে।/হের কুন্দ-গন্ধ-কুঙ্কুম বাসে।।" ভাগবতের [১০/৩০/১৩] বর্ণনায় পাই—"সখি, আমাদের অনুমান হয় এই সব লতা কৃষ্ণসংসর্গ লাভ করেছে। এদের জিজ্ঞাসা কর, এদের আশ্চর্য ভাগ্য। বৃক্ষবাহু আলিঙ্গন করেও নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের নখস্পৃষ্ট হয়েছে। কারণ এদের রোমাঞ্চিত দেখাচ্ছে।" শঙ্করদেবের বর্ণনা—"কতো গোপী বোলে শুনিয়া বাণী।/লতাত কৃষ্ণ পুঁছো কাহিনী।। /কৃষ্ণর নখর পরশ পাই।/ দেখা পুলকিত সমস্তে কায়।।" ভাগবতের বর্ণনায় আছে [১০/৩০/১৪] 'শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা গোপিকারা এরকম উন্মত্তের মতো কথা বলতে বলতে অবশেষে তাঁর [কৃষ্ণের] বিভিন্ন ক্রীড়ার অনুকরণ করতে লাগলেন।' শঙ্করদেবের তদনুসারী বর্ণনা—"বোলে বাক্য সবে উন্মত্ত ভাবে।/কৃষ্ণক বনত বিচারি চাবে।।/কৃষ্ণ-গুণ গান্তে প্রেম উপজে।/কৃষ্ণতে মন সমুদায় মজে।।/সমস্তে বিহ্বল হুয়া গোপিনী।/করে কৃষ্ণলীলা কতো আপুনি।।"

কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কখনোই শঙ্করদেব কতটা ভাগবতানুসারী হয়েছেন, তার বিচার করা নয়। ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র—একথা মনে রেখেও এই অংশের কাব্যগুণ যে পৌরাণিক বর্ণনার ধ্রুপদী রীতির মধ্যেই এক হৃদ্‌স্পর্শী গীতিধর্মী চারিত্র্য লাভ করেছে সেকথা মানতে হয়। কৃষ্ণবিরহী গোপিকারা নিজেদের বিরহবোধ থেকে যেভাবে ব্যাকুল আগ্রহে প্রকৃতির বৈচিত্র্যে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে ফিরেছে এবং নিজেদের আত্মানুভবকে প্রকাশ করেছে তা গীতিধর্মীই। কিন্তু এতে শঙ্করদেবের ওপর ভাগবত-প্রেরণাই কাজ করেছে। ভাগবতীয় বর্ণনায় গাছে গাছে, লতায় পাতায় যে গোপিকাদের কৃষ্ণানুভব, তা Cowper-এর এক উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে—"Nature is but a name for an effect whose cause is God."

আবার ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহবিলাপ যেমন রামায়ণ মহাকাব্যের ধ্রুবরস, ব্রজগোপীদের 'বিশ্লেষধিয়ার্তি' তেমনি ভাগবতের ধ্রুবপদ। তাই শুধু গোপিকথাতেই নয়, সমস্ত ভাগবত জুড়েই বেজেছে গভীর বিরহ সংগীত। পরমদয়িতের সঙ্গে দয়িতার বিরহ—রাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রিয় দাসদের বিচ্ছেদ সংগীত। সমস্ত ভাগবতপুরাণ কথার গভীর অন্তঃস্থল থেকে, তার বহু শাখায়িত কাহিনীর জটিল জাল ছাপিয়ে ধ্বনিত হয়েছে এই একটি কান্নার ধন—'কস্তদ্বিরহং সহতে' [৩/২/১৯]। এই যে নিরন্তর ক্রন্দনের শাশ্বত অশ্রুবিন্দু, তা সমস্ত ধর্মবিধানের কাঠিন্যকে অতিক্রম করে মুক্তা-বিন্দুর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ব্রজগোপীদের কৃষ্ণ-বিরহের এই ভাগবতীয় বিষয় শঙ্করদেব রূপায়িত করেছেন যথাযথভাবেই ভাগবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বাংলাভাষায় ভাগবত অনুবাদ করতে গিয়ে মালাধর বসুও কৃষ্ণের অন্তর্ধানে বন থেকে বনান্তরে গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণের বর্ণনা করেছেন শঙ্করদেবের মতোই মূলানুসারী হয়ে। মালাধর বসু ছাড়া আরও বহু বাঙালি পদকর্তার পদে এই প্রসঙ্গ অনুবর্তিত হয়েছে। যেমন পদকল্পতরুর ১২৬০ সংখ্যক পদটির বিষয়ও ভাগবতের এই দশম স্কন্ধের রাসান্তে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানহেতু কাতরা ব্রজ-গোপীদের কৃষ্ণান্বেষণ। পদকর্তা উদ্ধব দাস। পদটি উদ্ধৃত হল—

পনস পিয়াল চুতবর চম্পক
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া
আওল তুলসী সমীপ।।
জাতি যুথি নবমল্লিক মালতি
পুছল সজল-নয়ানে।
উত্তর না পাই সতিনি সম মানই
দুরহিঁ করল পয়ানে।।
পুন দেখে তরুকুল অতিশয় ফলফুল
ভরে পড়িয়াছে মহিমাঝ।
কানুক হেরি প্রণাম করল ইহ
এ পথে চলল ব্রজরাজ।।
এত কহি বিরহে বেয়াকুল অতিশয়
ব্রজরমণীগণ রোয়।
উদ্ধবদাস কহ শ্যাম ভেল অলখিত
কতিখণে মীলব মোয়।।

বনান্তরালে অন্তর্হিত কৃষ্ণের অন্বেষণে ব্রজ-রমণীগণ এ-পদেও বনের বৃক্ষরাজির কাছেই কৃষ্ণের সন্ধান জানতে চেয়েছে। উদ্ধবদাস বর্ণিত বৃক্ষরাজি ভাগবতের বর্ণনার অনুসারী—পনস পিয়ালের মতো দু'এক ক্ষেত্রে কবি নতুন নাম চয়ন করেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে ভাগবতীয় বর্ণনাকে শঙ্করদেব যেমন যথাযথ অনুসরণ করেছেন, এখানে তা ঘটেনি। ভূমি ও হরিণের প্রসঙ্গ উদ্ধবদাস গ্রহণ করেন নি। আর সবচেয়ে যে বড়ো পার্থক্যটি ঘটেছে, তা হল ভাগবতীয় কাহিনীতে কিংবা শঙ্করদেবের বর্ণনায় গোপরমণীগণের বিরহ গোকুলের রাজ-রাজেন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণদাসীদের বিচ্ছেদজাত বিরহ। কৃষ্ণের উদ্দেশ না পেয়ে ভাগবতে ও শঙ্করদেবের বর্ণনায় গোপীগণ কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে নিবিষ্ট হয়েছে। এদের কৃষ্ণপ্রেম দাস্যভাবিত। কৃষ্ণনাম করতে করতে এ-প্রেমের ভাব উপজিত হয়েছে—'কৃষ্ণ-গুণ গান্তে প্রেম উপজে'।

আর এ-গানের ভণিতায় কবি শঙ্কর দাস্যভাবিত হয়েই উচ্চারণ করেছেন—'কৃষ্ণের কিঙ্করে শঙ্করে ভণে।' কিন্তু উদ্ধবদাসের পদে কৃষ্ণের সন্ধান সম্পর্কে বৃক্ষরাজি নিরুত্তর থাকায় গোপীগণ তাদের সতীন বলেই মনে করেছে। এখানেই সূচিত হয়েছে রাগানুগার স্বাতন্ত্র্য। উদ্ধবের ভণিতাটিও রাগানুগা ভক্তির দ্যোতক—'উদ্ধবদাস কহ শ্যাম ভেল অলখিত/কতিখণে মীলব মোয়।।"

আবার ভাগবতের এই কাহিনীর বর্ণনামূলকতার সমস্ত বহিরঙ্গ আবরণ ত্যাগ করে, কেবল অন্তর্গত বিরহব্যাকুলতাকেই গীতিকবিতার আঙ্গিকে বাঙালি পদকর্তাগণ রূপায়িত করেছেন মাথুরের পদে। যেমন বিদ্যাপতি ভণিতার একটি সুপরিচিত পদ—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল।।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল।।

সন্দেহ নেই, পদটি উত্তর-চৈতন্য কালের কোনো বাঙালি কবি বিদ্যাপতির রচনা—মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির নয়। কারণ পদটির ওপর সুস্পষ্টভাবেই রূপগোস্বামীর 'ললিতমাধব' [৩/৪] নাটক ও হংসদূত [শ্লোক-৩] কাব্যের প্রভাব রয়েছে।

শঙ্করদেবের ভাগবতানুসারী 'গোপীর কৃষ্ণ অন্বেষণ' অংশটির সঙ্গে উদ্ধৃত বাঙালি বিদ্যাপতির পদটির তুলনা করতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে, শঙ্করদেবের পদে সমস্ত ব্রজগোপীর জীবনধন কৃষ্ণকে তারা অন্বেষণ করছে এবং তাদের সমবেত বিরহ-ব্যাকুলতাই বর্ণনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'অব মথুরাপুর মাধব গেল' শীর্ষক পদটিতে শ্রীমতী রাধা তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে কৃষ্ণশূণ্য বৃন্দাবনের বিষন্ন পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। সমস্ত গোপরমনির কাছে কৃষ্ণ-বিরহ বিষণ্ণতার কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু পদটির কেন্দ্রবিন্দুতে রাধাই প্রাধান্য পেয়েছে। রাধার কাছে এখন নন্দপুর-চন্দ্রহীন বৃন্দাবন অন্ধকার মনে হচ্ছে। স্মৃতিভারে পীড়িত, বেদনা-বিদীর্ণ সত্তার আর্ত হাহাকার রাধার কণ্ঠে বেজে উঠেছে—'গোকুল মাণিক কো হরি লেল।' পদটির পরবর্তী অংশে দেখি—শূন্য নগরীতে, শূন্য ঘরে বসে রাধা ভাবেন কি করে তিনি যমুনাতীরে যাবেন। কৃষ্ণবিহীন কুঞ্জ-কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কল্পনাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। কৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাধার চোখের নিদ্রা, মুখের হাসিও বিদায় নিয়েছে। সহচরীর সঙ্গে মিলে যেখানে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে একদিন ফুল-খেলা খেলেছেন, সেদিকে তাকিয়ে রাধা যেন বাঁচতেই চান না। পূর্ব-মিলনের সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি আজ বিরহিণী রাধার মনের বেদনাকে জাগিয়ে তুলেছে। নিরুপায়ভাবে এই বেদনা-দহনকে বহন করেন যে রাধা, তিনি আমাদের এই পরিচিত সংসারেরই—যে-সংসারে প্রতিমুহূর্তে প্রিয়জনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদের পর স্মৃতিভার নিয়ে পড়ে থাকা মানুষ শুধু সারাজীবন হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের কথা ভেবে চোখের জল ফেলে। এই রাধাকে কোনো দেশকালের পরিধিতেই আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু ভাগবতানুসারী শঙ্করদেবের গোপনারীরা একান্তই ভাগবতীয় কৃষ্ণপ্রিয়া। আর সৃষ্টিশীল কল্পনার বলে সাধারণীকৃত বাংলা পদাবলীর গোপী-প্রেম অনেক বেশি মর্ত্যধরিত্রীর মেদুর অনুভবকে শিল্প রূপায়িত করেছে। অনুরূপ আরও একটি পদের উল্লেখও এখানে করা যায়, যেমন রাধামোহন ঠাকুরের—'সভে মিলি বৈঠল কালিন্দি তীর।'

কিন্তু এই পার্থক্যের পেছনের রহস্যটিকেও আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। শঙ্করদেব যেখানে একান্তভাবেই দাস্যভাবের সাধক, সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ রাগানুগা ভক্তি। শঙ্করদেবের গোপিনীরা ভাগবতের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলেই সমগোত্রীয়া কৃষ্ণদাসী। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে

ব্রজগোপীদের মধ্যে সমভাব নয়, অবশ্যই তারতম্য আছে। সব ব্রজগোপীই কৃষ্ণের স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তি হলেও শ্রীমতী রাধার স্থান সর্বোচ্চ। তিনি ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা—'মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরানী।' তাই মাধব মথুরাপুরে চলে গেলে বিচ্ছেদের বেদনা তাঁকেই কেন্দ্র করে কবি বিস্তৃত করেন। তাঁর চোখ দিয়েই দেখেন—'গোকুলে উছলল করুণাক রোল।'

শঙ্করদেবের 'গোপীর কৃষ্ণ অন্বেষণ' অংশের অন্য আর একটি ভাগবতীয় প্রসঙ্গ হল, কৃষ্ণান্বেষণে কাতর কৃষ্ণাত্মিকা গোপীদের কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের প্রসঙ্গ। ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে,—"এক গোপী কৃষ্ণ হলেন, আরেক গোপী পুতনা হয়ে তাঁকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন; একজন শকট হলেন, আরেকজন কৃষ্ণ হয়ে তাঁকে পদপ্রহার করলেন। এক রমণী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের অনুকরণ করলেন, অন্য গোপী দৈত্য হয়ে তাঁকে হরণ করলেন। কোনো গোপী রাখাল বালকের শব্দের অনুকরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলেন; দু'জন রাম ও কৃষ্ণ হলেন। অন্যেরা গোপবালক রূপে অনুকরণ করলেন। কেউ 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। কৃষ্ণমনা কোনো গোপী অন্য এক গোপীর স্কন্ধে বাহুস্থাপন করে বিচরণ করতে করতে অন্যদের বলতে লাগলেন—আমি কৃষ্ণ, কেমন মনোহর রূপে গমন করছি দেখ।" [ভা. ১০/৩০/১৪-১৯]।

বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে। গোপীরা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখাদের বেশবাসে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করছে। তবে রাসান্তে কৃষ্ণাত্মিকা গোপীদের কৃষ্ণান্বেষণে কাতরতার পর এই অভিনয় হয়েছে ভাগবতে। শঙ্করদেবও ভাগবতেরই অনুসরণ করেছেন। বাংলা পদাবলীতে কখনো কখনো ভাগবতেরই পারম্পর্য মেনে গোপীদের কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। যেমন গুণরাজ খানের 'কানাই বিরহে বুলে সকল গোপিনী' শীর্ষক পদটি। তবে এ-পদেও আমরা লক্ষ্য করবো, ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলার ক্রম রক্ষিত হলেও, কবির স্বকীয় কল্পনাই প্রাধান্য লাভ করেছে—ভাগবতানুগত্য নয়।

বাংলায় আরও এক ধরনের পদে গোপীদের কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখা সাজার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু ঘটনার ক্রম রাসান্তে কৃষ্ণান্বেষণের পর নয়। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর একটি জনপ্রিয় প্রসঙ্গ গোপীগোষ্ঠ। গোপীরা গোপবালকদের অনুকরণে গোষ্ঠলীলা করছে কৃষ্ণ-বলরাম, শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতির বেশে সজ্জিত হয়ে। যেমন রায়শেখরের 'সখি সঙ্গে করি বেশের মন্দিরে বসিলা আনন্দ চিতে।' অনুরূপ আরও একটি পদ পাই দীন চণ্ডীদাসের :

সুচিত্রায় ছিদাম করিয়া বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি।।
প্রিয় বিশাখারে করে সুবল কিশোর।
বসুদাম চম্পকলতা সুচান্দ অধর।।
যোগামায়া পূর্ণমাসী সাক্ষাত আনিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া।।
বলরামের হৈল শিঙ্গা বলে রাই-কানু।
আমার না হইল ভাল কোথায় পাইব বণু।।
শিঙ্গা বেণু মুরলীহ বাজায় রাখাল।
বাঁশীটি নহিলে কেনে ফিরিবেক পাল।।
চণ্ডীদাসেতে বোলে হৈল বনমালী।
সলিলে আনিয়া পদ্ম করহ মুরলী।।

তাই বলতেই পারি, বাংলা পদাবলীর ক্ষেত্রে গোপীদের কৃষ্ণলীলাভিনয় কিছুটা বেশি বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

আমরা শঙ্করদেবের আর একটি 'জয় জয় যাদব জলনিধিজাধব ধাতা' শীর্ষক পদকে সামনে রেখে বাংলার সমভাবাত্মক পদের তুলনার অবকাশ গ্রহণ করছি। এই পদটি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনগীত। শঙ্করদেবের 'বড়গীত'-এর অন্তর্গত এই পদটি বহুখ্যাত পদ। সাধারণভাবে বরগীতের পদগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, শ্রীহরির নাম ও তাঁর বিবিধ লীলার স্মরণ এবং গোবিন্দের শ্রীচরণাশ্রয় প্রার্থনা। এই পদেও দেখা যায়, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব দৈত্যারি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় ঈশ্বর-সত্তার স্মরণ ও তাঁর চরণ-কিঙ্করে বৃত হয়ে দাস্যভাবিত আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেছেন।

পদটি যে ধ্রুবপদ দিয়ে সূচিত হয়েছে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের [যাদব = যদু + অ-অপত্যার্থে] জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে লক্ষ্মীর [জলনিধিজা, অর্থাৎ সমুদ্র কন্যা] স্বামী [ধব], অর্থাৎ বিষ্ণু বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর নাম শ্রবণ মাত্রই অখিল জীব-জগতের সংসার তাপ থেকে পরিত্রাণ ঘটে। তাঁর নাম স্মরণ করলে, তা সিদ্ধিপ্রদ হয়। তিনি দীনার্তের কাছে অসীম দয়ার আধার [দয়ানিধি], করুণাসাগর, কৃপাসিন্ধু। ভক্তের কাছে তিনি মুক্তিপদ-দাতা। মুক্তি বলতে পঞ্চবিধ মুক্তির কথা বলা হয়—সার্ষ্টি [সমান ঐশ্বর্য যুক্ত], সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্বাণ বা একত্ব। আর সিদ্ধি বলতে বোঝায় অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রভৃতি আটপ্রকার।

এই ধ্রুবপদকে সামনে রেখে মূলপদে যাদব শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্করদেব বলেছেন জগৎবাসীর জীবনস্বরূপ। এই শ্রীকৃষ্ণ কবির বর্ণনায় 'অজন', অর্থাৎ জন্মরহিত সনাতন, নিত্য। তিনি 'জনার্দন'-ও—'জন' নামক অসুরকে মর্দন করে বিষ্ণুর এই নাম। অন্য অর্থে 'জনার্দন' শব্দে মায়াতীত, মায়া-মর্দনকারীও বোঝায়। শঙ্করদেব তাঁর উপাস্যদেবতা কৃষ্ণকে দুঃখহরণকারী দনুজ-দমনকারী হিসেবেও দেখেছেন। দক্ষপ্রজাপতির 'দনু' নামক কন্যার চল্লিশ দানবপুত্রকে যিনি দমন করেছিলেন, সেই হরিও শ্রীকৃষ্ণই। ঈশ্বর-স্বরূপ আস্বাদনে যে মহৎ আনন্দলাভ ঘটে, তার উৎস বা মূল কারণও তিনিই, তিনি পরমানন্দ স্বরূপ। তিনি বৃন্দাবনের বনে-বনে ভ্রমণ করে বেড়ানো নন্দ-নন্দন। সেই বৃন্দাবনের বনে তিনি বহু বিচিত্রভাবে বিহার করেছেন, অর্থাৎ ক্রীড়া করেছেন। সেখানে তাঁর প্রকাশের দীপ্তিতে শরৎকালের শুভ্রোজ্জ্বল চন্দ্রকান্তিও যেন ম্লান মনে হয় [নিন্দি]। তিনি মঙ্গলময় [শিব], অনন্তনাগের ফণার ওপর শয্যাশায়ী নারায়ণ। তিনি কংসের অনুচর কেশী নামক অসুরকে বিনাশ করেছেন। আবার তিনি পীতবাস পরিহিত অবিনশ্বর ঈশ্বর। 'বিধু' শব্দটিও বিষ্ণুর অপর নাম। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের উপাস্য কৃষ্ণও জগৎবন্ধু বিষ্ণু। 'মাধব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে—মা [লক্ষ্মী]-ধব [স্বামী], অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি বিষ্ণুই শব্দটির অর্থ। এই মাধব আবার 'মধুরিপু'—মধু নামক দৈত্যের বিনাশকারী। মুর নামক দৈত্যকেও তিনি হত্যা করেছেন। তাঁর মূর্তি মধুর-সুন্দর।

পুরাণ-পারঙ্গম কবি শঙ্করদেব তাঁর এই ভজন-পদটিতে একই সঙ্গে দানবত্রাস সর্বশক্তিমান ঐশ্বর্যময় পুরাণ-পুরুষকে যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনি বৃন্দাবনবিহারী পীতবাসকেও স্মরণ করেছেন—মনন করেছেন। ভাগবতপুরাণের কৃষ্ণকথার দুই বৃত্তই—বৃন্দাবনলীলা ও দ্বারকালীলা, শঙ্করদেবের এই মুক্তাবিন্দু সদৃশ অতিক্ষুদ্র একটি পদের অন্তর্বয়নে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই পদে কবির ভক্তমনের মননটিকেও লক্ষ্য করতে হয়। বিচিত্র অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে কবির কৃষ্ণ-স্মরণ, কৃষ্ণকে অখিল ভুবনের দুঃখত্রাতা জেনেই স্মরণ। পদান্তের ভণিতায় শঙ্করদেব কেশবের পাদপদ্মের দাস্যানুমত [কিঙ্কর] সেবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতভাষা ও পুরাণ-সাহিত্যে অসাধারণ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল শঙ্করদেবের। এই ভজনগীতটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি 'কৃষ্ণ' সমার্থক পদই জগতের দুঃখত্রাতা, অত্যাচারী দানবের হাত থেকে উদ্ধারকারী ভগবানের কোনো-না-কোনো ভূমিকার স্মারক হিসেবে অত্যন্ত সুনির্বাচিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভণিতায় শঙ্করদেব তাঁর উপাস্যদেবতা কৃষ্ণকে 'কেশব' অভিধায়

অভিহিত করেছেন। এই 'কেশব' শব্দটি কিন্তু কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর কোনো লীলার স্মারক-শব্দ নয়। শব্দটি বহন করেছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। তাঁর ধর্মের নাম 'একশরণ নামধর্ম' অর্থাৎ সেই এক পরমপুরুষের কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করা। আর সেই এক হলেন বিষ্ণু, যিনি যুগে যুগে নারায়ণ রূপে নানাভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'কেশব' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে—ক [ব্রহ্মা]—অ [বিষ্ণু]—ঈশ [শিব] - ব [গমনার্থে]। অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র যাঁর অধীন, সেই পরম এক সত্তা বা নামান্তরে তিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। অন্য আর একটি অর্থ হল—কে [জলে] শব [শবতুল্য]; অর্থাৎ প্রলয়পয়োধিজলে যিনি অনন্ত শয়নে শবাকারে ভাসমান ছিলেন। এই অর্থেও বিষ্ণু বা কৃষ্ণই প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—সবই এক বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অধীন। শঙ্করদেবের শরণ্য সেই সমবেত ঐশী শক্তির একাধার 'কেশব'—তিনিই তাঁর একশরণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাকর্তাগণও শ্রীকৃষ্ণবন্দনাকালে কৃষ্ণরূপের অনুধ্যান করেছেন। সে-রূপচিত্র পদাবলীর অক্ষরেও শিল্প-সিদ্ধ হয়ে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু অসমীয়া একশরণ নামধর্মে উপাস্য দেবতা একমাত্র কৃষ্ণ। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য দেবতা রাধা-কৃষ্ণ। একশরণ নামধর্মের সাধনার ভাব দাস্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা অনুরাগ পথের সাধনা—রাগানুগা সাধনা। এ-কারণে কৃষ্ণরূপাবলোকনে দুই প্রদেশের দৃষ্টি পৃথক হয়ে গেছে। আমরা তুলনার প্রয়োজনে পদকল্পতরুর শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনার ১৯ ও ২০ সংখ্যক পদ দুটির আলোচনা এখানে করতে পারি। ১৯ সংখ্যক পদটি—

জয় জয় যদুকুল-জলনিধি-চন্দ।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ-কন্দ॥
জয় জয় জলধর-শ্যামর-অঙ্গ।
হিলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মুরতি মদন-ধনু ভাঙ্গু-ত্রিভঙ্গ।
বিষম কুসুম-শর নয়ন-তরঙ্গ॥
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত মউর-শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
সুধই সুধাময়-মুরলি বিলাস।
জগ-জন-মোহন মধুরিম হাস॥
অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল॥
তরুণ-অরুণ রুচি পদ-অরবিন্দ।
নখ-মণি-নিছনি দাস গোবিন্দ॥

পদটির সূচনা হয়েছে যদুকুল-রূপ সাগর হতে সমুদ্ভূত চন্দ্র-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিয়ে। এই যদুকুলনিধি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুল অর্থাৎ ব্রজবাসীগণের ও গোকুলের আনন্দের উৎস বা মূল স্বরূপ। শ্যামের অঙ্গকান্তি মেঘের মতো। কল্পতরু হল স্বর্গোদ্যানের বহুখ্যাত অভীষ্টফলদায়ক বৃক্ষ। গোকুলের সেই কল্পতরুই হল কদম্ববৃক্ষ, যার তলায় মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ সেই কল্পবৃক্ষে মনোহর সুন্দর ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ভুরু ত্রিভঙ্গ, যেন কামদেব মদনের কামধনু। সেই ত্রিভঙ্গ-মূর্তি কৃষ্ণের দৃষ্টি-তরঙ্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে মদনের কুসুম-শরসমূহ। মাথার মুকুটে উড়ছে মত্ত ময়ূরপুচ্ছ। কর্ণ-কুণ্ডলের দোলায় গণ্ডদেশ ঝলমল করছে। আর কৃষ্ণ সুধাময় স্বরে বাঁশী বাজাচ্ছেন। তাঁর মধুর হাসিতে জগৎবাসী বিমুগ্ধ। তাঁর গলায় দুলছে বনমালা। সেই বনমালার ফুলের সৌরভে জড়ো হওয়া মধুকর যে ঝংকার তুলছে, তা আরও যেন রসাল। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম নবোদিত রবির

কান্তির মতো আরক্তিম। পদকর্তা গোবিন্দদাস সেই পাদপদ্মের মণিতুল্য সমুজ্জ্বল নখ-রাজির নিছনি। অর্থাৎ গোবিন্দদাস সেই নখরাজির অনুপম সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে, তারই কাছে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করছেন। 'নির্মঞ্ছন' শব্দজাত 'নিছনি' শব্দের মূল অর্থ অমঙ্গল দূর করার জন্য যে-সব মাঙ্গলিক দ্রব্য গাত্র-স্পর্শ করিয়ে দূরে রাখা হয়। পরে শব্দার্থ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'উৎসর্গীকৃত'।

শঙ্করদেব ও গোবিন্দদাস উভয়ে ভক্ত কবি। অনাবিল ভক্তির বিনম্র আত্মনিবেদন উভয় কবির পদেই ফুটে উঠেছে গীতিকবিতার সুরে। শঙ্করদেবের নিবেদন—'কেশব চরণ সরোরুহ কিঙ্কর, শঙ্কর এহু অভিলাষী।' আর গোবিন্দদাসের নিবেদন—'নখ-মণি নিছনি দাস গোবিন্দ।' কিন্তু উভয় কবির চোখে তাঁদের প্রাণের দেবতার রূপ পৃথক। একজনের দেবতা দৈত্যারি ঐশ্বর্যমূর্তি পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আর একজনের দেবতা পৌরাণিক কৃষ্ণমূর্তির ঐশ্বর্যভাবমুক্ত, কেবল রাগানুগা ভক্তির অনুকূল প্রেমিক কৃষ্ণ। শঙ্করদেবের শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে ক্রীড়া করেছেন এ-কথা সত্য, কিন্তু তাঁর পদে সেই মূর্তি বিশেষ কোনো লালিত্যগুণে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। শঙ্করদেবের শ্রীকৃষ্ণ সংসারতাপ থেকে মুক্তিদাতা পরমৈশ্বর্যময় সর্বেশ্বর। কিন্তু গোবিন্দদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে সুপণ্ডিত কবি। তাঁর চোখে তাঁর দেবতা প্রেমের দেবতা—'মুরতি মদন-ধনু ভাঙ্গু ত্রিভঙ্গ'।

গোবিন্দদাসের আর একটি শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনার পদের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি—পদটি পদকল্পতরুর ২০ সংখ্যক পদ। জগৎবাসীর লোচন-ফাঁদ রাধা-রমণের জয়ধ্বনি দিয়ে পদটি শুরু হয়েছে। অভিনব নীল মেঘের মতো ঢল ঢল তনু শ্রীকৃষ্ণের মাথায় মুকুট পরিহিত। কাঞ্চন রঙের বসন [পীতবাস] ও রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নূপুর বাজছে রিনিরিনি শব্দে। তাঁর চোখ দুটি নীলপদ্মের মতো সুন্দর। চক্ষুর প্রান্তভাগ পুষ্পবাণ দ্বারা চঞ্চল। শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন বলে এখানে তাঁর নীলোৎপলতুল্য নেত্রযুগলের অপাঙ্গদৃষ্টিকেই পদকর্তা কন্দর্পের পুষ্পবাণরূপে বর্ণনা করেছেন। এই বাণের আঘাতে কুলরমণীগণের অন্তর মদনভারে অবিচলিতভাবে পীড়িত হচ্ছে। গলার আজানুলম্বিত বনমালার পরিমলে অলিকুল মত্ত হয়ে রয়েছে। আর বিম্বাধরের ওপরে মোহন মুরলী স্থাপন করে তা বাজাচ্ছেন। এই যিনি বাজাচ্ছেন, তিনিই গোবিন্দদাসের প্রভু বা ঈশ্বর।

গোবিন্দদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিরঙ্কুশ আনুগত্যে তাঁর পদাবলী রচনা করেছেন এ-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই—তিনিই এই আদর্শের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। কিন্তু বাংলার পদাবলী সাহিত্যের অন্যান্য কবিগণও যে, ভগবানের লীলারূপ বর্ণনা করেছেন, তাতে ষড়ৈশ্বর্যময় রূপ নয়, নন্দ-যশোদার দুলাল, ব্রজরাখালের সখা, ব্রজবধূগণের প্রেমিক 'রসিকশেখর রসময় কলেবর' ভগবানই বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছেন। এমনকি চৈতন্যপূর্বকালের কবি গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-বর্ণনার পদেও সেই একই মাধুর্যমূর্তি চিত্রিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা গুণরাজ ভণিতার 'পূর্ণিমার চান্দ যিনি বদন কমল।/খঞ্জনে জিনিয়া শোভে নয়ন যুগল।।' শীর্ষক পদটির কথা বলতে পারি। এই পদের 'দেব জগন্নাথে' অংশটিতে হয়তো সামান্য ঐশ্বর্যভাবের ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু তা কোনভাবেই সমগ্র পদের মাধুর্যপ্রাধান্যকে খর্ব করেনি।

শ্রীচৈতন্যের সমকালীন কবি অনন্তদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনার অন্যতম শক্তিমান কবি। তাঁর পদগুলিও সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যভাবমুক্ত কৃষ্ণরূপকে চিত্রিত করেছে। যেমন—'বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল' শীর্ষক পদে কবি কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—প্রস্ফুটিত কমলের মত মুখমণ্ডল। নয়নভঙ্গি যেন নৃত্যশীল দুটি খঞ্জন। মুখের হাসি থেকে ঝরে পড়ছে মৃদু মাধুরী। সেই মাধুরী পান করতে করতে আমার নয়ন আনন্দে বিভোর হয়ে পড়লো। চিকন বর্ণের সে-রূপ বর্ণনা করা যায় না। সে কি পুঞ্জিত মেঘ, না নীলপদ্মদল, অথবা দলিতাঞ্জন কিংবা ইন্দ্রনীলমণি, বাহুতে অঙ্গদ বলয়, বক্ষে হার, কর্ণে

মণিকুণ্ডল, চরণে নূপুর, কটিতে কিঙ্কিণীর কলধ্বনি। অলংকারের ছটায় এবং লাবণ্যের আভায় তরঙ্গিত তাঁর অঙ্গ। দেখলে মনে হয় যেন যমুনার নীল জলে চাঁদ নেচে বেড়াচ্ছে। কুঞ্চিত কেশে ফুলমালার সাজ, মাথার ওপর ময়ূরপুচ্ছের ছাঁদ। অনন্তদাসের এই প্রভু কৃষ্ণের অপরূপ লাবণ্যে সকল যুবতী ব্রজ-গোপীর মন ফাঁদে পড়লো। কৃষ্ণরূপের এই মাধুর্যবিকাশ শুধু চৈতন্য সমকালের পদাবলীতেই নয়, উত্তরকালের পদেও সমানভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত উত্তরকালের মহাপ্রতিভাধর কবি জ্ঞানদাসের বর্ণনার সাক্ষ্যও আমরা এখানে গ্রহণ করতে পারি। 'তরু অবলম্বনে কে' শীর্ষক পদে জ্ঞানদাস বর্ণনা করেছেন—তরু অবলম্বন করে কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে? তাঁর হৃদয়ে বিরাজিত মণিমালা, শ্যামলসুন্দর দেহ। এ-কি নতুন নীলপদ্মদাম, না নব অতসীপুষ্প। তাঁর লাবণ্য-প্রভা যেন নীলমণির দর্পণ। এ-কি দলিতাঞ্জন, না নব মেঘ। রূপ-শোভার তো বর্ণনা হয় না। কুসুমিত কেশপাশে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। যেন চাঁদ বিরাজ করছে। আরো অপরূপ, ললাটে চন্দনের তিলক, যেন মেঘমালায় চাঁদ উদিত হয়েছে। কৃষ্ণের বংশীবাদনরত মনোহর মুখমণ্ডলের কাছে কোটি চন্দ্রের সৌন্দর্যও যেন ম্লান হয়ে যায়। জ্ঞানদাস এই রূপ ভাবতে ভাবতেই কালযাপনের কামনা করেন। ভাগবতীয় পুরাণ-কথার বৃত্তে বন্দী থেকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলী এইভাবেই রচনা করেছে তাদের একান্ত নিজস্ব এক শ্যামরসের সুগভীর সরোবর, যা অসমীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্তিত কৃষ্ণকথার একান্ত ভাগবতাশ্রয়ী জ্ঞানমিশ্রা দাস্যভাবিত পদাবলীর থেকে আস্বাদনে পৃথক।

শুধু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবেই নন, তাঁর প্রবর্তিত ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই। শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেবের একটি পদের দৃষ্টান্তও আমরা এখানে গ্রহণ করছি। 'বড়গীতে'র অন্তর্ভুক্ত মাধবদেবের একটি পদের ধ্রুবপদ—"শঙ্খ চক্র গদা পঙ্কজপাণি গরুড়াসন বনমালী গোপাল।/পীতাম্বরধর শ্যামসুন্দর হরি, ভকতজনর ভয়হারী দয়াল।।" এই অংশে ঐশ্বর্যভাবদ্যোতকতা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। মূল পদটি এখানে উদ্ধৃত করা যাক্—

পরমানন্দ   পরম পুরুষোত্তম
    পরমকরুণা রস-সিন্ধু গোপাল।
কমলাকান্ত   কমল দল লোচন
    ভকতজনের নিজ বন্ধু দায়াল।।
জগদানন্দ   জগত-জন জীবন
    যদুকুল কুমুদিনী-ইন্দু গোপাল।
মাধব দীন   মুরুখমতি মাগয়
    ভকতি রতি একু বিন্দু দায়াল।।

মাধবের দেবতা একশরণ নামধর্মেরই ঈশ্বর। তিনি পরমানন্দ, পরম পুরুষোত্তম, পরম করুণা রস-সিন্ধু, কমলাকান্ত, ভক্তজনের দয়াল বন্ধু, জগদানন্দ, জগজ্জীবন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। পদকর্তা দীন মাধবদেব তাঁর কাছেই ভক্তি-রতির একটি বিন্দু প্রার্থনা করছেন। তাই বলা চলে, শ্রীচৈতন্যদেবও শ্রীশঙ্করদেব প্রবর্তিত দুই প্রদেশের বৈষ্ণবধর্ম এক ভাগবতকে আশ্রয় করে বিকশিত হলেও স্বতন্ত্র পথে বৈষ্ণব পদাবলীর পথকে আলোকিত করেছে।

প্রবন্ধের সূচনায় আমরা সর্বভারতীয় ভক্তিধর্মান্দোলনের পটভূমি থেকে পূর্বভারতের গৌড়-বঙ্গ ও আসামের ভক্তিধর্মান্দোলন এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে পদাবলী সাহিত্যকে দেখা শুরু করেছিলাম। দেখেছি ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাপক ভক্তিধর্মের প্রভাব, বিশেষ করে ভাগবতকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মের

জোয়ার আমাদের দেশের একটি ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়লেও তাতে মূল একটা ঐক্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু অঞ্চল-ভেদে তার আবার বৈচিত্র্যও ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের মতো। আমরা এই বৈচিত্র্য দর্শনের রম্যতাকে যেমন অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি তাকে শেষ সত্য বলেও স্বীকার করতে পারি না। বৈচিত্র্যের খণ্ড-দর্শন থেকে ঐক্যবোধের অখণ্ড চেতনায় আমাদের সাংস্কৃতিক বোধকে ইতিহাসের ভিত্তিতে সমুত্তীর্ণ করাই এই তুলনামূলক সমীক্ষার প্রেরণা।



বাংলা মঙ্গলকাব্য : অন্তর্লীন গঠনগত রূপকল্প

সনৎকুমার নস্কর

[শুরুতেই বলে নিই আমার আলোচনার সীমা মনসা-চণ্ডী ও ধর্ম এই তিন মঙ্গলকাব্য।]

লিখিত সাহিত্য হিসেবে ছন্দোবন্ধ কাব্য-পংক্তির আবির্ভাব সবচেয়ে আগে হলেও সম্ভবত সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল গল্পের। লেখা বাহুল্য যে, এ গল্প একালের মননজাত নির্দিষ্ট রূপবন্ধ ও ভাবনার জটিল বিন্যাসে গড়ে ওঠা 'Short Story' নয়। সে ছিল নিছক প্রাগৈতিহাসিক কালের অরণ্যচর ও গুহাবাসী মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জৌলুসহীন আদান-প্রদান। সে-গল্প তারা রচেছিল মুখে মুখেই। যতদূর মনে হয় তাতে বিনোদন-প্রত্যাশী মানুষের মাধুকরী কল্পনার ভেজাল ঢোকেনি। ভাষার জন্ম কোন্ আদ্যিকালে হয়েছিল তার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা আজ অসম্ভব। শুধু এইটুকু বোধহয় ঝুঁকি নিয়েই বলা যায় যে, পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা আবিষ্কারের পর ইতিহাসের সেই আলো-আঁধারি যুগে মানুষ নিজেদের ভেতরকার বিচিত্র জটিল অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে আত্মপ্রকাশের এই কৌশলের ব্যবহারযোগ্যতাকে ক্রমাগত বাড়িয়েই গিয়েছিল। গল্প এসেছিল ভাষার এই ব্যবহারযোগ্যতার পথ ধরেই। কিছু শিকারের প্রসঙ্গ, কিংবা কোনো বিপন্নতার ছবি অথবা টুকরো সাফল্যের ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে মানুষকে কথার পর কথা সাজিয়ে কোনও এক বা একাধিক ভাবের বাঙ্ময় মূর্তি গড়তে হয়েছিল। নড়বড়ে অন্বয়বোধ কিংবা নিতান্তই খুঁদ-কুড়ো-ভরা শব্দভাণ্ডার দিয়ে প্রাচীনতম বাক্-সক্ষম মানুষের এই খঞ্জ-প্রয়াসের পরম্পরা কোথাও কেউ লিখে রাখেনি। রাখলে ধরা পড়তো মানুষের গল্পকথন রীতির দুর্লভ ইতিহাস, তথা সাহিত্যের গল্প গড়ে ওঠবার ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের সেলুলয়েডিম ছবি।

গল্পের প্রতি রয়েছে মানুষের এক চিরন্তন আকর্ষণ। সে-গল্প পশুপাখি-জীবজন্তুর হোক কিংবা দেব-দৈত্য-রাক্ষসের। গল্প শোনা কিংবা পড়ায় মানুষের বয়সগত ভেদ থাকে না, থাকে কেবল বিষয় ও মাত্রাগত ভেদ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিশুরঞ্জক গল্প প্রধানত অল্পবয়সীদের তৃপ্তি দেয়, আর জীবনের জটিলতার গল্প বয়স্ক পাঠকেরই মনের যথার্থ দোসর হয়ে ওঠে। তবে বয়সভেদে গল্পের রকমফের থাকলেও তাদের রসোপলব্ধিগত আনন্দে কোন পার্থক্য থাকে না। অবশ্য শিশুতোষ কাহিনীর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের গল্পের একজায়গায় বিশাল এক তফাৎ আছে। সেটা তাদের আখ্যানের গঠনতন্ত্রে। অল্পবয়সীদের গল্পে কেবল ঘটনার পর ঘটনার মালা গাঁথা, আর বয়স্ক পাঠকের গল্পে ঘটনামালার ভিতর দিয়ে কোন এক বা একাধিক চরিত্রকে কিংবা অভিব্যঞ্জনাকে স্পর্শ করার চেষ্টা। অর্থাৎ প্রথমোক্ত ধরনের কাহিনীতে 'এরপর কী হল' এই কৌতূহলটাই যেন প্রধান হয়ে ওঠে, যেখানে পরোক্ত শ্রেণীর গল্পে 'কেন এমন হল' এই জিজ্ঞাসাটাই গুরুত্ব অর্জন করে। যে কোন আখ্যানের গঠনপ্রক্রিয়ায় এই দুই প্রধান রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। নির্মাণতত্ত্বের গোড়ার কথা এটাই। প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষের

গল্পে ঘটনার ক্রমান্বয়িক সজ্জাটাই সম্ভবত গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যদিকে, পরবর্তীকালের মানুষের গল্পে এসেছে মননের সূক্ষ্মতা।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠনতত্ত্ব নিয়ে দু-একটা ছেঁদো কথা বলতে গিয়ে এমন একটা খোড়ো-ভূমিকা করতে হলো। বাকি কাজটা এর ওপর কেবল দাগা বুলোনো। মঙ্গলকাব্য দেবদেবীদের মাহাত্ম্যকথা যতই ফেনিয়ে বলুক না কেন, তা তো শেষ-মেশ সেই মুখরোচক গল্পই। এমন গল্প কি আমরা আরো অনেক পড়িনি আমাদের দেশের হিতোপদেশে, পঞ্চতন্ত্রে কিংবা ওদেশের ঈশপ ফেবল্‌সে? আসলে এইসব গল্পের চরিত্র একটাই : মনোরোচক কাহিনীর কোটিং দিয়ে নীতিকথার তিক্ত বটিকা গেলানো। তবে এখানে আবরণটা পুরু, আরো চাকচিক্যময়। নীতিকথা এখানে ধর্মকথার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, যা শিশু-মনোরঞ্জক গল্পে আদৌ দেখা যায় না। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আঙিনায় মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলো প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তখন এদের সম্ভবত অন্যরকম দেখতে ছিল। যেমন দেখতে লাগে একই মানুষের বাল্য আর যৌবনের চেহারা। প্রথমটা আকারে ছোট, স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো অনতিস্ফুট, ব্যক্তিত্বের কোন বালাই নেই ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমশ বড় হলে তার শরীরে নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। চলন হয় ভারিক্কি, বলন হয় মেজাজী। পুষ্টি সুষম হলে গায়ে-পায়ে মাংস লাগে। পণ্ডিতদের মতে, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তাঁর শৈশবাবস্থা ব্রতকথার সম্পর্ক এমনই। এই উপমা আরো-একটা জায়গায় খুব খেটে যায়। সেটা তাদের প্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে। ব্রতকথা আর মঙ্গলকাব্যের গল্পের চরিত্রে কিন্তু খুব একটা আকাশ-পাতাল ফারাক দেখা যায় না। ঠিক যেভাবে মানব-শিশুর শৈশব-কৈশোরের অনেক সুপ্ত দোষ-গুণই প্রকট হয়ে ওঠে তার মধ্য-যৌবনে। ব্রতকথাগুলোর গল্প যে-ভাবে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়েছে, মঙ্গলকাব্যের আখ্যানও কম-বেশি সেই ধরণ ও লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। দুই-ই দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচারকেন্দ্রিক। তাই এ দুইয়ের মধ্যে টাইপ ও মোটিফগত মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। মঙ্গলকাব্যের গঠনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী সংরূপ ও সংগঠন সম্পর্কে কিছু বলতে যাবার আগে মঙ্গলকাব্যের শারীর-সংস্থান নিয়ে একটু ভাবা দরকার, যা গঠনতত্ত্বের প্রচলিত ভাবনার প্রান্তকে স্পর্শ করে আছে।

এটা ঘটনা হিসেবে সত্যি যে, প্রাচ্যে পশ্চিমী ভাবনার মতো কোন স্বতন্ত্র 'ন্যারেটোলজি' কখনোই গড়ে ওঠেনি; কিন্তু এদেশীয় কবিরা দীর্ঘদিন ধরে কাব্যরচনার যে রীতি-কৌশল অনুসরণ করে এসেছেন তার একটা অতীত ঐতিহ্য ছিল। বিশেষত মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুচ্ছানুসারী। তাঁরা সকলেই যে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন তা-ও নয়। সংরূপ তথা genre-এর ধারণা তো দূর-অস্ত। প্রথানুসারে তাঁরা বুঝে বা না-বুঝে পূর্বজ কোনো কবির অবলম্বিত পদ্ধতিই গ্রহণ করতেন। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্র্যহীন একাধিক সাহিত্যধারার। শতাব্দীর পর শতাব্দী, কবির পর কবি একই ধারার কাব্য লিখে যাবার ফলে গতানুগতিকতার ক্লান্তি উৎপাদনের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে কিছু সাধারণ লক্ষণও। এগুলি ওই সংরূপের গোত্রচিহ্ন বলে পরবর্তীকালে বিবেচিত। গোত্রচিহ্নগুলি সাহিত্যের উপাদানের দিক থেকে যেমন, তেমন গঠন-পদ্ধতির দিক থেকেও গণনীয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের সাধারণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বারমাস্যা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচারের বিস্তৃত বিবরণ, নানাবিধ বিষয়ে অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা নির্মাণ ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যের গঠনের ক্ষেত্রেও একাধিক সাধারণ সূত্রকেও সবাই মেনেছেন। যেমন : ১. মঙ্গলকাব্যের আখ্যানটি হবে বর্তুলাকার। গল্পের সূচনা যেখানে ঘটবে, অন্তিম সমাপ্তিও ঘটবে সেখানেই। তাই দেখা যায়, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে স্বর্গলোকের বিবরণ দিয়ে; পরে মর্ত্যলোক ঘুরে আবার স্বর্গলোকে গল্প সমাপ্তি লাভ করেছে। ২. প্রতিটি মঙ্গলকাব্যই এগিয়েছে কোন-না-কোন দেব কিংবা

দেবীর [তিনি শাস্ত্রীয় কিংবা অ-শাস্ত্রীয় যাই হোন না কেন] মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। মর্ত্যলোকে দেবতাদের পূজা করে থাকে এক বা একাধিক মানব-মানবী, যারা প্রকৃতপক্ষে দেবলোকবাসী। ফলে প্রতিটি মঙ্গলকাব্য দেবখণ্ডের শেষে একটা-না-একটা অভিশাপের প্রসঙ্গ থাকেই, যার দ্বারা কাহিনীকে মর্ত্যমুখী করে তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় ব্রতকথাগুলির আখ্যান। এমন কোনো ব্রতের গল্প নেই যেখানে কোনো দেব কিংবা দেবীর পূজা প্রচারের আখ্যান নেই। মর্ত্যে মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রতকথার গল্পগুলি লেখা হয়েছিল। তবে সেখানে সবক্ষেত্রে অভিশাপের প্রসঙ্গটি সংযুক্ত নয়। ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্য এইখানে কিছুটা পৃথক। ৩. মঙ্গলকাব্যে অভিশাপ দেবার ক্ষেত্রেও শরণ নেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট চরিত্রটির দোষত্রুটির, নইলে বাস্তবতাবোধ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আগে থাকতে প্রয়োজনীয় আয়োজন করেন কবিরা, যাতে ঘটনাটি আকস্মিকতা দোষদুষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে মানবসংসারের ধর্মাধর্ম, পাপ- পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাটিকে কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। দেবতারা সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হয়েও এক্ষেত্রে ছলনা করতে ও তুচ্ছ অপরাধে মারাত্মক শাস্তি দিতে পিছপা হন না। দৈববিধানের অমোঘতার ধারণাও এ ঘটনার ভিতর দিয়ে মানব-মনে পুঁতে দেবার প্রয়াস থাকে। ৪. প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই মিলেছে শিব-প্রসঙ্গ, যা দেবখণ্ডের কাহিনীর একটি বড় অংশ। কেউ কেউ এ স্থানে শিবকেন্দ্রিক পুরাণ কিংবা কালিদাসের কুমারসম্ভবের আশ্রয় নিলেও বেশিরভাগ কবিই অনুসরণ করেছেন বাংলার লোকায়ত শিবকথা। এই শিবই শিবায়নের পুরাণ-মাহাত্ম্যবর্জিত গণদেবতাটির প্রাথমিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছে বলে ধারণা করি। ৫. মঙ্গলকাব্যের আলোচকগণ প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে চারটি স্পষ্ট পর্যায়-ভাগ লক্ষ করেছেন। এগুলি যথাক্রমে—ক. বন্দনা খ. গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ গ. দেবখণ্ড ও ঘ. নরখণ্ড। প্রথম দুটি অংশে মূল গল্পের কোন আভাস পাওয়া যায় না। দেববন্দনার অংশটুকু রচিত হয় মঙ্গলাচরণের লক্ষ্য নিয়ে। তার সূচনা ঘটে গণেশবন্দনা কিংবা সরস্বতী বন্দনা দিয়ে, আর এটি সমাপ্ত হয় দিগ্‌বন্দনায়। সম্ভবত প্রতিটি দেবতার ধ্যানমন্ত্র ও পৌরাণিক পরিচিতি দিয়ে নির্মিত হতো দেববন্দনাগুলি। এক কবির সঙ্গে অন্য কবির এতে ইতর-বিশেষ পার্থক্য আছে। দিগ্‌বন্দনা অংশে অনেক অপরিচিত দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, যা সংশ্লিষ্ট কবির অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উঠে আসে। চৈতন্যোত্তর কালের কবিদের লেখায় মহাপ্রভু বা চৈতন্যবন্দনা মিলেছে, যেহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একাংশে তিনি কৃষ্ণাবতার বলে কল্পিত। এই বন্দনা-প্রথা পরবর্তী সময়ের অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। উনিশ শতক তো বটেই বিংশ শতকেও কথকতা, পদাবলী, ভাসান গান প্রভৃতি লোকায়ত কাব্যাঙ্গিক পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব রক্ষা করে গেছে আসর বন্দনার আঙ্গিকে। দ্বিতীয় পর্যায় গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে প্রায় সব কবিই তাঁদের সমকালীন ইতিহাসকে কোন-না-কোন সূত্রে স্পর্শ করে গিয়েছেন। এই অংশে আবশ্যিকভাবে এসেছে দৈবাদেশ, পোষ্টা-প্রভুর আদেশ কিংবা ওই জাতীয় কোন প্রণোদনার কথা, যার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে কবিরা কাব্য লিখেছেন বলে দাবি করেছেন। মঙ্গলকাব্য গঠনের এই আবশ্যিক বাস্তব শর্তটি সম্ভবত পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে গ্রন্থকারের মুখবন্ধ তথা অবতরণিকায়। তৃতীয় পর্যায় দেবখণ্ডের আখ্যানও কম-বেশি গতানুগতিক। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের দাম্পত্যজীবন উপস্থাপিত। ওই দুই মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কবি অবশ্য তাতে নিবৃত্ত না হয়ে কিছু কিছু ভিন্নজাতীয় পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন গল্পরসপিপাসু পাঠকদের জন্য। ধর্মমঙ্গলের 'স্থাপনা পালা'টি আবার অন্যরকম। সেখানে হনুমানের মুখে কাহিনীর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এবার নরখণ্ডের কথা। এই অংশের গল্পটিই মঙ্গলকাব্যের মূল গল্প। এ গল্পের প্রথম স্রষ্টা কে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। প্রতিটি ধারার একজন করে আদিকবির সন্ধান পাওয়া যায় বটে,

কিন্তু তাঁরাই যে কাহিনীটির আদি পরিকল্পক ছিলেন একথা জোরের সঙ্গে বলবার মতো অকাট্য তথ্য আমাদের হাতে নেই। লৌকিক দেবদেবীর মঙ্গলগাথাগুলি একদা যে ব্রতকথা-রূপে সমাজে সঞ্চরণশীল ছিল, এ নিয়ে সংশয় কম। আর কোন একটি নির্দিষ্ট ব্রতকথার রচয়িতা কে তা আজ বলা মুশকিল। ফলে মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলিকে লোকায়ত সমাজের স্বাধীন সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা উচিত। সমাজ তার নানাবিধ সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে এগুলি বানিয়ে নিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মঙ্গলকাব্যের তিন প্রধান ধারায় মোট গল্পের সংখ্যা পাঁচ। মনসামঙ্গলে মেলে চাঁদ সদাগরের আখ্যান, যিনি ধর্মবিশ্বাসে শৈব হওয়ার কারণে মনসাপুজার বিরোধিতা করেন এবং ক্রূর দেবী কর্তৃক বিপন্ন হন, পরে পুত্রবধূ বেহুলার প্রণোদনায় মনসার দেবীত্ব মেনে নিয়ে পুজো দেন। প্রায় এরই অনুরূপ একটি কাহিনী আছে চণ্ডীমঙ্গলে। সে গল্পের নায়ক ধনপতি বণিক। তিনিও শৈব। তাই চণ্ডীপুজোর বিরোধী। দেবী চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে বাণিজ্যযাত্রা করায় তিনিও দেবীর চক্রান্তে বিপন্ন হন ও সিংহলের রাজা শালিবাহন কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। সবশেষে পুত্র শ্রীমন্তের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে চণ্ডীর পূজায় সবকিছু ফিরে পান। পূজার মাধ্যমে দেবীর মহিমাও প্রচারিত হয়। এই দুই সদৃশ আখ্যানের গঠনে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। গল্পের নায়ক প্রথমে বিরোধিতা করে, পরে নিকটাত্মীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আগেকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। কবিরা এসব ক্ষেত্রে নায়কের ধর্ম-বিভ্রান্তিকে বিরোধের হেতু বলে বিবেচনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের আর একটি আখ্যান ব্যাধ কালকেতুকে নিয়ে। কালকেতু প্রথম থেকে দেবী চণ্ডীর অনুগৃহীত। দরিদ্র ব্যাধের সন্তান হবার কারণে বনে বনে পশু শিকার করে বেড়াতে হয় কালকেতুকে। সে-সব অরণ্য পশুদের রক্ষাকর্ত্রী হলেন অভয়াচণ্ডী। অতএব পশুদের কাতর ক্রন্দনে দেবী ছলনা করে কালকেতুকে বিপুল ধনসম্পত্তি দান করে পশুহত্যা থেকে বিরত রাখলেন। অতিরিক্ত দৈবী অনুগ্রহে বনের দরিদ্র ব্যাধ হলেন গুজরাট নগরীর রাজা। কিন্তু তখনো দেবীর মাহাত্ম্য কিংবা পূজা কালকেতুর দ্বারা প্রচারিত হয়নি। তাই তার আয়োজন চললো কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর বিরোধের ভিতর দিয়ে। ভাঁড়ু দত্তের ষড়যন্ত্রে রাজা কালকেতু বন্দী হয়ে কলিঙ্গরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁর কাতর প্রার্থনায় দেবী প্রসন্ন হলেন ও স্বপ্নাদেশের দ্বারা মুক্ত করলেন।

নায়কের প্রতি এমন অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের উপাখ্যানে। ধর্মের বরপুত্র লাউসেন জন্মানোর পর থেকে তাঁর মাতুল মহামদ পাতর সব সময়েই ভাগিনেয়কে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেবতার কৃপায় প্রত্যেকবারই লাউসেন বিজয়ী ও বিপদমুক্ত হয়েছেন। উপাখ্যানের শেষে অনৈতিক আচরণের জন্য মহামদও শেষ অব্দি ধর্মঠাকুর কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। এই কাব্যে অলৌকিকতার প্রচুর ছড়াছড়ি, যার মধ্যে অন্যতম লাউসেন কর্তৃক পশ্চিম দিকে সূর্যের উদয় ঘটানো। হাকন্দ সাধনায় বীর লাউসেনকে দিতে হয়েছে সবচেয়ে কঠিনতম পরীক্ষা। শরীরের মাংস কেটে হোম করার পরেও ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে নিজের মুণ্ড কেটে অগ্নিতে আহুতি দিতে পিছপা হননি লাউসেন। আর ঠিক তখনই ধর্মের কৃপায় পশ্চিমে সূর্যোদয় হলো।

যাইহোক, এ মঙ্গলকাব্যের গঠনে ড. সুকুমার সেন পুরনো রূপকথার অনুষঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করেন। গল্প গ্রন্থনে প্রভাব রয়েছে ভাগবতেরও। লাউসেন কর্তৃক ক্ষিপ্ত হাতীকে দমন কিংবা বৃক্ষধ্বংস ও তার পুনরুজ্জীবনের কাহিনী কৃষ্ণের বীরকৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ গল্পের আদি বীজ বোধহয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশচন্দ্র রোহিতাশ্ব-শুনঃশেপের উপাখ্যান। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রক্রিয়ার সঙ্গেও

মিল খুঁজে পাওয়া যাবে রঞ্জাবতীর সন্তানলাভ সংক্রান্ত উপকাহিনীর গড়নের। ড. সেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনী, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-বিধি ও ধর্মমঙ্গলের সূচনাভাগের আখ্যান—এই তিনের মধ্যে গঠন ও ভূমিকাগত ঐক্য দেখেছেন। সবদিক বিবেচনা করে তাঁর মন্তব্য : "প্রাচীন 'মঙ্গল' কাব্যের মধ্যে সর্বশেষে দেখা দিলেও গঠনে এবং বস্তুতে ধর্মমঙ্গলের বস্তু পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে বেশ পুরাতন। অপভ্রংশ রীতির কাব্যবন্ধের চিহ্নাবশেষ ধর্মমঙ্গলে যেরকম ও যতটা আছে এমন বোধকরি মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলেও নাই।"

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে আর-একটি গল্প প্রচলিত আছে। সেই আখ্যানের চরিত্রটি কিঞ্চিৎ পুরাণ-ঘেঁষা। সেটি হরিশচন্দ্র-মদনা-লুইধরের উপাখ্যান। হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজা হরিশচন্দ্র ধর্মের বরে কীভাবে পুত্র লাভ করেছিলেন ও শর্তানুসারে নিজ পুত্রের মাংস রেঁধে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে ধর্মঠাকুরকে তৃপ্ত করেছিলেন তার কাহিনী ওই অংশে পরিবেশিত হয়েছে। গল্পের সূচনায় জানতে পারা যায় রাজার অপুত্রকতার কারণটি। তিনি ধর্মঠাকুরবিদ্বেষী ছিলেন ও ধর্মের দেউল ভেঙে দিয়ে তাঁর রাজ্যে উক্ত দেবতার পূজা নিষেধ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে অভিশপ্ত হতে হয়।

এখান এই পাঁচটি কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলি প্রত্যেকটিই উদ্দেশ্যাভিসারী। মানুষের প্রয়োজনে দেবতাকে নানাভাবে উপস্থিত করে মানবজীবনে দৈবীপ্রভাবের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ব্রতকথাতে যেমন একটা-না-একটা সমস্যা থাকে, থাকে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি, কিংবা একটু ঘুরিয়ে বললে—দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে মঙ্গললাভ, বিরূপতা প্রকাশে ধ্বংস, মঙ্গলকাব্যও এই চেনা ছকেই বিন্যস্ত। মানব মনে ভীতি জাগিয়ে দৈবীবিধানের অমোঘতার প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলাই হয়তো ছিল মঙ্গলকাব্যগুলির গল্পগঠনের মূল অভিপ্রায়। এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে মানুষ আছে। কিন্তু এ মানুষ আধুনিক সময়কালের চেতনা-দীপ্ত মানুষ নয়। তারা শেষাবধি দৈবীশক্তির অধীনস্থ। চাঁদ, কালকেতু বা লাউসেনের মতো মানসিক বা দৈহিক বলে কেউ কেউ ভীষণভাবে দৃষ্টি আকর্ষক। কিন্তু তাদের যে-পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় মূল গল্পের পরিকল্পকরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে নিজেদের চেতনাকে প্রসারিত করতে অপরাগ ছিলেন। মনসা-চণ্ডীর বিরুদ্ধে চাঁদ কিংবা ধনপতির বিদ্রোহ এক অর্থে দৈবীমহিমা প্রচারের বিশিষ্ট কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হয়তো মনসামঙ্গলের কাহিনী ওই কাব্যের পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে, মানুষের কোনো শক্তিই দৈবী শক্তির চেয়ে মহত্তর কিছু নয়। দেবতার ইচ্ছাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অমোঘ। তাই তো চন্দ্রধর মহাশক্তিধর হয়েও শেষ অব্দি পরাজিত হয়। নিয়তিবাদের এই দৃঢ় ঘোষণাই কি মঙ্গল কাব্যগুলির গল্পে 'মরাল' হিসেবে নিঃশব্দে উচ্চারিত নয়? প্রাসঙ্গিকভাবে আর একটি কথা এখানে বলার। সম্ভবত মধ্যযুগের কবিরাও দৈববাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁদের কাহিনীসমূহকে উপস্থাপিত করেছিলেন। প্রবল মনসা-বিরোধিতার সূত্রে আজকের দিনে চাঁদ বণিককে যেভাবে ট্রাজিক গল্পের বীর নায়ক হিসেবে দেখা যায়, সেকালে তা করা হতো কিনা সন্দেহ। অন্যধর্মী বিচারে, চাঁদ ছিলেন মধ্যযুগের কবিদের চোখে সামান্য এক 'এজেন্ট', যিনি দেবীর পূজা প্রচারে প্রথমে বিরোধী অবস্থানে থাকলেও পরে দেবী-চরণে নতমস্তক হয়েছেন। আট-দশজন কবির গল্প ফাঁদার ভঙ্গিমার মধ্যে এই সত্যটাই ধরা পড়ে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির সাধারণ পরিচয় ছিল 'পাঁচালি'। এই সুবাদে কবিরা কাব্যের অনেক স্থলে 'মনসার পাঁচালি' 'চণ্ডীর পাঁচালি' ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটির মূলে দাঁড়িয়ে আছে একটি সংস্কৃত শব্দ—'পঞ্চালিকা', যার আভিধানিক অর্থ হল 'পুতুল'। এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, প্রাগাধুনিক কালে মঙ্গলকাব্যগুলি গান গেয়ে শোনানোর সময়ে বক্তব্যের উপযোগী

পুতুল নাচ প্রদর্শিত হতো। কিন্তু এই ধারণা সম্ভবত সত্য নয়। পাঁচালি আসলে বর্ণনাত্মক কাব্যের একটি সাধারণ পরিচয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ, কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালি'তে, দৌলত কাজির লেখা 'লোর-চন্দ্রানী ও সতীময়না' কাব্যে। এর থেকে মনে হয় যেসব কাব্যে কোন কাহিনীর উপস্থিতি থাকতো সেগুলি পাঁচালি বলে গণ্য হতো। ব্রতকথাধর্মী গল্পগুলো যে এককালে পয়ার-ত্রিপদীর দোলায় দুলিয়ে পরিবেশন করা হতো তা জানিয়েছেন বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি ব্রতকথা বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন, 'ব্রতকথার পদ্যরূপের নাম পাঁচালী'।

ব্রতকথার মতো পাঁচালিও এককালে মৌখিক রীতির আশ্রয়ে পরিবেশিত হতো। কোন ব্রত সাঙ্গ করার পর যেমন ব্রতকথা শোনার রেওয়াজ আছে বর্তমানে, তেমনি তার পরিবর্তে পাঁচালিও পঠিত হয় কোন কোন স্থানে। ইদানিং কবিতার আকারে লেখা শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি বা সন্তোষী মায়ের পাঁচালি গড়ে উঠেছে ওই একই উদ্দেশ্যে। মঙ্গলকাব্যগুলি এই ব্রত-পাঁচালিরই প্রসারিত রূপ। পূর্ববঙ্গে এককালে মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে মনসার ভাসান গান প্রচলিত ছিল। যার আঞ্চলিক পরিচিতি ছিল 'রয়ানি' নামে। চণ্ডীদেবীকে নিয়ে কম ব্রত নেই বাংলায়। মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি নামে নানা মাসে নানা উপলক্ষে তাঁর ব্রত প্রচলিত আছে। এগুলি যে সব শাস্ত্রীয় ব্রত এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই। বরং যোষিৎ-প্রচলিত ব্রতের অনেক লক্ষণ এগুলিতে লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের প্রতিটি কাহিনী ব্রতকথার ভিতর দিয়ে আবশ্যিকভাবে উঠে এসেছিল কিনা সে ব্যাপারে পণ্ডিত-গবেষকগণ নিশ্চিত নন, তবে তাঁরা মঙ্গলকাব্যের গল্পে তিন ধরনের উপাদান-মূলের সুস্পষ্ট উপস্থিতির সন্ধান পেয়েছেন, যা মঙ্গলকাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এগুলি হল—১. শাস্ত্রীয় উপাদান-মূল ২. ঐতিহ্যগত উপাদান-মূল ও ৩. কাব্যরচনার সমকালীন বাস্তব উপাদান-মূল। আবার এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক মিশ্রণের অনুপাত সব কবির কাব্যে একরকম ভাবে পাওয়া যায়নি। মনসামঙ্গল কাব্যে হাসান-হোসেনের পালাটি কাব্যরচনার সমকাল থেকে উঠে আসা এক ধরনের বাস্তব উপাদান-মূল। এ আখ্যানের জন্ম নিশ্চিতভাবে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে কোন এক সময়ে হয়েছে। এই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, এ গল্পের আয়োজন অনেক কবিই করেননি। আবার যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যেও কাহিনীর সমতার অভাব রয়েছে। আরো একটা কথা। মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় আখ্যান চাঁদ বণিককে ঘিরে দানা বাঁধলেও এতে আরো অনেকগুলি উপকাহিনী রয়েছে। হাসান-হোসেনের পালা ছাড়া বাকিগুলো হলো রাখালদের মনসাপূজা, ধন্বন্তরী ওঝার কাহিনী ও জালু-মালুর উপাখ্যান। সমাজের তথাকথিত শ্রমজীবী নিম্নবর্গের মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হবার পর চাঁদ বণিকের মতো গণ্যমান্যের দ্বারা দেবী স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিলেন—এমন একটা সমাজ-অভীপ্সাই যেন বেরিয়ে আসে আখ্যানগঠনের পারম্পর্য বিচারের ভিতর দিয়ে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায়, রাখালিয়া উপাখ্যানে দেবী জরতী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ নিয়ে তিনদিনের উপবাস কাটাতে রাখালদের কাছে দুধ যাচ্ঞা করছেন। কিন্তু রাখালরা সে-কথায় আমল দেয় না। ফল ঃ সর্পদংশনে তাদের বিপুল গো-সম্পদের মৃত্যু। বিপন্ন গোয়ালারা তখন কাতর হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইলে ও দেবীর পূজা দিলে পূর্বের গোধন আবার তারা ফিরে পায়।

উদ্ধতকে শাস্তি আর অনুগতকে কৃপা—দেবদেবীদের এমন সরলরৈখিক আচরণ ব্রতকথাগুলিতে হামেশাই লভ্য। অন্যদিকে জালু-মালুর গল্পে দেব-বিরোধিতার কোনো প্রসঙ্গই নেই। তাই দেবী অকাতরে তাঁর অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন দরিদ্র জেলেদের প্রতি। এই গল্পগুলিকে সংগঠনের দিক থেকে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলে গণ্য করা যায়। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত মনসামঙ্গলের কাহিনী-গ্রন্থনের পিছনে

খুঁজে পেয়েছেন অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করা এক তীব্র সংগ্রামের অস্তিত্ব, যা এর খণ্ডিত গল্পাংশগুলির ভিতর দিয়ে আদ্যন্ত প্রসারিত। এই দ্বন্দ্বকে দেখেছেন তিনি একাধিক মাত্রায়—'ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, নীতির সঙ্গে শক্তির, বলা যেতে পারে মুক্ত বুদ্ধির সঙ্গে যুগ-সঞ্চিত অন্ধভক্তির'। তাঁর মতে, এই দ্বন্দ্ব-বীজই কাহিনী-মহীরুহ গড়ে তুলেছে, এরই চৌম্বক আকর্ষণে জড়ো হয়েছে টুকরো টুকরো ঘটনার পিণ্ড, আর প্রতিটি খণ্ডই প্রসারিত হয়ে গেছে অখণ্ডের দিকে, গভীর তাৎপর্যকে শরীরে ধারণ করে। চাঁদের বিরুদ্ধে মনসার সক্রিয়তা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও ক্রূরকর্মের মধ্য দিয়ে ক্রমশ দ্বন্দ্বের তুঙ্গ স্থান স্পর্শ করেছে। দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর। তবে এই ক্রমোন্নতিময় আখ্যানে হঠাৎ ছন্দ-পতন আনে অনিরুদ্ধ উষাহরণ ও যমযুদ্ধের অংশটি। কেমন করে লখিন্দর ও বেহুলা স্বর্গলোক ছেড়ে পৃথিবীতে এল সেই ঘটনাটি বিজয় গুপ্ত এতটা বিশদে বলেছেন, যার ফলে মূল গল্পের চলমানতা ও সমুন্নত গতি নষ্ট হয়েছে। সংরূপটি মঙ্গলকাব্য হলেও গল্পগঠনের মূল শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায় কাহিনীও তার প্রার্থিত আবেদন ও আকর্ষণ হারিয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানের ঘটনাধারা বিশ্লেষণ করলে এ কাহিনীর মূল পরিকল্পকের প্লট সংস্থানগত কতকগুলি বিশেষত্ব ধরা পড়বে। যেহেতু এ কাব্যধারার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ স্বীকৃত, তাই তাঁর রচনা-দৃষ্টান্তে গল্প-গঠনের কাঠামোটিকে যৎসামান্য বিশ্লেষণ করি : ১. ভগবতী কর্তৃক নিদয়ার ঔষধদান থেকে কালকেতুর বনযাত্রা পর্যন্ত আখ্যান পরস্পর সংবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিতে চিত্রধর্মী। ২. প্রথামাফিক কার্যকরণভিত্তিক গল্প শুরু হয়েছে ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ থেকে, কিংবা তার একটু আগে পীড়িত পশুগণের চণ্ডীর কাছে আবেদন থেকে। এ পর্বের সমাপ্তি বন কেটে নগর পত্তনে, এমনকি একে টেনে নেওয়া যায় কলিঙ্গের দুর্গত প্রজাদের গুজরাটে পুনর্বাসিত হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত। কাহিনী মোটামুটি একমুখী, দ্বন্দ্বহীন, কোথাও কোথাও চরিত্রব্যঞ্জক। ৩. এই অংশে তেমন বড় মাপের সংঘাত না থাকায় ঘটনাধারা আকর্ষণহীন হতে পারে ভেবে কবি যোজিত করেছেন কিছু উপ-আখ্যান। ৪. ঘটনার মধ্যে ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশের পর কাহিনী পেয়েছে ভিন্ন ধরনের মাত্রা। এখান থেকেই কাহিনী নাটকীয় দ্বন্দ্বের উত্তেজনা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে পরিণামের দিকে। এর সমাপ্তি ভাঁড়ুর শাস্তিপ্রাপ্তিতে। বস্তুত কালকেতু-কাহিনীর প্রথমাংশটি পাঠকের ততটা মনোযোগ দাবি করে না, যতটা করে কাহিনীর শেষাংশ। কারণ হল এই দ্বন্দ্বময়তা। প্রথম দিকের কাহিনী টুকরো টুকরো ঘটনার মন্তাজ। গল্প এখানে ভীষণই সরলরৈখিক। কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তির আগে পর্যন্ত, ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে ঘিরে কালকেতু ও ফুল্লরার ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া কাহিনী দ্বন্দ্বমুক্ত, সমস্যাহীন। ফলে পুরোটাই পরিণত হয় আকর্ষণহীন এক দরিদ্র ব্যাধদম্পতির গল্পে। গুজরাটে নগর-পত্তনের পর ভাঁড়ু এসে দেখা দিলে সহজ স্রোতের গল্পধারায় এসে মেশে ঘোলা আবর্ত। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হাটুরিয়াদের সঙ্গে বিবাদ, কালকেতুর সঙ্গে বিরোধ, প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্যোগ, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও যুদ্ধে কালকেতুর পরাজয় ও বন্দিত্ব দ্বন্দ্বমুখর এক কাহিনীর অবতারণা করে। কবিকঙ্কণ ভাঁড়ুর জীবন-নাট্যের মধ্যে পাঁচটি সন্ধির উপস্থিতি কল্পনা করে উপাখ্যানের শেষাংশটিকে যথেষ্ট নাটকীয় করে তুলেছেন। পঞ্চসন্ধিসমন্বিত এই দ্বন্দ্বগর্ভ নাটকের 'প্রারম্ভ' বা Exposition : রাজসভায় ভাঁড়ুর আগমন; 'প্রযত্ন' বা Rising action : কালকেতু কর্তৃক ভাঁড়ুকে তিরস্কার; 'প্রাপ্তিসম্ভব' বা Climax : কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ; 'নিয়ত ফলপ্রাপ্তি' বা Falling action : কালকেতুর কারামুক্তি ও 'ফলযোগ' বা Catastrophe : ভাঁড়ুর বিচার ও শাস্তি। মোদ্দা কথা, এই উপকাহিনীটির গতি কিংবা পরিণতিতে ভাঁড়ুর চরিত্র যতটা সংবদ্ধ ও ওতপ্রোত জড়িত, পুরো কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে কালকেতু অথবা ফুল্লরার চরিত্র ততটা সংযুক্ত নয়।

চণ্ডীমঙ্গলের অন্য আখ্যানটি শৈব বণিক ধনপতি-কেন্দ্রিক। চাঁদ সদাগরের গল্পের গড়নের সঙ্গে এর একটা দূরান্বয়ী সম্পর্ক রয়েছে। দুটি কাহিনীরই নায়ক সমাজের উচ্চ অভিজাত বণিক ও শিবভক্ত। ফলে লৌকিক দেবীদের অর্চনায় স্বভাবতই তাঁরা পরাঙ্মুখ। আর সেই সূত্রে তৈরি হয় দেবতা ও মানুষের বিরোধ। ক্রুদ্ধ দেবীদের ষড়যন্ত্রে চাঁদ ও ধনপতি দুজনে দু-ভাবে বিপদগ্রস্ত হন। অথচ এই সাদৃশ্যটুকুর বাইরে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওই দুই নায়ক চরিত্র স্বভাবে কত না স্বতন্ত্র। ধনপতির চরিত্রটি চাঁদের মতো কর্তব্য-দৃঢ় তো নয়ই, বরং কামাসক্তিতে দুর্বল। তাঁর চরিত্র-দৌর্বল্যের রন্ধ্রপথেই সংসারে প্রবেশ করে অশান্তি, সংকট। ধনপতির প্রথম পত্নী লহনা অন্তরের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। লহনার রোষ গিয়ে পড়ে স্বভাব-দুর্বলা খুল্লনার উপর। ধনপতি গৌড়ে গেলে খুল্লনার উপর লহনার নির্যাতন ও লাঞ্ছনা চরমে ওঠে। ধনপতি ফিরে আসার পর খুল্লনা সব বলে দিলে বণিক লহনার উপর রুষ্ট হন। এই অপমানের প্রতিশোধ খুঁজতে থাকে লহনা। অচিরে মিলেও যায় সেই সুযোগ। ধনপতির দক্ষিণ পাটনে যাত্রাকালে স্বামীর সৌভাগ্য কামনায় খুল্লনা চণ্ডী-ঘট পূজতে বসলে লহনা সেকথা জানাতে ভোলে না বণিককে। শিবভক্ত ধনপতি তখন ঘরে এসে ঘটে লাথি মেরে বাণিজ্য-তরী নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেন। ফল যা ঘটবার ঘটে। অপমানিতা দেবী 'কমলে-কামিনী' নামের এক মায়াদৃশ্য সৃষ্টি করে ধনপতিকে সিংহলরাজের কারাগারে বন্দী করেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ কাহিনীতে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে—ধনপতি-লহনা-খুল্লনার পারিবারিক গল্প অনেক দূর এগোবার পর। এই অংশে কাহিনী যেন অনেকটা সামাজিক উপন্যাসের গড়ন পায়। মান-অভিমান-ঈর্ষা-প্রতিহিংসা-ষড়যন্ত্র-কুটিলতা-কাম-প্রেম ইত্যাদি মানবীয় ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে কোথাও দেবতা প্রবল বা প্রধান হয়ে ওঠেন না। খুল্লনার সূত্রে চণ্ডী ঢুকে পড়েন এই নিটোল পারিবারিক গল্পের মাঝখানে, আর সেই দৈবী অনুষঙ্গ নির্দিষ্ট পরিণতি পায় খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্তের কার্যকলাপে। শ্রীমন্ত ধনপতির সন্তান হলেও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, ফলে সিংহলের রাজ-কারাগারে বন্দী হয়েও শেষ অব্দি চণ্ডীর কৃপায় উদ্ধার পায় ও পিতাকে উদ্ধার করে। একই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, শ্রীমন্ত তার দুই পত্নীসহ স্বর্গলোকে ফিরে গেলেও ধনপতি রয়ে যান মর্ত্যলোকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এ কাহিনীর নায়ক তাহলে কে?

মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নায়কই স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আসে, পরে দৈবী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে আবার স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু এখানে যে কাহিনী-ছক বুনে তোলা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় দুটো স্বতন্ত্র স্বাদের গল্পকে জুড়ে দিয়েছিলেন প্রথম পর্বের আখ্যানস্রষ্টারা, তাই একাধিকবার অভিশাপের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে—যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটছে এবং অন্য পাঁচালিতে এর প্রতি-তুলনা টানাও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এ-বিষয়ে ড. সুকুমার সেনের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত অখণ্ড চণ্ডীমঙ্গলের 'ভূমিকা'য় তিনি লিখছেন : 'বণিক-খণ্ডের কাহিনী দুটি পৃথক গল্পের সংযোগে গড়া বলিয়া অনুমান করি। এই অনুমানের কয়েকটি সূত্র আছে। প্রথমত, দুই পুরুষের—মাতা ও পুত্রের—অভিশাপপ্রাপ্তি এক সঙ্গে নয়, মর্ত্যে অবতার তো একসঙ্গে নয়ই। মনে হয়, রত্নমালার অভিশাপপ্রাপ্তি ও খুল্লনার দুর্গতি কালকেতুর ও শ্রীমন্তের কাহিনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়ত, কালকেতু ও শ্রীপতি দুইজনেরই জন্ম শিবের অভিশাপে, কিন্তু খুল্লনার জন্ম দেবীর অভিশাপে।...তৃতীয়ত, খুল্লনার দেবী স্থলদেবতা, আর ধনপতিকে বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীপতিকে সৌভাগ্য দিয়াছিলেন যে দেবী তিনি জলদেবতা। শ্রীপতির দেবীর সঙ্গে কালকেতুর দেবীর যোগাযোগ আছে বৈপরীত্যে।' গল্পের বিপরীতধর্মী স্বভাবের কথা মাথায় রেখে বণিকখণ্ডের সমগ্র কাহিনীকে চরিত্রানুযায়ী দুটি পৃথক উপ-আখ্যানে ভাগ করা যায়। একটার কেন্দ্রে ধনপতি, অন্যটির কেন্দ্রে শ্রীমন্ত।

খুব সূক্ষ্ম বিচারে, এই দুই ভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্পও আবার দু-জাতের।

বলা বাহুল্য যে, আখ্যানভাগের প্রথমাংশে ধনপতিরই প্রাধান্য। যৌবনবতী খুল্লনাকে দেখে তাঁর প্রেমপিপাসার [না, কামবাসনা?] জাগরণ থেকে শুরু করে সিংহলরাজের কারাগারে বন্দী হওয়া পর্যন্ত ঘটনা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলেছে। মাঝে শুধু একবার খুল্লনার গর্ভসঞ্চারের ঘটনায় কাহিনীকে হঠাৎই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মর্ত্য থেকে স্বর্গলোকে। এই সময়টাই মালাধরের স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার সময়। তারপর শ্রীমন্তের জন্ম থেকে শুরু হল গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়। গল্পটি যে ধনপতির গল্পের অবিকল পুনরাবৃত্তি নয়, সেটা উপসংহার দেখলেই বোঝা যায়। কবিদের বর্ণনার গুণে [!] কোথাও কোথাও দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রায় ক্লান্তি আসে বটে, কিন্তু বর্ণনার এই ঐক্যটুকুর অন্যবিধ প্রয়োজন ছিল। গল্পের আদিস্রষ্টারা হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন যে, একই রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেও শৈব পিতা ও শাক্ত পুত্রের জীবনে বিপরীত ফলই ফলেছে। এতে স্পষ্টমাত্রায় ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে দেবীর মহিমা। অনুগতকে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করেন, আর চূর্ণ করেন বিরোধীশক্তির দম্ভ। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীও তার ব্যত্যয় নয়। তবুও এই দুটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্পে দু-ধরনের বিন্যাস কৌশল লক্ষ করা গেছে। আগেই বলেছি, উপাখ্যানের প্রথমাংশটি যেন চরিত্রকেন্দ্রিক উপন্যাসের গড়নে নির্মিত। অন্যদিকে, শ্রীমন্তের জন্মের পর গল্পটা এগিয়েছে কাহিনীভিত্তিক কৌতূহল নিয়ে। এখানে আর 'কেন'-র প্রশ্ন নেই, ঘটনার ফলাফল নিয়ে পাঠকও একপ্রকার নিশ্চিন্ত; কেননা ঘটনাগুলোর চালিকাশক্তি হিসাবে এখানে কাজ করছে দেবীর অনুগ্রহ। শ্রীমন্ত-কেন্দ্রিক গল্পে এখন কেবল পাঠকের প্রতীক্ষা থাকে পিতা-পুত্রের মিলনের। দেবীর ভূমিকা এ অংশে বরাভয়দাত্রীর। মশানে নিজের পক্ষপুটে রক্ষা করেন দুধের বালক শ্রীমন্তকে। গল্পের এই অংশে যেন জাদুদণ্ড বুলিয়ে ভেলকি দেখানো হয়েছে—যেমনটা হয়ে থাকে রূপকথায়। সেখানেও রাজপুত্র অচিনদেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফেরে স্বদেশে, মিলনের আনন্দময় সুর বাজতে থাকে কাহিনীর শরীর জুড়ে। এখানেও ঠিক তাই। ধনপতি ও শ্রীমন্তের দুই ভিন্ন চরিত্রের উপ-আখ্যানকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একটিমাত্র সুতোয়। সেটি হল—দেবী মঙ্গলচণ্ডীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন ও সেই সূত্রে তাঁর পূজা প্রচার। সেজন্য দেখা যায়, শ্রীমন্ত ও খুল্লনা কর্তৃক দেবী স্তুত ও পূজিত হবার পরেও বণিকখণ্ডের গল্প ততক্ষণ ধরে চলতে থাকে যতক্ষণ না বিদ্রোহী সদাগর চণ্ডীর দেবীত্ব মেনে নিচ্ছেন। এতে বোঝা যায়, শ্রীমন্ত কিংবা খুল্লনা অংশ বিশেষের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও সমগ্র কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে তার সহায়ক চরিত্র। আধুনিক কথাসাহিত্যের বিদেশি পরিভাষায়, খুল্লনা আর শ্রীমন্ত বণিকখণ্ডের গল্পে 'পেশেন্ট'-র ভূমিকা পালন করে, আর 'এজেন্ট' বা 'কার্নেল' হয়ে ওঠেন ধনপতি সদাগর। এজন্যই পুরো পালাটি চিহ্নিত হয় তাঁর নামে।

ধর্মমঙ্গলের আখ্যান-গ্রন্থনের কৌশল আবার ভিন্ন ধরনের। ধর্মঠাকুর লৌকিক সংস্কৃতিতে কেবল কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের দেবতা নন, তিনি সন্তানলাভের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে থাকেন বলে বিশ্বাস। ধর্মমঙ্গলের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুটো আখ্যানেই তাঁর এই বিশেষ কৃপার কথা জানতে পারা যায়। লাউসেনের উপাখ্যানে রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিবাহ ও প্রথম দিকে রঞ্জাবতীর সন্তানহীনতা ধর্মদেবতার ওই বিশেষ ভূমিকা প্রদর্শনের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে। বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ-হেতু রঞ্জার ভাই মহামদ অসন্তুষ্ট হয়। পরে ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জা লাউসেনের জন্ম দিলে মহামদ ঈর্ষাবশত ভাগিনেয়ের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে ও নানাভাবে লাউসেনকে অপদস্থ ও বিপন্ন করার কৌশল আঁটতে থাকে। সেই ষড়যন্ত্র-কৌশলের অঙ্গ হিসেবে আমরা ওই আখ্যানে অনেক ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হতে দেখেছি। নায়ক লাউসেনকে বারবার তাঁর বীরত্বের, সাহসিকতার, ধৈর্যের, চরিত্রের, আধ্যাত্মিক বলের পরীক্ষা

দিতে হয়েছে। তিনি দেবতার অনুগৃহীত বলে শৈশব অবস্থাতেও চোরে তাঁকে চুরি করতে পারে না, নানা দুর্গম স্থানে তাঁর নিঃশঙ্ক যাতায়াত, অজেয় রাজারা তাঁর বীরত্বে গৌড়ের পদানত, গণিকা সুরীক্ষার দুরুহ ধাঁধার উত্তর দিয়ে বন্ধনমুক্ত, এমনকি সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা সূর্যের পশ্চিমোদয়ে বিস্ময়করভাবে সফল। এ গল্প আসলে দেবানুগৃহীত ব্যক্তির সাফল্যের খতিয়ানকেই পর্যায়ক্রমে তুলে ধরে। চরিত্রমুখ্য এই আখ্যানে ঘটনার সংখ্যাধিক্য থাকলেও তাদের নিজস্ব গুরুত্ব কম। এখানে একটা ঘটনা আর একটা ঘটনাকে অনিবার্যভাবে আমন্ত্রণ জানায় না। বরং এখানকার কাহিনী-সজ্জাকে তুলনা করা যায় মাল্য-গ্রন্থনের কৌশলের সঙ্গে। এক অভিন্ন সুতোয় গাঁথা হয় একের পর এক ফুল। ওই সুতোটাই ফুলগুলোর একমাত্র যোগসূত্র। এখানেও ঠিক তাই। লাউসেনের চরিত্র-মহিমা প্রদর্শনের জন্য সুপ্রচুর ঘটনার আয়োজন, যে-লাউসেনের পিছনকার শক্তি হলেন লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুর। অর্থাৎ লাউসেন ধর্মদেবতার কৃপাপুষ্ট বলে তাঁর পক্ষেই এমন সব অসম্ভব ঘটনা বাস্তবে ঘটানো সম্ভব—এমন একটা দৈবীবিশ্বাসের ধারণা গল্পগুলোর সূত্রে গড়ে তোলাই এ কাহিনীর আদি পরিকল্পকদের লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়।

এতো গেল এদেশীয় গঠনতত্ত্বের নিরিখে বিচার। এবার প্রবেশ করা যাক পশ্চিমী ভাবনার জগতে। ওদেশে সংগঠনতত্ত্ব আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট বিচার-পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা থেকে সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ক্রম-প্রসারণ এর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তারই প্রমাণ। সাহিত্যবিচারের এই প্রেক্ষাপটটি অবশ্য গড়ে ওঠে লোককথা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের অসংখ্য লোককথার শ্রেণীবিন্যাসের ভার পড়ে গবেষক অ্যান্টি আর্নের উপর। তিনি ইওরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অন্যান্য অঞ্চলের লোককথার সংগ্রহগুলি দেখে ১৯১০ সালে প্রকাশ করলেন 'ভার্জিক্‌নিস্ ভার মারচেনটাইপেন' নামক একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই পাওয়া গেল লোককথা বিশ্লেষণের একটি জরুরি মানদণ্ড—'টাইপ'। এই শব্দটির দ্বারা আর্নে বুঝিয়েছিলেন লোককথার বিষয়গত এক-একটি ধরনকে। তাঁর ভাষায়—'A Type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the act that it may appear alone attests its independence.' আর্নের মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে টাইপ সূচির কাজটিকে সম্পূর্ণতা দিলেন আর-এক গবেষক স্টিথ টমসন। তিনি জীবজন্তুর গল্প, রূপকথা, ঐন্দ্রজালিক কাহিনী, ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনী, রোমাঞ্চকর গল্প, হাসিঠাট্টার কাহিনী, মিথ্যাবাদীর কাহিনী, সূত্রধর্মী আখ্যান, অনির্ধারিত শ্রেণীর গল্প ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ২৪৯৯টি টাইপের উল্লেখ করেছিলেন।

আর্নের এই টাইপ-সূচির কাজ সম্পূর্ণ করতে করতে টমসন প্রত্যক্ষ করলেন প্রত্যেকটি টাইপের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু উপাদানকে, যারা সমন্বিত হয়ে এক-একটি কাহিনী গড়ে তোলে। তিনি এদের নাম দিলেন 'মোটিফ'। সংজ্ঞায় বললেন, 'A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition.' বস্তুত মোটিফতত্ত্বের উদ্ভব হল কোন লোককাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র ও ঘটনাগত সাদৃশ্য ও সমধর্মিতার বোধ থেকে। আসলে লোককথার বিশ্বজনীন চরিত্রকে সনাক্ত করা যায় এই মোটিফ বিশ্লেষণের পদ্ধতির সাহায্যে। স্টিথ টমসন তাঁর ৬ খণ্ডের সুবিশাল নির্দেশ-সূচিতে মোটিফের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন ২৫ হাজারেরও বেশি। তাছাড়া অতিরিক্ত সংযোজনেরও পথ খোলা রেখেছেন। আজ সমগ্র বিশ্বে লোককথা বিশ্লেষণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পৃথিবীর সব লোককথার শ্রেণীবিভাজন ও লোকসমাজের মনের গভীরে বাসা বেঁধে থাকা নানা অভিপ্রায় সম্পর্কে জানা সম্ভব

হয়েছে।

অনেকের কাছে এ-আলোচনা মনে হতে পারে 'ধান ভানতে শিবের গীত'। কিন্তু একটু তলিয়ে বুঝলে ব্যাপারটা তা দাঁড়ায় না। পৃথিবীব্যাপী লোককথায় পণ্ডিতেরা যেমন দেখেছেন বিষয় [টাইপ] ও কাহিনী-মূলের [মোটিফ] ঐক্য, তেমনি বাংলা ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের চাল-চলনগত সাদৃশ্য। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য দুই-ই গল্পাশ্রয়ী, চরিত্র নির্ভর। নানা ব্রতের নানা গল্প, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন আখ্যান। কিন্তু এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও দেখা যাবে, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনীসমূহের বাহ্যরূপ [super-structure)] পাল্টে গেলেও ভিতরে ভিতরে অভিন্ন রয়ে গেছে তাদের অন্তর্কাঠামো [base-structure] । উল্লেখ্য যে, লোককথা ও ব্রতকথা—দুইয়েরই উৎপত্তিস্থল মোটামুটি এক। সেটি হল সংহত লোকসমাজ। বাংলা ব্রতকথাগুলো কবে কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। লোককথা যেমন লোকায়ত সমাজের অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে এককালে আবির্ভূত হয়েছিল,. তেমনি মঙ্গলকাব্যের পূর্বরূপ ব্রতকথাও লোকসমাজের ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ব্রতকথা লোকসমাজেরই নিজস্ব সম্পদ। ইষ্টদেবতা বা গ্রাম্যদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনই ব্রতকথার লক্ষ্য। ব্রতকথা শ্রবণের ফলে কখনো স্বর্গ কিংবা মোক্ষলাভের প্রত্যাশা থাকে না, তার পরিবর্তে থাকে বাস্তব জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি-মঙ্গলের কামনা। এর কাহিনীতে সেইসব চরিত্রই কেবল উপস্থিত থাকে যারা নিতান্ত আবশ্যকীয়। এর ঘটনা ও চরিত্র-পরিকল্পনা হয়ে থাকে বৈচিত্র্যহীন। ব্রতকথার গল্পকে চালিত করে এই ধর্মনীতি : দেবতার সন্তুষ্টিবিধানে ঐহিক সুখলাভ সম্ভব, অন্যথায় দেবতার অসন্তোষে ঘটবে সমূহ সর্বনাশ। এই চরিত্র কি মঙ্গলকাব্যের সব গল্পেই কম-বেশি আমরা পাই নি? আসলে সংস্কৃত পুরাণাদির প্রভাবে লোকসমাজের ব্রতকথা 'প্রমোশন' পেয়ে পরিণত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। এখন কেউ যদি মঙ্গলকাব্যের গঠনগত আলোচনায় পশ্চিমী সংগঠনতত্ত্বের প্রয়োগসূত্রে লোককথা বিশ্লেষণের জনপ্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, তাকে বিনা বিচারে অবান্তর বলে ছাঁটাই করে দেওয়া যাবে না। কেননা বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু সাধারণ ব্যাপার আছে, যা তার সর্বজনীনত্বের প্রমাণ। এটা একই সঙ্গে লোককথারও লক্ষণ। একাধিক ব্রতকথার গল্পের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের তুলনা করলেই এ-কথার সত্যতা টের পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে গবেষক দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য একটি চমৎকার প্রবন্ধে ['প্রসঙ্গ ঃ মঙ্গলকাব্য', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮৮-৮৯, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়] বাংলায় লেখা সত্যনারায়ণ পাঁচালির অন্তর্গত একটি কাহিনী ও সংস্কৃতে লেখা মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের একটি আখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, দুটি গল্পেই অভাববোধ বা আকাঙ্ক্ষা, অভাব পূরণের কৌশল তথা আকাঙ্ক্ষামোচনের উপায় জানা এবং সবশেষে অভাবমোচন বা আকাঙ্ক্ষাপূরণ একই ক্রমপরম্পরা অনুসরণ করে এসেছে—যদিও সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে ও মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায় উপাদান-মূলের [Mytheme] উপস্থিতি যথাক্রমে ছয়টি ও দুইটি। উক্ত গবেষক এখানে যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তা রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ের ভাবনা। তার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে সংক্ষেপে আদ্যন্ত পশ্চিমী অবয়ববাদ [Structuralism] সম্বন্ধে আলোচনা করে নেওয়া জরুরি। পরবর্তী ধাপে বাংলা মঙ্গলকাব্যে সেইসব রীতির যৎসামান্য প্রয়োগ দেখানোই আমাদের লক্ষ্য।

ভাষাবিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবয়ববাদী সমালোচনাতত্ত্বের [Structural Criticism] জন্ম হয় বিশ শতকের মাঝামাঝি। এর জন্মমূলে কাজ করেছিল প্রকরণবাদী ভাবনা [Formal Criticism], যার সূচনা ১৯১৪-১৫ সালে, রাশিয়ায়। অবয়ববাদের প্রাথমিক ভিত গড়েন বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর। পরে এই সমালোচনাতত্ত্বের জগতে পা রাখেন রোঁলা বার্ত, ভ্লাদিমির

প্রপ্, টি. তোদোরভ, জি. জেনেট, ক্লদ লেভি-স্ট্রাউস প্রমুখ বিদ্বজ্জন। অবয়ববাদের প্রধান লক্ষ্য হল, কোনো রচনার গুণগত মানের দিকে নজর না দিয়ে কাঠামোগত দিক দিয়ে তার সামগ্রিকতার অনুসন্ধান করা। এঁরা মনে করেন, জ্যামিতিক নক্‌শা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সৃষ্টির পিছনে যেমন কয়েকটি বিন্দু ও তাদের সংযোগ রেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি কোন উপাখ্যানেরও অবয়ব গড়ে ওঠার পিছনে নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাদানের পারস্পরিক শৃঙ্খল-বিন্যাস সক্রিয় ভূমিকা নেয়। অবয়ববাদীদের লক্ষ্য এই শৃঙ্খল-বিন্যাস তথা সংগঠনটিকে ব্যাখ্যা করা। কোন আখ্যানের ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি আসলে প্লটের বিন্যাস, যা মূলত কতকগুলি সক্রিয় এককের ওপর নির্ভরশীল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবয়ববাদী সমালোচনা তত্ত্বের প্রথম সার্থক প্রয়োগ ঘটান রুশ তাত্ত্বিক ভলাদিমির প্রপ্। সেজন্য তাঁকে আখ্যানতত্ত্বের [Narratology] পুরোধাপুরুষ বলে গণ্য করা হয়। এ বিষয়ে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'মরফোলজিয়া স্কাজকি' [ইংরেজি অনুবাদ 'The Morphology of the Folktale'] বইটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এ বইটিতে তিনি প্রায় একশোটির কাছাকাছি রুশ রূপকথা বেছে নিয়ে তাদের আখ্যানের গঠন-কৌশল বিশ্লেষণ করেছেন। করতে গিয়ে দেখেছেন, গল্পগুলোর কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের কথন-পদ্ধতিতে ঘটনা পুনরাবৃত্তির একটা সাধারণ ছক ফুটে উঠছে। বিষয়ের ভিন্নতা তথা রূপান্তরশীলতার শক্তিকে তিনি বলেছেন 'Variables', আর ছকের অপরিবর্তনীয় শক্তিকে বলেছেন 'Constants'। পুনরাবৃত্ত ঘটনাগুলিই অপরিবর্তনীয়। তাঁর ভাষায় এগুলি 'functions' বা ক্রিয়াশীলতা। কোন আখ্যান আসলে এই ক্রিয়াশীলতাগুলিরই গ্রন্থন। এ রকম ৩১টি মুখ্য ক্রিয়াশীলতার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি, যাদের উপস্থিতি পৃথিবীর সব দেশের সব রূপকথার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। এইসঙ্গে তিনি আরোও প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ভাষার অন্বয়ের ক্ষেত্রে যেমন কর্তা কর্ম ক্রিয়া ইত্যাদি পদ নির্দিষ্ট ক্রম রক্ষা করে আসে, তেমনি লোককথার গল্পেও কোন্ মোটিফের পর কোন্ মোটিফ্ আসবে তাও একটি বিশেষ রীতি মেনে অনুসৃত হয়। অন্বয় [Syntax] পদ্ধতির রীতি অনুসারী বলে প্রপের এই আখ্যানবিচার পদ্ধতিকে 'Syntagmatic model' বলে অভিহিত করা হয়।

লোককথার রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বিশ্লেষণে আর একজন বিশিষ্ট গবেষক হলেন ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ট্রাউস। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'Structural Anthropology'-র প্রথম খণ্ড। সেখানে তিনি মোটিফ ইন্‌ডেক্সের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নতুন একটি ধারণা দিতে সমর্থ হলেন। তা হল 'Binary Opposition' বা 'বিপরীতমুখী দুটি শক্তি'র অস্তিত্বের ধারণা। তাঁর অভিমত, প্রতিটি মিথের মধ্যে থাকে সূক্ষ্মতম একাধিক অংশ। এগুলির তিনি নাম দিয়েছেন 'মিথেম' [Mytheme]। কাহিনী বিশ্লেষণের সময় মিথেমগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে একটি অর্থবোধক পন্থায় সাজাতে হবে এবং বিপরীতধর্মী বক্তব্য ও শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর দেখা যাবে যে, যুগ্ম বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় ও মধ্যস্থকারী শক্তির সাহায্যে ঘটনাগুলো সুন্দর একটি পরিসমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে। যুগ্ম বৈপরীত্য ছাড়া পুরাকাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করা যাবে না বলে তাঁর ধারণা। ইনি ক্রিয়াশীলতার রৈখিক সজ্জার ব্যাপারটি অস্বীকার করে আনলেন আখ্যান-বিন্যাসের উলম্ব সজ্জার ধরণ। তাই তাঁর পদ্ধতিটি 'Paradigmatic model' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির আর একজন সার্থক ভাবুক অ্যালান ডানডেস্। ইনি তাঁর আলোচনার সূচনাতেই মোটিফ ইনডেক্সের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। স্ট্রাউসের 'মিথেম' শব্দের সাদৃশ্যে 'মোটিফেম' শব্দটি উদ্ভাবন করে তিনি লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সবচেয়ে সুপ্রযুক্ত সূত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি সব লোককথাতেই খুঁজে পেয়েছেন দুটি মূল মোটিফেমের

সন্ধান : ১. অভাববোধ [Lack] ও ২. অভাব দূরীকরণের আর্তি ও প্রয়াস [Liquidation of Lack]।

ডানডেসের 'Motifem theory'-কে সুবিন্যস্ত চেহারায় পাওয়া গেল ফরাসী সংগঠন-তাত্ত্বিক রোঁলা বার্তের 'Structural Analysis' পদ্ধতিতে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'Introduction to the Structural Analysis of Narratives' প্রবন্ধে যে-কথা বলেছিলেন তার সারাংশ হল এই যে, কোন আখ্যানের সাংগঠনিক এককগুলি বাক্যিক এককগুলির মতোই ক্রমবিন্যস্ত (hierarchical) হয়ে থাকে। তাঁর মতে, কোন আখ্যান গঠনে দেখা যায় তিনটি প্রধান পর্যায় : ১. ভূমিকা [role], ২. ক্রিয়াশীলতা [actions] ও ৩. বর্ণন [narration]। প্রতিটি লোককথায় থাকে কিছু ক্রম ও প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াগুলির পরস্পর সংহতি ও ন্যায়সিদ্ধ অনুক্রমে সাজানোই হল প্রাথমিক ক্রম, যার তিনটি ধাপ আছে : ক. আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ খ. চরিতার্থ করার উপায় নির্ধারণ ও গ. সাফল্য বা বিফলতা। এদের প্রত্যেকটিরই বৈকল্পিক রূপ কল্পনা করেছেন তিনি। যেমন : [ক১.] আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ, [খ১.] বাধার উৎপত্তি ও [গ১.] বিফলতা বা সাফল্য। মাঝে যদি বাধার উৎপত্তি ঘটে তাহলে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এগুলি ছাড়া বার্ত দু'ধরনের এককের কল্পনা করেছেন—সংযোজন একক [Integrative unit] ও বিভাজন একক [Distributional unit]। বিভাজক এককটি আবার দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়—সূচক প্রক্রিয়া [Pivot function] এবং বিস্তারক প্রক্রিয়া [Catalyst function]। সূচকটিতে সেইসব প্রক্রিয়াগুলির কথা বলা হচ্ছে যারা ন্যায়সিদ্ধ অনুক্রমে [Logical sequence] সম্পর্কিত। আর বিস্তারক প্রক্রিয়াটি থাকে সূচক ক্রিয়ার চারপাশে। এটি কাহিনীর বিস্তার ঘটানোর পাশাপাশি তার প্রবহমানতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্বোক্ত সংযোজক এককও দুটি অংশে বিভক্ত—লক্ষণাত্মক বিবৃতি [Indicator] ও অভিধাত্মক বিবৃতি [Informant]। এদের মধ্যে প্রথমটির কাজ অন্তর্নিহিত অর্থ তাৎপর্য নির্দেশ করা, আর দ্বিতীয়টির কাজ প্রত্যক্ষভাবে কিছু সংবাদ সরবরাহ করা।

বাংলা ব্রতকথায় নানা ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। স্থূল বর্গের বিচারে এগুলিতে রয়েছে রাজাদের কাহিনী, গৃহস্থের কাহিনী, বণিকসমাজের কাহিনী ও নিম্নবর্গের মানুষের গল্প। বাংলা মঙ্গলকাব্যেও তার অনুসরণ আছে। বর্ণে-বিন্যস্ত হিন্দু সমাজের চারটি স্তরেরই অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই। সরাসরি ব্রাহ্মণ সমাজের গল্প হয়তো মঙ্গলকাহিনীতে অনুসরণ করা হয়নি, কিন্তু বিবাহ, শিক্ষা কিংবা অন্য প্রসঙ্গ ধরে এই সামাজিক বর্গটি আখ্যানে উপস্থিত থেকেছে। কবিকঙ্কণের কালকেতু পালায় গুজরাট নগরীতে কোন্ কোন্ পদবীধারী ব্রাহ্মণরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন তার সুবিশাল তালিকা পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, বাংলা ব্রতকথার প্রায় অর্ধেক কাহিনী ব্রাহ্মণসমাজকে ঘিরেই। সেকালে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিভূ ছিলেন রাজা ও সামন্তপ্রভুরা। প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে কোন-না-কোন রাজার প্রসঙ্গ রয়েছে। ধর্মমঙ্গলের দুটো আখ্যানই রাজন্যকেন্দ্রিক। হরিশচন্দ্র হস্তিনাপুরের রাজা। লাউসেনের উপাখ্যানে একাধিক সামন্ত অধিপতি ও রাজার প্রসঙ্গ আছে। গৌড়রাজ্য, ঢেকুরগড়, ময়নাগড়, কামতানগর পুরনো দিনের রাজকীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হিসেবে বর্তমানে সনাক্ত করা গিয়েছে। রামনবমী ও মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতোপাখ্যান রাজাদের কাহিনীর ওপর গড়ে উঠেছে। ক্ষত্রিয়ের পরে বর্ণের বিচারে বণিকের স্থান। বিত্ত-বাহুল্যের কারণে এককালে সমাজে তাঁরা অভিজাত বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই সামাজিক মর্যাদাকে উঁচুতে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে বোধহয় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন অনভিজাত লৌকিক দুই দেবী—মনসা ও চণ্ডী। শিব-উপাসকদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে সবশেষে পুজো আদায় করার কৌশল বর্ণিত হয়েছে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে। ব্রতকথায় যে ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান পাওয়া যায় সেটা অবশ্য সত্যনারায়ণ ব্রতের। শনিব্রতের কাহিনী গড়ে উঠেছে জনৈক

শঙ্খপতি সওদাগরকে নিয়ে। মঙ্গলকাব্যে শূদ্র-সমাজের উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনীর চালচিত্রে। মধ্যযুগের শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে এরা চিহ্নিত। তবে চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডটি গড়ে উঠেছে এই সমাজের প্রতিনিধি কালকেতু ব্যাধকে নিয়ে। ব্যাধেরা সমাজে অন্ত্যজ বলেই পরিচিত। শিবমঙ্গলের একটি আখ্যান, যা 'মৃগলুব্ধ' নামে আখ্যায়িত, তারও গল্প দাঁড়িয়ে আছে আর-এক ব্যাধের উপর। এটাই মেয়েলি সমাজের ব্রতকথায় শিবরাত্রি ব্রতোপাখ্যান বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

গল্পের শ্রেণীমূল [টাইপ] বিচারে মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলির যে স্থূল ধরণ আমরা ওপরে লক্ষ্য করলাম, তাদের মধে বিষয়বস্তু-গত ভিন্নতা থাকলেও সাংগঠনিক কারিগরিতে তারা মোটামুটি একই। অ্যালান ডানডেস যেভাবে লোককথার বিন্যাসকে দেখেছেন, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী সংস্থাপনে তার ছায়া লক্ষ করা যায়। প্রতিটি আখ্যানের সূচনায় তৈরি হচ্ছে দেব বা দেবীর দিক থেকে একটা অভাববোধ, সবশেষে সেই অভাববোধের নিরসন। অভাবটা এখানে মূলত দৈবীমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার। দেবতারা তাঁদের পূজা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা করছেন। আর সেই আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি ঘটছে কখনো অনুগ্রহের সরল পথে, কখনো বিরোধিতার বাঁকা জটিল পথে। পথ যাই হোক না কেন গন্তব্য কিন্তু একটাই এবং শেষমেশ সেখানেই পৌঁছুচ্ছে গল্পগুলো। ব্রতকথাতেও এর ব্যত্যয় নেই। প্রপের তত্ত্ব অনুযায়ী এদের বাহ্যরূপটি আসলে 'Variables', আর অন্তর্কাঠামোটি 'Constant'। প্রপ্ লোককথার পাত্রপাত্রীদের যে একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতার কথা বলেন তার কিছু কিছু হাজির রয়েছে তিনটি মঙ্গলকাবের আখ্যানেই। প্রপের মতে, লোককথার প্রতিটি গল্পে থাকে একটি প্রাথমিক সূচনাংশ, যেখানে উপস্থাপিত হয় নায়কের পরিচয়, সমাজে তার স্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি। মনসা-চণ্ডী-ধর্ম—এই তিন মঙ্গলকাব্যের নায়ক হিসেবে যাঁরা উঠে এসেছেন, নরখণ্ডের সূচনাংশে তাঁদের পরিচয় বিবৃত হতে দেখা গেছে। এরপর প্রপ্ কাহিনীর ধাপগুলি অনুধাবন করে ক্রিয়াশীলতাগুলিকে পরপর সাজিয়েছেন, যেখানে বারবার এসেছে নায়ক ও খল-নায়কের কথা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এরা পরস্পর-বিরুদ্ধ চরিত্র। ক্লদ লেভি-স্ট্রাউস পরিকল্পিত বাইনারি অপোজিশনের তত্ত্বকে এখানে স্পর্শ করা যায়। ভালোর বিপরীতে মন্দ, সত্যের বিপরীতে মিথ্যা, মঙ্গলের বিপরীতে অমঙ্গল, ঘৃণার বিপরীতে ভালোবাসার শরীরী কিংবা অমূর্ত চেহারা গল্পগুলোতে বর্তমান থাকে। মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ। তিনি মনসার আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করে বিরোধিতা করেন। খল নায়িকা হিসেবে মনসাও চাঁদের সর্বনাশ করতে কু-মতলব আঁটতে থাকেন। চাঁদকে দুর্বল করার অভিপ্রায়ে ছলনার সাহায্যে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করেন। কৌশলে গোয়ালিনী বেশে বিষ দধি ভক্ষণ করিয়ে চাঁদের ছয় পুত্রকে বিনষ্ট করেন। মনসার রোষবহ্নি থেকে রেহাই পায় না চাঁদের বন্ধু বিষ-বৈদ্যক শঙ্কর গারুড়িও। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে মিলে যায় প্রপ্-বর্ণিত নিম্নলিখিত ক্রিয়াশীলতাগুলি ঃ

২.সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। নায়কের ক্ষতির কথা আগেভাগে জানানো হয়।

৩. নায়ক সেই সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে।

৪. খলনায়ক নায়কের বিরুদ্ধে কাজ করে।

৫. নায়কের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য খলনায়ক নায়ক সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে।

৬. খলনায়ক প্রতারণার আশ্রয় নিতে নানা ধরনের ফাঁদ পাতে।

৭. নায়ক নিয়তির বিধানে খল-নায়কের ছলনার শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হয়।

৮. খলনায়ক ক্ষতিসাধন করে।

এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে মিলবে। এরই সঙ্গে উল্লেখ্য লেভি- স্ট্রাউসের প্যারাডাইমেটিক মডেলটিও। আগেই বলেছি, এই মডেলে রয়েছে দুই বিপরীতধর্মী শক্তির জোরালো

অস্তিত্ব। এই শক্তি দুটির প্রভাবে নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মনসামঙ্গলের চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব তো সর্বজনবিদিত। এছাড়াও রয়েছে গোয়ালারা ও মুসলমানেরা। মনসার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা নিজেদের ঢঙে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু- আখ্যানও একেবারে দ্বন্দ্বহীন নয়। দ্বান্দ্বিক সেই পটভূমিতে নায়ক আর খলনায়ক কালকেতু ও ভাঁড়ু দত্ত। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যাধরাজা অভিজাত কায়স্থ ভাঁড়ুকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলে ভাঁড়ু ক্ষুব্ধ হয় ও কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে কালকেতুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানায়। এই দ্বন্দ্বই দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ বাধায়। এর পরিণাম, কালকেতুর বন্দিত্ব। উপরোক্ত পুরো ঘটনাই বিপরীতমুখী দুই শক্তির দ্বৈরথের ফল। লেভি-স্ট্রাউসের মতে, যুগ্ম বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় ঘটনাগুলি আবর্তিত হবার সময় ধীরে ধীরে সেখানে ঘটবে 'মিডিয়েটর' বা মধ্যস্থতাকারী শক্তির আবির্ভাব। আখেটিক খণ্ডতেও দেখা যায়, কালকেতু বন্দী হবার পরে দেবী চণ্ডী নিজেই সক্রিয় হচ্ছেন এবং কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে দুইয়ের মধ্যে বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করছেন। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডেও এই ছকটি লক্ষিতব্য। সেখানে ধনপতি ও চণ্ডীর মধ্যে বিরোধ বাধে। সেই বিরোধ দূর করছে তৃতীয় পক্ষ তথা মধ্যস্থশক্তি শ্রীমন্ত। বিরোধটিকে ধনপতি ও শালিবাহনের মধ্যে কল্পনা করে নিলেও তৃতীয় পক্ষটির পরিবর্তন ঘটে না। একইভাবে, মনসা ও চাঁদের মাঝখানে বিরোধ মেটাতে কি বেহুলার আবির্ভাব ঘটে না মনসামঙ্গলের আখ্যানে?

অ্যালান ডানডেসের 'মোটিফেম' তত্ত্বটি খুব দুর্বোধ্য নয়। অভাববোধ ও অভাবপূরণ—রূপকল্পের এই সরল বিন্যাস সব মঙ্গলকাব্যের ভিতর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায়। প্রতিটি মঙ্গ লকাব্যের আদি পরিকল্পকরা এ-বিষয়ে এক অভিন্ন কাঠামো অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। প্রথমে মনসামঙ্গল কাব্যের কথাই ধরা যাক। মনসা শিবের অযোনিসম্ভূতা কন্যা। পদ্মবনে তাঁর জন্ম। সেখানেই তাঁর বাস। শিব কন্যাকে বাড়িতে আনলেও চণ্ডী মনসাকে মেনে নিতে রাজি নন। ফলে দুইয়ের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সংঘাতে মনসার একটি চোখ বিনষ্ট হয়। শিব চণ্ডীর কথামতো মেয়েকে নেতার তত্ত্বাবধানে সিজুয়া পর্বতে রেখে আসেন। পরে মুনিকুমার জরৎকারুর সঙ্গে বিবাহ দেন। মনসার স্বামী একদিন তাঁকে ত্যাগ করে চলেও যান। অষ্টনাগ সন্তান নিয়ে ফাঁপরে পড়েন মনসা। দেবকন্যা হয়েও স্বর্গলোকে তাঁর কোথাও স্বীকৃতি জোটে না। অতএব তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় অভাববোধের—আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব, পূজাপ্রাপ্তির অভাব। পরে নেতার পরামর্শে একে একে রাখাল, হাসান-হোসেন, জালু-মালু ও চন্দ্রধর বণিকের কাছে পূজা আদায় করেন। অবশ্য আদায়ের কৌশলটি সর্বত্র তাঁর সমান নয়। তাঁর দেব-স্বীকৃতির পিছনেও একটা ক্রম লক্ষ করা যাবে। নিম্নস্তরের সমাজ থেকে ক্রমশ উচ্চ অভিজাত সমাজে তাঁর উঠে আসা। অভাবপূরণের পর মনসার সমস্ত প্রয়াস স্তব্ধ হয়। চণ্ডীমঙ্গলের দুটো আখ্যানও তাই। এখানে চণ্ডীর ক্ষেত্রে অভাববোধ তৈরি হচ্ছে শিবের সঙ্গে কলহে। কবিরা কেউ কেউ শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন নাথবতীর অনাথবৎ চেহারা। মা মেনকার সঙ্গে ঝগড়া করে পার্বতী চারপুত্র কন্যা আর স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি ছাড়েন। অতঃপর শিবের ভিক্ষাই সম্বল হয়। শিব একে দরিদ্র, তায় পেটুক। কলহপ্রিয়ও। নিজের দোষ বুঝেও তর্ক করতে পিছপা নন। ঝগড়া করে নিজেই ঘর ছাড়েন, পুত্র-কন্যাদের কথা ভাবেন না। পার্বতী বিপদ গণেন। তখন সখী জয়ার পরামর্শে মর্ত্যে পূজা প্রচারের কথা ভাবেন। নরখণ্ডের কাহিনীর সূত্রপাত হয় দেবীর এই অভাববোধ থেকেই। ব্যাধখণ্ডে তিনি প্রসন্নময়ী জননীস্বরূপা। বিরোধ নয়, বরং অনুগ্রহ বিতরণের ভিতর দিয়ে কালকেতুর হৃদয় জয় করেন। অন্ত্যজের দ্বারা পূজিতা হয়ে সমাজের নিম্নস্তরে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। বণিকখণ্ডে তাঁকে এগোতে হয়েছে বিরোধের মধ্য দিয়ে। তবে বরপুত্র

শ্রীমন্তের মধ্যবর্তিতায় বিরোধী শক্তি ধনপতির বিরাগ দূরীভূত হলে উচ্চ সমাজে তাঁর পূজা প্রচলিত হয়। দুটি ক্ষেত্রেই আখ্যানের ছেদ পড়ে দেবীর অভীষ্টপূরণে।

এবার আসি সংগঠনতত্ত্বের অন্যতম ভাবুক রোঁলা বার্তের গঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রটিতে। তিনি ঘটনার ক্রম ও প্রক্রিয়া ধরে প্রতিটি লোককথার গল্পকে যেভাবে ভেঙেছেন তা অ-দৃষ্টপূর্ব। এটাই সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি বলে ধারণা করি। তাঁর উপাদান বিন্যাসের ছক থেকে যে-কটি বিষয় স্পষ্টমাত্রায় ধরতে পারা যায় সেগুলি হল : ক. ন্যায়সিদ্ধ অনুক্রমে বিন্যস্ত উপাদানগুলি আসলে এক-একটি ক্ষুদ্রতর কাহিনী-একক; খ. উপাদানগুলি এমনভাবে সজ্জিত হয় যাতে দেবতার মহিমা শেষ অব্দি প্রতিষ্ঠিত হয়; গ. কাহিনীর বিস্তার ঘটাতে গিয়ে অতিরিক্ত কিছু দ্বন্দ্বমূলক উপাদান কখনো কখনো আমদানি করা হয়। দুটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের তিনটি গল্পে কীভাবে বার্ত-পরিকল্পিত বিন্যাস পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে তা নিচের ছকে দেখা যাক :

মনসামঙ্গল			
আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ	চরিতার্থ করার উপায়	দ্বন্দ্ব	সাফল্য বা বিফলতা
১. মর্ত্যে মাহাত্ম্য ও পুজোর প্রচার চান মনসা।	১. রাখালদের কাছে গিয়ে দুধ চাইলেন। কিন্তু পেলেন না।	১. দুধ না পেয়ে ক্ষিপ্ত মনসা রাখালদের গরুগুলো বিনষ্ট করলেন। ২. হোসেন প্রমুখ তুরুকেরা রাখালদের পুজোয় বাধা দিল।	১. মনসার রোষ দূর করতে রাখালরা পুজো দিল। ২. সাপের কামড়ে হোসেনের পুরীর সবাই প্রাণ হারাল।
	৩. প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাতর হাসানকে মনসা তাঁর পুজো দিতে বললেন।		৩. দেবীর কথামতো হাসান পুজা দিলে মৃত ব্যক্তিরা বেঁচে উঠল।
	৪. মাছ ধরতে গিয়ে জালু-মালু মনসার ঘট পেল। দেবী তাদের ঘট পুজো করতে বললেন।		৪. মনসার অনুগ্রহে জালু-মালুর দারিদ্র্য ঘুচে গেল।

আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ	চরিতার্থ করার উপায়	দ্বন্দ্ব	সাফল্য বা বিফলতা
	৫. জালু-মালুর দেখাদেখি সনকা ও তার ছয় পুত্রবধূ মনসার পুজো করল।	৫. তা দেখে শৈব চাঁদ হেতালের লাঠি দিয়ে দেবীঘট ভাঙলেন।	৫. মনসা ক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদের গুয়াবন ধ্বংস করলেন।
		৬. মহাজ্ঞানের সাহায্যে চাঁদ গুয়াবন পুনর্জীবিত করলেন।	৬. মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলেন। আবার গুয়াবন বিনষ্ট হল।
		৭. বন্ধু শঙ্কর গারুড়ীর সাহায্যে চাঁদ আবার বাঁচালেন গুয়াবনকে।	৭. মনসার চক্রান্তে শঙ্কর প্রাণ হারাতে বাধ্য হলেন।
৮. মনসা চাঁদের কাছে পুজো পেতে চাইলেন।		৮. চাঁদ তা দিতে অস্বীকার করলেন। অনেক কুকথা বলে অপমানও করলেন।	৮. মনসা চাঁদের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।
		৯. বিষ দধি খাইয়ে মনসা চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন।	৯. চাঁদ পুত্রহারা হলেন।
		১০. বাণিজ্যযাত্রী চাঁদের সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে দিলেন মনসা।	১০. চাঁদ সর্বস্বান্ত হলেন।
	১২. স্বামীকে বাঁচাতে বেহুলা স্বর্গলোকে এলে মনসা শর্ত দিলেন চাঁদকে দিয়ে পুজো দেওয়ালে তবেই তিনি লখিন্দরকে বাঁচিয়ে দেবেন।	১১. চাঁদের সপ্তম পুত্র লখিন্দর মনসাপ্রেরিত কালনাগিনীর বিষে মারা গেল।	১১. মনসার হাতে চাঁদের মারাত্মক পরাজয় হল।
			১২. এই শর্তে বেহুলা রাজি হলে মনসা লখিন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিলেন।
	১৩. বেহুলা চম্পকনগরে ফিরে এসে চাঁদকে শর্তের কথা জানাতে তিনি বাম হাতে পুজো দিতে সম্মত হলেন।		১৩. পুজো পেয়ে মনসার ক্রোধ দূরীভূত হলো। তিনি চাঁদের সাত পুত্র ও মধুকরসহ সাতডিঙা ধন ফেরৎ দিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল [আখেটিক খণ্ড]			
আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ	**চরিতার্থ করার উপায়**	**দ্বন্দ্ব**	**সাফল্য বা বিফলতা**
১. শিব রাগ করে সংসার ছাড়তে চণ্ডী মর্ত্যে পূজা প্রচারের কথা ভাবলেন।	১. ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশপ্ত করে কালকেতু রূপে মর্তে পাঠালেন।	১. ব্যাধ কালকেতু নির্বিচারে পশু হত্যা করতে লাগলো।	১.মনের পশুরা আত্ম-রক্ষার্থে দেবীর শরণাপন্ন হলে তিনি পশুদের অভয় দিলেন।
	২. দেবী চণ্ডী গোধিকা হয়ে ছলনা করার জন্য পথে মৃতবৎ পড়ে রইলেন।	২. অযাত্রিক পাপ মনে করে কালকেতু গোধিকাকে ঘরে নিয়ে এল।	২. দেবী কালকেতুকে বর দেবার জন্য এলেন।
	৩. চণ্ডী ষোড়শী রমণীরূপ ধারণ করলেন বিভ্রান্তি ও কৌতুক সৃষ্টির জন্য।	৩. দেবীকে চিনতে না পেরে ফুল্লরা ভুল বুঝলো। তাঁকে চলে যেতে বললো।	৩. ফুল্লরার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। দেবী কুটিরে রয়ে গেলেন।
	৪. সম্ভাব্য সপত্নীকে তাড়ানোর জন্য ফুল্লরা গিয়ে কালকেতুকে হাট থেকে ডেকে আনলো।	৪. দেবী তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। কালকেতু তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করলো।	৪. দেবী নিজমূর্তি ধরে এখানে আসার কারণ বিবৃত করলেন।
	৫. দরিদ্র কালকেতুকে অনুগ্রহ করার জন্য দেবী সাত ঘড়া মোহর ও মাণিক্যঅঙ্গুরী দিলেন।		৫. কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর পায়ে প্রণত হল।
	৬. কালকেতুকে আরো অনুগৃহীত করার জন্য বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নগর নির্মাণ করিয়ে কলিঙ্গে বন্যা ঘটিয়ে গুজরাটে প্রজাদের আনানোর ব্যবস্থা করেন দেবী।		৬. দেবীর উদ্দেশ্য সফল হল। নবাগতদের মধ্যে কপট ও কোপন স্বভাব ভাঁড়ু দত্ত গুজরাটে এল।
		৭. ভাঁড়ু হাটুরিয়াদের ওপর অত্যাচার করলে রাজা কালকেতু ক্ষিপ্ত হলেন।	৭. ভাঁড়ুকে দেশ থেকে রাজা বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন।
		৮. বহিষ্কৃত হয়ে ভাঁড়ু তার অপমানের প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করলো।	৮. ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো।
	৯. প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ভাঁড়ু কলিঙ্গ রাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলো।		৯. সংবাদের সত্যতা জানতে রাজা গুজরাটে দূত পাঠান।
		১০. দূত ফিরে এসে খবর দিলে কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজ যুদ্ধযাত্রা করেন।	১০. প্রথম পর্বের যুদ্ধে কালকেতুর জয় হল।

আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ	চরিতার্থ করার উপায়	দ্বন্দ্ব	সাফল্য বা বিফলতা
	১১. নীলাম্বরের অভি-শাপের কাল ফুরিয়ে আসছে বলে দেবী তাকে বিপদে ফেলে চৌতিশা বলিয়ে নিতে চান। তাই ধান্যঘরে লুকানো কালকেতু বন্দী হল। ১২. কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য কালকেতু চৌতিশা স্তব বললো।		১১. বিদ্রোহী কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগারে দিন কাটাতে বাধ্য হল। ১২. দেবী সন্তুষ্ট হয়ে কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে কালকেতুকে মুক্ত করলেন। দেবীর পূজা প্রচারিত হল।

চণ্ডীমঙ্গল [বণিক খণ্ড]			
আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ	চরিতার্থ করার উপায়	দ্বন্দ্ব	সাফল্য বা বিফলতা
১. বণিক সমাজে চণ্ডী নিজের পুজো প্রচার করতে চান।	১. স্বর্গের নর্তকী রত্নমালাকে অভিশপ্ত করে মর্ত্যে খুল্লনা রূপে পাঠালেন।		
		২. ধনপতি লহনা বর্তমানে খুল্লনাকে বিবাহ করলে শুরু হল সপত্নী দ্বন্দ্ব।	২. লহনার ষড়যন্ত্রে খুল্লনা ছাগল চরাতে বাধ্য হল।
	৩. সর্বশী ছাগল হারালে তা ফিরে পেতে খুল্লনা ইন্দ্রের পঞ্চকন্যার মাধ্যমে চণ্ডী-পূজার কথা জানতে পারলো।		৩. পুজো দিয়ে খুল্লনা হারানো সর্বশীকে খুঁজে পেল। ঘরেও মঙ্গল কামনায় দেবী চণ্ডীর পূজা করতে থাকলো।
		৪. গৌড় থেকে ধনপতি ফিরে এলে খুল্লনা তার নিগ্রহের কথা বললে লহনা ভর্ৎসিত হল ও প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে লাগলো।	
		৫. ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বিবাদ হওয়ায় খুল্লনাকে সতীত্বের বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে হলো।	
	৬. বাণিজ্যে যাবার জন্য ধনপতি উদ্যোগ করলে স্বামীর মঙ্গল কামনায় খুল্লনা চণ্ডীপুজো করলো।	৬. সেই খবর লহনা শৈব ধনপতিকে জানাতে চললো।	৬. লহনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। ধনপতি দেবীঘটে লাথি মেরে চলে গেলেন।

আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ	চরিতার্থ করার উপায়	দ্বন্দ্ব	সাফল্য বা বিফলতা
		৭. অপমানিতা হয়ে ক্ষুব্ধ হলেন দেবী।	
	৮. দেবী অপমানের প্রতিশোধ নিতে কৃত্রিম ঝড় সৃষ্টি করে একটি ডিঙা ছাড়া সব ডিঙা সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন।		
	৯. কালিদহে সমুদ্র-মধ্যে চণ্ডী ধনপতিকে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখিয়ে ছলনা করলেন।	৯. শালিবাহনকে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখানোর চ্যালেঞ্জ নিলেন ধনপতি।	৯. তা দেখাতে না পারায় শালিবাহনের কারাগারে ধনপতি বন্দী হলেন।
	১০. নিরুদ্দিষ্ট পিতার সংবাদ পেতে শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাটন যাত্রা।	১০. কমলে-কামিনী মূর্তি দেখানো নিয়ে রাজার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ শ্রীমন্তের।	১০. দেবীর কৌশলে তা দেখাতে না পারায় হত্যার জন্য শ্রীমন্ত মশানে নীত।
	১১. সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে শ্রীমন্তের চণ্ডীস্তব।	১২. মশান-রক্ষীদের সঙ্গে দেবীর বিরোধ ও যুদ্ধ।	১১. জরতীর বেশে মশানে দেবীর আবির্ভাব। ১২. যুদ্ধে দেবীর জয়। শ্রীমন্ত কারামুক্ত হল।
	১৩. কারাবন্দীদের মধ্যে শ্রীমন্তের ধনপতি অন্বেষণ।		১৩. শ্রীমন্ত পিতাকে খুঁজে পেলো।
	১৪. পিতাকে চণ্ডীর পূজো দিতে শ্রীমন্ত অনুরোধ করলো।	-	১৪. দেবীর মহিমা অনুভব করে ধনপতি চণ্ডীকে পুজো দিলেন ও তাঁর যাবতীয় হৃত সম্পত্তি ফিরে পেলেন। উচ্চ অভিজাত সমাজে দেবী চণ্ডীর পুজো প্রচলিত হল।

এই ছকে ফেলেই বিশ্লেষণ করা যায় যাবতীয় মঙ্গলকাব্য ও ব্রতকথাকে। কেননা এদের গল্পগুলিতে সংগঠনের অভিন্ন রূপ ভিতরে ভিতরে বর্তমান। আগেই বলেছি, প্রতিটি ব্রতকথা কিংবা মঙ্গলকাব্যের মূল অভিপ্রায় দেবদেবীর পুজো প্রচার। দেবসমাজে যাঁদের কৌলিন্য নেই তাঁরা হয় বিরোধ নতুবা অনুগ্রহ বিতরণের পথ ধরে এগিয়েছেন। দ্বন্দ্ব যে সবক্ষেত্রে দেবতা ও মানুষের মধ্যেই হয়েছে তা-ও নয়। প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব বেধেছে মানুষে মানুষে—যেমন লাউসেন ও তার মাতুল মহামদের সংঘাত। দ্বন্দ্বের অবলম্বন নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য। এ জাতীয় ছক প্রধানত কাল্পনিক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নমনীয়। ছকের প্রতিটি ‘এন্ট্রি’-কে ক্ষুদ্রতর এক-একটি কাহিনী-একক হিসেবে গণ্য করা যায়। এই ধরনের পুনরাবৃত্ত কাহিনী-একক নিয়ে ভাবতে ভাবতে অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ টমসন বানিয়ে ফেলেছিলেন অভিনব দুই ‘ইনডেক্স’ বা সূচি—টাইপ ও মোটিফ সূচি, যাদের কথা তত্ত্বালোচনার প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। ইদানিং মঙ্গলকাব্যের গল্পেও কেউ কেউ খুঁজছেন এই দুই উপাদানকে। ‘টাইপ’ নির্ভর করে গল্পের শ্রেণী-চরিত্রের উপর। আর ‘মোটিফ’ থাকে কাহিনীর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একক হিসেবে।

সেজন্য এক-একটি মঙ্গলকাব্যের ধারায় টাইপের ক্ষেত্রে খুব বৈসাদৃশ্য চোখে না পড়লেও মোটিফের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায় কবিতে কবিতে। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের ভিতর অজস্র মোটিফের উপস্থিতি যেকোন পাঠককে বিস্মিত করবে। প্রবন্ধের আকারের কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে আপাতত নীরব থাকা গেল। সুযোগ মতো পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করার ইচ্ছে রইলো।।

গঠনের রূপতত্ত্ব বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত রচনাগুলির কাছে ঋণ স্বীকার করছি :

১. বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইন্‌ডেক্‌স—দিব্যজ্যোতি মজুমদার।
২. লোককথার অন্তর্লোক— পল্লব সেনগুপ্ত।
৩. শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব—অভিজিৎ মজুমদার।
৪. প্রসঙ্গ : মঙ্গলকাব্য [প্রবন্ধ]— দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।



উমাপতি উপাধ্যায় : বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারের অভিজ্ঞানে

• • • • • •

সত্যবতী গিরি

পুরোনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় বাংলা ভাষায় না লেখা কিছু সাহিত্যের প্রসঙ্গ আমাদের টেনে আনতেই হয়। এই সাহিত্যসম্ভারে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্যের সঙ্গে আমরা যুক্ত করে নিয়েছি বিদ্যাপতিকে। তিনি আমাদের প্রিয় কবি—এখনও। বিদ্যাপতির আড়ালে কিন্তু ঢাকা পড়ে গেছেন মিথিলার আর এক কবি। তিনি জয়দেব আর বিদ্যাপতির মাঝখানে থাকা উমাপতি উপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা জায়গা তাঁরও প্রাপ্য। আমাদের আলোচনায় সেই দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হবে।

উমাপতির নাটকের নাম 'পারিজাতহরণম্'। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'বিহার এ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি'র পত্রিকায় জর্জ আব্রাহম গ্রিয়ার্সনের সম্পাদনায় এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ভূমিকাতেই জানিয়েছিলেন নাটকটির নাম পারিজাতহরণ। কিন্তু নাটকটির মূল নাম যে পৃথক হতে পারে সেই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় 'মঙ্গলযাত্রা, নাটগীত ও পাঁচালি কীর্তন' নামক বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত [১৩৫৯] সুকুমার সেনের একটি প্রবন্ধে। তিনি জানালেন—'এই মূল নাটগীতের নাম যে 'পারিজাতমঙ্গল' ছিল তা সূত্রধারের উক্তিতেই মিলে—আদিষ্টো ঽস্মি শ্রীহরিহরদেবেন যথা উমাপত্যপাধ্যায় বিরচিত; নব পারিজাতমঙ্গলম।' এছাড়া তিনি নাটকটির 'মঙ্গল' নামের অন্য আর একটি যুক্তিও উপস্থিত করেছেন। যুক্তিটি হল—'পারিজাতমঙ্গলের গানগুলির ভণিতায় যথারীতি কবির শুভ ভাবনার ও কল্যাণকামনার প্রকাশ আছে।' ['বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' পৃ. ৭০] কিন্তু তবুও উমাপতির নাটকটির নাম যে পারিজাতহরণ ছিল তার প্রমান আছে। শশিভূষণ বিশ্বাস গ্রিয়ার্সনেরও সাত বছর আগে [১৩১৭ সালে] মৈথিলি ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির 'পারিজাত -হরণ' নামে একটি নাটকের পরিচয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় উপস্থিত করেছিলেন। [সাহিত্য; ২১ বর্ষ; ১০ম সংখ্যা; মাঘ; ১৩১৭; পৃ. ৬০১] কিন্তু আসলে নাটকটি উমাপতিরই রচনা, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় সূত্রধার যে 'মঙ্গল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা সাধারণত সাহিত্য অর্থেই; আর নাটকটির নাম 'পারিজাতহরণ'ই ছিল।

ভূমিকা অংশে গ্রিয়ার্সন গ্রন্থ সম্পর্কিত একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মধুবনীর মহকুমাশাসক থাকার সময় গ্রিয়ার্সন মৈথিল নাট্যকারদের কতকগুলি নাটক সংগ্রহ করে সংকলন করেছিলেন। এর মধ্যে পারিজাতহরণের একটি পুঁথিও ছিল। এই একমাত্র পুঁথিটিকে মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করতে গিয়ে তিনি দেখেন—এর কতগুলি পাতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই গ্রন্থের অন্য পুঁথির জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে আরও দুটি পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রাচীন পুঁথি। দেখে মনে হয় পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর। এর একটি পাতা নেই এবং বাকি পাতাগুলোও অত্যন্ত জীর্ণ। আবার জলের দাগ পড়ে গিয়ে কিছু কিছু পাতা

একেবারে পাঠের অযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রিয়ার্সনের পুঁথিটির পাঠ মেলাতে এটি খুবই সহায়ক হয়েছে। অন্য পুঁথিটি ছাপানো। ১৮৯৩ সালে দ্বারভাঙ্গার মিথিলা পাবলিশিং কোম্পানি থেকে ছাপা। তারই মুদ্রিত রূপ এই গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত।

আমাদের আলোচ্য উমাপতি ছাড়া আরও একজন বিখ্যাত উমাপতি হলেন জয়দেবের সমকালীন কবি উমাপতি ধর মিশ্র। এই উমাপতি বিজয় সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন—এই তিন পুরুষেরই সভাসদ ছিলেন। গীতগোবিন্দের চতুর্থ শ্লোকে জয়দেবও 'পল্লবিত বাক্যবয়ন পটু' উমাপতি ধরের উল্লেখ করেছেন। রাজসাহীতে পাওয়া একটি লিপিলেখনে যে দীর্ঘ শ্লোকটি পাওয়া যায় তা এই উমাপতিরই লেখা। তিনি তাঁর এই লিপিলেখনে বলেছেন বিজয়সেন নান্য নামক বীরকে পরাজিত করেন। এই নান্যদেব একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে তিরহুতে রাজত্ব করতেন। তিরহুত রাজপুত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইনিই। এবং এঁরই বংশধরের সভাকবি 'পারিজাতহরণ' রচয়িতা উমাপতি। এই কবি দ্বারভাঙ্গা জেলার ভাউর পরগণার কৈলাখের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দুপতি হরিহরদেবের সভাকবি। এই রাজার রাণীর নাম ছিল মহেশ্বরী দেবী। নাটকের গীত অংশের ভণিতায় কবি মহেশ্বরী দেবীর উল্লেখ করেছেন। তিরহুতের জাতিপ্রথার সংগঠক হিসেবে হরিহরদেব মিথিলায় প্রসিদ্ধ। বল্লালসেন এক শতাব্দী আগে বাংলাদেশে যা করেছিলেন হরিহর দেব মিথিলায় তাই-ই করে গেছেন। উমাপতির এই নাটক থেকেই জানা যায় যে তিনি সার্থকভাবে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। কবি বলেছেন তাঁর ভীষণ তরবারি যবন-অরণ্য উচ্ছেদ করেছিল এবং একটি ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত অগ্নিরূপে তিনি এই যবন অরণ্যকে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। উমাপতি সম্পর্কে এর বেশি কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি। যদি হরিহরদেবই তাঁর পৃষ্ঠপোষক হন—তবে বিদ্যাপতির পূর্ববর্তী কবি ছিলেন তিনি। বিদ্যাপতিকে আমরা পেলাম তাঁর এক শতাব্দী পরে।

উমাপতির পরিজাতহরণ নাটকটি সাধারণ সংস্কৃত নাটকের মতো নয়। সাধারণত সংস্কৃত নাটক বলতে অন্যূন পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত মিলনান্ত নাটককেই বোঝায়। কিন্তু পারিজাতহরণ এই শ্রেণীর নয়। কারণ এই নাটকে একটিমাত্র অঙ্ক। সংস্কৃতে একাঙ্ক নাটক নানা ধরণের। যেমন ব্যায়োগ, ভাণ, গোষ্ঠী, হল্লীশক, শ্রীগদিত, ভার্ণিশ, ভাণী, রাসক ও নাট্যরাসক প্রভৃতি। এগুলিকে বলা হয় রূপক। এই একাঙ্ক রূপকগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও উমাপতির পারিজাতহরণ নাটকে ফেলা যায় না। তবে কোন কোন রূপকের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন ব্যায়োগের বৈশিষ্ট্য হল—একাঙ্ক, প্রখ্যাত নায়ক বিশিষ্ট, ঋষিকন্যা পরিণয়, সম্ভোগ শৃঙ্গার হীন, দীপ্ত বীর রৌদ্ররসবিশিষ্ট। পারিজাতহরণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এটিও একাঙ্ক, প্রখ্যাত দিব্য নায়ক বিশিষ্ট, অবশ্য এতে ঋষিকন্যা পরিণয় নেই। এটি সম্ভোগহীন, তবে শৃঙ্গাররস এখানে উপস্থিত। অনুরাগ, অভিমান ও অভিমান মোচন প্রসঙ্গও এখানে রয়েছে। রৌদ্ররস না থাকলেও বীররসের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। শ্রীগদিত নামক একাঙ্ক রূপকের বৈশিষ্ট্য হল উদাত্তবচন সমন্বিত, বস্তু আর নায়ক প্রখ্যাত, এতে নারী উপবিষ্ট থেকে করুণ পাঠ বলে। পারিজাত হরণেও বস্তু অর্থাৎ বিষয়বস্তু বিখ্যাত পৌরাণিক ঘটনা, নায়কও প্রখ্যাত; নায়কের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বচন কখনও কখনও উদাত্ত। খণ্ডিতা মানিনী নায়িকা সত্যভামা বসে বসে করুণ পাঠ বলেছে। নাটকটি আবার শেষ হয়েছে চিরনির্দিষ্ট মিলনে আর ভারতবাক্য পাঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই রূপকটি প্রায় সর্বলক্ষণযুক্ত হয়েও একাঙ্ক রূপকের শ্রেণিবিশেষগুলির কোনোটিকেই কঠোরভাবে অনুসরণ করে না। তবে ভাবপ্রকাশন রচয়িতা শারদাতনয় যে উল্লোপ্যক নামের উপরূপকের কথা বলেছেন তার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উল্লোপ্যকের বৈশিষ্ট্যগুলি হল এটি একাঙ্ক, গীতবহুল, উদারনায়ক ও দিব্যচরিত্র অবলম্বনে রচিত। এতে হাস্য, করুণ ও শৃঙ্গাররসের প্রয়োগ আছে। [ভাবপ্রকাশনম্:

শারদাতনয়, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৯৩০, নবম অধিকার/২৬৬/২১] এই বৈশিষ্ট্যগুলি পারিজাতহরণ নাটকেও আছে।

এর পর নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক সাহিত্য থেকেই গৃহীত। হরিবংশ ভাগবত আর কিছুটা ভিন্নভাবে বিষ্ণুপুরাণেও এই কাহিনী পাওয়া যায়। ভাগবতে এই কাহিনী তাৎপর্যহীন সংক্ষিপ্ততায় বর্ণিত। বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে মানবী ভেবে অগ্রাহ্য করে শচী তাঁকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করেন নি। তাই সত্যভামা ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে উত্তেজিত করেছেন ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সপত্নীদের তুলনায় সত্যভামাই যে কৃষ্ণের অধিকতর প্রেয়সী সে কথাও তিনি স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এখানে সত্যভামার বিরোধ শচীর সঙ্গে। শচীর গর্ব চূর্ণ করার জন্য তিনি কৃষ্ণকে দিয়ে পারিজাত হরণ করিয়েছিলেন। কিন্তু পারিজাতহরণের কাহিনী ভাগবত কিংবা বিষ্ণুপুরাণকে অনুসরণ করেনি। উমাপতি হরিবংশের কাহিনীটিই প্রায় অবিকৃতবাবে গ্রহণ করেছেন। এবং হরিবংশের কাহিনীটিই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। নাটকের কাহিনীটি নিম্নলিখিতরূপ—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ও দ্বারকাপতি কৃষ্ণের দুই প্রধানা মহিষী—রুক্মিণী ও সত্যভামা। দুজনের মধ্যে রুক্মিণী বয়োজ্যেষ্ঠা এবং যুবরাজ প্রদ্যুম্নের মাতা। অন্যদিকে সত্যভামা কৃষ্ণের প্রিয়তমা।

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি আশ্চর্য বৃক্ষ আছে। এর নাম পারিজাতবৃক্ষ এবং সর্বপ্রার্থনাপূরণকারী। একদা দ্বারকায় কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন—তখন নারদ আসেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নারদ কৃষ্ণকে একটি পারিজাত পুষ্প উপহার দেন এবং কৃষ্ণ সেটি দেন রুক্মিণীকে। সত্যভামা এই সংবাদ জেনে ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের উপর অভিমান করেন। এবং কৃষ্ণের কাছে কেবল পারিজাত ফুল নয়—পারিজাত বৃক্ষটিই প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রের কাছে কৃষ্ণ পারিজাতবৃক্ষটি চেয়ে পাঠালে ইন্দ্র তা দিতে অস্বীকার করেন। কৃষ্ণ তখন ইন্দ্রকে আক্রমণ করেন ও তাঁকে পরাজিত করে পারিজাত বৃক্ষটি সত্যভামাকে উপহার দেন। নারদ সত্যভামাকে বলেন, "পারিজাততটে দত্তমক্ষয়ম ভবতি।" কিন্তু এই দেয় সামগ্রী দানকারিণীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় হওয়া চাই। সত্যভামা ব্রাহ্মণ নারদকে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কৃষ্ণকে দান করেন। এবং সুভদ্রাও তাঁর স্বামী অর্জুনকে দান করেন। কৃষ্ণ এবং অর্জুন নারদের দাস হন। নারদ তাদের বিক্রয় করতে মনস্থ করলে সত্যভামা ও সুভদ্রা এক একটি গাভীর বিনিময়ে তাঁদের স্বামীদের ক্রয় করেন। আনন্দের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়।

এই নাটকের কাহিনীটিই যে কেবল হরিবংশ থেকে নেওয়া তা নয়—কখনও কখনও সংলাপও হরিবংশের অনুরূপ। হরিবংশে নারদ কৃষ্ণের দূত হয়ে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে কৃষ্ণের কঠোরবাক্য উচ্চারণ করেছেন :

স পারিজাতং যদি না প্রদস্যতি
প্রযাচ্যমানো ভবতামরেশ্বরঃ।
ততঃ শচী ব্যামৃতানুলেপন
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি।।

[হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব; সপ্ততিতম অধ্যায়, ৯ম শ্লোক]

— যদি আপনি যাজ্ঞা করলেও অমরেশ্বর ইন্দ্র পারিজাত না দেন, তবে যে বক্ষস্থলের অনুলেপন শচীদেবীর আলিঙ্গনে নষ্ট হয়ে গেছে—সেখানে গদাপ্রহার করব।

পারিজাতহরণ নাটকেও কৃষ্ণ নারদের মাধ্যমে ইন্দ্রকে বার্তা প্রেরণ করেছেন :

পুরন্দর প্রেষয় পারিজাতম্
পশ্যন্তু বধ্বস্তব সাভিলাষাঃ।
পুলোমকন্যাকুচকুঙ্কুমাঞ্চিতম্।
ভিনত্তু মা শার্ঙ্গশরস্তবোরঃ।।

— হে পুরন্দর, তোমার বধূরা পারিজাত দর্শনে অভিলাষিণী। যদি প্রদান না করেন—তবে আমার শর শচীর কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত তোমার বক্ষ ভেদ করবে।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র তাঁর বক্তব্য নারদকে বলেছেন :

পলাশপত্রার্ধমপি ত্বয়াজিতো
ন পারিজাতস্য তব প্রদাস্যতি।

— তুমি জয় না করলে পারিজাতবৃক্ষের একটি পত্রার্ধও তোমাকে দান করব না।

অন্যদিকে উমাপতির ইন্দ্র বলেন :

পারিজাতদলং যাবৎ সূচিকাগ্রেণ বিধ্যতে।
তাবৎ কৃষ্ণ বিনা যুদ্ধং ময়া তুভ্যং ন দীয়তে।।

তবে হরিবংশের কাহিনী অনেক বেশি বিস্তৃত। এখানে ইন্দ্র পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে নারদের কাছে পারিজাত আকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের নিন্দা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন যুদ্ধও পুরো অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত। কিন্তু পারিজাতহরণে ইন্দ্রের কৃষ্ণনিন্দা প্রসঙ্গ নেই। এবং কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের যুদ্ধ প্রসঙ্গ নারদের একটিমাত্র গানে বর্ণিত।

হরিবংশের পারিজাতহরণ কাহিনীতে কৃষ্ণকথার তিনটি বিশিষ্ট দিক আমরা লক্ষ্য করি—১. অন্যান্য মহিষী, বিশেষত রুক্মিণীর তুলনায় সত্যভামার প্রতি কৃষ্ণের প্রগাঢ় প্রেম এবং মানিনী সত্যভামার মানোৎকর্ষ, ২. প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধবিশারদ কৃষ্ণের একটি বিশিষ্ট পরিচয়, ৩. ইন্দ্র ও কৃষ্ণের দীর্ঘকালীন বিরোধ।

কাহিনীর এই তিনটি প্রসঙ্গের মধ্যে নাট্যকার মানিনী সত্যভামার মান ও কৃষ্ণের প্রতি তার প্রগাঢ় প্রণয়কেই প্রধান উপজীব্য করেছেন। নাটকের শেষাংশে অর্জুনের সংলাপে তিনি মানিনী সত্যভামার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইন্দ্রের মুখে কৃষ্ণের নিন্দা ও দীর্ঘকালীন বিরোধের উল্লেখ এবং কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের যুদ্ধ এই দুটি প্রসঙ্গের প্রথমোক্তটি নাটকে অনুপস্থিত এবং শেষোক্ত প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সংক্ষেপে নারদের মুখের একটি গানে উল্লিখিত হয়েছে,— তা আগেই বলেছি মৈথিল ভাষায় রচিত উমাপতির গীতগুলি নাটকের মধ্যে ব্যবহার জয়দেবের প্রভাবজনিত—একথা অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। জয়দেবের কাব্যের অনুরূপে শৃঙ্গাররসকে স্থায়ীভাব দান করার জন্যই তাঁর কাব্যে পারিজাতহরণ ও তৎসংক্রান্ত কৃষ্ণ-সত্যভামা প্রসঙ্গ এসেছে। আবার কাব্যটি কবি রচনা করেছিলেন হরিহরদেবের যুদ্ধজয় উপলক্ষ্যে। সেই কারণেই কৃষ্ণের বীরত্ব প্রকাশক কাহিনী হিসেবেও তিনি এই কাহিনীটিকে গ্রহণ করেছেন। সত্যভামার মান হরিবংশে বেশ বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত—উমাপতির নাটকেও তাই। তবে হরিবংশের বিবৃতিধর্মী আখ্যানমূলকতা থেকে কাহিনীটিকে নাটকীয়তায় উত্তীর্ণ করার জন্য তিনি কিছু পরিবর্তনও সাধন করেছেন। এই নাটকীয়তা সৃষ্টির কারণেই তিনি নাটকের মূল উপজীব্য সত্যভামার মান ও কৃষ্ণকর্তৃক মানভঞ্জন প্রসঙ্গকে প্রায় যথাযথ রেখে অন্যান্য দীর্ঘ প্রসঙ্গকে নির্মমভাবে বর্জন করেছেন। হরিবংশের কাহিনীতে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে পারিজাতপ্রদান এবং নারদের রুক্মিণীপ্রশংসা দাসীদের কানাকানিতে সত্যভামার কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু নাটকে সত্যভামা আড়াল থেকে সমস্ত ঘটনা নিজের কানেই শুনেছেন। এতে কাহিনীর নাটকীয়তা অনেকখানি বেড়ে গেছে। হরিবংশে সত্যভামার

মান অংশে কৃষ্ণ দাসীর হাত থেকে :

গ্রহায় ব্যজনথৈব স্থিত্বা স পরিপার্শ্বতঃ।
মনৈরিবাসৃজদ্ বাতংজহাস মনকৈরিব॥

[হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব; ৬৬তম অধ্যায়, ১৪শ শ্লোক]

— তিনি পার্শ্বে থেকে হাতে ব্যজন নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে ও হাসতে লাগলেন।

নাটকে দেখি শ্রীকৃষ্ণ 'সখীং সংজ্ঞায় নিবার্য বিজ্ঞাপয়িত্বা চরণতলং পবিমৃশতি'। সত্যভামার চরণস্পর্শকারী কৃষ্ণ সম্ভবত গীতগোবিন্দের কৃষ্ণের সাদৃশ্যেই পরিকল্পিত। মানিনী সত্যভামার তীব্র অভিমান ও অভিমানমোচনের জন্য কৃষ্ণের উক্তি নাটকে সঙ্গীতে পরিবেশিত। হরিবংশে সত্যভামা কৃষ্ণের প্রশ্নে বলেছেন—

যৎ পারিজাতকুসুমং দত্তবান্নারদস্তব।
তৎ কিলেষ্টজন দত্তং ত্বয়াহং পরিবৰ্জ্জিতা॥

[তদেব, ৬৭ তম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক]

—দেবর্ষি নারদ তোমার হাতে যে পারিজাত পুষ্প দিয়েছিলেন—তা তুমি আমাকে উপেক্ষা করে নিজের প্রিয়জনকে দিয়েছ।

এরপর সপ্তষষ্ঠীতম অধ্যায়ের নবম শ্লোক থেকে ষড়্‌বিংশ শ্লোক পর্যন্ত সত্যভামার দীর্ঘ অভিমানোক্তি প্রসারিত। তাঁর অভিমানপূর্ণ খেদোক্তির উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন—

পারিজাতকপুষ্পাণি যদীচ্ছস্যতিকোপনে।
তদা দাতাস্মি সুশ্রোণি সত্যমেতদ্ ব্রবমি তে॥
স্বর্গাস্পদাদাসয়িত্বা পারিজাতং দ্রুমেশ্বরম্।
গৃহে তে স্থাপয়িষ্যামি যাবৎ কালংত্বমিচ্ছসি॥

[বিষ্ণুপুরাণ; ৬৭ তম অধ্যায়, ৬১-৩২ শ্লোক]

কিন্তু নাটকে সত্যভামা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের কাছে পারিজাতবৃক্ষ প্রার্থনা করেছেন :

মাধব করহ হমর সমাধানে।
দেহ মোহি পারিজাততরু আনে॥
এহি খন তোরিত করিঅ পরযানে।
নহি তঈ হমর অবস অবসানে॥

এই পরিবর্তনটুকু যেন অভিমানিনী নায়িকার অধিকারবোধকেই প্রকাশ করে।

নাট্যকার নাটকের শেষদিকের ঘটনাতেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। হরিবংশে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে কৃষ্ণ একাই একশো। নিজেরই পুত্র-পরিজনের সাহায্যে তিনি পারিজাতবৃক্ষ হরণ করেছেন। কিন্তু উমাপতির নাটকে যুদ্ধ ঘটনার প্রত্যক্ষ বর্ণনা না থাকলেও পারিজাতহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। মানিনী সত্যভামার মানকে বেশি মর্যাদা দেওয়ার জন্য আর নাট্যকাহিনীকে অধিকতর সংঘাতময় করে তোলার জন্যই সম্ভবত এখানে কৃষ্ণকে অর্জুনের সাহায্যপ্রার্থী দেখানো হয়েছে। এইভাবে পারিজাতহরণের দুঃসাধ্যতা দেখিয়েই শুধু নাট্যকার ক্ষান্ত হন নি। অর্জুনের মুখ দিয়ে মানময়ী সত্যভামার শ্রেষ্ঠত্বও বর্ণনা করেছেন।

তবে কাহিনীর দিক দিয়ে পুরাণকে অনুসরণ করলেও এই গীতিনাট্যকে কোনমতেই পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত একটি সাহিত্যকৃতি বলে চিহ্নিত করা যায় না। এক শতাব্দী আগে জয়দেবের অমরকাব্য 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার আধারে লৌকিক নরনারীর

আসঙ্গসুন্দর রভসমধুর যে উত্তপ্ত প্রেমের উল্লাস পরিবেশিত হয়েছে—তাতে একই সঙ্গে আছে হরিস্মরণসাধনা আর বিলাসকলাকুতূহল। উমাপতি উত্তরাধিকারসূত্রে সেই কাব্যের বিশেষ ভাবাবহকেই স্মরণ করতে চেয়েছেন তাঁর নাটকের মধ্যে। কিন্তু পেরেছেন কতটা? জয়দেবের কাব্যের সঙ্গে উমাপতির নাটকের সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্য আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে।

জয়দেবের একটি পদের হুবহু অনুরূপ পদ দেখা যায় উমাপতির নাটকে। জয়দেবের কৃষ্ণ রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

বন্ধূকদ্যুতি বান্ধবো হয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি—
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন শ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্তন্মুখ সেবয়া বিজয়তে বিশ্বংস পুষ্পায়ুধ।।

[গীতগোবিন্দ; ১০ম সর্গ; ১৫শ শ্লোক]

— তোমার অধর বন্ধুক পুষ্পের মতো, কপোল মধুকপুষ্পের মতো, নয়ননীল পদ্মের শোভাকে পরাজিত করে, নাসা তিলফুল সাদৃশ, আর দন্তপংক্তি কুন্দকুসুমের মতো, মনে হয় মদন তোমার শ্রীমুখ প্রসাদে বিশ্বজয় করেছে।

অন্যদিকে উমাপতির নাটকে কৃষ্ণ সত্যভামার রূপবর্ণনায় বলেন :

আস্যং তে সরসীরুহেণ রচিতং নীলোৎপলাভ্যাং দৃশৌ।
বন্ধুকেন রদচ্ছদৌ তিলতরোঃ পুষ্পেন নাসাপুটম্।।

— তোমার অধর কমলের সৌন্দর্যে নির্মিত, চোখদুটি নীলোৎপলের মতো, ওষ্ঠদ্বয় বন্দুক পুষ্পের মতো, আর তিলতরুর পুষ্পে তোমার নাসিকা নির্মিত।

উমাপতির নাটকে রয়েছে মৈথিলী ভাষায় লেখা একুশটি গান। এই ভাষায় এই ধরণের গান সর্বপ্রথম উমাপতির রচনাতেই পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও মহাকাব্যের ফ্রেমে বাঁধা পদাবলীর সমষ্টি। অন্যদিকে উমাপতি তাঁর পদগুলিকে বেঁধেছেন সংস্কৃত নাটকের কাঠামোয়। এক্ষেত্রে তিনি জয়দেবকেই অনুসরণ করেছেন। তবে জয়দেবের কাব্য রাধাকৃষ্ণ আর সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে নাট-গীতির বহুল বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত কাব্যই হয়ে উঠেছে, আর উমাপতির রচনা প্রত্যক্ষভাবেই নাটক। নাট্যকার যে পৌরাণিক কাহিনীকে বেছে নিয়েছেন সেটিও গীতগোবিন্দের তুলনায় অনেক বেশি নাটকীয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানগুলি কবির নামাঙ্কিত অন্ত্যভণিতা যুক্ত। উমাপতির গানও তাই। জয়দেবের কাব্যের মধ্যে গানগুলির অন্ত্যভনিতা বিসদৃশ না হলেও উমাপতির নাটকে এই ধরণের অন্ত্যভণিতাযুক্ত স্বতন্ত্র পদ বেমানান মনে হয়। এমনকি নাটকে ব্যবহৃত এই গানগুলি সবসময় নাটকের কাহিনীতে অনিবার্যভাবেও আসে নি। কোনো কোনো গানের সঙ্গে নাটকের ঘটনার যোগ খুবই সামান্য। অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না যে এক শতাব্দী পূর্ববর্তী জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের গীতগুলির অসামান্য জনপ্রিয়তা এই কবিকেও প্রাদেশিক ভাষায় পদরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পদগুলির উপস্থাপনার জন্য তিনি জয়দেবের অনুরূপ পদ্ধতিরই সাহায্য নিয়েছেন। জয়দেবের রচনায় গীত কাব্যের মধ্যে গ্রথিত,— উমাপতির রচনায় নাটকে।

নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও কবি একই সঙ্গে জয়দেবের উত্তরাধিকার স্বীকার আর স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন। জয়দেবের মতো কৃষ্ণকথাই তাঁর উপজীব্য। কিন্তু জয়দেবে গ্রহণ করেছেন লোকসমাজে অধিকতর জনপ্রিয় বৃন্দাবনলীলার রাধাকৃষ্ণপ্রেমকে, আর উমাপতির উপজীব্য কৃষ্ণের

দ্বারকালীলার অভিজাত প্রেম। জয়দেব রাজসভার কবি, এ কেবল ইতিহাসের নানা কিংবদন্তীতে আমাদের শ্রুতিগোচর; তাঁর কাব্যে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অন্য চারজন কবির উল্লেখে আমরা বুঝতে পারি তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সঙ্গে অন্তত রজাসভার আবহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অথচ তাঁর কাব্যের কোথাও রাজবন্দনা নেই। তিনি রাজসভায় বসে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন কিনা তাও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তাঁর কাব্যে ভক্তের বিনম্র প্রার্থনায় নিজেকে অগণ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর—বৃহত্তর জনসমষ্টির একজন করে নিয়েই সমষ্টির জন্য কল্যাণকামনায় সোচ্চার : 'তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং পণতেষু'। 'বয়ম্' শব্দের এই বিশেষ ব্যবহারেই জয়দেব মধ্যযুগীয় রাজানুগত্যের সীমাশৃঙ্খল ছেদন করেছেন। তাঁর কাব্য রাজা আর রাজসভার সীমিত গণ্ডীকে ছাড়িয়ে বিস্তৃর্ণ হয়ে গেছে জনপদবাসী অগণ্য জনমানসে। প্রাকৃত প্রেমের ইন্দ্রিয়নির্ভর আবেগ উল্লাসের সঙ্গে জনমাসনের ভক্তিরসোচ্ছ্বাসকে রূপায়িত করার প্রয়োজনে জয়দেবের উপজীব্য হয়েছে জনমানসে অধিকতর আদরণীয় আর বহুব্যাপ্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথা।

অন্যদিকে উমাপতির নাটক প্রত্যক্ষভাবে রাজপ্রশস্তির কারণে রাজানুরোধে রচিত [আদিষ্টোদৃস্মি শ্রীহরিহরদেবেন উমাপত্যুপাধ্যায় বিরচিতং নবপারিজাতমঙ্গলম্']। তাঁর নাটকের প্রারম্ভে মহিষাসুরমর্দিনীর কাছে তিনি কল্যাণ কামনা করেছেন 'সকল স্বভার', কিন্তু নিজেকে তাদের থেকে পৃথকই রেখেছেন।

নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবেও তিনি বেছে নিয়েছেন রাজা কৃষ্ণের শৌর্য আর প্রেমের যুগপৎ সম্মেলন ঘটেছে—এমন একটি ঘটনাকে। ফলে তাঁর নাটক কবিমানসের দ্বিধাবিভক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হয়েছে। একদিকে রাজমনোরঞ্জন আর অন্যদিকে মৈথিল ভাষায় রচিত গীতিকবিতাগুলির সংযোজন। জয়দেবের তুলনায় উমাপতির বিষয়বস্তুর সংকীর্ণতাও লক্ষ্য করার মতো। প্রকট উদ্দেশ্যমূলকতাও হয়তো এই কাব্যকে লোকপ্রিয়তায় উত্তীর্ণ হতে দেয় নি। তাছাড়া জয়দেবের মধুরকোমলকান্তপদাবলী ব্যাপ্ত সাধারণের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ভাষার সহজতম লালিত্যে রচিত। অন্যদিকে উমাপতির গীতগুলি প্রাদেশিকতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করার ক্ষমতা অর্জন করে নি। কিন্তু তাঁর গীতগুলির শিল্পরসোত্তীর্ণতার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী লোকপ্রিয় কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার ভ্রান্তিতে, মিথিলার জনসাধারণের মধ্যে তাঁর গীতাবলীর বহুল প্রচলনে।

জয়দেবের কাব্যের নায়িকা রাধা। রাধাকে কাব্য নায়িকা করার মধ্যেও জয়দেবের শিল্পী ব্যক্তিত্বের মৌলিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। হরিবংশ আর ভাগবত—এই দুটি কৃষ্ণজীবনী সম্বলিত প্রধান পুরাণে রাধার কোন প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিক্ষিপ্তভাবে ছিল বিভিন্ন প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় লেখা প্রকীর্ণ শ্লোকে। গাথাসপ্তশতী, সুভাষিতরত্নকোষ আর জয়দেবের সমকালীন সদুক্তিকর্ণামৃত-তে এসেছে রাধাপ্রসঙ্গ। পদ্মপুরাণ আর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার উল্লেখও জয়দেবের খুব একটা দুরবর্তী নয়। অন্যদিকে উমাপতির কাব্যনায়িকা সত্যভামা পুরাণে কৃষ্ণপ্রেয়সী মানিনী নায়িকা হিসেবেই সুপ্রতিষ্ঠিতা। পার্থক্য হল, উমাপতি জয়দেবের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও পুরাণ প্রতিষ্ঠানের বাইরে পা বাড়াতে পারেন নি। কিন্তু পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া জয়দেব একশো বছর আগেই সেই কাজটি করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও গীতগোবিন্দের খণ্ডিতা রাধার সঙ্গেই উমাপতির পারিজাতহরণের সত্যভামার তুলনা করা যায়। শপথ লঙ্ঘন করে নায়ক অন্য নারীতে সমাগত হলে বঞ্চিতা নায়িকাকে খণ্ডিতা বলা হয় গীতগোবিন্দে খণ্ডিতা রাধা—নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্। /বালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়িত মলয়সমীরম্।।

'পারিজাতহরণ'-নাটকে রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত উপহার দিলে সত্যভামা ক্রুদ্ধ হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীত হয়ে সখী সুমুখীর কাছে তাঁর সংবাদ জানতে চাইলে সখী সত্যভামার যে অবস্থা বর্ণনা করলেন, তা রাধার অবস্থার চেয়েও গুরুতর :

অপনুক আপন আরসি হেরী।
চাণক ভরম কোপ কত বেরী।।
চিকুর-নিকর নিঅ নয়ন নিহারী।
জলধরজাল জনি হিঅ হারী।।
আপন বচন পিকবর অনুমা৷ ন।
হরি হরি তেহু পরিতেজয় পরাণে।।

এবার পারিজাতহরণের শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যাক। জয়দেবের কাব্যে কৃষ্ণবন্দনা আর কৃষ্ণের দশাবতারবন্দনা আছে। ঐশ্বর্যময় ভগবান কৃষ্ণের বিরাট স্বরূপ সেই বন্দনায় বিস্মিত। পারিজাতহরণ নাটকে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশিকায় এই কবি নাট্যকারও কৃষ্ণবন্দনা করেছেন—

কংস কোসিকুলে মোচল উগ্রসেন দলরাজ।....
ভূমিক ভার উতারব তারব দানবলোক।
ধরম ধরাতল থাপর হরব সাধুজন সেই।

সেই সঙ্গে নাটকের কাহিনীরও আভাস দিয়েছেন—'গরব হরব সুররাজক'। শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তিতেও তাঁর অবতার মহিমা প্রকাশিত। দুই কবিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশী শক্তি সম্পর্কে পাঠক আর শ্রোতাকে সচেতন করে দিয়েছেন। কিন্তু তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানিনী প্রিয়ার মানের কাছে এই অনন্ত ঐশ্বর্যময় ভগবানের সম্পূর্ণ আত্মসর্ম্পণে মধুর রসাশ্রিত কান্তাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ ঘোষণা করেছেন।

মানিনী প্রেয়সীর মান আর কৃষ্ণকর্তৃক সেই মানভঞ্জন জয়দেব এবং উমাপতি দুজনেরই উপজীব্য। গীতগোবিন্দ আর পারিজাতহরণের দুই নায়িকার মানই সহেতু মান। রাধা মান করেছেন শ্রীকৃষ্ণের অন্য নায়িকা বিলাসের জন্য, আর সত্যভামা মান করেছেন রুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অধিক পক্ষপাত প্রকাশে। গীতগোবিন্দের রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে বলেন :

হরিহরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিযাদম্।।

[গীতগোবিন্দ; অষ্টম সর্গ; ১ম শ্লোক]

আর মানিনী সত্যভামা একই ভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে সখীকে বলেন :

পুরুব পিরিতি রিতি হুনি জউঁ বিসরল
তদঅো ন হুনকর দোসে।
কতন জতন ধরি জউঁ পরিপালিঅ
সাপ না মানয় পোসে।।

এই দুর্জয় মানবতীদের মান ভাঙানোর জন্য শেষ পর্যন্ত নায়ককে নায়িকার পদধারণ করতে হয়। গীতগোবিন্দে ভীত কৃষ্ণ সখীকে বলেছেন : 'অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ'। কিন্তু এতে কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত বহু অনুনয় বিনয়ে রাধার মানভঞ্জন করা হয়েছে। পারিজাতহরণেও কৃষ্ণ ভীত হয়েই মানিনী সত্যভামার কক্ষে প্রবেশ করেছেন আর প্রথম থেকেই তিনি সত্যভামার পদসংবাহনরত। মানভঞ্জনের জন্য গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন :

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম।।

[গীতগোবিন্দ; ১০ম সর্গ, ২য় শ্লোক]

পারিজাত হরণের ত্রস্ত কৃষ্ণের উক্তি প্রায় এরই প্রতিধ্বনি :

মনিন মানহ জউঁ মোর দোসে।
সাংতি বারহ বরু ন করহ রোসে।।
ভৌঁহ কমান বিলোকন বাণে।
বেধহ বিধুমখি কয় সমধানে।
পীনপয়োধর গিরিবর সাধী।
বাহু পাস ধনি ধরু মোহি বাঁধি।।

পারিজাতহরণের নায়ক কৃষ্ণ অবশ্য শুধু পদসংবাহনেই সত্যভামার মান ভাঙাতে পারেন নি— তার জন্য তাকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধও করতে হয়েছে। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করাও তাঁর একার পক্ষে সম্ভব হয় নি —অর্জুনের সাহায্য নিতে হয়েছে। পারিজাতহরণের মূল কাহিনীর যে বৈশিষ্ট্য তা পরিবর্তিত করা যায় নি।

কিন্তু 'এহ বাহ্য', এই সমস্ত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আলোচনার পরও কেউ বলতে পারেন 'আগে কহো আর'। উত্তরে বলা যায় এই সমস্ত বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের প্রমাণেই শুধু উমাপতিকে জয়দেবের উত্তরাধিকারের যথার্থ গ্রাহক বলা হচ্ছে না। জয়দেবের কাব্যের মূল সুর তার গীতিপ্রণতা। গীতগোবিন্দের অভিজাত সংস্কৃত শ্লোক অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে এই প্রাণোচ্ছল গীতগুলির পাশে। তাই সাহিত্যের ঐতিহাসিক এই ধরণের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন : 'জয়দেবের গীতিকাব্য, আসলে চব্বিশটি পদাবলীর সমষ্টি। প্রস্তুত বিষয়ের সর্বান্তিক শ্লোকগুলির...আমদানি হয়েছে শুধু মহাকাব্যোচিত সর্গবিভাগের প্রয়োজনেই।' [বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ; সুকুমার সেন; মঙ্গলযাত্রা, নাটগীত ও পাঁচালি কীর্তন; পৃ. ৬৩]

পারিজাতহরণ সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য অনুরূপ। মৈথিলী পদাবলীগুলিই উমাপতির নাটকটির ঐশ্বর্য।

জয়দেবের কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য আমরা গ্রহণ করবো কিনা—তা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু তাঁর কাব্যের শ্লোকগুলির তুলনায় গীতের বহুল জনপ্রিয়তার অন্যান্য নিদর্শনও আমরা পেয়েছি। জয়দেবের গীত কেবল সাহিত্যরসবোদ্ধার সহৃদয় স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করে থাকে নি। পদ্মাবতীর ললিত নৃত্যে আর কবিকণ্ঠের শ্রবণসুভগ সঙ্গীত মাধুর্যের বিস্তারে ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের আস্বাদনযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কোচবিহারের ছোটরাজা শুক্লধ্বজ তাঁর গীতগোবিন্দ টীকায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তাঁর সভাকবি রামসরস্বতীও 'জয়দেব' কাব্যে বলেছেন :

কৃষ্ণের গীতক জয়দেবে নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

[সুকুমার সেন, প্রগুক্ত]

গীতগোবিন্দের শেষ শ্লোকেও কবি পরাশর প্রভৃতি প্রিয় বন্ধুর কণ্ঠে গীতগোবিন্দের কবিত্বসিদ্ধি কামনা করেছেন। কাব্যকে সর্বসাধারণের উপভোগ্য করে তোলার জন্য নৃত্যগীতমাধ্যমের ব্যবহার নিঃসন্দেহে গীতগোবিন্দের গীতকে ব্যাপক ও বহুলভাবে জনপ্রিয় করেছে। সচেতন শিল্পী হিসেবে

জনপ্রিয়তার এই সূত্রটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণেই চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে মৈথিল ভাষায় গীতিরসসুরভিত পদ তাঁর নাটকেই আমরা পেলাম। তাঁর নাটকে গীতগুলি সব সময় নাটকের কাহিনীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বিভাসরাগে গাওয়া সত্যভামার একটি গানের কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরা যায় :

কোকিল অলিকুল কলরব আকুল
করও বহও দুহুঁ কানে
সিসির সুরভি জত দেহ দহত্ত তত
হনও মদন পচ বাণে।।

বসন্তকালীন প্রকৃতির মনোরম পটভূমিকায় নায়ক অথবা নায়িকার মদনবাণে বিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা জয়দেবের গীতগোবিন্দেই যে শুধু রয়েছে তা নয়—পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও এটি একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। তবে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করায় সত্যভামার ক্রোধের অর্থ আমরা বুঝতে পারলেও মদনবাণে বিদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। কিন্তু নাটকের সঙ্গে এর যোগ যত অল্পই থাকুক না কেন—গীতগুলি ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতির স্পন্দনে জীবন্ত। এগুলির অন্য-নিরপেক্ষ শিল্পসৌন্দর্যও নিতান্ত কম নয়। নাটকের প্রথম দিকের গীতে যে বসন্ত বর্ণনা রয়েছে তা গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের বসন্তবর্ণনার মতই মনোরম। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরছি :

অতি মুংজুবংজুল পুংজমিংজল চারু চূঅ বিরাজহী।
নিজ মধুহিঁ মাতলি পল্লবচ্ছবি লোহিতচ্ছবি ছাজহীঁ।।
পুনু কেলিকলকল বতহু আকুল কোকিলা কুজন কুজহী।
জনি তীনি জগ জিতি মদন-নৃপমণি বিজয় বাজ সুরাজহী।।
নব মধুর মধুর সুমগুধ মধুকর নিকর নিকরসভাবহী।
জনি মানিনী জন মান ভংজন মদন গুরুগুণ গাবহীঁ।।

এই কারণেই জয়দেবের মতো উমাপতির একুশটি গীতও শুধুমাত্র সাহিত্যের পাতায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি—মৈথিল জনসাধারণের কণ্ঠে স্থায়ী আসন পেয়েছে।

কিন্তু উমাপতি শুধু জয়দেবের ঋণই গ্রহণ করেন নি। তাঁর কাছেও ঋণী হয়েছেন—মিথিলার তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি বিদ্যাপতি। উমাপতির নাটকের গানগুলি মিথিলায় কোনো কোনো সময় অভিন্ন হয়ে গেছে বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে— এমনকি উমাপতির নামেই মিথিলায় প্রচলিত ছিল। পূর্বোল্লিখিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় মুদ্রিত জনৈক শশিভূষণ বিশ্বাসের 'বিদ্যাপতির পারিজাতহরণ' প্রবন্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবন্ধকারের আলোচনা দেখে মনে হয় জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন বহু পুঁথি দেখে উমাপতির যে পারিজাতহরণ সংকলন করেছেন, সেই পারিজাতহরণেরই কোনো বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পুঁথি প্রবন্ধকার তাঁর আলোচনার আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ প্রবন্ধকার নাটকটির যে কাহিনী বলেছেন তা উমাপতির পারিজাতহরণেরই কাহিনী। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত পদ বা পদ্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরূপ, কোথাও বা কিঞ্চিৎ পাঠান্তরযুক্ত। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে যেতে যেতে গান গাইছেন: সখি হে রভসরঙ্গ চলু খুলবাড়ী। /তাঁহা মিলত মোহি মদন মুরারি।।' এই উদ্ধৃতিটি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ও আমাদের আলোচ্য গ্রিয়ার্সনের পারিজাতহরণে হুবহু একই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করলে রুক্মিণী যে গান করেছেন—তা

একেবারে অনুরূপ নয়। প্রবন্ধের উদ্ধৃতিতে রয়েছে :

আজ জন্ম ফল ভেলা। সব সখি পরিহরি মোহি ফুল দেলা।।
পুরব পুজল হাস গৌরী। আশা দেয় পরিপূরল মোরি।।
উপর রহল মোর মাথে। ষোড়শ সহস্র বরনারীকে সাথে।।

গ্রিয়ার্সন সম্পাদিত নাটকে রয়েছে :

আজ জনম ফল ভেলা। সভ পরিতেজি হরি মোহিফুল দেলা।।
পূজল পুরুব হম গৌরী। আসা তনি পরিপূরলি মোরি।।
উপর রহল মোর মাথে। সৌউস সহস রব নারিক সাথে।

অতএব যেটুকু পার্থক্য তা পাঠান্তর হিসেবেই গৃহীত হতে পারে—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রবন্ধকার তাঁর আলোচ্য নাটকটি বিদ্যাপতির বলে বর্ণনা করেছেন আর ভণিতা উদ্ধৃত করেছেন নিম্নরূপ :

'সুমতি বিদ্যাপতি ভণ পরমাণে। জগমাতা দৈ হিন্দুপতি জানে।

অতএব, আমাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত শশিভূষণ বিশ্বাস 'সাহিত্য' পত্রিকায় যে পারিজাত হরণ নাটকটির আলোচনা করেছেন, তা বিদ্যাপতির নয়, উমাপতিরই। কিন্তু প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত এই নাটকটি মিথিলাতে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল : "এই গীতিনাট্যের গীতগুলির মিথিলায় বড় আদর। তথায় 'পারিজাতহরণ' সুর-তান-লয়ে গীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গানেই বিদ্যাপতির ভণিতা।" এই তথ্য থেকে আমরা আর একটি সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছি—উমাপতির নাটক মৈথিল জনমানসে বিদ্যাপতির উত্তরকালেও সমাদৃত ছিল। বিদ্যাপতির প্রতিভাদীপ্তি তাকে গ্রাস করতে পারে নি। কেবল নামের খ্যাতিটুকু তাতে আরোপিত হতে চাইছিল। এইসব তথ্য প্রমাণ থেকে একদিকে উমাপতির দীর্ঘস্থায়ী কবিত্ব শক্তির যেমন প্রমাণ পাই তেমনি আর একটি সম্ভবনার কথাও মনে জাগে। এই দুই কবির মধ্যে মিলন-মিশ্রণযোগ্য কোনো ঐক্য নিশ্চয়ই ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীতে উমাপতির প্রভাব অন্বেষণ করে আর উভয়ের শিল্পগত ঐক্যের সন্ধান করে এরপর আমরা সেই জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে পারি।

এক শতাব্দী আগে পূর্ববর্তী কবি জয়দেব উমাপতিকে স্বাভাবিক করেছেন। এদিক থেকে বিদ্যাপতিও সেদিন বিপুলভাবে লোকপ্রিয় কবিব্যক্তিত্বের কাছে ঋণী। নিজেকে তাই বারবার কবি অভিহিত করেছেন 'নব জয়দেব' ও 'অভিনব জয়দেব' নামে। সুতরাং উমাপতি ও বিদ্যাপতি উভয়েই কাব্যরচনায় একই শিল্পীব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সেই কারণে তিন শতাব্দীর এই তিন কবির মধ্যে কখনও কখনও একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

ক. জয়দেবের মানিনী রাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে নায়ক কৃষ্ণ বলেন :

বন্ধুকদ্যুতির্বান্ধবো হয়মধরঃ স্নিগ্ধোমধুকচ্ছবি।
গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীল-নলিন শ্রীমোচনং লোচনম্।।

খ. উমাপতির কৃষ্ণও মানিনী সত্যভামার মান ভাঙাতে গিয়ে রূপবর্ণনার জন্য পুষ্পোপমার আশ্রয় গ্রহণ করেন :

কমলবদন কুবলয় দুহুঁ লোচন
অধুর মধুরি নিরমানে।
সগর সরীর কুসুম তুঅ সিরিজল
কি এ তুঅ হৃদয় পখানে।।

গ. অনুরূপভাবে বিদ্যাপতির কৃষ্ণও মানিনী রাধাকে বলেন—

অধর মধুরি ফুল পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কতখন জীবে।।
মানিনি মন তোর গড়ল পসানে।।

এক্ষেত্রে জয়দেবের প্রভাব দুজনের ওপরই ক্রিয়াশীল—এই মন্তব্য কেউ কেউ করতে পারেন। কিন্তু উমাপতি ও বিদ্যাপতির উদ্ধৃত পদ্যাংশের শেষ পংক্তি জয়দেবে অনুপস্থিত। সুতরাং এক্ষেত্রে উমাপতিই বিদ্যাপতিকে প্রভাবিত করেছেন—নিঃসন্দেহে এই মন্তব্য করা যায়। জয়দেবের নয়, উমাপতির বাগ্‌রীতিই বিদ্যাপতি ব্যবহার করেছেন।

মানিনী নায়িকার অবস্থা বর্ণনাতেও উমাপতি আর বিদ্যাপতির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। জয়দেবের নায়িকা বলেন :

নিন্দতিচন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাসনিয়লমিলনেন গরলমিব কয়লতি মলয়সমীরম্।

রাজসভার কবি উমাপতি ঈষৎ পরিবর্তিত করে তাঁর মানিনী সত্যভামার বর্ণনায় বলেন:

অপনক আনন আরসি হেরি
চানক ভরম কোপ কত বেরী।

এবং ভরি বরিসত্তো বিস বহত্তো দহত্ত দিস
মলয় সমীণণ মংদা।।

বিদ্যাপতিও যেন উমাপতির অনুসরণেই কিঞ্চিৎ প্রকট নাগরিকতার অনুলেপনে তাঁর বিরহিনী নায়িকার বর্ণনা দেন :

নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভুসন
চাঁদ মানএ জনি আগী

তিনজন কবিরই উপজীব্য প্রেম। জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যনায়িকা রাধা। উমাপতির সত্যভামা। তবে জয়দেবের রাধাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মতো প্রশ্ন করতে পারি—'কোন কালে ছিলেন নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়সী?' খণ্ডিতা রাধাকে দিয়েই তাঁর কাব্য আরম্ভ—উমাপতির কাব্যও প্রেমকলায় অভিজ্ঞা পরিণত যৌবনা পুরাণ নায়িকা সত্যভামাকে দিয়েই শুরু। অন্যদিকে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা নিয়ে বিচ্ছিন্ন পদরচনা করলেও, তাঁর রাধা কৈশোর থেকে যৌবনের উপকূলে উত্তীর্ণা। জয়দেব আর উমাপতির উপজীব্য নায়িকার মান ও নায়ক কর্তৃক মানভঞ্জন। কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্যে রয়েছে নায়িকার প্রথম যৌবন সমাগমের আনন্দময় কৌতূহল, নায়কনায়িকার পূর্বরাগ, অভিমানের অবসানে জয়দেবের মতোই অনঙ্গরঙ্গময় অনাবৃত কামকেলির উত্তপ্ত উল্লাস। জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাদৃশ্য অলংকৃত কাব্যকলা সৃজনেও,— কিন্তু মান আর মানভঞ্জনের পদে বিদ্যাপতি বহুলাংশে উমাপতির দ্বারা প্রভাবিত। উমাপতির কৃষ্ণ মানিনী প্রেয়সীকে বলেন :

অরুন পুরব দিসি বহলি সগর নিসি
গগন মগন ভেল চন্দা।

বিদ্যাপতির কৃষ্ণও মানিনী রাধাকে বলেন :

কতএ অরুণ উদয়াচল উগল
কতএ পছিম গেল চন্দা।

[বিদ্যাপতির, মিত্র মজুমদার সংস্করণ; ৩৮৬ সংখ্যা শব্দ]

এই ধরনের সাদৃশ্য আরও আছে।

মানিনী সত্যভামার আক্ষেপোক্তিতে প্রেমিকার প্রেমগর্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ায় যে হতাশ বেদনার সুর শোনা যায়—বিদ্যাপতির রাধার কণ্ঠেও সেই একই বেদনা অনুরণিত হয়েছে একই ধরণের বাক্‌বিন্যাসে। উমাপতির সত্যভামা বলেন :

হরি সউঁ প্রেম আস কয় লাওল
পাওল পরিভব ঠামে।
জলধর ক্কাহরি তর হম সুতলহুঁ
আতপ ভেল পরিণামে।। ......
পুরুব পিরীতি রিতি হনি জউঁ বিসরল
তই ও ন হুনকর দোসে।
কতন জতন ধরি জউঁ পরিপালিঅ
সাপ ন মানয় পোসে।
কবহু নেহ পুনু নাহি পরগাসিঅ
কেবল ফল অপমানে।
বেরি সহস দস অমিঅ ভিজাবিঅ
কোমল ন হঅ পখানে।।

এই আক্ষেপে নায়িকার বেদনা আর ক্ষোভ দুই-ই ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে জয়দেবের রাধার সুদীর্ঘ আক্ষেপে শুধু অন্য নায়িকার সঙ্গে রভসমত্ত কৃষ্ণের বর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু উমাপতির সত্যভামার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় রোমান্টিক বেদনার উপস্থিতি। আর এই কারণেই আসঙ্গ উল্লাসে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাপতির রাধা মনোধর্মে জয়দেবের নয়—উমাপতির সত্যভামারই সগোত্রীয়া। তাঁর রাধাও আক্ষেপ করে বলেন :

আতপেঁ তাপিত সীতল জানিকহু
সেওল মলয় গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দূরে গেল
কত্রল দাবানল দাহে।।
কত দুখে আজ সমুদ্রতির পাওল
সগরেও জল ভেল ছারে।

এই পদেও উমাপতির নায়িকার মতো একই আঘাতের তীব্রতায় বেদনার অশ্রুমোচন। ভাবের এই ঐক্য ছাড়াও শব্দ, চিত্র আর চিত্রকল্পের সাদৃশ্যও সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

আর সম্ভবত এই সাদৃশ্যের কারণেই কখনও কখনও উমাপতির পদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিদ্যাপতির পদাবলীতে। উদাহরণ হিসেবে একটি পদের উল্লেখ করা যায়,—উমাপতির একটি গীত :

অরুণ পুরুব দিশি বহলি সগরি নিসি
গগন মগন ভেল চন্দা
মুনি গেলি কুমুদিনি তইঅো তোহর ধনি
মুনল সুখ অরবিন্দা।।

পদটি 'বিদ্যাপতি পদাবলীর বসুমতী সংস্করণে' কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে সংকলিত [বিদ্যাপতি পদাবলী;

বসুমতী সংস্করণ; ম্যান; পদসংখ্যা—২৩]। মিত্র মজুমদার সংস্করণের নিপুণ সম্পাদকদের বিবেচনায় এটি বিদ্যাপতির পদ বলে গৃহীত হয় নি। এটিকে আমরা বিদ্যাপতির পদ বলে প্রমাণও করতে চাই না। কিন্তু বসুমতী সংস্করণে উমাপতির এই পদটির অবিকল অন্তর্ভুক্তিই প্রমাণ করে, কাব্যকলায় ভাবভাবনায় এই দুই কবির এমনই সাদৃশ্য ছিল, যার পারস্পরিক মিশ্রণে পাঠক বা শ্রোতার ঔচিত্যবোধ পীড়িত হয় না।

আসলে বিদ্যাপতির বিপুল প্রতিভার মূল্যায়নে আমরা জয়দেবের কথা ভাবি, আবিষ্কার করার চেষ্টা করি পূর্ববর্তী বিপুল ভারতীয় সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ। কিন্তু তাঁর নিজের ভাষার এই স্বল্পবিত্ত পূর্বসুরী অপরিচয়ের জন্যই আড়ালে থেকে যান। উমাপতির যে সমস্ত পদ যৎসামান্য পাঠান্তরে বিদ্যাপতির ভণিতায় পাওয়া যায় তা যদি প্রক্ষেপ বলেও মেনে নেওয়া যায় তবু পদ্যাংশ, ভাবভাবনা, চিত্র, চিত্রকল্পের ঐক্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। মিত্র মজুমদার সংস্করণে সংকলিত পদেও এই প্রভাব লক্ষ্য করে বলা যায় উমাপতি বিদ্যাপতিতে প্রক্ষিপ্ত নন, বিদ্যাপতি উমাপতির দ্বারাই প্রভাবিত। এই প্রভাবসূত্র ইতিহাসের ক্রমরক্ষার যেমন সূত্রসন্ধান দেয়—তেমনি বিদ্যাপতির কবিব্যক্তিত্বের উৎসসন্ধানেও কিছুটা আলোকপাত করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা-বিচারে এই তথ্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এখন আমাদের কোন্ ভাষাতত্ত্ব চাই

• • • • • •

নির্মল দাস

১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সভায় যে বক্তৃতা দেন তাতে ইউরোপের কয়েকটি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। এখান থেকেই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত। এবং ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বলা হয় যে এখান থেকেই ভাষাবিজ্ঞানচর্চারও আধুনিক পর্বের সূচনা। এর পর এরই সূত্র ধরে গোটা উনিশ শতক জুড়ে প্রথমে তুলনামূলক ভাষাব্যাকরণ, তারপর ঐতিহাসিক ভাষাব্যাকরণের চর্চা চলতে থাকে। ব্যাকরণচর্চার এই দুটি ধারাই ছিল লিখিত সাহিত্যের ভাষা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণকারেরা ক্রমে লক্ষ করলেন যে ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস শুধু ভাষার লিখিত নিদর্শনের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে না, ভাষার ইতিহাসের অনেক অদৃশ্য সূত্র ভাষার কথ্য রূপের মধ্যেও নিহিত থাকে। এরই সূত্র ধরে উনিশ শতকের শেষ দিকে দেখা দিল কথ্য উপভাষার সন্ধান ও বিশ্লেষণ। এইভাবে ভাষাবিজ্ঞান ভাষার লিখিত রূপের এলাকা ছেড়ে ভাষার কথ্যরূপের দিকে পা বাড়াল। এর পর বিশ শতক ধরে মুখের ভাষা ও তার মান্যরূপ ধরে একে একে নানা শৃঙ্খলার ব্যাকরণচর্চা শুরু হল। বর্ণনামূলক, সংগঠনমূলক, শেষে সঞ্জননী-সংবর্তনী ভাষাবিজ্ঞান। এর সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি দেখা গেল ভাষাবিজ্ঞানের নানা পার্শ্বশাখা, যেমন : সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরে ভাষাবিজ্ঞানের যেসব শাখা ও পার্শ্বশাখার উল্লেখ করা হল সেগুলির উদ্ভব ও অনুশীলন সমাজের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘটেছে, তবে সব বিদ্যাশৃঙ্খলারই থাকে দুটো দিক : তাত্ত্বিক দিক ও ব্যাবহারিক দিক। তাত্ত্বিক দিকের ক্ষেত্রে প্রবক্তার বিশেষ দার্শনিক উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধি রূপায়ণের প্রয়াস বিশেষভাবে কাজ করে। সেখানে সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের সঙ্গে তার তেমন যোগ না-ও থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যাশৃঙ্খলার ব্যাবহারিক দিক থেকে সমাজের ব্যাবহারিক প্রয়োজনের বিষয়টাই সবচেয়ে জরুরি। প্রকৃতপক্ষে আঠারো শতকের শেষে এবং গোটা উনিশ শতক জুড়ে যে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাকরণচর্চার বিস্তার ঘটেছে তার সঙ্গে জড়িত ছিল সমসাময়িক ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাবহারিক স্বার্থ, বিশ শতকের সংগঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের পেছনে ছিল বিশ্বযুদ্ধের সাময়িক চাহিদা যাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অচেনা জায়গায় সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সেনাদলকে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত করানো যায়। আবার, অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে যে নতুন করে তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলন শুরু হয় তার পেছনেও ছিল পূর্ব-ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রসারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : এখন এই মুহূর্তে সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে কোন্ ধরনের ভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলন বিশেষভাবে জরুরি।

. এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলে আগে দেখা দরকার পশ্চিমবঙ্গে এখন ভাষাবিজ্ঞানচর্চার অবস্থাটা কী? সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞানচর্চার অবকাশ দুটি ক্ষেত্রে : এক. বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ধরে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন, দুই. প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের কোনো শাখায় গবেষণা। পশ্চিমবঙ্গে গত শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণায় প্রধানত তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান নামান্তরে বহুকালিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এরপর রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সত্তরের দশক থেকে সংগঠনমূলক-বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মতো এককালিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা যুক্ত হয়েছে। এখন তত্ত্বমূলক সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও ভাষাবিজ্ঞানের সাধারণপত্রে স্থান পাচ্ছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে উপভাষা নিয়ে এককালিক গবেষণা ও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্কসন্ধানী তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা ক্রমশ পিছনে পড়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর সামাজিক পরিস্থিতির দিক থেকে এই অবস্থা কতটা কাম্য?

প্রথমত, ভারতবর্ষ একটি বহুভাষিক দেশ। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক ভাষানীতির ফলে সারা ভারতে ইংরেজির একচ্ছত্র প্রসার ঘটেছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, না সিলেবাসের মধ্য দিয়ে, না সমাজের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার বদলে আরও অবনতি ঘটেছে। একদিকে রাষ্ট্রভাষার নামে জনসম্পর্কহীন এক কৃত্রিম হিন্দির আধিপত্য, অন্যদিকে প্রাদেশিক ভাষাগুলির অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিকতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। আমরা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জাতীয় সংহতির কথা বলি, কিন্তু ভারতে যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার মানুষের বসবাস তাদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা কোথায়? জাতীয় শিক্ষানীতি, ভাষানীতিতে তার প্রতিফলন কোথায়? এর জন্য দরকার জাতীয় শিক্ষানীতির অঙ্গ হিসোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার নানাস্তরে ভারতীয় ভাষা নিয়ে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণা। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহে স্নাতকোত্তর স্তরে মাতৃভাষার পঠন-পাঠন করতে হলে আর একটি ভারতীয় ভাষার অধ্যয়ন করতে হত। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থাও অন্তর্হিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ৬০ বছর কেটে গেল। এখনও কি বিষয়টি নিয়ে পুনর্ভাবনার সময় আসে নি? বিগত ৬০ বছরে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে ভাষাগবেষণার নানা কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেগুলিতে ভাষাভিত্তিক জাতীয় সংহতির প্রয়াস কোথায়? সব মিলিয়ে কি মনে হয় না যে এখন ফেলে-আসা বহুকালিক ভাষাবিজ্ঞান বা তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিকীকৃত পুনর্বাসনের সময় এসে গিয়েছে? এ কাজ একজন-দুজন গবেষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ফেলে না দিয়ে এ ব্যাপারে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত উদ্যোগ দরকার।

দ্বিতীয়ত, যেসব শক্তি বিশ্বের বাজার-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের চোখে ভারত একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় শক্তিধর দেশ। হয়তো ভারতের জনসংখ্যার বিপুলতা, মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এই ভাবনার একটা বড়ো কারণ। এই কারণে ভারত এখন রাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। এই গুরুত্ব আরও নিবিড় ও ব্যাপক করতে হলে দরকার এই এলাকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্তরে সম্পর্ক স্থাপন। এই কাজটা এক দিক থেকে খুব কঠিন নয় এই কারণে যে অতীতে এই সব দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সূত্রে ভারতের সঙ্গে এই সব দেশের একটা সম্পর্কের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই পুরনো

ঐতিহ্যের আধুনিক পুনর্বাসন ঘটাতে পারলে তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। এক্ষেত্রেও দরকার প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা যা মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অনুষঙ্গী গবেষণাকেন্দ্র থেকেই পাওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এখন একদিক থেকে দরকার তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মতো বহুকালিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা, অন্যদিকে দরকার উপভাষাচর্চার মতো এককালিক ভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা হলেও এখানে দীর্ঘদিন ধরে অন্যভাষার মানুষেরাও বসবাস করেন। বিশেষ করে এখানে নানা নৃবংশের আদিবাসী মানুষ আছেন যাঁরা বাংলা-ভাষী জনসমাজের দীর্ঘ দিনের প্রতিবেশী, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর তেমন নিবিড় ও ব্যাপক যোগ স্থাপিত হয়নি। এই সব আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঘরে মাতৃভাষা ব্যবহার করলেও বাইরে কাজের জগতে বাংলাভাষা ব্যবহার করেন। এতে বাংলাভাষী মানুষের একটু শ্লাঘাবোধ হলেও বিষয়টি তেমন বাঞ্ছনীয় নয়। এইসব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করতে হলে, তাঁদের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করতে হলে ভাষা ও সংস্কৃতির স্তরে তাঁদের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্পর্ক তৈরি করাই বাঞ্ছনীয়। আর এক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নানা দিক থেকে সাহায্য করবে।

আগেই বলেছি, পশ্চিমবঙ্গে এখন বহুকালিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে উপভাষাবিজ্ঞানের মতো এককালিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও সামাজিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত পশ্চিমবঙ্গে [এমনকি বাংলাদেশেও] বাংলা কথ্য উপভাষা নিয়ে কোনো ব্যাপক কাজ হয় নি, যা হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন ও বিকীর্ণ। দ্বিতীয়ত উপভাষাচর্চার মধ্যে ভাষার আঞ্চলিক শাখাই হচ্ছে উপভাষা—অর্থাৎ উপভাষা ভাষার চেয়ে ছোটো—এই ধরনের একটি ভ্রান্ত ঔপনিবেশিক ধারণা বলবৎ থাকায় উপভাষাচর্চার অনেক জায়গায় বৈজ্ঞানিকতার অভাব ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই গবেষকরা উপভাষার বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে মান্য চলিত বাংলার সঙ্গে তুলনা করে তার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। এটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা ভেবে দেখার দরকার আছে। কাজেই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাপকভাবে উপভাষাচর্চা শুরু করতে হবে। এ কাজ ব্যাপকভাবে করতে হবে, তার কারণ তার ফলে বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হবে এবং কথ্য উপভাষাগুলি যে বাংলা ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রকাশ তা উপলব্ধি করে উপভাষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ঔপনিবেশিক ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদকেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ODBL [১৯২৬] প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বাংলা উপভাষাগুলির তুলনা করতে পারলেই বাংলা ভাষার বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অমূল্য গবেষণাকার্যের অসামান্যতা স্বীকার করেও বলতে হয় ঐ গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক পুনর্গঠনকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষাগুলির তুলনার উপর তেমন নির্ভর করা হয় নি। সেটা তখন করাও তেমন সুবিধাজনক ছিল না, কারণ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কাজের সময় বাংলা উপভাষার ক্ষেত্রভিত্তিক বিস্তৃত পরিচয় তেমনভাবে প্রকাশিত হয় নি। এখন উপভাষার চর্চা তেমন ব্যাপ্তিলাভ না করলেও যেটুকু কাজ হয়েছে তাতে বেশ বোঝা যায় উপভাষাগুলির আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যেই বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের অনেক অনালোকিত সূত্র নিহিত আছে। এই কারণেই বাংলা ভাষার ইতিহাস নতুন করে লিখতে গেলে বাংলা কথ্য উপভাষাগুলি নিয়ে আরও কাজ হওয়া দরকার।

উপভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এখন সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও ব্যাপকভাবে করা দরকার। কারণ উপভাষাচর্চায় ভাষার ভৌগোলিক বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পুরোপুরি সামাজিক

ছবিটা তাতে ধরা পড়ে না। যেমন, কলকাতার উত্তর-পূর্ব এলাকার সল্টলেক বা দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্ক এলাকায় ধনী বসতির পাশাপাশি গরিব জনবসতি আছে। এই দুই বসতির বাংলাভাষী বাসিন্দাদের বসবাস একই ভৌগোলিক এলাকায় হলেও তাদের ভাষাব্যবহারে তফাত আছে। এই তফাতের কারণ ভৌগোলিক নয়, আর্থসামাজিক। ভাষার এই আর্থসামাজিক বৈচিত্র্য ধরা পড়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানচর্চায়। সামাজিক উন্নয়ন আমাদের আনুষ্ঠানিক সঙ্কল্প হলেও বর্তমানে সরকারের দিক থেকে এ ব্যাপারে একটা সচেতন ও সক্রিয় প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে যা আগে ছিল না। আমরা তো জানি উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সব মানুষকে আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে উন্নয়নের একটা মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা। কিন্তু আমাদের সমাজ নানাভাবে শ্রেণিবিভক্ত, তাই নানা ধরনের প্রান্তিকায়নের লক্ষণ আমাদের সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান। সমাজের এই প্রান্তিক অংশকে সমাজের কেন্দ্রীয় মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চাই মানসিক স্তরে যোগাযোগের উন্নয়ন যা একমাত্র সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমেই করা সম্ভব। দেশে জাতীয় স্তরে সার্বিক সাক্ষরতার কাজ শেষ হয়েছে, সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজ এখনও চলমান। কিন্তু এ কাজে অসুবিধা হচ্ছে ভাষার ক্ষেত্রে। সাক্ষরতা ও সর্বশিক্ষার জন্য যেসব বই ব্যবহার করা হয় তার ভাষা বাংলা হলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত-এলাকার বাঙালিদের মধ্যে ঐসব বই ব্যবহারে অসুবিধা হচ্ছে। সেই অসুবিধা যত না ভৌগোলিক তার চেয়েও বেশি আর্থসামাজিক। এই অসুবিধা দূর করতে হলে দরকার সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রসমীক্ষা যা আমাদের কাছে সমস্যার স্বরূপ সনাক্ত করে সমাধানের পথও বাতলে দেবে। অথচ এই জরুরি কাজে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। কিন্তু পিছিয়ে থাকলে তো চলবে না, এগোবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তার জন্য চাই উপযুক্ত অ্যাকাডেমিক পৃষ্ঠপোষকতা যা পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এই জন্য দরকার স্নাতক-স্নাতকোত্তর স্তরে ভাষাবিজ্ঞানের পাঠক্রমে সময়োপযোগী নানা পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস। বলা বাহুল্য, সিলেবাসের এই পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা পরিকল্পিত সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। না হলে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সামাজিক স্তরে কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।।



বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

• • • • • •

অনিমেষকান্তি পাল

এক.

বাংলা ভাষায় বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণতা দান করার দিক থেকে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে।

যে ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণতা দান করে, তাকে বলে সমাপিকা ক্রিয়াপদ। সমাপিকা ক্রিয়াপদে ক্রিয়ার কাল, ভাব, প্রকার এবং কর্তার পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।

যে ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণতা দান করে না, কিন্তু সক্রিয়তার ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, তাকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অন্তে ইয়া/এ, ইলে/লে, ইতে/তে প্রত্যয় যুক্ত হয়। ইবা/আ প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যয়ের দিক থেকে বিচার করে দেখলে বাংলা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদ চার রকমের।

সারণী—১

	সাধু	চলিত	তাৎপর্য
১	ইয়া	এ	পূর্বকালীন
২	ইলে	লে	শর্তসাপেক্ষ
৩	ইতে	তে	নিমিত্তার্থক
৪	ইবা	আ	ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য, পূর্বকালীন

এই চার ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়াপদ কী অর্থে ও কীভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা বিবেচনা করে দেখা যাক।

১. পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ : 'সে ভাত খাইয়া/খেয়ে বিদ্যালয়ে গেল'—বাক্যে ক্রিয়া ব্যাপার হল দুটি—খাওয়া এবং যাওয়া। খাওয়া কাজটি আগে হয়েছে তাই সেটি পেল ইয়া/এ-অন্ত অসমাপিকা রূপ আর যাওয়া কাজটি তার পরের ঘটনা তাই সেটি পেল সমাপিকা রূপ।

তবে, 'সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে/ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে' বাক্যে নাক ডাকা এবং ঘুমানো—দুটো কাজই যে একসঙ্গে চলছে তা বোঝা যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তব জীবনের যুক্তি ব্যাকরণে সব সময় মেনে চলা হয় না। ব্যাকরণে কতকগুলো ব্যাপার ধরে নেওয়া হয়। যেমন—আলোচ্য বাক্যটিতে ঘুমানো ব্যাপারটাই' মুখ্য ক্রিয়া তাই সেটি সমাপিকা রূপ পেল আর নাক ডাকানো ব্যাপারটা গৌণ ক্রিয়া, তাই তা পূর্বকালীন অসমাপিকা রূপ পেল কারণ যেটি মুখ্য বা প্রধান ক্রিয়া তারই সাহায্যে বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণতা দান করা যায়।

ইয়া/এ অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া পূর্বকালীন, অর্থাৎ, আগে ঘটে যাওয়ার অর্থ প্রকাশ করে বলে এর সাহায্যে বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াগুলির পারম্পর্য দেখানো যায়, অর্থাৎ দেখানো যায় কোনটার পর কোনটা ঘটেছে এবং তার ফলে বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ সাধন করা যায়, খণ্ডবাক্যগুলিকে একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে দেওয়া যায়। যেমন—'বাড়িতে যাইয়া, স্নান করিয়া, ভাত খাইয়া, ফিরিয়া আসিও'—বাক্যটিতে অসমাপিকা রূপে ক্রিয়াগুলির পারম্পর্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আবার—'তারা বাড়ি এসে সকলকে এক জায়গায় ডেকে সবকথা বলল—বাক্যটিতে তিনটি আলাদা উক্তি বা খণ্ডবাক্য পাওয়া যাচ্ছে (১) তারা বাড়ি এল, (২) সকলকে এক জায়গায় ডাকল, (৩) সব কথা বলল। প্রথমটিতে ক্রিয়াপদ অসমাপিকা রূপে উক্তি বা খণ্ডবাক্যগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়ে একটি বাক্যে পরিণত করেছে। তাছাড়া, ইয়া/এ-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াটি আগে ঘটে যাওয়া বোঝায় বলেই তা ক্রিয়া-বিশেষণের মতো কাজ করে। কোন সময়ে বা কেমন করে কাজটি ঘটেছে, তা বোঝানো তো ক্রিয়া বিশেষণের কাজ।

২. শর্ত সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়াপদ : ইলে/লে-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, সমাপিকা ক্রিয়াপদটি সম্পন্ন হওয়ার জন্যে একটা শর্ত সৃষ্টি করে, যেমন—'সে আসিলে আমি যাইব'—বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ 'যাইব' অসমাপিকা ক্রিয়াপদ 'আসিলে'র উপর নির্ভরশীল। আস্ ধাতুর দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদটি সম্পন্ন হয়ে গেলে পরবর্তী সমাপিকা ক্রিয়াপদ 'যাইব' সংঘটিত হবে।—এই শর্ত বোঝা যায়।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, ক্রিয়া দুটির কর্তা আলাদা আলাদা। 'আসিলে' ক্রিয়ার কর্তা 'সে' এবং 'যাইব' ক্রিয়ার কর্তা 'আমি'। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি বাক্যে যদি দুটি কর্তা থাকে এবং তাদের যদি আলাদা আলাদা ক্রিয়া থাকে, তবে যে ক্রিয়াটি পূর্বকালীন অর্থাৎ আগে ঘটবার, সেই ক্রিয়াটির অন্তে ইলে/লে প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। তার ফলে সময়ের পারম্পর্য সৃষ্টি হয় এবং এই শর্তসাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি বাক্যের অন্তর্গত একাধিক উক্তি বা খণ্ডবাক্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে পারে।

সাধু ভাষায় ইলে এবং চলিত ভাষায় লে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শর্তসাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি গঠিত হলে তা কেমন ভাবে সময়ের পারম্পর্য সৃষ্টি করে, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে কিন্তু সময়ের পারম্পর্য বোধকে আরও স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে ইলে/লে প্রত্যয়ান্ত পদের শেষে 'পর', 'পরে' শব্দও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন—'সে আসিলে পরে আমি যাইব' কিংবা 'সে এলে পরে আমি যাব।'

ইলে/লে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের আরও এক বিশেষ রকমের প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যেমন—'সে এখন এলে হয়', 'চোরটি ধরা পড়িলে ভালো'। তবে এই দুটি বাক্যেই একটি পরে পদ উহ্য আছে অর্থাৎ অনুক্ত আছে, যথা—সে এখন এলে [ভালো হয়]; চোরটি ধরা পড়িলে ভালো [হয়]। দেখা যাচ্ছে, এই দুটি বাক্যেও আসলে দুটি করে ক্রিয়াপদ। তাই শর্তসাপেক্ষ অসমাপিকা আগে ঘটে যাওয়া কাজকে বোঝায়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটি তির্যক অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলা, তাই একটু অন্যরকম লাগে।

কিন্তু 'তুমি মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে গেলে পার' বাক্যটিতে লে-অন্ত ক্রিয়াপদ সম্ভাব্যতা বোঝাচ্ছে। আগের দুটি বাক্যেও এই সম্ভাব্যতার অর্থটি স্পষ্ট। এই সম্ভাব্যতা আরো স্পষ্ট হয় এই ধরনের বাক্যে—'তাহারা কথাটা বলিলে বলিতে পারে'। শর্ত সৃষ্টি এবং ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা — দুটি ধারণারই সুযোগ নেওয়া হয়েছে এই বাক্যে।

৩. নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়াপদ : ইতে/তে অন্ত ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণতা দান

করে না কিন্তু সক্রিয়তার ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলে এটিকেও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। পূর্বকালীন এবং শর্তসাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়াপদের একটা জায়গায় মিল দেখা যায়। ইতে / তে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদও পূর্বকালীনতা, অর্থাৎ আগে ঘটে যাওয়া বোঝাতে পারে, যেমন—'তাকে যেতে দেখেছি'; 'সেই উচ্চতা হইতে তাহাকে পড়িতে দেখিলাম' ইত্যাদি বাক্যে 'যাওয়া' এবং 'পড়া'র কাজ আগে হয়েছে, তারপর 'দেখেছি', 'দেখিলাম' ইত্যাদি ক্রিয়াব্যাপার সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু কোনো ক্রিয়ার নিমিত্ত বা উদ্দেশ্য বোঝানোই ইতে/তে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রধান কাজ। যেমন—'সে খাইতে বসিয়াছে' বাক্যে প্রশ্ন করা চলে—সে কী নিমিত্ত বা কেন বসিয়াছে? উত্তর—খাইতে বসিয়াছে। যে বাক্যে কর্তা একটি এবং যে বাক্যে কর্তা কাজটি প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সম্পাদন করে, সেই বাক্যে ইতে/ তে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, সমাপিকা ক্রিয়াপদের নিমিত্ত বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এই জন্যই এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়াপদকে নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বলা যায়।

তবে তির্যক বাক্য গঠনের জন্য ইতে/তে প্রত্যয়ান্ত পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—'মেয়েটি দেখিতে ভালো', 'ঘর থাকিতে বাবুই ভিজে', 'নির্বোধেরা দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'— প্রভৃতি বাক্যে ইতে/তে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদকে 'ভাবে প্রয়োগ' বলা হয়। অবশ্য এখানে ক্রিয়াপদ পূর্বকালীন কিন্তু নিমিত্তার্থক নয়। 'তাহারা আসিতে আমরা বাহির হইলাম'—বাক্যে আসিতে স্থানে আসিলে লেখা চলে। কাজেই বোঝা যায় যে ইতে/তে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ ইলে/লে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের মতই শর্তও সৃষ্টি করতে পারে।

৪. **ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য [পূর্বকালীন] এবং ক্রিয়ামূলক বিশেষণ** : সমাপিকা এবং অসমাপিকা রূপ ছাড়াও আরও অন্যভাবে কাজের ধারণাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায়। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে গঠন করা হয় ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য এবং ক্রিয়ামূলক বিশেষণ পদ। এইসব পদও কাজের ধারণাটিকে প্রকাশ করে। এই সব প্রত্যয়কে সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয় 'কৃৎ প্রত্যয়' তাই এই প্রত্যয়যুক্ত পদকে সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয় কৃদন্ত (কৃৎ + অন্ত) পদ। এই পদগুলি হল—ইবা/আ, আ, অন, অন্ত, ইত প্রভৃতি। এইগুলি যোগ করে এই সব পদ গঠিত হয়, যেমন—চল ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে চলা [ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য], ইবা প্রত্যয় যোগ করে চলিবা [ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য], অন প্রত্যয় যোগ করে চলন [ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য], এবং অন্ত প্রত্যয় যোগ করে চলন্ত [ক্রিয়ামূলক বিশেষণ] এবং ইত প্রত্যয় যোগ করে চলিত [ক্রিয়ামূলক বিশেষণ]। চলা, চলন, চলন্ত, চলিত ইত্যাদি পদ আলাদা আলাদা ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু শুধু চলিবা পদটি অসম্পূর্ণ। বাক্যে এটিকে ব্যবহার করতে হলে এর সঙ্গে -র যোগ করতে হবে, যেমন—'আমার চলিবার শক্তি নাই'। তবে চলিবামাত্র প্রয়োগটিতে -র বিভক্তি লাগে না।

ক্রিয়ার ভাব বচন অর্থাৎ তির্যক প্রয়োগের সময় এইসব পদের ব্যবহার হয়ে থাকে। কর্তা যেখানে উহ্য থাকে বা অনুক্ত থাকে অথবা কর্তাকে যেসব বাক্যে উল্লেখ করা হয় না, সেই সব বাক্যে ধাতুর এইরকম প্রত্যয়যুক্ত ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ইবা/আ প্রত্যয়ান্ত পদকে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে আলোচনা করার আলাদা কোনো তাৎপর্য আছে কি?

'তাহারা ট্রেনে উঠিবা মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া দিল'—বাক্যটিতে দেখা যাচ্ছে ট্রেনে ওঠার কাজটি আগে হয়েছে। অর্থাৎ 'উঠিবা' এই ক্রিয়াপদটি অসম্পূর্ণ এবং পূর্বকালীন। চলিত ভাষায় বলা যায়—'ট্রেনে ওঠা মাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল'। এক্ষেত্রে 'উঠিবা' পদের বিকল্প হল 'ওঠা'। কাজেই ইবা/আ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়াপদেরই আর একটি রূপান্তর। ইবা প্রত্যয়টি

সাধুভাষার আর চলিত ভাষায় এর রূপ- আ। তবে, আ প্রত্যয় যোগে ভাববাচক ক্রিয়ামূলক বিশেষ্য পদও গঠিত হয়ে থাকে, যেমন—আসা, যাওয়া, খাওয়া, থাকা, চলা ইত্যাদি।

□ **অসমাপিকা ক্রিয়া পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ ঃ** ইয়া/এ এবং ইতে/তে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পরপর দুই বারও প্রয়োগ করা হয় কিন্তু ইলে/লে এবং ইবা/আ প্রত্যয়ান্ত পদ দুবার প্রয়োগ করা হয় না। ব্যাকরণগত তাৎপর্যের দিক থেকে বলা চলে যে, অসমাপিকার দ্বিত্ব প্রয়োগ সমাপিকা ক্রিয়াপদটিকে বিশেষিত করে। অর্থাৎ ক্রিয়া সম্বন্ধে 'কেমন করে'—এই প্রশ্নটির উত্তর দেয়। যেমন—'মেয়েটি নেচে নেচে গান করছে' কিংবা 'মেয়েটি নাচতে নাচতে গান করছে'—বাক্য দুটিতে প্রশ্ন করা চলে—'কেমন করে গান করছে?' উত্তর, নেচে নেচে বা নাচতে নাচতে। ইয়া/এ কিংবা ইতে/তে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ক্রিয়াটির ঘটমানতা বুঝিয়ে থাকে, কিন্তু ঘটমানতাও দুই ধরনের—(১) অবিরাম ঘটমানতা এবং (২) সবিরাম ঘটমানতা।

এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইতে/তে প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বিত্ব প্রয়োগের মাঝখানে না অব্যয় পদ ব্যবহারের রীতি থেকে। যেমন—'বলতে বলতে গাড়ি ছেড়ে দিল' বা 'বলতে না বলতে গাড়ি ছেড়ে দিল'। দুটি বাক্যেই সবিরাম ঘটমানতা [সবিরাম মানে অল্প একটু থামা] প্রকাশ পেয়েছে দ্বিত্ব প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু বলতে না বলতে প্রয়োগের মধ্যে ঘটমানতা যে সবিরাম তা বুঝতে অসুবিধা নেই। এই জন্যই দ্বিত্ব প্রয়োগের মাঝখানে না অব্যয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে। কিন্তু ইয়া/এ অন্ত অসমাপিকার দ্বিত্ব প্রয়োগের মাঝখানে না অব্যয় পদ ঢোকানো চলে না।

তাছাড়া ইয়া/এ অন্ত অসমাপিকার দ্বিত্ব প্রয়োগ অবস্থাবাচক ক্রিয়া বিশেষণের কাজ করে এবং ইতে/তে অন্ত অসমাপিকার দ্বিত্ব প্রয়োগ কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণের কাজ করে। 'কাজ করে করে, কাজ করে করে মেয়েটি সারা হয়ে গেল'—জাতীয় বাক্যকে বলা যায় দ্বিত্ব প্রয়োগের চূড়ান্ত। এরকম প্রয়োগ দীর্ঘস্থায়ী ঘটমানতা বুঝিয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা তিন রকমের ঘটমানতা বোঝানো সম্ভব—

১. অবিরাম ঘটমানতা ২. সবিরাম ঘটমানতা এবং ৩. দীর্ঘস্থায়ী ঘটমানতা।

দুই : ধাতু ও ক্রিয়াপদ : পারস্পরিক সম্পর্ক

সক্রিয়তা বা তৎপরতা বোঝানোর জন্যে যে পদ ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যে পদের দ্বারা করা, হওয়া, থাকা, ঘটা ইত্যাদি কাজ বোঝায়, তাকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। ক্রিয়া মানে কাজ।

বাক্যের সাহায্যে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ অর্থ—(১) কোনো ইচ্ছা, (২) ধারণা, (৩) ঘটনা প্রকাশ করা। এর মধ্যে ইচ্ছা এবং ঘটনা হচ্ছে ক্রিয়া ব্যাপার, অর্থাৎ কাজ। দেখা যায়, বাক্য মাত্রই কোনো না কোনো ক্রিয়া ব্যাপার বা কাজের সঙ্গে জড়িত।

ক্রিয়াপদের যে অংশটি অপরিবর্তিত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয় কিংবা যে অংশটিতে পদটির আসল অর্থ নিহিত থাকে, তাকে বলা হয় ক্রিয়ামূল বা ধাতু।

ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়। ধাতু ও ক্রিয়াপদের এই হল পারস্পরিক সম্পর্ক। যেমন চল্ হচ্ছে একটি ধাতু বা ক্রিয়ামূল। এর সঙ্গে একটি ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে পাওয়া যেতে পারে চলছে ক্রিয়াপদ। বাক্যে ব্যবহার করে বলা যায়—এখন তো এপথেই গাড়ি চলছে'। ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে পাওয়া যায় সমাপিকা ক্রিয়াপদ। আবার ধাতুর সঙ্গে ইয়া/এ, ইতে/তে, ইলে/লে এবং ইবা/আ প্রত্যয় যোগ করে পাওয়া যায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, যেমন চলে, চলতে, চললে, চলা ইত্যাদি।

ধাতু ও ক্রিয়ার গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুগুলি গঠনের দিক থেকে তিন

রকমের :

১. সিদ্ধধাতু বা মৌলিক ধাতু বা একদল ধাতু।

২. সাধিত ধাতু বা বহুদল ধাতু।

৩. বহুপদ বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. যেসব ধাতুকে বিশ্লেষণ বা বিভাগ করা যায় না, তাকে বলে সিদ্ধ ধাতু বা মৌলিক ধাতু, যেমন—চল, দেখ্, যা, দে ইত্যাদি। এই ধাতুগুলি একটি মাত্র দল বা অক্ষরের দ্বারা গঠিত বলে এগুলিকে একদল ধাতুও বলা যায়। ক্রিয়া বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর মধ্যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হতে দেখা যায়।

২. যে ধাতু বিশ্লেষণ করলে কোনো একটি নাম-শব্দ, মানে—বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ বা অন্য কোনো ধাতু বা একটি কিংবা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাকে বলে বহুদল বা সাধিত ধাতু। সিদ্ধ ধাতু কেউ নিজে নিজে বানিয়ে নিতে পারে না। এগুলি হচ্ছে ভাষার মৌলিক উপাদান। কিন্তু সাধিত ধাতু একাধিক উপাদান থেকে বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে, যেমন কর্ একটি সিদ্ধ বা মৌলিক বা একদল ধাতু; আর করা= কর্ + আ [অন্য কাউকে দিয়ে করানো] একটি প্রত্যয়যুক্ত সাধিত ধাতু। সাধিত ধাতুতে একাধিক অক্ষর বা দল থাকে বলে তাকে বহুদল ধাতুও বলা যায়। সাধিত ধাতু বা বহুদল ধাতু তিন রকমের—১. প্রযোজক ধাতু, ২. নাম ধাতু, ৩. ধ্বন্যাত্মক ধাতু।

(১) **প্রযোজক ধাতু** : যে ধাতুর দ্বারা বোঝায় যে কর্তা নিজে কাজটি না করে অন্য কাউকে দিয়ে করাচ্ছে, সেই ধাতুকে বলা হয় প্রযোজক ধাতু। বাংলা ভাষায় এরকম ক্ষেত্রে যোগ করা হয় আ, ওয়া প্রত্যয়, যেমন দেখ ধাতুর প্রযোজক রূপ হল দেখা। আমি দেখি কিন্তু আমি দেখাই [প্রযোজক ক্রিয়াপদ]। আমি খাই কিন্তু আমি খাওয়াই [প্রযোজক ক্রিয়াপদ]। বাংলা ভাষায় ভাব বাচ্যে কোনো ধাতুকে ব্যবহার করতে হলেও তার সঙ্গে আ, ওয়া প্রত্যয় যোগ করে নিতে হয়, যেমন—শুন/শোন—শুনা/শোনা—কথাটা ভালো শোনায় না।

(২) **নামধাতু** : ঠিক একই ভাবে, যেসব নাম-পদ, ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাতেও আ/ওয়া প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু গঠন করতে হয়। যেমন—ধমক—ধমকা [নাম ধাতু]—তারা আমাকে ধমকাচ্ছে। বিষ-বিষা [নাম ধাতু]—যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু।

(৩) **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** : অনেক ধ্বন্যাত্মক শব্দও ক্রিয়াপদ রূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে অধিকাংশ ধ্বন্যাত্মক শব্দে আ প্রত্যয় যোগ করে নিতে হয়। এর ফলে যে ধাতুটি গঠিত হয়, তাকেই বলা হয় ধ্বন্যাত্মক ধাতু। ধ্বন্যাত্মক ধাতু তিন রকমের হয়—

(ক) ধ্বন্যাত্মক শব্দে কোনো প্রত্যয় যোগ করা হয় না; ধ্বন্যাত্মক শব্দটির সঙ্গে সরাসরি ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে দেওয়া হয়, যেমন—হাঁচ—আমি হাঁচি; ধুঁক—লোকটা ধুঁকছে।

(খ) ধ্বন্যাত্মক শব্দে আ যোগ করে দ্বিতীয় প্রকারের ধ্বন্যাত্মক ধাতু গঠিত হয়, যেমন হাঁফ—হাঁফা—কুকুরটা হাঁফাচ্ছে; ফোঁস—ফোঁসা—সাপটা ফোঁসাচ্ছিল।

(গ) তৃতীয় প্রকারের ধ্বন্যাত্মক ধাতু গঠিত হয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিত্বের শেষে আ প্রত্যয় যোগ করে, যেমন—ঠকঠক—ঠকঠকা—কাঠঠোকরা ঠকঠকাল; ঝটপট—ঝটপটা—ডানা যতই ঝটপটাও খাঁচার বাইরে যেতে পারছ না।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় বহু সংখ্যক সংস্কৃত ধাতু ব্যবহৃত হয়ে থাকে

কিন্তু এগুলি কদাচিৎ বাংলা কিংবা সংস্কৃত ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আর প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃত ধাতু প্রায়ই নামপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিংবা প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃত ধাতুর পরে কর্, হ্ ইত্যাদি সংযোগমূলক ধাতু ব্যবহার করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

সে সমস্ত সংস্কৃত ধাতু এইভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হল—আ-হর, কীর্ত, গর্জ, চুম্ব্, তিষ্ঠ, ত্যজ্, ধ্যা, ধ্বনি, নম, নির্মা, নির্ণি, নিশ্চি, প্রণ্‌ম, বন্দ, বর্জ, বর্ত, ভঞ্জ, ভর্ৎস, মর্দ, যজ, রাজ, শোভয়, সেব, স্মর, হানয়, হিংস, ইত্যাদি। এই সব ধাতু বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করেই বেশি ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু কিছু সংখ্যক সংস্কৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ কবিতায় বাংলা ধাতুর মতো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এগুলি প্রকৃতির দিক থেকে নামধাতুর মতো কিন্তু অন্য নামধাতুর মতো এগুলির সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করা হয় না। এগুলির প্রয়োগ অবশ্য খুবই কম এবং প্রয়োগের সময় কিন্তু এদের অর্ধ-তৎসম বা তদ্ভব রূপেই বেশি পাওয়া যায়। এগুলি হল—

> তেয়াগ, বরণ, দরশ, পরশ, অগ্রসর, আদেশ, আকুল, আঘাত, আনন্দ, আলাপ, আশিস, উচ্ছেদ, উত্তাপ, উদ্ধার, উন্মেষ, উলঙ্গ, চিত্র, ত্রস্ত, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, দান, দীপ, নাম, নীরব, নিনাদ, নিশ্চয়, নিষ্ফল, নিস্তার, পরিহর, প্রদান, প্রণাম, প্রমাদ, প্রসার, প্রশম, পুরস্কর [পুরস্কার], প্রভাব, ভাব, বিকাশ, বিদ্বেষ, বিনাশ, বিস্তার, চেষ্টা, যোগ, যাগ, সংহর, সন্তোষ, স্তুতি ইত্যাদি।

তিন

বহুপদ ধাতুর দুই শ্রেণি—যুক্ত ও যৌগিক : বাংলা ভাষায় কিছু সংখ্যক ধাতু আছে যেগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি নামপদের পরে বসে নামপদটির সঙ্গে অর্থের দিক থেকে যুক্ত হয়ে যায় এবং একটি নতুন ধাতু সৃষ্টি করে। এই জাতীয় ধাতুকে বলে সংযোগমূলক ধাতু বা বহুপদ ধাতু।

'কর্' এবং 'হ্' ধাতুই এইভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন—কষ্ট করা, খেলা করা, ব্যায়াম করা, যোগাযোগ করা, ব্যবস্থা করা, ভালো করা, ঝগড়া করা, রাগ করা, খুশি হওয়া, রাজি হওয়া, নরম হওয়া, গরম হওয়া, খারাপ হওয়া, দেখা হওয়া, রাগ হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা ভাষায় সংযোগমূলক ধাতুর সংখ্যা কত এবং সেগুলি ঠিক কী কী? নানাভাবে হিসেব করে দেখা গেছে যে, বাংলা ভাষায় সংযোগমূলক ধাতুর সংখ্যা মোট চৌত্রিশটি, যথা—কর, হ, যা, খা, দে, ছাড়, ধর, পড়, কাট, নাম, লাগ, টান, পাত, পাড়, বাড়, বাস, খেল, খোল, তোল, ফেল, নে, থাক, ঘাট, কষ, মার, দেখা, ওঠা, রটা, পাকা, পাতা, বসা, বাসা, খাটা, মাখা। লক্ষ্য করার বিষয় হল—এইসব সংযোগমূলক ধাতুর নিজস্ব অর্থটি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে হারিয়ে যেতে পারে; সাঁতার কাট ধাতুটির অর্থের মধ্যে কাট্ ধাতুর অর্থ আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে না, তেমনি অঙ্ক কষ ধাতুর অর্থের মধ্যে কষ্, ধাতুর অর্থ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

বাংলা ভাষায় আঠারোটি ধাতুকে আলাদা করে চেনার দরকার আছে; কারণ এগুলি আরেকটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ধাতুটির অর্থই প্রাধান্য পায়, দ্বিতীয় ধাতুটির [আঠারোটির কোনো একটির] অর্থ লুপ্ত হয়ে যায় বটে কিন্তু এটি প্রথম ধাতুটির অর্থকেও সামান্য পরিবর্তিত করে দেয়। সমাস যেমন দুটি নামপদের মধ্যে অর্থের যোগ, তেমনি যৌগিক ক্রিয়া হল দুটি ক্রিয়াপদের মধ্যে অর্থের যোগ। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটিকে সহকারী ক্রিয়া বলা যেতে পারে। প্রারম্ভিকতা, ইচ্ছা, অনুমোদন, সামর্থ্য, ...া, পূর্ণতা, স্থায়িত্ব, বিশদতা, পরীক্ষা ইত্যাদি ধারণা এইসব সহকারী ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত

হয়। তবে সহকারী ক্রিয়াগুলিও আসলে সংযোগমূলক ধাতুই। এগুলি হল—আন, আস, ওঠ, তোল, থাক, দে, ধর, নে, পড়, ফেল, বস, বেড়া, যা, লাগ, হ, রাখ, চল, আছ। সংযোগমূলক ধাতু কিংবা যুক্ত ধাতু এবং সহকারী ক্রিয়া বা যৌগিক ক্রিয়ার তালিকা মিলিয়ে দেখলে দশটি ধাতুকে দুই তালিকাতেই পাওয়া যায়। এগুলি হল—হ, যা, দে, ধর, ফেল, তোল, নে, থাক, পড়, লাগ। সংযোগমূলক ধাতু এবং সহকারী ক্রিয়া কোনো নতুন ধরনের ধাতু নয়। সংযোগমূলক ধাতু এবং সহকারী ক্রিয়া হল সিদ্ধ এবং সাধিত ধাতুর এক একটা প্রায়োগিক শ্রেণি মাত্র। সংযোগমূলক ক্রিয়াপদের প্রথম অংশটি নামপদ আর যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশটিও ক্রিয়াপদ। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে উভয় প্রকার ক্রিয়াপদে একই ধাতু ব্যবহৃত হতে পারে।

সহকারী ক্রিয়াপদগুলির প্রায়োগিক বিশিষ্টতাগুলি আলাদা আলাদা করে বিচার করে দেখা যেতে পারে—

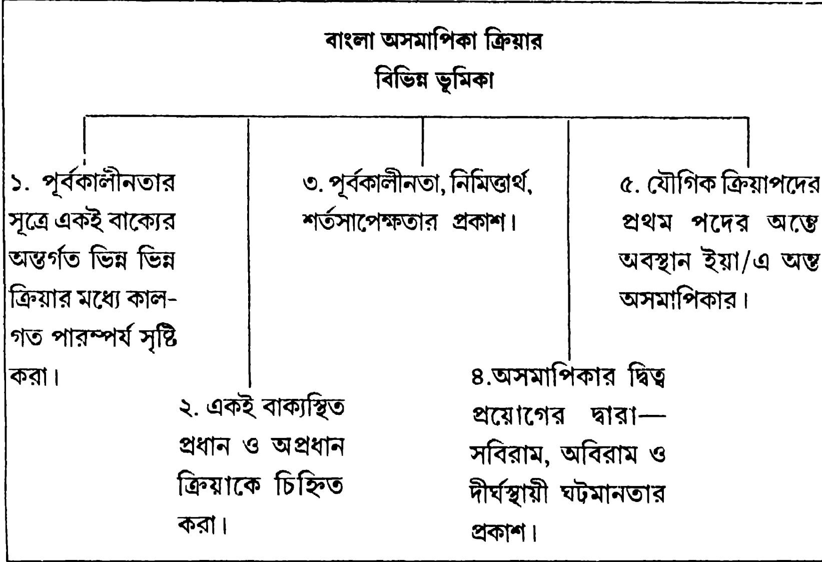
১. বেড়া [কাজটি অনবরত হয়] : সে বিলে মাছ ধরে বেড়ায়।
২. বস্ [কোনো কাজ হঠাৎ হওয়া] : কাজটা তো করে বসব, তারপর কী হবে?
৩. যা [নিরন্তরতা] : ঠিক আছে, যেমন করছ তেমনি করে যাও।
৪. চল্ [নিরন্তরতা] : তিনি যেমন দেখিয়েছিলেন, তেমনি ভাবেই করে চলেছি।
৫. থাক্ [নিরন্তরতা] : কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে?
৬. আছ্ [নিরন্তরতা] : সে কী! তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ?
৭. লাগ [প্রারম্ভিকতা] : কতক্ষণ আগে গাছটা কাটতে লেগেছে?
৮. রাখ [অবস্থার স্থিতি] : জায়গাটা দেখে রেখেছি।
৯. হ [বাধ্যতামূলকতা] : এখন যেতে হবে, আর কোনো উপায় নেই।
১০. ফেল্ [পূর্ণতা/সম্পন্নতা] : আরেকটু দেখতে পেলেই বুঝে ফেলব।
১১. নে [পূর্ণতা/সম্পন্নতা-কর্তার পক্ষে] : কাগজটা আনো, একটু দেখে নেব।
১২. দে [পূর্ণতা/সম্পন্নতা-কর্মের পক্ষে] : লোকটাকে এখুনি তাড়িয়ে দাও।
১৩. পড়্ [আকস্মিকতা] : যে কোনো মুহূর্তে সবাই এসে পড়বে।
১৪. ওঠ্ [আকস্মিকতা] : বাচ্চাটা চেঁচিয়ে উঠল।
১৫. তোল্ [পূর্ণতা/সম্পন্নতা-সাধারণভাবে] : ঘরটাকে একেবারে গোয়াল করে তুলেছ।
১৬. আন্ [পূর্ণতা/সম্পন্নতা-সাধারণভাবে] : কাজটা প্রায় করে এনেছি।
১৭. ধর [অবস্থার স্থিতি] : এই ধারটা টেনে ধরবি, ছাড়বি না কিছুতেই।
১৮. আস্ [অভ্যাস] : বহুদিন ধরে পেয়ে আসছি এই ব্যবহার।

লক্ষ্য রাখতে হবে যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশটিকেও। ধরে বেড়ায়, করে বসব, করে যাও, করে চলেছি, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে আছ, দেখে রেখেছি, বুঝে ফেলব, দেখে নেব, এসে পড়বে, টেনে ধরবি, তাড়িয়ে দাও, করে তুলেছ, করে এনেছি, চেঁচিয়ে উঠল, পেয়ে আসছি—এই ষোলটি যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রথমাংশের অন্তে আছে এ/ইয়া প্রত্যয়। যেহেতু ক্রিয়াপদগুলি চলিত ভাষার, তাই প্রত্যয়টি হচ্ছে—এ; সাধু ভাষায় এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ইয়া প্রত্যয়। বাকি দুটি ক্রিয়াপদের প্রথমাংশের অন্তে আছে-তে প্রত্যয়, যেমন—যেতে হবে, কাটতে লেগেছে। কেন এই পার্থক্য ঘটল তা আলাদা ভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

চার

অসমাপিকা যুক্ত ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য : বিষয়টি নিয়ে আগে বেশি ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ছাত্রপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ বইগুলিতে এই সম্বন্ধে যৎসামান্য উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। আসলে অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণে গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা দেখা যায় না। অনেকেই বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াকে দেখেছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিতে, অথচ বাংলা ভাষায় অসমাপিকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ভূমিকাগুলিকে ধরার চেষ্টা করা যাক :

রেখাচিত্র—১



১ সংখ্যক রেখাচিত্র থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষায় বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রথমত, পূর্বকালীনতার ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে—'সমানকর্তৃকয়ো পূর্বকালে ক্ত্বাচ্'। মানে এক কর্তার একাধিক ক্রিয়া থাকলে যেটি পূর্বকালীন তাতে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় যোগ করতে হবে। এর ফলে কৃত্বা, গত্বা, পঠিত্বা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় যার মানে—করে, গিয়ে, পড়ে ইত্যাদি। এইভাবে পূর্বকালীনতার ধারণাটি বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদেও চলে এসেছে। কিন্তু **দ্বিতীয়ত,** যখন বলা হচ্ছে 'মুখংব্যাদায় স্বপিতি', মানে 'হাঁ করে ঘুমুচ্ছে' তখন দুই ক্রিয়াই সমকালীন, আগে-পরে নয়। তখনই প্রধান-অপ্রধান ক্রিয়ার ধারণা আসছে এবং প্রধান ক্রিয়াটি সমাপিকা ও অপ্রধান—অসমাপিকা ক্রিয়াপদে পরিণত হচ্ছে। 'ঘুমুচ্ছে' প্রধান ক্রিয়া, 'হাঁ করে'—অপ্রধান তাই তা অসমাপিকা। একই বাক্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার কালিক পারম্পর্য ক্রিয়াগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং তারই ফলে সরল বাক্যগুলিকে জোড়া লাগিয়ে এক বাক্যে ধরা যায়, যেমন 'আমি বাড়ি গেলাম, স্নান করলাম, ভাত খেলাম তারপর স্কুলে গেলাম' না বলে বলা যায়—'আমি বাড়ি গিয়ে, স্নান করে, ভাত খেয়ে, স্কুলে গেলাম।'

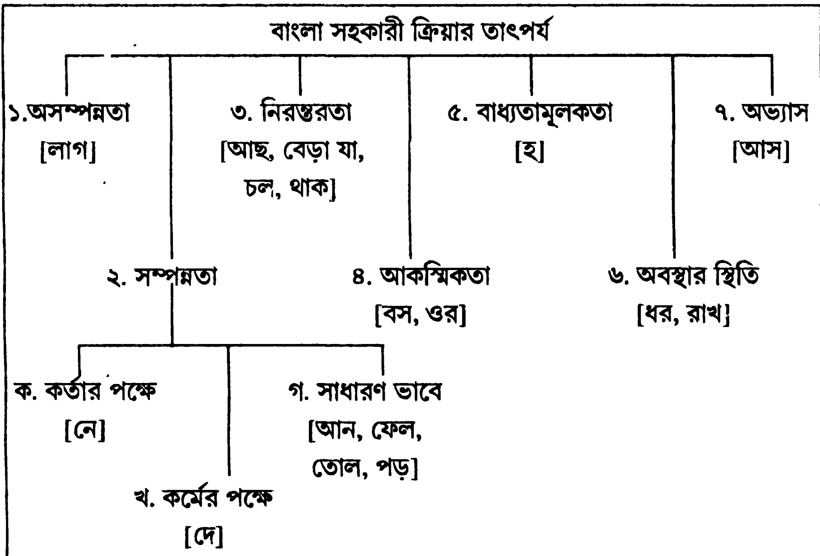
তৃতীয়ত, ইয়া/এ যোগে পূর্বকালীনতা, ইতে/তে যোগে নিমিত্ততা এবং ইলে/লে যোগে শর্ত-সাপেক্ষতার কথা বাংলা ব্যাকরণে আগে বলা হত না সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবের জন্য। 'ল্যবর্থ',

'তুমর্থ' অসমাপিকা বলে ছেড়ে দেওয়া হত বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বিশেষ ভূমিকার গুরুত্ব প্রদর্শন না করে। চতুর্থত, অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব প্রয়োগে (ক) অবিরাম, (খ) সবিরাম এবং (গ) দীর্ঘস্থায়ী ঘটমানতার কথা এখনো বাংলা ব্যাকরণে স্পষ্ট করে বলা হয় না। ইয়া এবং ইতে প্রত্যয়ের পার্থক্যটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয় না। পঞ্চমত, যৌগিক ক্রিয়া যে আধুনিক বাংলা ভাষার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ তাও খুব কম বাংলা ব্যাকরণেই দেখানো হয়। আসলে যত দিন যাচ্ছে ততই যে যৌগিক ক্রিয়াপদ এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাড়ছে এই তথ্যটিও অনেকেরই অজানা যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রথম পদটি ইয়া/এ—অন্ত অসমাপিকা এর কারণ কী? কোনো বাংলা ব্যাকরণে এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে পূর্বকালীনতা এবং প্রধান-অপ্রধান ক্রিয়ার ধারণা যে এর সঙ্গে জড়িত তা অনেকেই খেয়াল করেন না।

কথা হচ্ছে, কেন যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বাড়ছে? প্রত্যেকটি আধুনিক ভাষায়ই ক্রিয়াপদের aspect প্রকাশ করার গুরুত্ব বাড়ছে। এই পারিভাষিক শব্দটির সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা বিকল্প এখনো তৈরি হয়নি তাই ইংরেজি অভিধানের সাহায্যে শব্দটির অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। OED, 115 পৃষ্ঠায় বলছে—"5 gram. A vebal form used to express action or being in respect of its inception, duration, or completion, 1853."—মানে হচ্ছে কোনো ক্রিয়ার, প্রারম্ভিকতা, ঘটমানতা এবং সম্পন্নতা প্রকাশ করার ব্যাকরণগত ক্রিয়ারূপ। আরো সহজ করে বলা যায়, ক্রিয়ার আরম্ভ, শেষ এবং ঘটমানতা বোঝানোর ব্যাকরণগত ব্যবস্থা। আসলে ক্রিয়াবিভক্তিগুলি এই ব্যাপারটি প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে এবং যৌগিক ক্রিয়া গঠন করা হচ্ছে প্রথম পদটিকে অসমাপিকা রূপ দিয়ে। এই ব্যাপারটিকে প্রথমে একটি রেখাচিত্রে এবং তারপর একটি সারণীতে বিন্যস্ত করে স্পষ্টভাবে দেখানো হবে।

যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠনের জন্য বাংলা ভাষায় যে আঠারোটি সহকারী ক্রিয়া ব্যবহার করা হয় সেগুলির কাজ কী?—তা বোঝানোর জন্যে একটি রেখাচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে—

রেখচিত্র—২



রেখাচিত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আধুনিক বাংলা ভাষায় কেবল অসম্পন্নতা-সম্পন্নতা প্রকাশই নয়, তার সঙ্গে রয়েছে নিরন্তরতা, আকস্মিকতা, বাধ্যতামূলকতা, অবস্থার স্থিতি এবং অভ্যাস প্রকাশের ব্যবস্থাও। সম্পন্নতা তিন রকমের—কর্তার পক্ষে, কর্মের পক্ষে এবং সাধারণ ভাবে। যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়া তার অর্থ বজায় রাখতে পারে না তবে মূল ক্রিয়ার অর্থে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। একটি সারণীর সাহায্যে ব্যাপারটাকে আর একটু বিশদ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

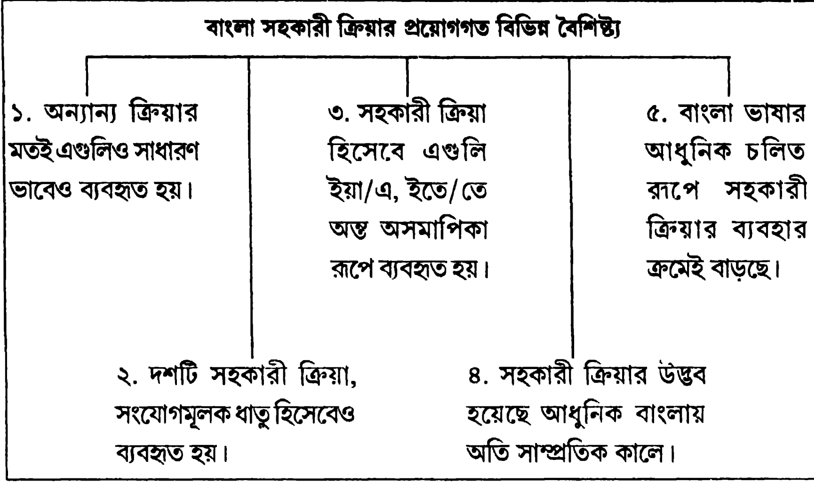
সারণী—২

ক্রম	aspect বা ক্রিয়া-পরিস্থিতি	সহকারী ক্রিয়া	বাক্য
১.	অসম্পন্নতা	১. লাগ	লোকগুলি সকাল থেকে গাছ কাটতে লেগেছে।
২.	সম্পন্নতা কর্তার পক্ষে	২. নে	সব মালপত্র ভালো করে দেখে নেবেন।
৩.	সম্পন্নতা কর্মের পক্ষে	৩. দে	ওদের হাতে সব জিনিস দিয়ে দে।
৪.	সম্পন্নতা সাধারণ ভাবে	৪. আন	কাজটা প্রায় করে এনেছি।
		৫. ফেল	কাজটা প্রায় করে ফেলেছি।
		৬. তোল	কাজটা প্রায় করে তুলেছি।
		৭. পড়	অনেক লোক এসে পড়েছে।
৫.	নিরন্তরতা	৮. আছ	গাড়িটা রাস্তায় পড়ে আছে।
		৯. বেড়া	লোকটি নদীতে মাছ ধরে বেড়ায়।
		১০. যা	কাজটা করে যা পরে ফল পাবি।
		১১. চল	কাজটা করে চল পরে ফল পাবি।
		১২. থাক	কাজটা করতে থাক পরে ফল পাবি।
৬.	আকস্মিকতা	১৩. ওঠ	লোকটা হঠাৎ কী যেন বলে উঠল।
		১৪. বস	কোথায় যে কী বলে বসো।
৭.	বাধ্যতামূলকতা	১৫. হ	আমাকে তো এখুনি যেতে হবে।
৮.	অবস্থার স্থিতি	১৬. ধর	টেনে ধর, ছাড়িস না যেন।
		১৭. রাখ	টেনে রাখ, ছাড়িস না যেন।
৯.	অভ্যাস	১৮. আস	আমরা অনেক দিন ধরেই এই টাকাটা পেয়ে আসছি

এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে সহকারী ক্রিয়া যুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদের নয়টি অ্যাসপেক্ট বা ক্রিয়া-পরিস্থিতি প্রকাশ করা সম্ভব। এই ক্রিয়া-পরিস্থিতিগুলি হল—১. অসম্পন্নতা, ২. সম্পন্নতা-কর্তার পক্ষে, ৩. সম্পন্নতা- কর্মের পক্ষে, ৪. সম্পন্নতা সাধারণভাবে, ৫. নিরন্তরতা, ৬. আকস্মিকতা, ৭. বাধ্যতামূলকতা-পরোক্ষে, ৮. অবস্থার স্থিতি, ৯. অভ্যাস।

প্রায়োগিক দিক থেকে দেখলে সহকারী ক্রিয়াগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্পষ্ট করে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

রেখাচিত্র—৩



রেখাচিত্র তিনের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল যে বাংলা সহকারী ক্রিয়ার প্রয়োগগত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—১. অন্যান্য ক্রিয়ার মতই এগুলিও সাধারণ ভাবেও ব্যবহৃত হয়, ২. দশটি সহকারী ক্রিয়া সংযোগমূলক ধাতু হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, ৩. সহকারী ক্রিয়া হিসেবে এগুলি ইয়া/এ, ইতে/তে অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়। ৪. সহকারী ক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে আধুনিক বাংলায় এবং অতি সাম্প্রতিক কালে। ৫. বাংলা ভাষার আধুনিক চলিত রূপে সহকারী ক্রিয়ার ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে।

এখন সহকারী ক্রিয়ার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। ১. জানা দরকার, আধুনিক বাংলা ভাষায় সহকারী ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়াপদের উদ্ভবের কারণ কী? 'সে খেয়েছে' এবং 'সে খেয়ে ফেলেছে'—এই দুই বাক্যে তফাৎ কী? 'খেয়েছে' পুরাঘটিত বা সম্পন্ন বর্তমান কালের ক্রিয়া এবং 'খেয়ে ফেলেছে'-ও সম্পন্ন বর্তমান কালই বোঝায়। তাহলে অতিরিক্ত 'ফেল' ধাতুটির প্রয়োজন হল কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে 'খেয়ে ফেলেছে' কেবল 'খা' ধাতুর সম্পন্নতা বোঝায় না, সেই সঙ্গে আকস্মিকতাও বোঝায় এবং সম্পূর্ণতাও বোঝায়। 'খেয়ে ফেলেছে' মানে হঠাৎ খেয়ে ফেলেছে এবং [কোনো জিনিস] পুরোটাই খেয়েছে। এই যে 'হঠাৎ' এবং 'পুরোটাই'—এই দুটি অতিরিক্ত অর্থের ব্যঞ্জনা সঞ্চারের জন্যেই 'ফেল' সহকারী ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে।

২. জানা দরকার, কেন মূল ক্রিয়াটি অসমাপিকা রূপে যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমে থাকে? এখানে দুটো ক্রিয়ার মিলিত রূপ ব্যবহৃত হয় বলেই মূল ক্রিয়াটিকে ইয়া/এ-অন্ত পূর্বকালীন অসমাপিকা রূপ দিতে হয়, যেমন—'করে ফেলেছে' ক্রিয়াপদে 'করে' প্রধান ক্রিয়া বলে অন্তে-এ প্রত্যয় যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু 'যেতে হবে', 'কাটতে লেগেছে' এবং 'করতে থাক' এই তিনটি যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমাংশে 'তে' অন্ত অসমাপিকার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ 'হ', 'লাগ' এবং 'থাক'—এ তিনটি সহকারী ধাতু ব্যবহার করতে হলে প্রথম ক্রিয়াপদের অন্তে ইতে/তে প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে। এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? 'আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে' বাক্যটিতে প্রথমেই আছে

'আমাকে', সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার নিয়ম অনুযায়ী প্রধান ক্রিয়া নিমিত্তার্থক অসমাপিকা এবং সহকারী ক্রিয়ার সমাপিকা রূপ ব্যবহৃত হবে।—আমাকে .....হবে, আমাকে যেতে হবে। ব্যাপারটা উল্টোদিক থেকেও দেখা যায়—হবে,—যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে। 'হ' ধাতুর আগে নিমিত্তার্থক অসমাপিকা যেতে, করতে খেতে ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে কারণ বাক্যের কর্তা রূপের দিক থেকে কর্মের জায়গা নেবে, 'আমি' হয়ে যাবে 'আমাকে'। বাক্যটি কর্তৃবাচ্য থাকবে না। বাচ্যান্তর হচ্ছে বলেই অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি ইতে/তে অন্ত নিমিত্তার্থক অসমাপিকা হয়ে যাচ্ছে।

'সকাল থেকে ওরা গাছটি কাটতে লেগেছে'—বাক্যে ক্রিয়া অসম্পন্ন—তা বোঝা যাচ্ছে। ক্রিয়া-পরিস্থিতির অসম্পন্নতার জন্যই ইয়া/এ [পূর্বকালীন] প্রত্যয় ব্যবহৃত না হয়ে ইতে/তে [নিমিত্তার্থক] প্রত্যয় ব্যবহৃত হচ্ছে। 'কাজটা করতে থাক'-বাক্যেও ক্রিয়া পরিস্থিতি অসম্পন্ন, অর্থাৎ শেষ বা সম্পূর্ণ হওয়ার কথা নেই তাই অসমাপিকাটি পূর্বকালীন না হয়ে নিমিত্তার্থক। এইটেই আসল কথা, সম্পন্নতা বোঝালে ইয়া/এ প্রত্যয় আর অসম্পন্নতা বোঝালে ইতে/তে প্রত্যয়।

৩. এখন বাংলা সহকারী ক্রিয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এজন্য আমরা আর একটি সারণীর সাহায্য নেব। কারণ সব ক্রিয়াপদের সঙ্গে সব সহকারী ক্রিয়া জোটবদ্ধ হয় না। বাংলা ভাষায় এ ব্যাপারে একটা পরম্পরা গড়ে উঠেছে যেটা আলাদা ভাবে বোঝা প্রয়োজন।

সারণী—৩

ক্রম	সহকারী ক্রিয়া	সম্ভাব্য যৌগিক ক্রিয়ায় প্রথমাংশ	aspect বা ক্রিয়া পরিস্থিতি
১.	লাগ	পড়তে, করতে, ঘুমুতে, শুতে, খেতে, যেতে, মারতে, লিখতে, কাটতে, ফাটাতে, আঁকতে, শুঁকতে, ডাকতে।	অসম্পন্নতা
২.	নে	করে, খেয়ে, লিখে, এঁকে, কেটে, বেঁটে, এনে, টেনে, ধরে, মেরে, নিয়ে, দিয়ে ফেলে।	সম্পন্নতা
৩.	দে	করে, লিখে, এঁকে, কেটে, বেঁটে, এনে, টেনে, ধরে, মেরে, দিয়ে, ফেলে।	সম্পন্নতা
৪.	আস	করে, ধরে, মেরে, টেনে, কেটে, বেঁটে, লিখে, কিনে, ঠেলে, ডেকে, ঢেকে, পেড়ে, বেড়ে।	সম্পন্নতা
৫.	ফেল	করে, ধরে, মেরে, তুলে, কেটে বেঁটে, লিখে, শিখে, কিনে, ঠেলে, ঢেকে, পেড়ে, বেড়ে, খুলে।	সম্পন্নতা

ক্রম	সহকারী ক্রিয়া	সম্ভাব্য যৌগিক ক্রিয়ায় প্রথমাংশ	aspect বা ক্রিয়া পরিস্থিতি
৬.	তোল	করে, এনে, ভেজে, মেজে, ঘষে, বানিয়ে।	সম্পন্নতা
৭.	পড়	এসে, গিয়ে, ধরে, কেটে, ফেটে, কেঁদে, হাঁপিয়ে, দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে, শুয়ে, ঘুমিয়ে।	সম্পন্নতা
৮.	আছ	পড়ে, মরে, ধরে, শুয়ে, ঘুমিয়ে, জেগে।	অসম্পন্নতা
৯.	বেড়া	করে, ধরে মেরে, টেনে, ডেকে, নিয়ে, দিয়ে।	নিরন্তরতা
১০.	যা	করে, মরে, ধরে, মেরে, টেনে, কেটে, লিখে, ঠেলে, মেলে, চেলে, ফেলে, নিয়ে, দিয়ে।	নিরন্তরতা
১১.	চল	করে, নিয়ে, দিয়ে, লিখে, খেয়ে, টেনে।	নিরন্তরতা
১২.	থাক	পড়ে, মরে, ধরে, শুয়ে, ঘুমিয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে।	অসম্পন্নতা
১৩.	ওঠ	করে, লিখে, দিয়ে, নিয়ে, এঁকে, টেনে, ঠেলে, বলে, ফেলে, খেয়ে, নেয়ে।	আকস্মিকতা
১৪.	বস	করে, বলে, ধরে, এনে, দিয়ে, নিয়ে, লিখে।	আকস্মিকতা
১৫.	হ	করতে, বলতে, শুতে, খেতে, বসতে, লিখতে, পড়তে, যেতে, ঘুমুতে, দাঁড়াতে, ঠেকাতে, নাড়াতে, হাঁফাতে, লাফাতে।	বাধ্যতামূলকতা
১৬.	ধর	টেনে, মেলে, খুলে, তুলে।	অসম্পন্নতা
১৭.	রাখ	ধরে, করে, লিখে, দিয়ে, নিয়ে, এনে, টেনে, পড়ে, কেটে, শুনে, বলে, ডেকে, এঁকে, ফেলে, কিনে।	অসম্পন্নতা
১৮.	আস	পেয়ে, দিয়ে, নিয়ে, ফেলে, করে, খেলে, টেনে, ঠেলে, লিখে, শুনে, পড়ে, দেখে, খেয়ে।	অভ্যাস

পাঁচ : ক্রিয়াযৌগ : সংস্কৃত ব্যাকরণে দুটি নামপদের অর্থগত মিলনকে সমাস বলে। সংস্কৃত ভাষায় দুটি ক্রিয়াপদের অর্থগত মিলন ঘটে না তাই এ ব্যাপারটার জন্যে সংস্কৃত ব্যাকরণে কোনো পারিভাষিক শব্দ নেই। তবে এই ব্যাপারটাকে ইংরেজি ভাষায় Verbal Compound বলা যেতে পারে। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বাংলা যৌগিক ক্রিয়াকে ক্রিয়াযৌগ বলা অধিকতর যুক্তিসম্মত বলে মনে হয়। যদিও যৌগিক ক্রিয়াতে দুটি ক্রিয়ার অর্থগত মিলন ঘটেছে বলা যায় তবু একে ক্রিয়া-সমাস বলা যাবে না, কথাটা অর্থহীন শোনাবে। তাই Verbal Compound-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ক্রিয়াযৌগ কথাটি বাংলা ব্যাকরণের পরিভাষায় গৃহীত হলে ভালো হয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে ক্রিয়াযৌগ বা যৌগিক ক্রিয়া ব্যাপারটায় অর্থগত মিলন ঠিক কী ভাবে ঘটে থাকে? ৩ সংখ্যক সরণীতে দেখানো হয়েছে যে বাংলা ভাষায় যে কোনো ধাতুর সঙ্গে যে কোনো ধাতুর মিলন ঘটে না। এক্ষেত্রে অর্থগত দিক থেকে একটা পরম্পরার ব্যাপার আছে। এমনকি চৌত্রিশটি সংযোগমূলক ধাতুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এগুলি যেকোনো নামপদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। যেমন অঙ্ক কষ, মাংস কষ, প্যাঁচ কষ ইত্যাদি হতে পারে কিন্তু কষ্ট কষ হবে না, কষ্ট

কর, কষ্ট দে, কষ্ট পা ইত্যাদি হতে পারে। সাঁতার কাট, আঁক কাট, ইত্যাদি হতে পারে কিন্তু ঘুঁষি কাট হবে না। ২ এবং ৩ সংখ্যক সারণীতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে যৌগিক ক্রিয়া বা ক্রিয়াযৌগের প্রধান প্রয়োজনীয়তা aspect বা ক্রিয়া-পরিস্থিতি প্রকাশ করা। ৩ সংখ্যাক সারণী অনুসারে aspect বা ক্রিয়া-পরিস্থিতিগুলি হচ্ছে—১. অসম্পন্নতা, ২. সম্পন্নতা, ৩. নিরন্তরতা, ৪. আকস্মিকতা, ৫. বাধ্যতামূলকতা এবং ৬. অভ্যাস। কাজেই ক্রিয়াপদগুলির অর্থের মধ্যে সঙ্গতি না থাকলে অর্থগত মিলনে বাধা আসে।

যৌগিক ক্রিয়া বা ক্রিয়াযৌগের গঠনে অর্থের সঙ্গতির মতোই আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল দুটি ক্রিয়ার অর্থের মাঝখানের ফাঁক যাকে ইংরেজিতে বলা যায় juncture বা hiatus। যদি বলা হয় 'লোকটাকে ধরে আন'—তাহলে 'ধরা' এবং 'আনা' দুই ব্যাপারই বোঝাচ্ছে। কিন্তু যদি বলা হয়—'ধরে নে, এখানে কিছুই পাবি না' তাহলে নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কেবল 'বোঝার' ব্যাপার। এখানে 'নে' ধাতুর অর্থ লুপ্ত আর 'ধর' ধাতুর মানে দাঁড়াচ্ছে 'পুরোপুরি বোঝা'। এমনি করেই প্রতিটি যৌগিক ক্রিয়া বা ক্রিয়াযৌগের ক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে হবে দুটি ক্রিয়াপদের অর্থের মধ্যে কোনো ফাঁক আছে কিনা, না, দুটি অর্থ জোড়া লেগে গিয়ে ক্রিয়া-পরিস্থিতি বা aspect প্রকাশিত হচ্ছে কিনা।



বিশ শতকে মননচর্চা

• • • • • •

অলোক রায়

গদ্য পদ্য নির্বিশেষে যে কোনো রচনাকে একসময়ে প্রবন্ধ বলা হত। পরস্পর অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলী বা পূর্বাপর সংগতি আছে এমন রচনাকে অভিধানে প্রবন্ধ বলা হয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের ব্যবহার প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-সন্দর্ভ/নিবন্ধ 'প্রবন্ধ' নামে চিহ্নিত হল। রামমোহন রায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা বই বেদান্ত গ্রন্থ [১৮১৫]-এর সূচনায় গদ্যরচনার রীতিবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন, 'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না...।' পরে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' [১৮৩৩] গ্রন্থে রামমোহন 'অন্বয় প্রকরণ' নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এইভাবে উনিশ শতকে বাংলা গদ্য-প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সন্দর্ভ ধারার সৃষ্টি হয়। তখন প্রবন্ধ ছিল বিশেষ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের উপায়। প্রবন্ধের বিকাশ ও বিবর্তনে রামমোহন পরবর্তীকালে সাময়িকপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** [১৮৪৩] বাংলা গদ্যকে শুধু একধাপ এগিয়ে দেয়নি, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে।

তবে সাময়িকপত্রের প্রয়োজনে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার একটা বড়ো অংশ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। প্রবন্ধে তথ্য এবং তত্ত্বের প্রয়োজন আছে, তবে তার সঙ্গে মন ও মননের যোগ না ঘটলে তাকে সাহিত্য বলা যায় না। বিশ শতকের সূচনায় বাংলা মাসিকপত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। **ভারতীর** সূচনা উনিশ শতকে, চলেছে ১৯২৬ পর্যন্ত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির **সাহিত্য** চলেছে উনিশ শতেকর শেষ দশক থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত। বিশ শতকের সূচনা হয়েছে **প্রবাসী** পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। **ভারতবর্ষ** আর **মানসী ও মর্মবাণী** বিশ শতকে কাছাকাছি সময়ে বেরিয়েছে। আমাদের মনে পড়বে শরৎচন্দ্র যখন **ভারতবর্ষে** লিখতে শুরু করেন নি [তখন **যমুনায়** লিখছেন], সে সময়ে তিনি কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্যের 'ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ' বা সত্যসুন্দর দাসের 'প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব' প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করেছেন এবং জানিয়েছেন 'নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্যবাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম।' শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল উপন্যাস-গল্পের থেকে তিনি প্রবন্ধ ভালো লিখতে পারেন, প্রবন্ধ লেখার জন্য যে ব্যাপক পড়াশোনার দরকার তা তাঁর ছিল। ['প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়— কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্প-টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তাহলে প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি।... বয়স হয়েছে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়।' 'গত দশ বৎসর ফিজিওলজি,

বাইওলজি অ্যান্ড সাইকোলজি এবং কতক হিস্ট্রি পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কিছু পড়িয়াছি।' 'এক একবার ইচ্ছা করে এইচ. স্পেন্সার-এর সমস্ত 'সিন্থেটিক ফিলোসফির একটা বাংলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য ফিলোসফার যাঁরা স্পেন্সর-এর শত্রু-মিত্র তাঁদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত।'] অবশ্য প্রবন্ধ লেখার অনেক রকম পরিকল্পনা সত্ত্বেও **নারীর মূল্য** ছাড়া আর সেরকম কিছু লিখে উঠতে পারেন নি।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত সে সময়ের প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য ছিল। প্রবাসী ও ভারতবর্ষের কোনো সংখ্যা হাতে নিলেই তখন চোখে পড়ত এই ধরনের প্রবন্ধ—বনমালী বেদান্ততীর্থের প্রাচীন ন্যায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণের ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ, কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্যের শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিতেন কি না, ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের অথর্ববেদ সংহিতা, শ্রীনাথ সেনের ভাষাতত্ত্ব, অরুণ দত্তের ঔরঙ্গজেবের কলঙ্কমোচন, রামনদাস বসুর বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত, শরচ্চন্দ্র রায়ের মারাঠাজাতির অভ্যুদয়, আবদুল করিমের ওয়ারেন হেস্টিংসের মীর মুনসী, ইন্দুমাধব মল্লিকের উদ্ভিদ-জীবন ও ফুল, চুনীলাল বসুর উপবাস তত্ত্ব, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থাপত্যশিল্প, সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের জীবতত্ত্বের গুটিকয়েক কথা। এ-সব প্রবন্ধ থেকে আমরা প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে পারি, কিন্তু সে জ্ঞান অধিকাংশ সময়ে বই-পড়া জ্ঞান। মৌলিক চিন্তার পরিচয় সেখানে কদাচিৎ মেলে। মহাপণ্ডিত প্রবন্ধকারের রচনায় মৌলিকতার পরিচয় যদি বা মেলে, তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রবন্ধকারদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-অলংকার ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মদর্শনে অনেকের ব্যুৎপত্তি ছিল, যেমন, পঞ্চানন তর্করত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, পদ্মনাথ দেশশর্মা [বিদ্যাবিনোদ], সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বেশ আধুনিকমনা, যদিও **বঙ্গদর্শনে** যাঁর প্রথম রচনার প্রকাশ, সেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে তুলনীয় নন। সম্ভবত উনিশ শতকেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম, যে জন্য, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, 'অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা আর খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেন নি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারি করেন। হরপ্রসাদ যে-যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না।' রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গে বললেন, 'বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ করে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিসটি বড়ো বিরল।'

রবীন্দ্রনাথ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পড়াশোনার জগৎ ছিল বহুধা-বিস্তৃত। নানা বিষয়ে ছিল তাঁর আগ্রহ ও অধিকার। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অসামান্য ধী-শক্তির অধিকারী। আর তাঁর রচনাশক্তির কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল মহাকবি শুধু কবিতা বা সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তাই নয়, সমসাময়িক যে-কোনো প্রসঙ্গ যা তাঁকে উদ্‌বেজিত করেছে, তা নিয়ে লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ। ১৯০৭ সালে বেরিয়েছে **প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য** ও **সাহিত্য** গ্রন্থ। **সাহিত্যের পথে** [১৯৩৬] ও **সাহিত্যের স্বরূপ** [১৯৪৩] অনেক পরে। সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে তাঁর **শব্দতত্ত্ব** [১৯০৯] **ছন্দ** [১৯৩৬], **বাংলা ভাষা-পরিচয়** [১৯৩৮]-এর মতো বইয়ের কথা বলতে হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ও তার

অনতিপরে তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় মেলে একাধিক প্রবন্ধ-সংকলনে—**আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, রাজা প্রজা, সমূহ, স্বদেশ সমাজ**। জীবনের শেষ পর্বে এই ধারার প্রবন্ধ গ্রন্থ **কালান্তর** [১৯৩৭]। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও তথা বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ নিয়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি পাওয়া যাবে **শিক্ষা** [১৯০৮], **আশ্রমের রূপ ও বিকাশ** [১৯৪১], **বিশ্বভারতী** [১৯৫১] প্রভৃতি বইতে। 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।'—এ শুধু কবির মুখের কথা নয়, বা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার কথা ভেবে বলা নয়, কবি শুধু বিজ্ঞানের বই পড়তে ভালোবাসতেন তাই নয়, অনেক পড়াশোনার পর লিখেছেন **বিশ্বপরিচয়** [১৯৩৭]-র মতো বই। অন্যদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির পরিচয় আছে **ধর্ম** [১৯০৮], **শান্তিনিকেতন** [১৯০৯-১৬] ও **মানুষের ধর্ম** [১৯৩৩] প্রবন্ধমালায়। এর বাইরে থেকে গেল তাঁর পত্র-প্রবন্ধের সংকলন—**যাত্রী** [১৯২৯], **রাশিয়ার চিঠি** [১৯৩১], **জাপানে-পারস্যে** [১৯৩৬] **পথে ও পথের প্রান্তে** [১৯৩৮], **পথের সঞ্চয়** [১৯৩৯]। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সংকলিত হয়েছে কিছু প্রবন্ধসংকলন; যেমন, আত্মপরিচয়, সমবায়নীতি, মহাত্মা গান্ধী, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, ইতিহাস, সংগীতচিন্তা। এর বাইরের নিশ্চয় ছড়িয়ে আছে আরও অনেক প্রবন্ধ।

কখন লিখলেন তিনি এত প্রবন্ধ! কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, গান লেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখতে হয়েছে প্রবন্ধ, পেশাদার প্রবন্ধকারের পক্ষেও যা অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমন আছে রীতিবৈচিত্র্য। **বিচিত্র প্রবন্ধে** 'বিষয়বস্তু গৌরবের' থেকে 'রচনারসসম্ভোগ' প্রধান হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এ দুয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানা যায় কি না সন্দেহ। অতুলচন্দ্র গুপ্তের যদিও মনে হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।' আর তাই 'ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্‌বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এসব প্রবন্ধে লেগেছে।' কিন্তু আবেগ-সঞ্চার রবীন্দ্রপ্রবন্ধের সামান্য লক্ষণ নয়। কোথাও আবেগ আছে, থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো চিন্তা-ভাবনায় নিজের পক্ষপাত সব সময়ে গোপন করতে পারেন নি। কিন্তু মননের স্পর্শ বঞ্চিত নয় কোনো রচনা। রবীন্দ্রযুগের কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন, রবীন্দ্রভাষা আয়ত্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, যা সম্ভব হয়নি তা হল মৌলিক চিন্তা যথার্থ সন্ধিৎসার অভাব। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারদের মধ্যে একজন।

বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল নবপর্যায় **বঙ্গদর্শন** [১৯০১]। তখনও উনিশ শতকের বঙ্গদর্শনের লেখকদের মধ্যে অনেকে জীবিত আছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা আগে বলেছি। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে আগের যুগের লেখকদের মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে প্রবন্ধ লিখতে দেখি। প্রবাসী ও ভারতবর্ষের প্রবন্ধকারদের লেখাও বঙ্গদর্শনে দেখা যায়, যেমন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, কালীবর বেদান্তবাগীশ, বনমালী বেদান্ততীর্থ, গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ। এঁরা 'কর্ম কি ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী কি', 'মুক্তি বিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ', 'বেদান্তদর্শন, ও 'ষড়্‌দর্শন'-এর মতো প্রবন্ধ লিখেছেন। এইসব প্রবন্ধ পড়লে ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব, কিন্তু এর মধ্যে মৌলিক চিন্তা বা রচনাশ্রীর পরিচয় মেলে না। তুলনায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অমূর্ত ও মূর্ত' বা বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'আমাদের ধর্মশাস্ত্র' প্রবন্ধ সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে এ একেবারেই অন্যরকম ব্যক্তিত্বের স্পর্শে উদ্দীপিত প্রবন্ধ লিখলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ['বেদান্তের প্রথম কথা', 'তিন শত্রু', 'বর্ণাশ্রমধর্ম']।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একহিসেবে উনিশ শতকের প্রবন্ধকার [**তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ভারতীর লেখক**]। কিন্তু বিশ শতকে দ্বিজেন্দ্র-মননে ও রচনায় যে-পরিণতি দেখা দিয়েছে, তা তাঁর সমসাময়িক

আর কোনো প্রবন্ধকারের রচনায় দেখা যায় না [কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সেই মন্তব্যের কথা মনে পড়বে, 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.']। রবীন্দ্রসম্পাদিত পত্রিকায় তাঁর ভাইদের লেখা বেরোবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের জন্য লিখলেন 'নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন', 'সার সত্যের আলোচনা', 'বিদ্যা আর জ্ঞান', 'হারামণির অন্বেষণ'। দ্বিজেন্দ্রনাথের অল্প কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প লিখেছেন, কিন্তু তিনি লিখতে জানতেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা কম, যদিও আন্তর-মূল্য কম নয় ['গীতার কালনির্ণয়', 'গীতার দর্শন']। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন পুরো সাহিত্যিক, সাহিত্যের সব ধারাতেই তাঁর সহজ বিচরণ। হয়তো অনুবাদকর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি, তবে মৌলিক প্রবন্ধও লিখেছেন এবং তা সুখপাঠ]। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন, বঙ্গদর্শনে তাঁর লেখা অল্প, কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর রচনা সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি।

নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রবীণ ও নবীন প্রবন্ধকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বিপিনচন্দ্র পাল, দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগেশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী। ব্রহ্মবান্ধবের আগ্রহের বিষয় ছিল অনেক—ধর্মদর্শন থেকে সমাজ-শিক্ষা-রাজনীতি। ব্রহ্মবান্ধব অল্প কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি বর্ণাশ্রমধর্মের মুখপাত্র। তবে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কালে তাঁর প্রতিপাদ্য 'হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা' সকলে মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বর্ণাশ্রমধর্ম' প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধবের মতো তিনি মনুসংহিতার নির্দেশ মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। বর্ণাশ্রমধর্ম ভালো কি মন্দ, আমরা প্রবজ্যাগ্রহণ করব কি না, এমন বিতর্ক তাঁর কাছে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক। তিনি জানেন, সমাজ যখন পরিবর্তনশীল তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ব্যর্থভাষায় জানান, 'একালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই, হইবেও না।' অন্যদিকে পরিবর্তন কাম্য, 'কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়; সেই আদর্শ কালানুযায়ী মূর্তি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।' রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন এবং ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর ভালোমতো পরিচয় ছিল। স্বচ্ছদৃষ্টি, যুক্তিবাদী মন, রসসৃষ্টির ক্ষমতা একালে রামেন্দ্রসুন্দরের মতো আর কারও মধ্যে দেখা যায় না।

সখারাম গণেশ দেউস্কর সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল ইতিহাস, তবে সেই সঙ্গে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান তাঁর প্রবন্ধকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন, যার মধ্যে **দেশের কথা** দীর্ঘদিন জনসমাদর লাভে সক্ষম হয়। বিপিনচন্দ্র পাল এক হিসেবে আগের যুগের মানুষ [তাঁর লেখালিখির সূচনা উনিশ শতকের আটের দশকে]। বিশ শতকের সূচনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে বিপিনচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহযোগী, তবে তাঁর স্বদেশ ও সাহিত্যচিন্তাকে রবীন্দ্রানুসারী বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশ, বিপিনচন্দ্রের 'শিবাজী-উৎসব' ও 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানী-মূর্তি' প্রবন্ধের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ধর্মান্দোলনের যোগ। বিপিনচন্দ্র ভালো বাগ্মী ও লেখক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের সঙ্গে Hindu Review মাসিকপত্র সম্পাদনার মধ্যে হয়তো কোনো বিরোধ ছিল

না, কারণ তিনি একই সঙ্গে যুক্তিবাদী ও ভক্তিবাদী। পরে নারায়ণ পত্রিকায় তিনি তাই অনায়াসে লিখতে পারেন 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব', 'বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা', 'ধর্ম ও আর্ট', 'হিন্দু শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার'-এর মতো প্রবন্ধ। সমকালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যদিও আসলে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। কোনো বিশিষ্ট মত সারাজীবন অনুসরণ করেছেন, এমন কথা বিপিনচন্দ্র ও পাঁচকড়ি সম্বন্ধে বলা যায় না। তুলনায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল হলেও তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা সংগতি আছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। এঁদের পাশাপাশি সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তীকে আমরা অনেক বড়ো মাপের প্রবন্ধকার বলে গণ্য করি। বয়সে তরুণ হলেও মননের ক্ষেত্রে তাঁরা পরিণতবুদ্ধি ও লিখনক্ষমতার অধিকারী।

ওঁ প্রাণায় স্বাহা—মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে **সবুজপত্র** পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। প্রমথ চৌধুরী পত্রিকার ঘোষিত সম্পাদক হলেও যাঁর 'অভিপ্রায়ে' সবুজপত্র প্রকাশিত হয়, যিনি ছিলেন 'বেনামদার' সম্পাদক, তিনি রবীন্দ্রনাথ। সবুজপত্রের উদ্দেশ্য ছিল 'মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।' চিত্তের জাগরণের জন্য মননের চর্চা অপরিহার্য। প্রমথ চৌধুরী নিজে কবিতা ও গল্প লিখলেও তিনি ছিলেন মুখ্যত প্রবন্ধকার। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল—সমাজ রাজনীতি থেকে ইতিহাস-দর্শন, পুরাতত্ত্ব-অলংকারশাস্ত্র থেকে ভাষা-সাহিত্য নিয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, যার অতি অল্প অংশমাত্র গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে একদিকে যেমন 'বহুজ্ঞানচর্চায় শাণিত বুদ্ধির' প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি 'দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা' লক্ষ করা গেছে। সবুজপত্রে তিনি যেমন 'আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ' বা 'আর্যসভ্যতার সহিত বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ' লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন বীরবল-ছদ্মনামে 'যৌবনে দাও রাজটীকা'র মতো প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' বা 'শিক্ষার মিলন', তেমনি 'আষাঢ়' বা 'শরৎ'। প্রবন্ধের জন্য প্রমথ চৌধুরীকে অনেক সময়ে নির্ভর করতে হয়েছে প্রথাগত প্রবন্ধ-রচয়িতার উপর, যেমন রমাপ্রসাদ চন্দ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বক্তব্য যেমনই হোক না কেন, বলবার ভঙ্গি যে সমান 'গুরুত্বপূর্ণ' একথা রবীন্দ্র-প্রমথ দুজনেই বিশ্বাস করতেন। তাই কখনো কোনো লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি তাৎপর্যপূর্ণ বোধ হয়—"র-র লেখাটি যাকে বলে 'সারবান'। নিন্দা করাও শক্ত, হজম করাও তাই। এ সব লেখা ভোগ করার যোগ্য নয় অথচ জমিয়ে রাখার যোগ্য। পত্রপুটে ফুল রাখা চলে, মিষ্টান্ন রাখাও চলে, কিন্তু খনিজ-পদার্থের ভার ত তার উপর সয় না—সবুজপত্র-পুটের পক্ষে এই প্রত্নতত্ত্ব রত্নবিশেষ হলেও বেশি গুরুতর হয়েছে।" অবশ্য সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'সবুজপত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি—বিশেষতঃ, যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে। অর্থাৎ সবুজপত্রে কেবল ফুলের সূচনা মাত্র করে না তাতে ফলেরও আয়োজন আছে এইটে না প্রকাশ হলে জিনিসটা একটু সৌখিন হয়ে দাঁড়াবে।'

সবুজপত্রকে অনেকটা নির্ভর করতে হয়েছে তরুণ লেখকদের উপর, প্রমথ চৌধুরী যাঁদের তৈরি করে নিয়েছেন [রবীন্দ্রনাথের উপদেশ/সতর্কবাণী—'আরো লেখক চাই। লেখা-সৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায়, কিন্তু এখনো বেশি দূর পর্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌঁচচ্ছে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়—তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে']। সবুজপত্রের বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁরা হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সতীশচন্দ্র ঘটক, কিরণশঙ্কর রায়, বরদাচরণ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারিতকৃষ্ণ

দেব, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এস. ওয়াজেদ আলি। এছাড়া সবুজপত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন ইন্দিরা দেবী [চৌধুরাণী], সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বপতি চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী ও দিলীপকুমার রায়। এঁদের সকলের প্রবন্ধেই কমবেশি পরিমাণে বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, 'বুদ্ধিবাদ অর্থে ১. চরিত্রশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, ২. বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, ৩. যে তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং ৪. যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত অঙ্গীকারের উপসিদ্ধান্ত হল বুদ্ধির স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষ [সাধারণের বুদ্ধি আছে সবুজ পত্রের দল স্বীকার করেনি কখনও], সেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, লেখক কর্মজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না, সাহিত্যিক জীবনে সর্বদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয় অবশ্য নির্দিষ্ট ছিল না, তবে সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিকস-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পলিটিক্যাল গোঁড়ামি, ধর্মের গোঁড়ামি, এমনকি বিজ্ঞানের, দর্শনের। মোদ্দা কথা কিছুই বাদ পড়েনি। ফলে লেখায় এসেছিল ফুর্তি, এবং **সাহিত্যে এল প্রবন্ধ**, সর্ব বিষয়ে জানবার আগ্রহ।

সবুজপত্র ১৯২২ সালের পর অনিয়মিত হয়ে পড়ে [সম্ভবত এত উচ্চমানের পত্রিকা কখনও দীর্ঘজীবী হয় না, যদি না মানের অবনয়ন ঘটে], ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হল **কল্লোল**। সবুজপত্রের কোনো কোনো লেখক কল্লোলেও লিখতেন, যেমন, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এস. ওয়াজেদ আলি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়। তবে কল্লোল, অথবা সমসাময়িক কালি-কলম, প্রগতি গল্প-কবিতার ক্ষেত্রে যতটা সংস্কার-মুক্তি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, মননচর্চায় ততটা অভিনিবেশের পরিচয় দিতে পারেনি। বরং উত্তরা পত্রিকা এদিক থেকে আমাদের বেশি মনোযোগ দাবি করে। উত্তরার প্রধান দুজন প্রবন্ধকার কল্লোলেও লিখেছেন [মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ] তবে উত্তরায় আমরা পেয়েছি বিশ শতকের আরও কয়েকজন লেখককে, যাঁদের চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— গোপীনাথ কবিরাজ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল শীল। মননঋদ্ধ গাঢ়বদ্ধ প্রবন্ধ নলিনীকান্ত গুপ্তের মতো খুব বেশি জন লিখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগ দেওয়ার ফলে পরিণত বয়সে ধর্মদর্শনে তাঁর আগ্রহ বেশি দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক বিদেশি ও বাংলা কবিতার আলোচনায় তাঁর মর্মগ্রাহিতা ও রসবোধ অতুলনীয়।

সবুজপত্রের সঙ্গে নানাদিক থেকে তুলনীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত **পরিচয়**। প্রমথ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে যেমন 'সবুজ পাতার দল' গড়ে ওঠে, সুধীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তেমনি 'পরিচয়-গোষ্ঠী'। সুধীন্দ্রনাথের সহায় ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায় ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বাদ দিলে পরিচয়ের অধিকাংশ নিয়মিত লেখক সাহিত্যজগতে তখনও অপরিচিত, একমাত্র ব্যতিক্রম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য তীর্থপতি রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র বিরাজমান,—প্রথম বছরের চারটি সংখ্যার মধ্যে দেখি রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ, একটি গ্রন্থসমালোচনা, একটি পত্র ও পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বছরে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুশোভন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব থেকে শুরু করে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সংগীত, ছন্দ, অলংকার শাস্ত্র,

ব্যাকরণ-ভাষাতত্ত্ব—কী নয়! সাহিত্য প্রসঙ্গ তো আছেই। অন্যদিকে পরিচয়ের সবচেয়ে বড়ো গৌরব 'পুস্তক পরিচয়' পত্রিকার অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকত। প্রথম বছর পুস্তক সমালোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, অশোকনাথ বেদান্ততীর্থ, সুধীরকুমার চৌধুরী; পশুপতি ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রলাল বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হিরণকুমার সান্যাল, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, দিলীপকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু, নির্মলচন্দ্র দত্ত, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমার দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিরিশ বছর, যৌবনের তেজ ও কর্মশক্তির প্রকাশ হয়েছে পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মনীষা, বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ও অত্যুচ্চ সাহিত্য-মান রক্ষার প্রয়াস পরিচয়কে একধরনের আভিজাত্য দান করেছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ পরিচয়ের কুড়ি বছর পূর্তির পর লিখেছেন, 'পরিচয়-গোষ্ঠীর প্রত্যেকের স্টাণ্ডার্ড ছিল, কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে তার কোনো ইডিয়লজি ছিল না, যদিও প্রত্যেকে আইডিয়া ব্যবসায়ী ছিল। ঐ সাধারণ স্টাণ্ডার্ডের ওপর ভর করেই কাজ চালানো গিয়েছিল। সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ডই ছিল সবচেয়ে উঁচু, আমাদের কারুরই নিচু ছিল না, কিন্তু আমরা জ্ঞানত ও অজ্ঞানত সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ড বজায় রাখতে চেষ্টা করতাম। একদিনও সে সম্পাদকী কর্তৃত্ব ফলায়নি আমরাও কোনোদিন আচারে-ব্যবহারে তাকে জানবার অবকাশ দিইনি যে সে সম্পাদক। অথচ বহু রচনার সম্পাদন সে করেছে।' দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, 'পুরাতন দলের একটা স্টাণ্ডার্ড ছিল; আমরা শরৎবাবুকেও প্রথম শ্রেণীর নভেলিস্ট বলিনি; তাঁকে ঠুকতেও দ্বিধা বোধ করিনি—পরিচয়ের পৃষ্ঠা দেখুন।' [উত্তেজিত শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ার জন্য দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য—'পরিচয় বলে একখানা ত্রৈমাসিক অভিজাত শ্রেণীর কাগজ বেরিয়েছে। তাতে তোমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় শেষপ্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। পড়েচো বোধ হয়? তাঁর 'মোদ্দা' কথাটা এই যে যে-হেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু কমল-চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ যেহেতু নীরেনের চোখ দুটো কটা সেই হেতু তার বুদ্ধি ঠিক বেড়ালের মতো। দুঃখ এই যে এরাও কলম ধরে এবং তা ছাপাও হয়। কারণ নিজেদের কাগজ রয়েছে। অহংকার এই যে ফরাসি জানি, জার্মান জানি।]

ত্রৈমাসিক পরিচয় পত্রিকা সুধীন্দ্রনাথ পাঁচ বছর এবং মাসিক হওয়ার পর সাত বছর সম্পাদনা করেন। এই সঙ্গে পত্রিকার প্রথম পর্বের অবসান ঘটেছে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পরি, 'পরিচয়-এর পরিচালনাভার সুধীনবাবু '৪৪ সালের শেষের দিকে তুলে দেন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখকসংঘের হাতে—এ থেকে অন্তত অনুমান অমূলক নয় যে কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ তাঁর অপছন্দ হলেও নিজের সাধের পত্রিকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়াটা তাঁর উদার চিত্তবৃত্তি এবং আমাদের প্রতীতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধারই নিদর্শন। পরিচয়-আড্ডার চেহারা ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছিল; চারুচন্দ্র দত্ত, [অধ্যাপক ও কবি] সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বসন্তকুমার মল্লিক প্রমুখ প্রবীণ তখন আর নেই,.....গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বা সুশোভন সরকারের মতো ব্যক্তি পরিচয়-এর অজানা সংক্রমণে সেতুর মতো রয়েছেন; হাবুলবাবু [হিরণকুমার সান্যাল] পূর্বাপর অধ্যায়ে সমানভাবেই সহজ ও সহর্ষ; নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র পরিচয়-এর নবপর্যায়ে আস্থা আর নিষ্ঠা আর কর্মশক্তি নিয়ে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন।' সুধীন্দ্রনাথকে কোনোভাবে মার্কসবাদী বলা চলে না সত্য, কিন্তু তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন 'অর্থ কাব্যজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ লিখেছেন, যার মধ্যে হিরণকুমার সান্যাল লক্ষ করেছেন 'মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যা' তেমনি সুশোভন সরকার সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পরিচয় পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ

করেন গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল। সমাজ ও সাহিত্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা ক্রমশ প্রাধান্য পেতে শুরু করে, বিশেষত রনদিভের নেতৃত্বকালে নবপর্যায়-পরিচয় সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুসের নেতৃত্বে সবদিক থেকে নবজন্ম লাভ করে। সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে বড়ো রকম কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আসলে বিশ শতকের চারের দশকের প্রবন্ধকারেরা মাকর্সবাদ প্রচারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ফলে সেই অগ্রণী [১৯৩৯] থেকে শুরু করে পরবর্তী দশ-এগারো বছরের মধ্যে বেরিয়েছে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন, যাকে পলিটিক্যাল ম্যাগাজিন বললেও ভুল হয় না, যেমন অরণি, ক্রান্তি, মার্কসবাদী, প্রতিরোধ, ডাক, ইস্পাত, ফতোয়া, অঙ্গীকার, সাহিত্য পত্র ও নতুন সাহিত্য। এইসব পত্রিকায় বিখ্যাত কবি-কথাসাহিত্যিকেরা যেমন প্রবন্ধ লিখেছেন [গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, গোলাম কুদ্দুস, অসীম রায়], তেমনি অধুনাবিস্মৃত অনেক প্রবন্ধকার অসামান্য কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন—নরহরি কবিরাজ, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিল সিংহ, নীহার দাশগুপ্ত, চিত্ত বিশ্বাস, হরিদাস নন্দী, ধীরেন্দ্র রায়, নিমাই চক্রবর্তী, মিহির মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অমল দাশগুপ্ত, বিমল ভৌমিক, মিহির সেন। এঁরা সকলেই প্রগাঢ় প্রত্যয় নিয়ে লেখালিখি করেছেন। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনা বোধ হয় অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। সাহিত্য বিচারেএর ফলে বিপদও দেখা দিয়েছে কখনও। হিরণকুমার সান্যালের মনে হয়েছিল, **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা**, 'হল ঠাকুমার ঝুলি থেকে বের করা ছেলেভোলানো রূপকথা'। জাগরীব মধ্যে গোপাল হালদার দেখেছেন 'বর্তমানের কমিউনিস্ট-বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ' এবং লেখকের আত্মবিস্মৃতি। সতীনাথের 'আন্টা-বাংলা' গল্প পড়ে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের মনে প্রশ্ন জাগে 'আন্টা-বাংলা যাহার প্রতীক সেই শক্তিমান ধনিকবর্গের দ্বারা নিঃস্বশ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণ, তাহা কি এইরূপ স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুর পথে চলিবে? তাহার জন্য কি অপরিহার্য শ্রেণীসংগ্রাম, নিষ্করুণ আততায়িত্ব, শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান, কেবল যাহারই পরিণামে রচিত হইতে পারে শ্রেণীহীন সমাজ ও শান্তিময় পৃথিবী?' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' করতে গিয়ে নিজের লেখা সহরতলী উপন্যাসে 'শ্রমিক স্বার্থের বিরোধী', 'শ্রমিকশ্রেণীর আবেগের মিথ্যা রূপায়ণ' দেখেন, তার কারণ 'বুর্জোয়া সাহিত্যিক যে মজুরকে রূপ দেয় তা মিথ্যা শুধু এই জন্য যে সত্যিকারের মজুরের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। হয়তো এ সব প্রবন্ধে সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রয়োগ নিয়ে অন্তর্দলীয় কলহ ও সেই সময়ে আত্মবিস্মৃতির প্রকাশ ঘটেছে। ভবানী সেন, প্রদ্যোৎ গুহ, নৃপেন্দ্র গোস্বামীর কথা বাদ দিচ্ছি, সরোজ আচার্যের মতো স্থিতবুদ্ধি সাহিত্যবোদ্ধাও ১৩৫২ সালে পরিচয় পত্রিকায় 'মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা'র মতো প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হন। অবশ্য প্ররোচনা ছিল, বিশেষভাবে **শনিবারের চিঠি** ও কিছু পরিমাণে **পূর্বাশা, চতুরঙ্গ** পত্রিকায় পরিকল্পিত ভাবে মার্কসবাদ-বিরোধিতা উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। পণ্ডিচেরির অনিলবরণ রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শশাঙ্কমোহন সেন ও বটকৃষ্ণ ঘোষ, সর্বোপরি মোহিতলাল মজুমদার সুলেখক হওয়া সত্ত্বেও মতান্ধতা তাঁদের দৃষ্টি ও যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করেছিল। অনেক ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রয়োজন আছে, তবু বিশ শতকের চারের দশক থেকে শতাধিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংকলন করা সম্ভব।

তেইশ বছর বয়সে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কুমিল্লা থেকে প্রকাশ করেন **পূর্বাশা** [১৯৩২], তখন কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির ধারানুসরণ ছাড়া তার মধ্যে অভিনবত্ব ছিল কম। আধুনিক রুশ সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেও রাজনৈতিক তত্ত্বদর্শনে সম্পাদকের আগ্রহ ছিল না। প্রধান প্রবন্ধকার সম্পাদক ছাড়া প্রবোধচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রভু গুহঠাকুরতা, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

দিলীপকুমার রায়। রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায় [১৯৪১] প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে সেকালের প্রায় সব বিখ্যাত প্রবন্ধকার লিখেছেন। ১৯৩৭ থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'মার্কসীয় ধারার সাহিত্য পরিবেষণে' আগ্রহী হন, কিন্তু স্তালিনপন্থার বিরোধিতা ও ট্রটস্কি-প্রতিষ্ঠিত 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক' বিশ্বাস শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় নয়, সাহিত্যভাবনায় প্রভাব বিস্তার করে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই সম্ভবত পূর্বাশা 'হার্ড থিঙ্কিং'-এর ওপর জোর দেয়। মন্বন্তর বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশভাগ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ১৯৪৭ পরবর্তীকালে পূর্বাশায় প্রকাশিত হয়েছে [সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'মন্বন্তরোত্তর বাংলা' বা 'আজ', ধূর্জটিপ্রসাদের 'সাম্প্রতিক বাঙলা' বা 'মার্কসবাদ ও মনুষ্য ধর্ম', আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'সাধ এবং সৃজন' বা 'সাহিত্যিকের সমাজচেতনা', বিমলচন্দ্র সিংহের 'যুদ্ধোত্তর ভারত : অর্থনীতি ও বিপ্লব' বা 'বাংলার আর্থিক অবস্থা', হুমায়ুন কবিরের 'ভারতবর্ষ ও ইউরোপ' বা 'চিরস্থায়ী জমিদার প্রথা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে', 'ভুল চিন্তার মাশুল', সরোজ আচার্যের 'চার্বাক দর্শন' বা 'ভলটেয়ার']। পূর্বাশা পত্রিকা আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাস-কবিতায় নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে [নতুন লেখক আবিষ্কার ও লেখককে তৈরি করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো সম্পাদক খুব কম দেখা গেছে], প্রবন্ধ সাহিত্যে তেমন কিছু করতে সক্ষম না হলেও বাঙালির মননচর্চার ধারাকে পরিপুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

পরিচয় ও *পূর্বাশার* যোগফল বলা যেতে পারে হুমায়ুন কবির সম্পাদিত *চতুরঙ্গ* [১৯৩৮]। হুমায়ুন কবির যেমন পূর্বাশায় লিখতেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তেমনি চতুরঙ্গ পত্রিকায়। চতুরঙ্গ এক হিসেবে অনেক উচ্চাভিলাষী ও সুপরিকল্পিত সাহিত্যপত্র। প্রথম বছর হুমায়ুন কবিরের সহযোগী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পরে হুমায়ুন কবিরের একার নামই সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছে যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। হুমায়ুন কবির একালের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। পরে তিনি সাহিত্য ও দর্শন ছেড়ে রাজনীতির প্রাঙ্গণে বিচরণ করেছেন। সে সময়ে, অথবা তার আগে থেকেই চতুরঙ্গের যথার্থ পরিচালক ছিলেন আতাউর রহমান। পত্রিকায় গল্প ও কবিতা [পরে ধারাবাহিক উপন্যাস] ছাপা হলেও সংখ্যায় ও পরিমাণে প্রবন্ধের আধিক্য দেখা যাবে। চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচির দিকে তাকালে সম্পাদকীয় আদর্শ ধরা পড়বে—

প্রবন্ধ	সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি	সুশোভন সরকার
কবিতা	নারী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	মুদ্রারাক্ষস	বিষ্ণু দে
	ফুটপাথে	জীবনানন্দ দাশ
	অনাবশ্যক	হেমচন্দ্র বাগচী
	বিরোধী	সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	ব্যাঙ্	বুদ্ধদেব বসু
প্রবন্ধ	বাংলার কাব্য	হুমায়ুন কবির
	রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শান্তি	বুদ্ধদেব বসু
গল্প	বোমা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবন্ধ	প্রগতি ও পরিবর্তন	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
গল্প	নেহাত গল্প নয়	আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ

ইংরাজী সাহিত্য	বর্তমান ইংরাজী সাহিত্য	
ভারতীয় সাহিত্য	উর্দু ভাষার উদ্ভব	ইসারাৎ হোসেন জুবেরী
	তামিল গদ্য	পদ্মনাথন
সঙ্গীত	সঙ্গীত	হেমেন্দ্রলাল রায়
সিনেমা	অভিনয়। শ্রীভারতলক্ষ্মী	
	দেশের মাটি। নিউ থিয়েটার্স লি:	
সমালোচনা	কাদম্বরীর বাংলা তর্জমা	অতুলচন্দ্র গুপ্ত
	বাংলা কাব্যপরিচয় (রবীন্দ্রনাথ)	অশোক মিত্র
	চোরাবালি (বিষ্ণু দে)	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
	অষ্টাদশী (হুমায়ুন কবির)	চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
	মানস-রিহ (হেমচন্দ্র বাগচী)	চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
	পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্প	সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এরকম ভুরিভোজের আয়োজন কদাচ হয়েছে বাংলা সাহিত্যপত্রের জগতে। প্রথম দিকে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের বয়স যাই হোক না কেন, তাঁরা সকলেই সুঅধীতী, পরিণতমনা, চিন্তাশীল মণীষী। সুশোভন সরকার, হুমায়ুন কবির, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আছেন নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ ঘোষ, পঞ্চানন চক্রবর্তী, সৈয়দ মুজতবা আলী, নবেন্দু বসু, অচ্যুত গোস্বামী, কাজী আবদুল ওদুদ, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পুস্তক সমালোচনায় কে নেই—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী। বিশ শতকের চারের দশকের শেষের দিকে, পাঁচের দশকের সূচনায় আমাদের জাতীয় জীবনে এক উথালপাথাল কাল। অশোক মিত্র দেখেছেন 'পরিচয় পত্রিকার ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আবর্তন ঘটেছে, সম্পাদকীয় আচরণ-বিচরণে প্রকট, প্রায়-ধর্মীয় একপাক্ষিকতা, বাংলা সাহিত্যেও কেন ভয়ংকর ভাবনা-বিপ্লব সংঘটিত হবে না তা নিয়ে উত্তেজিত আলোড়ন। উত্তেজিত, অথচ সব ক্ষেত্রে উত্তেজক নয়।' পূর্বাশা শেষ পর্যন্ত এতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যা সৃষ্টিকর্মে সহায়ক হয়েও সমাজধারা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। পূর্বাশা বাঁচেনি, কারণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য সমঝোতা করতে জানতেন না—হয় এসপার, নয় ওসপার। পূর্বাশা কবেই বিলুপ্ত। কিন্তু পরিচয় আছে, সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় নয়। চতুরঙ্গ আছে, হুমায়ুন কবিরের চতুরঙ্গ নয়। এর ফলাফল আপাতত বিচার্য নয়। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, ভালো প্রবন্ধ আজ দুষ্প্রাপ্য হলেও দুর্লভ নয়। হয়তো মননের গভীরতা-বিস্তার আজ সন্ধানসাপেক্ষ। তবু রবীন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদ-রামেন্দ্রসুন্দরের ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। সাময়িক সাহিত্য মনন-সাহিত্যের পরম শত্রু। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সালতামামী গ্রহণে একেবারে নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কারণ নেই।

সহায়ক গ্রন্থ

ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, ২০০৬
গীতা মিত্র, 'সবুজ পত্র ও দশটি খণ্ডের সম্মিলিত প্রবন্ধসূচি', গ্রন্থাগার/বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩৭৭
হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়-এর কুড়ি বছর
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, পরিচয়-এর আড্ডা
সত্যপ্রিয় ঘোষ সম্পাদিত পূর্বাশার কথা, ১৯৯৯
সত্যপ্রিয় ঘোষ সম্পাদিত পূর্বাশা সংকলন, ২০০১
সত্যপ্রসন্ন দত্ত, পূর্বাশা চতুর্থ আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র, ১৯৯২
অশোক মিত্র সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' থেকে, দুই খণ্ড, ১৯৯৬, ১৯৯৯
ধনঞ্জয় দাশ, মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, তিন খণ্ড, ১৯৭৯-১৯৮১



উত্তর-আধুনিকতা : আর্থ-সামাজিক উৎসের সন্ধানে

• • • • • •

পবিত্র সরকার

১. দু-একটা কথা [১]

উত্তর-আধুনিকতা নাকি বিশ্বের সদ্যতম এক শিল্পের আদর্শ, কারও কারও মতে সমস্ত মতবাদ ও আদর্শকে খতম করে দিতে তার উদ্ভব। শুধু শিল্পে কেন, জীবনের সমস্ত প্রকাশকে সে ধরতে চায়। বাংলাতেও একাধিক লেখা নিজেকে উত্তর-আধুনিক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য বুক ঠুকে এগিয়ে এসেছে। সমীর রায়চৌধুরী, কখনও 'অধুনান্তিকতা' নাম দিয়ে নানা পর্যায়ে তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।[২] তবে এই লেখকের নিজের অসম্পূর্ণ অধ্যয়ন থেকে যা মনে হয়েছে, এঁরা সকলেই উত্তর-আধুনিকতার লক্ষণ-উদ্ধার এবং নিজেদেরও অন্যদের লেখায় সেই লক্ষণ প্রতিষ্ঠা বা সন্ধানে যত ব্যস্ত, উত্তর-আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক-বৈশ্বিক ভূমিকা সম্বন্ধে তত আগ্রহী নন। এ নিবন্ধে তারই প্রয়াস করা হয়েছে। এর প্রয়াসের একটা উপলক্ষ্য এই যে, বাংলায় ইদানীং উত্তর-আধুনিক কথাটা খুব অসতর্কভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি। আমাদের গণ্ডগোল অনেক সময় পরিভাষার এই সাধারণ অর্থে ব্যবহার নিয়ে ঘটে। পরিভাষার যে একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, সে অর্থ না মানলে যে ধারণার বাঁধুনি থাকে না, এবং সমস্ত তর্কই একটা বাজারের কোন্দলে পরিণত হয়, সেটা আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি। সব পরিভাষা অবশ্য সমান সংহত ও সুনির্দিষ্ট নয়, তাও আমরা লক্ষ করব।

আমরা এখান থেকেই কথাটা শুরু করব যে, উত্তর-আধুনিকতা [পোস্টমডার্নিজম] বলে কোনো সংহত, সুনির্দিষ্ট সীমাপ্রগাঢ়, স্থাপত্যঘন তত্ত্ব নেই। এ সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেই একমত। এর কোনো স্থিতসংবদ্ধ গোষ্ঠী নেই—যার সদস্যরা অন্তত বুক বাজিয়ে বলতে থাকবে, 'আমরা বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল উত্তর-আধুনিক; বাকিরা হয় পরিষ্কার না-উত্তর-আধুনিক—সম্পূর্ণ ভিন্ন দল, নিছক, 'অপর' না হয় আমাদের মতো খাঁটি উত্তর-আধুনিক নয়। ওদের কথায়, কেউ কান দিয়ো না।' এ থেকেই বোঝা যাবে যে, উত্তর-আধুনিকতা একটা সময়ে উঠে-আসা নানা ভাবনা ও বিশ্বাসের একটা জোড়াতালি-দেওয়া তত্ত্ব। কিন্তু খুব শক্তিশালী তত্ত্ব, কারণ সাহিত্যরচনা থেকে শুরু করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ফোটোগ্রাফি, বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও বিনোদন, দর্শন—সমস্ত কিছুতেই তার লক্ষণ ছড়িয়ে গেছে, সমস্ত কিছুতেই নাকি এক ভাবনার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। আর পশ্চিমের আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ এই তত্ত্বের জন্মসূত্র। তবে ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, যারা এটিকে এ সময়ের চূড়ান্ত এক তত্ত্ব বলে দাবি করে তারাও খেয়াল করে না যে, এটিকে তারাও এক 'বৃহদাখ্যান' বা grand-narrative করে তুলতে চাইছে [পরে বৃহদাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা দেখুন]।

এই বহুমুখী ও বহুস্তরীয় ভাবপুঞ্জের কোনো বড়ো একক দার্শনিকও নেই, যাঁর দর্শনকে এই তত্ত্বগুচ্ছের একমাত্র ভিত্তি বা উৎস বলা যায়। সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক দর্শনের উদ্‌গাতা যেমন ছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স, কিংবা ধনবাদী দর্শনকে সংহত রূপ যেমন দিয়েছিলেন

জন মেনার্ড কিন্‌স। উত্তর-আধুনিকতার দার্শনিক হিসেবে যাঁদের নাম করা হয়, যেমন নিটশে বা হাইডেগার বা জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়োতার [Lyotard] বা জাঁ বোদ্‌রিয়ার [Baudrillard]—তাঁরা উত্তর-আধুনিকতার উদগাতা নন, এর কোনো কোনো লক্ষণের ব্যাখ্যাতা মাত্র। জাক্‌ দেরিদাও আবির্ভূত হয়েছেন উত্তর-অবয়ববাদী [পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট] হিসেবে, তিনিও বিশেষভাবে উত্তর-আধুনিকদের কেউ নন। কখনও-কখনও মিশেল ফুকো [Foucault] বা জাক লাকাঁ [Lacan]-র নামও উচ্চারিত হয় উত্তর-আধুনিকতার সূত্রে, কিন্তু তাঁরাও নিছক উত্তর-আধুনিক নন। অবশ্য সকলেই উত্তর-আধুনিকতার অসংবদ্ধ ঘটনাকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছেন, যেমন অন্য কালের বা অন্য দেশের আরও কেউ কেউ করেছেন।

২. শব্দার্থ সন্ধান

'পোস্টমডার্নিজম' শব্দটির বয়স আজ একশো ত্রিশ বছরের মতো হল। উত্তর-আধুনিক স্থাপত্য-ও শিল্প-বিশেষজ্ঞ চার্লস জেংক্‌স [Jencks] খবরের কাগজে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, ১৮৭০-এ তিনি কথাটির সবচেয়ে পুরোনো উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন। সে সময়কার এক ইংরেজ শিল্পী জন উইলকিন্‌স চ্যাপম্যান ফরাসি নব্য-ইম্প্রেশনিস্ট ক্লোদ মনে আর ওগুস্ত রেনোয়ার-এর ছবি দেখে এই পোস্ট উপসর্গবিশিষ্ট শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এরা তখনকার মতো 'আধুনিক' ইম্প্রেশনিজ্‌মকে উত্তীর্ণ হয়ে আরও এগিয়ে গেছে।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, আজ পোস্ট-মডার্নিজম কথাটার যে অর্থ, প্রথম প্রয়োগে তার সে অর্থ ছিল না। প্রথম কেন, পরবর্তী আরও বহু প্রয়োগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে [Ward, 2003 : 7-9]। ওয়ার্ড ১৯১৭, ১৯৪৭, ১৯৫৭, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮-তে এর আরও সব প্রয়োগ লক্ষ করেন, এবং সব প্রয়োগই ভিন্ন অর্থে। ১৯১৭-এ জার্মান লেখক রুডল্‌ফ পেন্‌ভিট্‌স-এ কথা প্রয়োগ করেন ইউরোপীয় 'আধুনিকতা'র বন্ধনমুক্ত মানুষ সম্বন্ধে, ১৯৪৭-এ আর্নল্ড টয়েনবির প্রয়োগের অর্থ ছিল 'শিল্পবিপ্লব ও বৃহৎ শিল্পায়নের পরবর্তী যুগ'। মার্কিন সংস্কৃতিতাত্ত্বিক বার্নার্ড রোজেনবার্গ ১৯৫৭-তে বলেন প্রযুক্তির আধিপত্যে কঠোর সার্বিক সমতা-চাপানো এক জীবনযাপনের কথা, যার আংশিক প্রতিধ্বনি হয়তো শুনতে পাওয়া যায় হার্বার্ট মার্কিউজ-এর 'একমাত্রিক মনুষ্য' বা One-dimensional man কথাটির মধ্যে। ১৯৬৪-তে লেসলি ফিডলার উচ্চকোটির মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে পোস্টমডার্নের অর্থ খোঁজেন; তাঁর মনে নিশ্চয়ই ছিল তৎকালীন হিপি, ফ্লাওয়ার চিলড্রেন ও কালো মানুষদের নতুন প্রতিবাদী আচরণবিধি ও নন্দনতত্ত্বের কথা—যা WASP বা White Anglo-Saxon Protestant-দের আচরণবিধি ও নন্দনতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।[৩] ১৯৬৮-তে লিয়ো স্টাইনবার্গের অভিপ্রেত অর্থ শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। মার্কিনদেশে পপ [পপুলার] ও অন্যান্য নতুন শিল্প পোস্টমডার্ন, কারণ তা আগেকার এলিট শিল্পতত্ত্বকে বাতিল করতে চায়।

অবশ্যই এ সব প্রয়োগ বিত্তবৈভবশক্তির 'উন্নত' পাশ্চাত্যদেশগুলির সামাজিক-বাণিজ্যিক-অর্থনীতিক-সামরিক-প্রাযুক্তিক-নান্দনিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। এক অর্থে তৃতীয় বিশ্বের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু অন্য নানা গভীরতর অর্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যে-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সদ্যতন পর্যায়ে এই তত্ত্বের উদ্ভব বলে ফ্রেডরিক জেম্‌সন জানিয়েছেন, সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করেই বেঁচে আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যবস্থার সাম্রাজ্যে আমরা অধীনস্থ প্রজা, তাই এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করতেই হয়। পৃথিবীর এখন এমন এক অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আমেরিকা-ইউরোপের সর্দি লাগলে আমরাই আগে বেদম হাঁচতে শুরু করি।

পোস্টমডার্নিজম এই নব্য ধনব্যবস্থার প্রতিচ্ছায়া, কাজেই এই উত্তর-আধুনিকতাকে বুঝতে নতুন ধনব্যবস্থাকেও আমরা আরও বুঝতে পারব—এও একটা যুক্তি। এ ব্যবস্থা আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশ ও সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বিশ্বায়নের বজ্র-আঁটুনিতে জড়িয়ে ধরছে, তারই দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটছে পোস্টমডার্নিজমে।

বঙ্গভাষী অঞ্চলে আর-একটি কথাও হয়তো বলে নেওয়া দরকার। গত শতকের আশির বছরগুলিতে পশ্চিমবাংলায়—কলকাতায় বলাই ভালো—অঞ্জন সেন সম্পাদিত *গাঙ্গেয়পত্র* এবং আরও দু-একটি পত্রিকায় উত্তর-আধুনিকতা বলে একটি মূলত কবিতার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। *সাম্প্রত* ও অন্যান্য পত্রিকার একাধিক সংখ্যাতেও এ নিয়ে আলোচনা দেখেছি। তার সঙ্গেও পশ্চিমি উত্তর-আধুনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থানের [CIIL-Central Institute of Indian Languages] অধ্যক্ষ এবং মৈথিল ভাষার প্রখ্যাত কবি উদয়নারায়ণ সিংহ, কবি অমিতাভ গুপ্ত, প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। ভারতের সাহিত্য আকাদেমির তখনকার সচিব ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এঁদের নিয়ে Indian Literature পত্রিকাতেও লিখেছিলেন।[৪] কিন্তু পশ্চিমি উত্তর-আধুনিকতার আঁচ এসে পৌঁছোনোর পর এঁরা খুব সযত্নে তা থেকে নিজেদের অবস্থানকে পৃথক করতে থাকেন। এঁরা বলেন এঁদের উত্তর-আধুনিকতা মূলত দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা, ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। এঁরা কবিতার শৈলী ও রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন, কিন্তু আগেকার স্মৃতিলোককে প্রত্যাখ্যান বা খেলাচ্ছলে তার খাবলা-খাবলা ব্যবহার এঁদের পরিকল্পনায় ছিল না। উদয়নারায়ণ সিংহের কথায় বাংলা উত্তর-আধুনিক কবিতার লক্ষণ তার 'ভাষায়, শব্দচয়নে, কলনে, ন্যাসে, অর্থবিস্তারে ও ছন্দে স্বচ্ছন্দে—রয়েছে বিষয় নির্বাচনে, স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে-শ্রুতিতে-স্মৃতিতে, আছে রূপে-রূপকল্পে এবং সর্বোপরি ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মীয়তায়।' [দ্র. অঞ্জন সেন ও অন্যান্য, সম্পা. ১৪১১ : ৮৩]। বাংলাদেশেও এই আন্দোলনে বিস্তারিত হয়েছিল তা লক্ষ করেছি [মনিরুজ্জামান, ১৪১০ দ্র.]। কিন্তু তাতে বাঙালি উত্তর-আধুনিক আর পশ্চিমি উত্তর-আধুনিকদের মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট থাকেনি বলে মনে হয়। তবু এজাজ ইউসুফীদের বয়ান ও রচনা পাশ্চাত্য উত্তর-আধুনিকতারই বেশি কাছাকাছি।

তৃতীয় আর-একটা কথাও মনে হয় প্রথমেই বলে রাখা দরকার—সেটা খুব গোড়ার কথা। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্বে বহুবিধ 'ইজম' বা 'বাদ'-এর প্রচার ও আস্ফালনের ইতিহাস আমরা পড়তে বাধ্য হই। ক্লাসিক, রোমান্টিক, নিও ক্লাসিকাল, 'আধুনিক' ইত্যাদি ছাপ্পার আড়ালে সাহিত্য ও কাব্যবিচারের মূল এই প্রশ্নটা আড়ালে পড়ে যায় যে, একটা 'নাম' একটি রচনার উৎকর্ষের সঙ্গে কী যোগ করে? আদৌ কি তার উপভোগ্যতা বাড়ায়? উৎকর্ষ আর উপভোগ্যতার সমীকরণ এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু দুয়ের কোনোটাই কি সুনিশ্চিত হয়? নাকি একটা লেবেল ওই রচনাটির সময় ও সৃষ্টিপটভূমিকাকেই শুধু চিহ্নিত করে দেয়, আর কিছু নয়? 'বাদ' সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাঠক কি রচনাটি থেকে কিছু প্রত্যাশা করবেন, না করবেন না? আমরা মাথামোটা সাধারণ পাঠকেরা শিল্প থেকে একই সঙ্গে আনন্দ, জীবনকে একটু-আধটু বুঝে নেওয়া, মানুষ [কখনও অন্য প্রাণীর, এমনকি প্রাণসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণদ প্রকৃতির] বাঁচা-মরা অস্তিত্বের সুখ-দুঃখের বড়ো কোনো একটা অভিজ্ঞতা, বিচিত্র পৃথিবী সম্বন্ধে জানা, কিছু অগ্রগতির নিশানা, কিছু সংগ্রামের নির্দেশ—এসব হয়তো প্রত্যাশা করি শিল্প থেকে, কিন্তু পোস্টমডার্ন জাতীয় লেবেল কি আমাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে? বাড়িয়ে দেয় বা সমৃদ্ধতর করে? লুসি [২০০০] যাকে non-appreciationist বা উদ্দেশ্যবাদী শিল্পতত্ত্ব বলেন তার কথা আমরা এখানে বলছি না। তাতেও শিল্পের উৎকর্ষ বা উপভোগ্যতার অমোঘ

আশ্বাস নেই।

এগুলি খুব সরলচিত্ত প্রশ্ন, কারণ তাত্ত্বিকভাবে এ প্রশ্নগুলির বিরুদ্ধতা করে বলাই যায় যে, ভালো লাগা, মন্দ লাগার কোনো নিরপেক্ষ নির্বিশেষ মাত্রা নেই। এটা যেমন এক দিকের কথা; তেমনই আর একদিকের কথা হল যে, অনেক শিল্পতত্ত্ব শুধু ভালো লাগাতেও চায় না, চায় একটা কোনো প্ররোচনা দিতে বা কোনো কাজে উদ্দীপনা জাগাতে। শিল্পসৃষ্টি একটা লক্ষ্য, তাই আমাদের গন্তব্য—নাকি তা অন্য কোনো গন্তব্যে পৌঁছোবার একটা রাস্তা, একটা উপায়—লুসির কথায় appreciationist আর non-appreciationist—এই দুটো মতে নন্দনতত্ত্ব প্লাতোর সময় থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেখানে পাঠকের/দর্শকের/শ্রোতার ভালো লাগা, মন্দ লাগার বিষয়টি যেন তাত্ত্বিক প্রাবল্য হারিয়ে ফেলে। আর পরে তো আমরা দেখব যে, উত্তর আধুনিকতা তো শিল্পের 'শিল্পত্ব' নিয়ে বাহাদুরি করার অধিকারকেই স্বীকার করে না, ফলে তার আবার ভালো-মন্দ কী? তবে যতই দুর্বল হোক আমাদের প্রশ্নগুলি, তা তুলে রাখতে দোষ নেই, কারণ এ-প্রশ্ন মাত্র দু-চারজনের নয়।

৩. কখন শুরু, কখন শেষ?

উত্তর-আধুনিকতা অবশ্যই এখনও চলছে পাশ্চাত্যে, অর্থাৎ তাকে বাতিল করে এখনও কোনো নতুন সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, দর্শন ও আন্দোলন শুরু হয়নি। এ থেকে বোঝা যায়, একটির পর একটি আন্দোলনের উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিকতা বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। বেশির ভাগ তত্ত্ব বা আন্দোলনই শুরু হয় সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্য তত্ত্ব বা আন্দোলনের প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া থেকে। সেই কারণে কোনো আন্দোলনের আরম্ভ ও শেষের একটা মোটামুটি সময় নির্দেশ করা যায়। মোটামুটিই সেটা সম্ভব, কারণ তার আরম্ভ ও শেষের প্রান্ত পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট থাকে না। আবার তার কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের সময়েই হয়তো তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার একটা ক্ষীণ স্রোতের জন্ম হয়, পরে যা শক্তিশালী হয়ে তাকে সরিয়ে দিতে এগোয়। অর্থাৎ যে-কোনো সময়ে সংস্কৃতি বা ইতিহাসের একাধিক ছোটোবড়ো স্রোত পাশাপাশি চলে, তারমধ্যে একটি প্রধান হয়ে ওঠে। ফ্রেডরিক জেম্‌সনের [Jameson, 1991 : 158-59 ও অন্যত্র] Cultural dominant কথাটি থেকে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত আমরা বুঝতে পারি।[৫]

জেম্‌সন এক নব্য মার্কসবাদী, মার্কিনদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্কসবাদের চর্চার একটা সম্ভ্রান্ত জায়গা মূলত তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। জেম্‌সনের এই কথাটির পেছনে মার্কসের ইতি-নেতি-সমন্বয় বা থিসিস-অ্যান্টিথিসিস-সিনথেসিস তত্ত্ব যে কাজ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হেগেলের উদ্ভাবিত ইতিহাসব্যাখ্যানের এই সূত্রকে মার্কস তার ভাববাদী ভিত্তি থেকে ছিনিয়ে এনে বাস্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই তত্ত্ব আমাদের বলে যে, প্রতিটি সমাজে প্রচলিত প্রধান ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নিজের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এক সময় তারও বিপরীত প্রতিক্রিয়া [antithesis] তৈরি হয়। শেষে দুয়ের সংঘাতে তৃতীয় একটি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এইভাবে ইতিহাসের অগ্রগতি হয়। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিপ্লব হয়তো অল্প সময়েই ঘটে, কিন্তু তারই ফলে অতীতের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাতারাতি নতুন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে না। বিপ্লবে ছেদ মূলত ঘটে উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের—অর্থাৎ উৎপাদনের পুঁজি, প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার মালিক কোন্‌ শ্রেণি, তারা কীভাবে কাদের শ্রম কেনে, যাদের শ্রম কেনে তাদের উপরের উপাদানগুলিতে অধিকার কতটা, সৃষ্টি ও বিনোদনের অবসর কাদের কতটা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর। মার্কসবাদ

অনুসারে ভিত্তি [base] ও অধিগঠনের superstructure সম্পর্কটি ধ্রুব, কিন্তু খুব প্রত্যক্ষ নয়, সরলও নয়। তাই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন ঘটা সহজ নয়। এই কারণেই বিপ্লবের পর নতুন করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দরকার হয়। আর বিপ্লব যখন বা যেখানে হয় না, সেখানে এই ভিত্তির পরিবর্তনও এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।

যাই হোক এই cultural dominant-এর সূত্রটি ধরেই উত্তর-আধুনিকতার উদ্ভব ও বিকাশকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এবং দেখতে হবে, কোন্ ভিত্তি বা [base] থেকে, অর্থাৎ কোন্ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার আশ্রয়ে এই উত্তর-আধুনিকতার জন্ম হয়েছে।

এখানেও জেম্‌সনের নির্দেশই সবচেয়ে কার্যকর। জেম্‌সন অনুসরণ করেছেন জার্মান আর্থনীতিক-ঐতিহাসিক মান্ডেলকে, যিনি তাঁর *Late Capitalism* [1986] বইয়ে ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের নানা পর্যায়ের এইরকম বিভাগ করেছেন : শিল্পবিপ্লবের ফলে বাজারনির্ভর ধনতন্ত্র বা মার্কেট ক্যাপিটালিজম হল প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সাম্রাজ্যবাদ অথবা একচেটিয়া উৎপাদনের ধনতন্ত্র—এটাকেই ভুল করে পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমও বলা হয় [দ্র. Homer, 1988 : 107]। এ-সকলেরই শিকারক্ষেত্র যে তৃতীয় বিশ্ব তা আমাদের মনে রাখা দরকার। মান্ডেলের মতে বাজারভিত্তিক ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের কাল শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত। তারপর ১৮৪৭ থেকে ১৮৯০-এর সময়খণ্ডে, তার পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে [১৯৩৯-৪৫], এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত—সব মিলিয়ে যে মোট চারটি পর্ব পাই, তাদের সময় জুড়ে ইউরোপ-আমেরিকার শিল্প-বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত নানা বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। তার ফলে ঘটেছে মানুষের সামাজিক-শারীরিক অস্তিত্ব ও জীবনযাপনে আমূল বিপ্লব। প্রথমটিতে কারখানায় শ্রমিকদের হাতে-তৈরি বা ব্যক্তিগত চেষ্টায় নির্মিত বাষ্পচালিত যন্ত্রের আধিপত্য, দ্বিতীয় পর্বে নানা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যন্ত্রনির্মিত বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার। এই দ্বিতীয় পর্বের ঘটনাটিই মান্ডেলের মতে প্রথম প্রযুক্তিগত বিপ্লব। এর পরে এল তৃতীয় পর্ব এবং দ্বিতীয় প্রযুক্তি-বিপ্লবের মুহূর্ত। এই কালখণ্ডে মোটর ইঞ্জিনের, অর্থাৎ পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদির অর্থাৎ দহনে শক্তিসঞ্চারিত স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের-সার্বিক ব্যবহার দেখা গেল। ১৯৪৫ থেকে শুরু হয়েছে তৃতীয় প্রযুক্তি-বিপ্লব—এ সময়ে ঘটেছে কম্পিউটার প্রযুক্তির বৈশ্বিক ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার।[৬]

একটু সরল করে আমরা মান্ডেলের এ ইতিহাসকে ছকে বিন্যস্ত করি।

আর্থ-সামাজিক পর্যায়	**প্রযুক্তি বিপ্লব**
১. বাজার-ভিত্তিক ধনতন্ত্র [সাম্রাজ্যবাদের শেষ বিস্তার] শিল্পবিপ্লব—১৮৪৭	১. প্রথম প্রযুক্তি বিপ্লব
২. ১৮৪৭-১৮৯০	২. দ্বিতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব
৩. ১৮৯০-১৯৪৫	৩. তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব
৪. ১৯৪৫—বর্তমান কাল	

জেম্‌সন মান্ডেলের শেষ তিনটি পর্বের তিন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি থেকে তিনটি পৃথক সাংস্কৃতিক অধিগঠনের সম্পর্ক এইভাবে নির্ণয় করেন :

প্রথম প্রযুক্তি বিপ্লব—বাস্তববাদ [রিয়্যালিজম]

দ্বিতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব—আধুনিকবাদ [মডার্নিজম]

তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব—উত্তর-আধুনিকতা [পোস্টমডার্নিজ্‌ম]

তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটেছে ১৯৪৫-এর পরে, এখান থেকেই সদ্যতন বা late capitalism-এর সূত্রপাত। [৭] এখানে লক্ষণীয় যে, জেম্‌সন তাঁর বইয়েরই নাম দিয়েছেন *Postmodernism : or the Cultural Logic of Late Capitalism* [Jameson, 1991]

ডেভিড হার্ভে [দ্র. (Harvey, 1989] উত্তর-আধুনিক পটভূমি বা পোস্টমর্ডান কন্ডিশন সম্বন্ধে আর একটু ব্যাখ্যান করে লিখেছেন যে, এই সদ্যতন ধনতন্ত্রবাদে বাজার যেমন নানা জায়গায় বহুলভাবে ছড়িয়ে গেছে বহুজাতিক সংস্থার কল্যাণে, তেমনই উৎপাদন-উৎসও আর এক কেন্দ্রে বা একটিমাত্র দেশে সীমাবদ্ধ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে উঠেছে ভোগ্যপণ্য ও সেবা-প্রদানকারী বহুজাতিকগুলির লক্ষ্য। ক্রয়বিলাসী মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও নানা দেশে বহুজাতিকের বিপণন ও উৎপাদনে উৎসাহ দিচ্ছে, ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাচ্ছে। বহিরুৎপাদন বা আউটসোর্সিং-এর কল্যাণে একটি পণ্যের মূল নকশা যেখানে তৈরি হচ্ছে তা তার চূড়ান্ত রূপে [উৎপাদিত পণ্যে] পৌঁছোবার আগে নানা দেশের নানা কারখানায় খণ্ড খণ্ড ভাবে অঙ্গ নির্মাণের পর অন্য কোথাও এক সঙ্গে জোড়া হচ্ছে। আগেকার ফোর্ড-পদ্ধতি বা 'ফোর্ডিজমে'র এককেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করেই সদ্যতন ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা এসেছে। অবশ্য ফোর্ডিজমও সম্ভবত এখন এসব কালোচিত পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েছে।

৪. আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যানের নানা রূপ ও উত্তর-আধুনিকতা পোস্টমডার্নিজম নিয়ে হই-হট্টগোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম শুরু হয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে তা সবসময় হালের উত্তর-আধুনিকতার চেহারা পায়নি। বার্টেনসের বইয়ের [Bertens, 1995 : 20-36] দ্বিতীয় অধ্যায়ে নানা ধরনের আধুনিকতা-বিরোধের মধ্যে তার উদ্ভব ও বিবর্তনের একটা ছবি পাওয়া যায়।

বার্টেন্‌স লক্ষ করেন, ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন সাহিত্য-সমালোচক চার্লস অল্‌সন সমকালীন মার্কিন কবিতায় আধুনিকতা-বিরোধী প্রবণতার কথা বলেছেন এবং তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় পোস্টমর্ডান কথাটা ঘন ঘন ব্যবহার করছেন। ১৯৫১-তে অল্‌সনের পড়ানোর জায়গা ব্ল্যাক মাউন্টেন কলেজে এক অদ্ভুত অভিকরণের[৮] ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে চিত্রকর রশেনবার্গ [Rauschenberg], নৃত্যশিল্পী মার্সি ক্যানিংহাম [Cunninghum]—এঁর নাচ আমরা কলকাতায় দেখেছি—এবং স্বল্পতর খ্যাত আরও কিছু শিল্পী 'যে যেমন খুশি করো' সৃষ্টি ও প্রদর্শনের খেলায় মেতেছিলেন। কেউ জানতেন না অন্যরা পরমুহূর্তে কে কী করবেন। বার্টেনসের বিবরণে এটিই প্রথমদিককার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আধুনিকতা-বিরোধী সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের উপলক্ষ। শিল্পগুলির নিজস্ব সীমানা ভেঙে পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানের খেলায় যোগ দেওয়ারও এটি একটি বড়ো ঘটনা।

তার আগে থেকেই সমালোচনায় তত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বে অল্‌সন নতুন এক বিকল্প অভিজ্ঞতার কথা বলে এসেছেন। ১৯৫১-তেই তিনি মার্কিনি ইন্ডিয়ানদের অঞ্চল ইয়ুকাতান্‌-এ কিছুদিন বাস করেন। তার পরে লেখা তাঁর 'হিউম্যান ইউনিভার্স' বলে প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের গ্রিক-ইহুদি-খ্রিস্টীয় যুক্তি পরম্পরা[৯] ও ভাববিন্যাসের সুশৃঙ্খল মননপটভূমি বিসর্জন দিয়ে শিল্পে তিনি এক নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলেন। যাতে উঠে আসবে স্বাভাবিক 'প্রাকৃতিক' অভিজ্ঞতা, নিজের কোনো আরোপিত ভাষা বা সংগঠন তার শরীরে থাকবে না। ইউরোপীয় 'এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট'-এর আত্মম্ভরী যুক্তিবাদের এক যুক্তি-ভাঙা, বোধিলব্ধ বিকল্প যেন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ইন্ডিয়ানদের ওই ভাববিশ্বে। এতে কতটা রোমান্টিকতা ছিল, একটাকে পুরো প্রত্যাখ্যান করে আর একটাকে আঁকড়ে ধরার দ্বিভাজিত বা binary প্রবণতা কতটা যুক্তিযুক্ত, সে তর্ক এখানে তুলছি না আমরা। কেবল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে চিহ্নিত করতে চাইছি। এতে উত্তর-আধুনিকের দুটো চিন্তা উঠে আসছে দেখতে পাই।

একদিকে একটা বৃহৎ ও প্রভুত্বপ্রতাপী কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে margin বা প্রান্তিকতায় নির্বাসিত যে সব অভিজ্ঞতা ছিল, ইউরো-কেন্দ্রিক বা পাশ্চাত্য বিশ্বভাবনা বৃত্তের বাইরে যে জগৎ পড়ে ছিল, তাকে গ্রহণ করার একটা ইচ্ছা। আর একটা হল, শিল্পীর বা স্রষ্টারও প্রভুত্ব বা authority বিলোপ। পরে আমরা দেখব যে, পোস্টমডার্নের নানা সূত্রের মধ্যে এ দুটিও খুব মূল্যবান সূত্র হয়ে উঠবে।

সেই সঙ্গে অলসন ইউরোপের উদারনৈতিক মানবতাবাদের যুক্তিশৃঙ্খলকে [১০] এবং ইউরোপীয় প্রজ্ঞাযুগ বা এনলাইটেনমেন্টের আত্মতৃপ্ত প্রগতি ও উন্নতির ধারণাকেও বর্জন করতে চান। তাঁর যুক্তি সম্ভবত এই যে, অন্তত তৃতীয় বিশ্ব থেকে তাই আমাদের ভাবতে ইচ্ছে হয়—এই ধারণাগুলি, এদের নানা ভালো ও মানবিক মূল্য সত্ত্বেও, একসময় ইউরোপের সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং তার অনুষঙ্গী নানা লুণ্ঠন অত্যাচার, হত্যা ও নির্লজ্জ শোষণ থেকে খুব দূরবর্তী ছিল না। অল্সন হাইডেগার ও দেরিদার দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলে জানা যায়। তাঁর নিজস্ব পোস্টমডার্নিজমের নাম তাই হয়েছে অস্তিত্ববাদী বা 'এগজিস্টেনশিয়ালিস্ট' পোস্টমডার্নিজম। বার্টেন্স অল্সনের সঙ্গে মার্কিন সমালোচক আরভিং হাউ [Howe]-এর মতামতেরও উল্লেখ করেন। ১৯৫৯-এ হাউয়ের প্রবন্ধ 'Mass society and posmodern fiction' বেরোয়, যাতে সল বেলো, নর্মান মেলার, জে ডি স্যালিঞ্জার ও বার্নার্ড মেলামড্‌কে তিনি উত্তর-আধুনিককালের কথাসাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেন। পরে ১৯৮০ দশকে জেমসন ও বোদরিয়ার-এর মতামতের কিছুটা পূর্বাভাস হাউয়ে পাওয়া যাবে। এঁরা সকলেই, বিশেষত জেম্সন, যেন 'উন্মত্ততা ও স্বেচ্ছাচারের' বিরুদ্ধে শেষ লড়াই করছেন বলে বার্টেন্সের মনে হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির চরিত্র ও মেজাজ বদলের লক্ষণগুলি তাঁরা চিহ্নিত করতে ভুল করেননি।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭-র মধ্যে উত্তর-আধুনিকতা 'really took off' বলে বার্টেন্সের মনে হয়েছে। যেসব তাত্ত্বিক ও সমালোচক এই নব্য সংস্কৃতির অভ্যর্থনা করেন তাঁরা হলেন লেনার্ড বি মেয়ার, ইয়াব হাসান, সুজান সন্ট্যাগ, লেসলি ফিড্লার প্রমুখ। বিশেষ করে রবার্ট ভেনচুরির [Venturi] 'Justification for a Pop-architechture' প্রবন্ধে নগরস্থাপত্যে উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্বে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিসর বা space-এর কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। কথাসাহিত্যের আখ্যানতত্ত্ব [narratology] বা কাহিনিকৌশল মূলত কাল বা 'টাইম'-এর সঙ্গে যুক্ত, তার কাজ সময়ক্রম নিয়ে[১১]। সময়ক্রমে সাজানো ঘটনার নানা পরীক্ষানিরীক্ষা আখ্যানকলার নতুন প্রয়াসের অঙ্গ, কিন্তু চিত্রকলা ও স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে আসে স্থান বা পরিসরের কথা। ভেনচুরি এই দিকটিতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা এঁদের কিছু প্রবন্ধের নাম পাশাপাশি সাজিয়ে দিচ্ছি—এইসব নাম থেকেই এঁদের আশ্বাস, বিশ্বাস, আশঙ্কা, সংশয় ইত্যাদির বিমিশ্র চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, হয়তো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না : ইয়াব হাসান—'The dismemberment of Orpheus : reflections on modern culture, language and literature'; সুজান সন্ট্যাগ—'*Against Interpretation*'; এরিক কালার [Kahler, 1968]-এর বই *The Disintegration of Form in the Arts*। ফিড্লার একটু উৎসাহ নিয়েই উত্তর-আধুনিকতা প্রসঙ্গে 'apocalyptic, anti-rational, blatantly romantic and sentimental, 'anti-artistic', 'anti-serious' ইত্যাদি আখ্যাকে ব্যবহার করেছেন।

এ-কথাগুলি উদ্ধৃত করে হয়তো আমরা আগে থেকেই একটা পক্ষপাতী ঝোঁক দেখিয়ে ফেললাম। যাই হোক, পোস্টমডার্নিজমের বামপন্থী দক্ষিণপন্থী দু'ধরনের সমালোচনা বা সমর্থনই মার্কিনদেশে লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে দুই ফরাসি দার্শনিক লিয়োতার ও বোদ্রিয়ারও তার নানারকম ভাষ্য ব্যাখ্যা দেন। গত শতকের আশির বছরগুলিতে জেম্সন একটু সংশয় নিয়ে 'দেখি না ব্যাপারটাতে

কী আছে' ভেবে এগিয়ে এলেন। তখন থেকে উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে আলোচনায় অনেকটা গভীরতা এসেছে বলে মনে হয়।

৫. লক্ষণগুলি কী কী : প্রাগ্ উত্তর-আধুনিক

যে কোনো প্রাথমিক পরিচয়-পুস্তকে উত্তর-আধুনিকতার লক্ষণগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলি আমরা একটু পরে দেখব। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা যেন এই যে, [বা এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে], উত্তর-আধুনিকতা যেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমি গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির সৃষ্টি ও সম্ভোগের অধিকারে কোনো আটক রাখা হয়নি। পৃথিবী বা ইতিহাস শেষ হয়ে আসছে, কাজেই আর কোনো ব্যাটার পরোয়া করি না, এইরকম একটা মনোভাব যেন এর পেছনে তাড়া করছে।

অবশ্যই 'আধুনিকতা'র সঙ্গে তুলনায় গিয়ে এই উত্তর-আধুনিকতাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিকতার কালক্রম পর্যন্ত পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিতে পাশ্চাত্যের একটা বিশ্বাস ছিল। তবে তৃতীয় বিশ্বের হয়ে আমরা বুঝতে পারি—এই 'অগ্রগতি' ও উন্নতির ধারণাকে পাশ্চাত্য নিজের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেকটা বুঝতে চেয়েছে, তাদের প্রভুত্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের শর্তেই, তার বাইরে গিয়ে নয়। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকের নানা দর্শন তাদের এই আত্মতৃপ্ত বিশ্বাসে কিছুটা চিড় তৈরি করে। এর মধ্যে নিট্‌শে, [১৮৪৪-১৯০০] হাইডেগার [১৮৮৯-১৯৭৬] ও অপরাপর নানা বর্ণের অস্তিত্ববাদীদের চিন্তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেটাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রকাশ বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয় তার অপর পিঠ হল একটা দৃঢ় কেন্দ্র বা একটা বিশ্বাসের বন্ধনের অভাব[১২]—যার ফলে ব্যক্তিরা বিস্ফোরণে ভেঙে যাওয়া নক্ষত্রের টুকরোর মতো চূর্ণ চূর্ণ নক্ষত্রখণ্ড হয়ে নিজের নিজের কক্ষে স্থিতু হয়ে নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে থাকে। বিশ্বাসের জায়গায় পড়ে থাকে একটা কালো গহ্বর। আগেই সোরেন কিয়ের্কগার্ড [১৮১৩-১৮৫৫] ঈশ্বর, সত্য সব কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরে নিট্‌শের 'দাস স্পোক জরথুষ্ট্র' বইয়ে 'ঈশ্বর মৃত'—এই ঘোষণা থেকেই পশ্চিমি দুনিয়ার সংশয় ও অনিশ্চয়ের সময় শুরু হয়েছিল, জীবনের terror and horror-কে বাস্তব ধরে নিয়েছিলেন এই দার্শনিক।[১৩] তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ এসে পশ্চিমের আরও অনেক বিশ্বাস ধ্বংস করে, এলিয়টীয় 'পোড়ো জমি'-র বুকে যে-শূন্যতার ছবি ফুটে ওঠে তা ওই অনিশ্চয়েরই রূপকল্প। তার পরে আমেরিকার অর্থনৈতিক ধ্বস, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে উত্তর-আধুনিকদের 'পূর্বাবস্থা না-মানবার' বহুবিধ শর্ত তৈরি হয়। বিশ শতকের সত্তরের বছরগুলিতে জাক দেরিদার [১৯৩০-২০০৫] উত্তর অবয়ববাদ বা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের তত্ত্ব, বিশেষ করে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে গুলিয়ে দিয়ে 'ভাষার মানে কিছুই দাঁড়ায় না'-র তত্ত্ব আধুনিকতার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় বলা চলে।

আধুনিকতার সঙ্গী যেসব শিল্প, সমাজ ও ইতিহাসের তত্ত্ব, পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের নানা শাখা, আচরণবাদ, বাস্তববাদ, সাহিত্যে পাঠভিত্তিক 'নব্য-সমালোচনা', অবয়ববাদ [স্ট্রাকচারালিজম], কিংবা তার পূর্বসূরি আঙ্গিকবাদ [ফর্ম্যালিজ্‌ম] ভিক্টোরীয় যুগের উপর তলাকার রোমান্টিক নৈতিকতা আশ্বাসকে ছিন্নভিন্ন করা সত্ত্বেও—সকলেই যেন এই বিশ্বাসগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল—আধুনিকতার এই লক্ষণগুলিকে :

ক. শিল্প চারপাশের বাস্তবের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ বাস্তব বা সত্য বলে একটা কিছু আছে। জ্ঞানে তা মানুষ জানতে পারে—অন্তত এতদিনকার জ্ঞানতত্ত্ব [এপিস্টেমোলজি] মানুষকে

সেই আশ্বাস দিয়ে এসেছে, মাঝেমধ্যে সংশয়বাদীদের প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও। আবার মানুষ এও বিশ্বাস করে এসেছে যে, মানুষের সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি সেই বাস্তবের ছবি মোটামুটি বিশ্বাস্যভাবে তুলে ধরতে পারে। অর্থাৎ রচনা কল্পিত হলেও তা থেকে [দেখে বা পড়ে বা শুনে] মানুষ ভাবতেই পারে যে, 'হ্যাঁ, এরকমই তো আছে, এরকমই তো ঘটে'। মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানও মানুষের মনের সত্য ছবি প্রকাশ করতে পারে, মনোজগতের বাস্তব ও মানুষের আয়ত্তে এসেছে। অবশ্যই কোনো কোনো শিল্পতত্ত্ব এই প্রথাগত বাস্তবের ভাঙচুর করেছে—উন্মত্ততা, মনোবিকার, স্বপ্ন ইত্যাদির বিনষ্ট বিকৃত বাস্তবকে আশ্রয় করে,—যেমন এক্সপ্রেসানিজ্‌ম, কিউবিজ্‌ম, সুররিয়ালিজ্‌ম, দাদাবাদ ইত্যাদি—কিন্তু নন্দনতত্ত্বের বাস্তবনির্ভরতা পুরোপুরি অস্বীকার হয়নি, যেমন দর্শনে সত্য নিয়ে বড়ো প্রশ্ন ওঠেনি।

খ. ভাষাতে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ আর বাক্যে শব্দগুলির অর্থও যে পৃথিবীতে উপস্থিত শারীরিক, অনুভবগত বা কল্পিত বাস্তবকে নির্দেশ করে—তাও মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ মোটামুটি নিত্য ও ধ্রুব। আমরা কথা বলে পরস্পরকে বুঝতে, বোঝাতে পারি। এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, সার্ত্রের অনুপ্রেরণায় দার্শনিক আইরিস মারডক ভাষাকে ঘোলা কাচের সঙ্গে তুলনা করেছেন গত শতাব্দীতে। ১৯৫০-এর পর থেকে পাশ্চাত্যে অ্যাবসার্ড বা কিম্ভূত নাটকে দেখানোই হয়েছে যে, মানুষের ভাষা ক্রমশ তার সংগত অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। [দ্র. সরকার, ২০০১] তা সত্ত্বেও অন্য নাট্যকাররা বাস্তবকে প্রকাশের জন্য নাটক লিখতে দ্বিধা করেননি।

গ. আধুনিক সময় পর্যন্ত এই বিশ্বাস পোষণ করা হয়েছে যে, সমাজে অর্থনীতি-রাজনীতির উপর নির্ভর করে সভ্যতা মোটামুটি একমুখী অগ্রগতি ধরে চলে। অর্থাৎ তার একটা 'টেলিয়োলজিক্যাল' অভিমুখিতা আছে। এ পর্যন্ত উন্নতি, অগ্রগতি, 'ক্রমমুক্তি'—ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্বাস একেবারে লুপ্ত হয়নি। অবশ্যই ধনতন্ত্রের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারণা [মূলত আরও বড়ো বাজার, আরও বেশি লাভ], আর সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ বা মার্কসবাদের উন্নতির ধারণা এক ছিল না। দ্বিতীয়টি প্রশ্ন করে কার উন্নতি, কীসের উন্নতি, এবং বঞ্চিত শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি অগ্রগতির হিসেব করে। কিন্তু তারও প্রত্যাশা আছে যে, 'মানুষের ক্রমমুক্তি' ঘটবে। এ ক্রমমুক্তি একমুখী একরৈখিক [linear] নয়, কিছুটা বৃত্তাকার পথ ধরে চলবে, ইতিহাসের বৃত্তাকার পরিক্রমায় সাম্যবাদ আসবে।

ঘ. এও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শিল্পে উচ্চ-নীচের ভেদ আছে। বহুচর্চা ও পরিশীলনের ফলে গড়ে ওঠা বা সৃষ্ট যে-শিল্প, যার পিছনে দীর্ঘদিনের নন্দনতত্ত্ব আর সক্ষম প্রযুক্তির সমর্থন আছে—তার সঙ্গে পার্কের পাঁচিলে টাঙানো বা রাস্তার ধারে সাজিয়ে বসা ছুটির দিনে সাধারণত লোকের কাছ বিক্রির 'শিল্পের' তুলনা হয় না, যেমন তুলনা হয় না রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলির* সঙ্গে হাটের ছড়া-কিস্‌সার।

শিল্প যে উচ্চাঙ্গের, তা ঠিক কের দেয় কে? ঠিক করে দেয় নন্দনতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ধ্বজাধারী শিল্পসমালোচকের দল। একমাত্র তাদেরই সুপারিশে যেন স্থির হয়ে যায় যে, এই ছবিটা বা ভাস্কর্য বা লেখা সুন্দর ও মূল্যবান। দর্শন উপভোক্তাদের বিচার গণ্য করবার মতোই নয়। হার্বার্ট রিড এ প্রসঙ্গে বলেন এক natural taste-এর কথা [Read, 1963 : 93]যে natural taste-ই নাকি ঠিক করে দেয় শিল্পকর্মের কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা তত ভালো নয়, এবং কোন্‌টা অত্যন্ত খারাপ।

অবশ্যই natural taste বলতে কিছু নেই। রিড তাঁর মতো শিক্ষিত শিল্পবোদ্ধাদের taste-কে স্বাভাবিক রুচি বলে দেখাতে চাইলেও সংস্কৃতিতত্ত্বে তা গৃহীত হতে পারে না—অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতত্ত্ব natural ও culture-কে বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করায় তাতে। এ থেকে বোঝা যায় যে নন্দনতত্ত্বের একটা প্রভুত্ব আছে, তা উপর থেকে 'সর্বসাধারণের' জন্য ঠিক করে দেয় কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ। মাঝে মধ্যে এমন সন্দেহেও অবশ্য ওঠে যে, আড়ালে থাকা ছবি মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসায়ী ও দালালরা অনেক সময় এই নন্দনতত্ত্বকে প্রভাবিত করে—শিল্প যেহেতু এখন বাজারের পণ্যও বটে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন বড়ো পত্রিকার ঢাক-পেটানো বিজ্ঞাপন। সেটাও আর-একটা প্রভুত্বের জায়গা তো বটেই।

এই natural taste-এর বিষয়ে প্রশ্ন থেকে সাহিত্যে যৌনতার প্রশ্নটিও এসে যায়। 'আধুনিকতা'য় ডি. এইচ. লরেন্স এক ধরনের সহজ যৌনতার স্থান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর-আধুনিক বলে স্বীকৃত হেনরি মিলার তাঁর নানা উপন্যাসে [*Tropic of Cancer, Nexus, Plexus* ইত্যাদিতে যৌনতার যে নিরঙ্কুশ ছড়াছড়ি করেছেন তাতে natural taste-এর প্রবক্তাদের শিউরে ওঠার কথা। বস্তুতপক্ষে লুসি [Lucy, 200 : 1-41] যেমন বলেছেন, যৌনতা নিয়ে এক ধরনের ছেলেখেলা, যা চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার লক্ষণ, তা পোস্টমডার্নের শিল্পতত্ত্ব-ধ্বংসী মনোভাবের একটা মুদ্রা।

ঙ. শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বহুবিধ শিল্পরূপ তৈরি করেছে—সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদি। আরিস্তোতলই সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে এই সব শিল্পের মিল ও সাদৃশ্য দেখান। কিন্তু তার মূল কথা হল, প্রত্যেকটা শিল্প আঙ্গিকে, উপকরণে ও করণকৌশলে পৃথক হবে, পৃথক হবে বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আরিস্তোতলের করা চারুশিল্পের প্রাথমিক বিভাগের পরে আরও অনেক বিস্তার এবং সংশোধনও ঘটেছে এ বলাই বাহুল্য। কিন্তু মৌলিক নীতিটি এখনও একই আছে যে, শিল্পগুলি আলাদা আলাদা সাহিত্যে, সঙ্গীত বা ভাস্কর্যের মধ্যে কোনো মৌলিক যোগ নেই। এবং প্রত্যেকটি থেকে মানুষের পাওয়া 'রসের'ও তফাত ঘটে। এই ভাবনা আধুনিকতায় এসে একটু দুর্বল হলেও আধুনিকতা এই সীমাগুলিকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করেনি।

চ. একই সঙ্গে আধুনিক সময় পর্যন্ত এ বিষয়টাও স্বীকার করা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ শিল্পের মধ্যেও একাধিক সংরূপ বা জাঁর [genre] তৈরি হয়ে যায়। সাহিত্যে যেমন গীতিকবিতা, মহাকাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। এদের মাঝখানে যে-দেওয়াল তোলা হয়েছিল, তাও আধুনিকতা পর্যন্ত মোটামুটি অটুট ছিল। যদিও দেওয়াল ভাঙার কিছু কিছু চেষ্টা অবশ্যই হয়েছে। উত্তর-আধুনিকতা নানা শিল্পের দেওয়াল যেমন ভাঙছে, তেমনই জাঁর বা সংরূপের সীমানাও মানছে না। কীভাবে, তা আমরা পরে দেখব।

ছ. শিল্পে নন্দনতত্ত্ব যেমন একটা প্রভুত্বের পরিসর তৈরি করে তেমনই চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, কবিতা, গল্প ইত্যাদির উপর তার স্রষ্টারও একটা প্রভুত্ব থাকে। সে যেহেতু স্রষ্টা—তার সৃষ্টি তার ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক চিহ্ন বহন করে—সেটাই তার ব্র্যাণ্ড। পিকাসোর ছবি পিকাসোরই, শাগালের ছবি তাঁরই। মৌলিকতা বা originality-র প্রশ্নটি এখানে বিবেচ্য। এই ব্র্যাণ্ডমূল্য—অর্থাৎ কে সৃষ্টি বা রচনা করেছে তার উপরেও তার বাজারের দাম তৈরি হয়ে যায়। স্রষ্টার নাম অনুযায়ী সৃষ্টির বাজারদরের হেরফের ঘটে, জনপ্রিয়তা এবং ফ্যাশন হুজুগেরও তারতম্য হয়।

জ. শিল্পে বিশেষত চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি দৃশ্যকলায় প্রতিটি সৃষ্টি একক [unique] ও দোসরহীন। এই অনন্যত্বও শিল্পসৃষ্টির মূল্যবত্তা ও মহার্ঘতার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে বিত্তবান সংগ্রাহকেরা প্রচুর দাম দিয়ে শিল্পবস্তু নিজেরা কিনে ঘর সাজায়, নিছক মূল্যবান সংগ্রহের অহংকার

দেখায়, যেন দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার নৃমুণ্ড শিকারিদের মতো শিকার করা মাথা ঘরে ঝুলিয়ে রাখে, না-হলে বাজারের জন্য নিলামের দর চড়ায়। সাধারণ মানুষের কাছে এসব শিল্পবস্তু অনায়ত্তই থেকে যায়। বিত্তের এই একচেটিয়া প্রভুত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যামিনী রায় একভাবে ভেঙেছিলেন, অসংখ্য যিশুখ্রিস্ট বা গণেশের ছবি এঁকে নানাজনের কাছে বিক্রি করেছেন। পরে আমরা দেখব, উত্তর-আধুনিকরা অন্যভাবে একক শিল্প সৃষ্টির উপর এই একচেটিয়া দখলদারি ভাঙবার চেষ্টা করে।

ঝ. শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের অগ্রগতি ঘটেছে মূলত আগেকার এসব তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান ও সংশোধন করে। অবশ্যই রাতারাতি আমূল পরিবর্তন হয়নি। এক্ষেত্রেও হেগেল-মার্কসের ইতি-নেতি-সমন্বয়ের সূত্র কার্যকর থেকেছে। কিন্তু কুন্ [Kuhn, 1963] যাকে বলেছেন আদর্শ-বিক্ষেপ [প্যারাডাইম শিফট] তার দৃষ্টান্ত অধিগঠন বা সুপারস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, তেমনি ভিত্তি বা বেস-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বাষ্পীয় থেকে মোটর ইঞ্জিন এবং তা থেকে কম্পিউটার প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রের এসে যাওয়া এইরকম ভিত্তির আদর্শ-বিক্ষেপের উদাহরণ। এখানেও জেম্‌সনের 'কালচারাল ডমিন্যান্টের' বিষয়টি যে দেখা দেয়নি তা নয়।

অবশ্যই হার্বার্ট রিড [১৪] এবং আঙ্গিকবাদীদের অনেকে সাহিত্যের ইতিহাসে একমুখী অগ্রগামিতার চেয়ে এক ধরনের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করেন [দ্র. Wellek & Warren, 1963 : 252-71]। রিড যেমন বলেন ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে ক্ল্যাসিকাল ও রোমান্টিকের পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের কথা। অবশ্য রিড ও ওয়েলেকদের পুনরাবর্তনের ধারণা এক নয়। রিড ইংরেজি কবিতার ইতিহাসের পর্যালোচনায় বলেন সুনির্দিষ্ট কাব্যতত্ত্বের [ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক] পুনরাবর্তনের কথা; আর ওয়েলেকরা বলেন পুরোনো আদল [Norm] বা প্রথা [Convention] ভেঙে নতুন আদলের জন্মের কথা। [১৫]

যাই হোক, আগের নন্দনতত্ত্বকে বাতিল না বর্জন করে নতুন নন্দনতত্ত্বের উদ্ভব—এই একমুখী অগ্রগতির ছকটাও উত্তর-আধুনিকতা ভাঙে। তার শিল্পতত্ত্ব অতীতের প্রতি 'নস্টালজিক'—অর্থাৎ প্রায়ই কাল উল্লম্ফন করে অতীতের শৈলীকে গ্রহণ করে, কিংবা নানা দেশের শৈলীর বিষম ভঙ্গিকে মিলিয়ে দেয়। বিশেষ করে স্থাপত্যে—যে শিল্পকে জেমসন পোস্টমর্ডানিজমের Priviledged বলেন—তাতে অতীতের বা দূরদেশের সব শৈলীর কিম্ভূত মিশ্রণ ঘটতে পারে। কিন্তু আধুনিকতা-চিহ্নিত স্থাপত্য ছিল ছিমছাম, বিশাল ও কার্যকর। অল্প জায়গা ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি সুবিধে আদায়ই ছিল তার লক্ষ্য। পায়রার খোপের মতো বহুতল বাড়ি তার চিহ্ন। অবশ্যই ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট বা লে কর্বুশিয়ের তার মধ্যে কিছুটা সৌন্দর্য এনেছিলেন, কিন্তু তাতে বাহুল্য ছিল না। উত্তর-আধুনিকতা বাহুল্যে উল্লসিত।[১৬]

এবার আমরা এই প্রাগ্ —উত্তর-আধুনিক পর্বের চিহ্নগুলিকে ভিত্তি করে উত্তর-আধুনিকের চরিত্র নির্ধারণ করবার চেষ্টা করব।

৬. উত্তর-আধুনিক : চিহ্ন ও চরিত্র

উপরে আমরা ৯টি ক্ষেত্র নির্দেশ করেছি সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ক্ষেত্র এই সদ্যতন ধনতন্ত্রের অধীন সমস্ত নাগরিককেই প্রভাবিত করে, আর কতকগুলি ক্ষেত্র বিশেষভাবে শিল্পস্রষ্টাদের সৃষ্টির অধিকার, স্বাধীনতা ও ব্যাপ্তির সঙ্গে জড়িত। দুয়ের যোগও ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের বাস্তবের চেহারাটি ঠিক কী [বিশ্বাস ১]—এটা সাধারণ নাগরিকের প্রশ্ন যেমন, তেমনিই যে শিল্পী বা টেলিভিশনের সংবাদদাতা এই নাগরিকের কাছে বাস্তবের কোনো না কোনো চেহারা সাজিয়ে দেন—এটা তাঁরও প্রশ্ন। উপরে তালিকাবদ্ধ বিশ্বাসের মধ্যে ঘ থেকে জ

পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, শিল্পের অনন্যতা, উপভোগ, বাজার ও মূল্যনির্ধারণ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু ক. মূলত শিল্পস্রষ্টার সমস্যা, ঝ-ও অংশত তাই। ঝ. আবার বিশেষজ্ঞের বা শিল্প ইতিহাসকারেরও সমস্যা—সাধারণ মানুষ এমনকি শিল্পীরাও তাতে প্রতিদিন লিপ্ত হবেন এমন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সূত্রগুলি মূলত সামাজিক ভোক্তা মানুষ এবং বিশেষজ্ঞ বা স্রষ্টা মানুষের মধ্যে বিভাজিত। যদিও উপরেই আমরা দেখেছি যে, কোথাও কোথাও তা উভয়েরই সমস্যা। কিন্তু দু-পক্ষের সমস্যার চরিত্র পৃথক—এও আমরা দেখব।

৬. ১ প্রথম গণ্ডগোল—বাস্তব কী?

বাস্তবকে জানার আমাদের দুটো উপায় আছে, একটা প্রত্যক্ষ—নিজের ইন্দ্রিয়ের সূত্রে একেবারে সামনে দেখছি শুনছি গন্ধ নিচ্ছি, ছুঁচ্ছি ইত্যাদি। এখানে আমরা বলতেই পারি যে, 'হ্যাঁ, এ আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা'।

আর একটা উপায় হল মধ্যস্থতা। তার একটা হল ভাষার মধ্যস্থতা। তারও আবার দুটি চেহারা—একটি মৌখিক, আর একটি লিখিত বা মুদ্রিত। মৌখিক কথা কারও মুখ থেকে আসতে পারে, আবার তা মুদ্রিত কণ্ঠস্বর হিসেবে ক্যাসেট, সিডি, রেডিও ইত্যাদির মধ্যস্থতাসূত্রে আমার কানে পৌঁছোতে পারে। আর লিখিত/মুদ্রিত মধ্যস্থতা সাজিয়ে রাখা হয় বইয়ে, খবরের কাগজে, সাময়িকপত্রে।

ইদানীংকালে বাস্তবকে জানার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থ বা উপায় হয়ে উঠেছে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, অর্থাৎ গতিশীল ও সমস্তব্য বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রক্ষেপ করা দৃশ্যাবলি। এর আগে মুদ্রিত ছবিও দেখেছি আমরা, তা দেখে বাস্তব বা ঘটনা সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করেছি। এখনও ভ্রমণের বা ইতিহাসের রঙিন ছবিওয়ালা বইয়ের পাতা উলটে আমরা তাতে পরিবেশিত বাস্তব সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করি। বৈদ্যুতিন দৃশ্যাবলি মৌখিক ভাষাকেও ব্যবহার করে, ফলে তা অনেক বেশি জীবন্ত। তবে দৃশ্যাবলি সচল হোক বা অচল হোক, সাধারণভাবে আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে থাকি যে, যা এগুলিতে দেখছি সে-সব ঘটনা বা দৃশ্য ওখানে ঘটছে বা আছে। অর্থাৎ এগুলিই বাস্তব। মধ্যস্থতার সূত্রে এলেও বাস্তব।

উত্তর-আধুনিকতায় পা রেখে দার্শনিক বোদরিয়ার [Baudrillard, 1983] এখানেই একটা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন তোলেন। বিশেষ করে টেলিভিশনে দেখা সংবাদ সম্বন্ধে। এতে দর্শকদেরও যেন একটা দায়িত্ব এসে যায়। প্রথমত, পোস্টমর্ডান দর্শকেরা কী আছে বা কী ঘটছে—সে সব নিয়ে কি খুব একটা জানতে-বুঝতে আগ্রহী? এই যে টিভি-র সামনে বসে, অজস্র চ্যানেলের বিকল্পের সুযোগ নিয়ে তারা রিমোট হাতে নিয়ে 'জ্যাপ' [Zap)] করে, একটা চ্যানেল থেকে আর একটা চ্যানেলে লাফিয়ে লাফিয়ে যায়—তাতে কি এটা প্রমাণ হয় যে দর্শকেরা কী আছে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে খুব জানতে চায়? দর্শকদের যদি দায়ী নাও করি, তবু বলতে পারি যে, উত্তর-আধুনিক ব্যবস্থা তাদের এমন একটা জায়গায় বেঁধে ফেলেছে যে, তারা এখন বাস্তব-বিমুখ। বাস্তবে একটানা মনোনিবেশ করার ধৈর্য তাদের নেই। এতে উপভোগবিলাসী ও উপভোগ-বিক্রেতা ধনতন্ত্রেরই সুবিধে, কারণ তারা টিভি-র দর্শকদের অবিরাম ও একাগ্রভাবে বিনোদন-সন্ধানী করে তুলেছে। উত্তেজনার অনন্ত সরবরাহ তাদের চাই। উত্তর-আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য নিয়ে নিরন্তর খেটে চলেছে।

বোদ্‌রিয়ার এবার বলেন একটা কিম্ভূত কথা। তিনি বলেন, টেলিভিশনে, বিশেষত পাশ্চাত্যের টেলিভিশনে যা দেখানো হয়, সবই বানানো ছবি বা semulcra [semulcrum-এর বহুবচন] বা simulations। তাঁর মতে ৯০-এর বছরগুলির গোড়ায় ইরাকের যুদ্ধ আদৌ ঘটেনি, বাগদাদে স্কাড্

ক্ষেপণাস্ত্র আদৌ নিক্ষেপ করা হয়নি, লোকজন মারা যাযনি, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়নি, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লুট হয়নি—সবই নাকি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বানানো। কম্পিউটারে এখন যে কোনো ছবি তৈরি করা যায়। স্টার ওয়ার্স জাতীয় ছবি মূলত কম্পিউটার সিমিইউলেশন করেই তৈরি হয়। বোদ্রিয়ারের কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে, এমনকি ইরাকযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কথাবার্তা একটু নিষ্ঠুর ও অবিবেচকের মতো বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর মূল কথা হল যে, টেলিভিশনের পর্দায় হাজার হাজার ছবির মিছিল দ্রুত দৌড়ে যায়, ফলে দর্শকের বোধ কিছুই ধরে রাখতে পারে না। তারই ফলে ছবির আড়ালে যে ঘটনা, অর্থাৎ মধ্যস্থতাকারী দৃশ্যের reference point—তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বোদ্রিয়ার [1988 : 170] 'an effect of franitc self-referentiality' বলতে এটাই বুঝিয়েছেন; অর্থাৎ টেলিভিশনের দৃশ্যাবলি নিজেরাই নিজেতে বদ্ধ। তারা বাইরের কোনো দৃশ্য বা ঘটনার প্রতিফলন নয়[১৭]।

অর্থাৎ সোজা বা সরলীকৃত কথায়, আমরা বাস্তব সম্বন্ধে আগ্রহী যেমন নই, তেমনই বাস্তবের সত্য ছবি পাবার রাস্তাও আমাদের হাতে নেই। আমরাও নিজেরা একটা hyperreal বা অধিবাস্তব জগতে বদ্ধ বা বন্দি, এবং তার দেওয়াল ভেঙে বৃহৎ বাস্তব পৃথিবীর সুখদুঃখের সত্যে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। পরের প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, বাস্তবের আর এক প্রাচীন মধ্যস্থ—অর্থাৎ শব্দ [words] বা ভাষা সম্বন্ধেও দেরিদা একই প্রশ্ন তুলেছেন। ভাষা আমাদের সত্যে পৌঁছে দেয়, না সত্যকে আড়াল করে? উপরের নম্বর সূত্রে যে metanarrative বা grand narrative [মূলত Lyotard-এর শব্দাবলি]-এর কথা আছে টেলিভিশন-মায়া পৃথিবীর নাগরিকদের যে সামাজিক ও মানবিক, বহুজনের সঙ্গে জড়িত যে-অস্তিত্ব তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সাহায্য করে। এই আত্মবদ্ধ দর্শক যে কোনো বৃহৎ প্রত্যয় বা আদর্শ বা সংগঠনের অধীন হতে চায় না [আসলে একথাটা সত্য নয়, সত্য হল তাকে হতে দেওয়া হয় না]—এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত। পরে এ সম্বন্ধে আমরা আরও বলব।

৬.২. শব্দ আর অর্থ

এই জায়গাটায় একটা বড়ো ধাক্কা দিলেন উত্তর-অবয়ববাদী [পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট] জাক দেরিদা। তিনি বললেন, ভাষায় শব্দ তোমাকে যে অর্থ দেয় সেটা নিছক আপাত অর্থ, খাঁটি অর্থ নয়। খাঁটি অর্থ পাবার জন্য শব্দের ইতিহাস-ভূগোল-ব্যুৎপত্তি বিভঞ্জন [dcconstruction] করে তোমাকে অর্থ খুঁজতে হবে। [দ্র. Derrida, 1976] তা করলেও দেখবে কোনো সাফল্য নেই, কারণ পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত পেঁয়াজের অন্তর্দেশ বলে কিছুই থাকে না।

গত শতাব্দীর গোড়ায় ফের্দিনাঁ দ সোস্যুরের উচ্চারণ 'linguistic symbols are arbitrary' অর্থাৎ ভাষার প্রতীকের সঙ্গে তা যার প্রতীক [ভাষার ধ্বনিগঠিত শব্দ অর্থের প্রতীক, লিখিত শব্দ উচ্চারিত শব্দের প্রতীক] তার কোনো নিত্য, ধ্রুব ও অপরিহার্য সম্বন্ধ নেই। তা প্রথার দ্বারা আরোপিত সম্বন্ধ মাত্র [Baskin, 1965]। সেই সূত্রের উপর ভিত্তি করে দেরিদা তিলকে তাল করেছেন বলা যায়। তিনি এই সমাধানে পৌঁছেছেন যে, শব্দ [উচ্চারিত হোক, লিখিত হোক] আর অর্থের সম্বন্ধ ভয়ঙ্কর গোলমেলে, ফলে সত্যকে জানবার ভাষাগত কোনো উপায় আর নেই। দেরিদার সমালোচকেরা বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলেন, তা যদি হয়, তাহলে দেরিদার বইয়ের ভাষায় যে 'সত্য' আছে বা যা তিনি 'সত্য' বলে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, তা আমরা জানব কী করে? তার অর্থও [অর্থাৎ সত্যও] তো আমাদের আয়ত্তে আসবে না সহজে, তার misreading-এর সম্ভাবনা তো থেকেই যাচ্ছে। মার্কিনদেশে দেরিদা-অনুগামী খ্রিস্টোফার নারিসও শেষ পর্যন্ত

স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, না, এই বিষয়টাতে celebrants of deconstruction একটু বেকায়দায় আছে, এটা তারা have not been sufficiently willing to address. [Norris; 1985 : 219]।

বিভঞ্জন বা deconstruction তত্ত্বের হয়তো একটা খুব বড়ো দার্শনিক গুরুত্ব আছে। দার্শনিকদের কখনও কখনও প্রথা ও প্রচলিত বিশ্বাসের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে হয় এবং প্রচলিত বিশ্বাসকে ধরে প্রবল ঝাঁকানি মাঝে মধ্যেই দিতে হয়। দেরিদা তাই দিয়েছেন। অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবয়ববাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ এবং লেভি স্ত্রোস্ প্রভৃতির সঙ্গে তর্কের মূলও এইখানে যে, অবয়ববাদীরা মনে করেন পৃথিবীতে এখনও 'সত্য'-কে উদ্ধার করা যায়, তা উচ্চারিত ভাষা বা তার লিখিত অবয়ব —যা থেকেই হোক।

উত্তর-আধুনিকতার বাস্তব ও সত্যের যে ধারণা—তাতে বলা হয় যে, এই দুইই আমাদের আয়ত্তের বাইরে, কিংবা সেসব আমাদের আয়ত্ত করতে দেওয়া হয় না। দেরিদার তত্ত্ব তাকে পুষ্ট করেছে। আমাদের মতে দেরিদার তত্ত্বের দার্শনিক গুরুত্ব যতই থাক, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও প্রয়োজনের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন। আমাদের কোনো একটা বিশ্বাসের সন্ধান করতেই হয়, একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরতেই হয়। সে সত্যকে আমরা মূলত ভাষার মধ্যে দিয়েই পাই। অন্যান্য শিল্পের ভূমিকাও তাতে অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

৬.৩ মনস্তত্ত্বের বাস্তব

বাইরের বাস্তবকে আমাদের নানাভাবে প্রত্যক্ষ করার উপায় থাকলেও মনস্তত্ত্বের বাস্তব আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। মনস্তত্ত্বের রোগী ডাক্তারের শোয়ানো চেয়ারে বসে মূলত ভাষায় বলে—তার স্বপ্ন, অনুভব ইত্যাদির কথা। ভাষার সত্যপ্রকাশের ক্ষমতা যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে বহির্জগতের বাস্তব যেমন, তেমনই মনোজগতের বাস্তবকেও জানবার সম্ভাবনাকে আমাদের অস্বীকার করতে হয়। পোস্টমডার্ন বাহির এবং অন্তরের দুরকম সত্য বা বাস্তব নিয়েই প্রশ্ন তোলে, প্রশ্ন তোলে সময় ও স্থানের সংহতি ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে, বাস্তবের সংগঠন সম্বন্ধে।

৬.৪ সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি বা অভিমুখীনতা

উত্তর-আধুনিকতার সমালোচকেরা প্রায়ই এই সাংস্কৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে apocalyptical কথাটিকে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ উত্তর-আধুনিকতা হলো সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ লগ্নের, বলা যায় চূড়ান্ত ধ্বংসকালীন সময়ের তত্ত্ব। আবার একে বলা হয়েছে 'কল্পলোকাশ্রিত' 'utopian'। দুটোতেই ইতিহাসের ভূমিকা অস্বীকৃত। প্রথমটায় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘোষণা, ফুকুয়ামা যেমন সোল্লাসে করেছেন ; দ্বিতীয়টাতে ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। অ্যালান ওয়াইল্ডের [Wilde 1981 : 131] মতে উত্তর-আধুনিকেরা এমন এক পৃথিবীর কথা বলে যে-পৃথিবী 'beyond repair'। আধুনিকতা কিন্তু বলে সেই পৃথিবীর কথা যা হল 'a world in need of mending' অর্থাৎ মানুষের সভ্যতার প্রগতি বা অগ্রগতি সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর দায় বা বাধ্যবাধকতা উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের নেই, এ তত্ত্ব নিজের চমকপ্রদ সাক্ষাৎকারে মুগ্ধ। জেমসন [1991 : 368] এর fantastic historiography-র কথা বলেন। অন্যদিকে উত্তর-আধুনিকরা যত বলেন অতীতের নানা নন্দনতত্ত্বে 'return' এর কথা, কখনও তত বলেন না এখান থেকে কোথায় যাবেন। না ইতিহাস, না নন্দনতত্ত্ব, না শিল্পের মহত্ত্ব ও প্রভুত্ব, না বৃহৎ আদর্শের বন্ধন ও বিশ্বাস—এই একগাদা 'না'-এর উপর দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁরা, তৈরি করে তোলেন এক বৃহৎ আত্মবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ

বৃত্তের 'হ্যাঁ'। অবশ্যই উত্তর-আধুনিককালের কিছু কিছু ইতিবাচক অভিক্ষেপও ঘটেছে, তার একটি হল প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীগুলির স্বীকৃতি ও সম্ভাষণ—যেমন কালো মানুষদের কথা, রেড ইন্ডিয়ান ও অন্যান্য আদিবাসী মানুষদের কথা। বিশেষভাবে নারীদের কথা। পরে আমরা লিয়োতারের metanarrative [grand narrative, master narrative] প্রত্যাখ্যানের আলোচনায় এসব কথা বলব।

৬.৫ শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত অবস্থান : উচ্চাঙ্গের শিল্প, জনপ্রিয় শিল্প

ইউরোপে কান্ট তাঁর *Critique of Judgement* বইয়ে যে নতুন নন্দনতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন তাতে শিল্পের একটা মহদ্‌বোধ বা sublime-এর ধারণা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। নিট্‌শে এসে তাকে অস্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও ইউরোপের নন্দনতত্ত্বে উচ্চাঙ্গের শিল্প আর সস্তা শিল্পের একটা তফাত বরাবরই স্বীকার করা হয়েছে। আবার হার্বার্ট রিডের কথা আমরা উদ্ধার করি—ওই 'taste' প্রসঙ্গে তাঁর কথা হলো "Taste is formed by a continuous assessment of quality such as all craftsmen instinctively direct towards each other's work. In society as a whole a critical attitude of this kind-produces a progressive awarenss of the formal beauty of human artifacts and this is the true meaning of 'taste' [পূর্বোল্লেখ]। আগেই তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে suncapped peaks-এর রূপক ব্যবহার করেন।

উত্তর-আধুনিকতা শিল্পের এই উচ্চতা-নীচতার ভেদ স্বীকার করে না। এমনকি কোন্‌টা শিল্প আর কোন্‌টা শিল্প নয়—তার তফাতও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। উত্তর-আধুনিকতা সম্বন্ধে আর একটি প্রারম্ভিক বইয়ে [Appignanesi and Garratt: 1995 : 51-55] অন্যভাবে সাজানো 'না-শিল্পের' এই শিল্প হিসেবে ন্যায্যতা বা legitimation-এর দৃষ্টান্ত হিসেবে মার্সেল দুশা [Marcel Duchamp] নামে নব্য 'দাদা'বাদী এক শিল্পীর কথা বলা হয়েছে। ইনি ১৯১৪ নাগাদ একটি প্রস্রাব-পাত্রকে প্রদর্শনশালার দেয়ালে লটকে দিয়ে installation art হিসেবে জাহির করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ঝরণা' বা Fountain। অবশ্য একথা বলা যেতেই পারে যে, স্নানঘরে প্রস্রাব-পাত্রের যে স্থান ও ভূমিকা, সে জায়গায় সে প্রস্রাব পাত্রই। কিন্তু প্রদর্শনীকক্ষে ভিত্তির উপর তাকে বসিয়ে দিলে এবং দর্শকের দৃষ্টির সামনে তাকে স্থাপন করলে তা প্রত্যাশিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন হল, তার ভূমিকাও বদলে গেল। ফলে তা আর নিছক প্রস্রাবপাত্র রইল না। অবশ্য তার মধ্যে শিল্পীর মৌলিক 'সৃষ্টি'-অংশ কতটা, অভিনব কল্পনার অংশ কতটা, সৃষ্টি সে-কল্পনাকে সমৃদ্ধ করছে না কল্পনা সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করছে, তাতে 'সৌন্দর্য' কিছু তৈরি হচ্ছে কিনা,— এসব নিয়ে তর্ক চলতেই থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিকোত্তর শিল্পের সঙ্গে 'না-শিল্পের' আদান-প্রদানের পথটি বেশ প্রশস্তই। জেম্‌সন এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য ভ্যান গখের চাষির এক-জোড়া বুটজুতোর ছবি আর নব্য মার্কিন শিল্পী অ্যান্ডি ওয়ারহল-এর 'ডায়মন্ড ডাস্ট শুজ' ছবিদুটির তুলনা করেন। প্রথম ছবিতে জেম্‌সন [পূর্বোক্ত 7-8] "The whole object of agricultural misery, of stark rural poverty, and the whole ordimentary human world of backbreaking peasant toil, a world reduced to its most brutal and menaced, primitive and maginalized state" লক্ষ করেন, সেখানে ওয়ারহল-এর ছবি সম্পর্কে বলেন... 'it does not really speak to us at all'। অন্যদিকে ওয়ারহলের ছবির বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের চরিত্র, ফটোনেগেটিভের ছাঁচ যেন এর অন্তর্নিহিত অর্থকে একটা flatness or depthlessness, a new kind of superficiality-র ধরন এনে দেয়।

না-শিল্পের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্যকে যেমন উত্তর-আধুনিকতা আচ্ছন্ন করতে চায়, তেমনই সে চায় উচ্চ শিল্পের সঙ্গে বাজারি শিল্পের বা সস্তা সাধারণ রুচির শিল্পের তফাত নষ্ট করতে। শুধু তাই নয়, pop art বা mass art-কে তার সংস্কৃতির উপযুক্ত শিল্পশস্য বলে প্রমাণ করতে চায়। পরে আমরা এ বিষয়ে আর একটু বলব। তার আগে আনুষঙ্গিক আরও দু-একটি কথা বলে নিই।

উচ্চ বা উন্নত শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে উত্তর-আধুনিকরা প্রথম যে প্রশ্নটা করে তা এই : এটা যে উঁচুদরের শিল্প তা কে ঠিক করল? যদি কেউ উত্তর দেয় যে, তা ঠিক করেছে শিল্পতাত্ত্বিকরা, শিল্প সমালোচকরা—তারা বলবে, ফুঃ! আমরা ওসব authotiry বা প্রভুত্ব মানি না। ক্লাইভ বেল্ শিল্পকে organized form বলুন আর রিড [পূর্বোল্লেখ, পৃঃ ৪] উন্নত শিল্পকে "something beyond self-expression... which might be called life-expression" বলুন না কেন, উত্তর-আধুনিক বলবে, 'লাইফ-ই-বা কী, আর selt-ইবা কী—দুয়ের অস্তিত্ব কী তাই তো জানি না।'

দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লেখ করেছি, চিত্রশিল্পের এক-একটি ছবি যে একটি অনন্য, স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি, এবং টাকা দিয়ে কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে সেটি দখলে রাখতে পারে, তারও বিরুদ্ধে দাঁড়ায় উত্তর-আধুনিকেরা। একদিকে যেমন স্রষ্টা শিল্পীর একক originality, authority বা প্রভুত্বে এঁদের আপত্তি, তেমনই এঁরাই আবার সে শিল্প যে একটিমাত্র ধনী ক্রেতার একমাত্র অধিকারে থাকবে তাতেও আপত্তি জানায়। এতে মনে হতে পারে যে, ধনীর সঞ্চয় ও সম্পত্তি সমাবেশে, একক মালিকানায় এঁদের আপত্তি। তা কিন্তু নয়। এঁরাই যখন কোটি কোটি টাকা খরচ করে বেহিসেবি ও অনর্থক অপ্রয়োজনীয় অলঙ্করণের উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যের [লাস ভেগাসে যেমন দেখা যায়] জন্য উচ্ছ্বাস করে তখন এঁদের স্ববিরোধ প্রকট হয়। কারণ অতুল বৈভব ও অলজ্জ অপচয় ছাড়া ও ধরনের স্থাপত্য আদৌ সম্ভব হত না—সে প্রসঙ্গ তারা মনেই রাখে না।

যাই হোক, ছবির শিল্পীর নামচিহ্নিত অনন্যতা, সমালোচক-নির্দিষ্ট দামের প্রতিবাদে উত্তর-আধুনিকরা হাজার হাজার ছবির নকল সস্তাদামে বাজারে বিক্রি করার পক্ষপাতী। ১৯৭৮-এ হাল্টার বেন্ইয়ামিন বলেন এই পরিপ্রেক্ষিতে, ফোটোগ্রাফির বিশেষ গুরুত্বের কথা [Benjamin, 1978], বলেন তা নন্দনতত্ত্বের গোড়া ধরে নাড়া দেবে। কারণ ফটোগ্রাফ অজস্র কপি করে বিক্রি করা যায়।

সাহিত্যে ডিটেকটিভ উপন্যাস, প্যারোডি এইসব জনপ্রিয় রচনা বা Kitsch হয়ে ওঠে সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পফসল। কারণ এই সংস্কৃতিকাল সত্যে অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সুন্দরেও। নন্দনতত্ত্ব নামক শাস্ত্রের ন্যায্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে এরা। পিয়ের বুর্দো [Bourdiew, 1993] বিশেষ করে উচ্চ ও জনপ্রিয় শিল্পের তফাত ভাঙার কথা বলেন।

৬.৬ শিল্পতত্ত্বে দ্বিতীয় আখ্যান : শিল্পে শিল্পে দেওয়াল—শিল্পের সীমারেখা; অন্যদিকে একটা শিল্পের মধ্যে নানা সংরূপ বা genre-এর খোপ খোপ ভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত :

হ্যাঁ, এই দুটো বেড়াই ভাঙতে চাইছেন উত্তর-আধুনিকরা। প্রথমত, শিল্পে শিল্পে মাঝখানে যে দেওয়াল থাকে, সাহিত্য আর চিত্রকলা, চিত্রকলা ও সংগীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্য বা ভাস্কর্য—এই কলাবিদ্যার দেওয়াল-ভাঙা আধুনিকতার যুগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা এটাকেই কাম্য বলে মনে করে। মিক্সড মিডিয়া বলে যে কথাটা আমরা ইদানীং হরহামেশা শুনি, তা যেন চারুশিল্পে, উত্তর-আধুনিকতার বিশেষ অবলম্বন। এবং ভিডিয়ো বা সিডিতে দৃষ্টি ও শ্রুতি দুয়েরই উপজীব্য থাকে বলে ভিডিয়োতে সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাটক সবই মিশে যেতে পারে। সেই কারণেই জেম্সনরা ভিডিয়োকে বিশেষভাবে উত্তর-আধুনিক প্রযুক্তির অন্তর্গত করে দেখেন। লুসি

[Lucy, 2000] বলেছেন এক ধরনের ছবিওয়ালা picture novel-এর কথা, বয়স্কপাঠ্য উপন্যাসে যা দীর্ঘদিন দেখা যায়নি, যদিও পিটার ভাইস প্রভৃতির দু'একটি উপন্যাসে আমরা ভাষার আখ্যান ও ছবির অন্তর্বয়ন দেখেছি বলে মনে হয়। পরে দেখা যাবে লিয়োতারের বয়ান—বিজ্ঞানের শাখাগুলিরও দেওয়াল ভাঙছে। আমরা প্রবন্ধের প্রথম দিকে অলসনের ব্ল্যাক মাউন্টেন কলেজে কবি চিত্রকর নৃত্যশিল্পী সকলে মিলে যে অদ্ভুত অভিকরণের কথা বলেছিলাম—তাই যেন উত্তর-আধুনিকের উচ্চারণ—'দ্যাখো আমরা শিল্প বলতে কী বুঝি!'

আবার একটি শিল্পের মধ্যেও উপন্যাস-কবিতা-নাটক গোছের সংরূপ বা genre-এর খোপ খোপ ভাগ উত্তর-আধুনিকরা ভেঙে দিতে চান। এ কাজ তাঁরা শুরু করেননি, কিন্তু তাঁরা শেষ করতে ইচ্ছুক। জেমস্‌ন [পূর্বোল্লেখ, ৩৭৩] চমৎকারভাবে এই genre-hopping-কে দর্শকদের টিভির এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে পর পর লাফিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কথায়—'Thus the movement from one generic classification to another is radically discontinuous, like switching channels on a cable television set; and indead it seems appropriate to characterize the strings of items and the compartments of genres of their typologization as so many "channels" into which the new reality is organized." এর অনেক আগেই জেমসন উত্তর-আধুনিক পৃথিবীতে "the language of forms or genres"-এর সন্ধান বৃথা হবে বলে রায় দিয়েছেন [p. 67]।

সুতরাং শিল্প সৃষ্টি ও শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতা বেশ জোর গলায় এই দাবি হাজির করেছে—উচ্চকোটির নন্দনতত্ত্বের মহিমা ভেঙে উচ্চ শিল্প ও জনপ্রিয় শিল্পের তফাত স্বীকার করা যাবে না, শিল্পে, বিশেষত চিত্রশিল্পে শিল্পীর নাম ও স্বাক্ষরের জুলুম, অন্যদিকে তারই জোরে ধনীর সেই চিত্রে একচ্ছত্র মালিকানা স্বীকার করা যাবে না। এছাড়া, শিল্পে শিল্পে তাত্ত্বিক পাঁচিল ভাঙতে হবে এবং একই শিল্পে, যথা সাহিত্যে সংরূপ বা genre-এর কক্ষভাগ চলবে না।

সাহিত্যে, বিশেষত কথাসাহিত্যে, আখ্যানকলা বা narration-এর ভঙ্গি যে এই পর্বে একেবারেই অন্যরকম তাও বলে রাখা দরকার। চিত্রকলা তো আধুনিক পর্বে এসেই বিমূর্ততার আশ্রয় নিয়ে গল্প বলা ছেড়ে দিয়েছে; তা হয়েছে আত্মনির্দেশক বা self-referential। অর্থাৎ সে বলছে, খানিকটা কথাহীন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতো করেই—'শুধু আমাকেই দ্যাখো, আমার বাইরে আর কিছু নেই'। উত্তর-আধুনিকতা এটাকেই শিল্পের একমাত্র কাজ বলে মনে করে, এই আত্মনির্দেশনাকে। গল্পে-উপন্যাসে গল্প বলার একটা দায় আধুনিক পৃথিবী মুদ্রণযুগে এসে তুলে নিয়েছিল। তারও আগে ছিল মৌখিক গল্প, কাব্যের সম্ভার। কিন্তু উত্তর-আধুনিকেরা গল্প বলাতে আখ্যান-বর্ণনার প্রাচীন ঢং সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, ফলে সময় অনুসারে ঘটনাক্রম, বাস্তবতা বা বিশ্বাস্যতার মাত্রা রক্ষা, যুক্তি ও ঔচিত্যের লক্ষণ বজায় রাখা—কিছুই আর স্বীকার করতে রাজি নয়। কাপ্‌লানের সম্পাদিত সংকলনে ফ্রেড ফাইল [Pfeil, 1988] দুটি উপন্যাসের আলোচনা করেছেন, যে-দুটি তাঁর কাছে উত্তর-আধুনিকতার সার্থক প্রতিনিধি বলে মনে হয়েছে। টমাস ডিশ [Disch]-এর *The Businessman : A Tale of Terror*, আর ডেনিস জনসনের *Fiskadoro*। প্রথম বইটিতে স্ত্রীকে স্বামী খুন করে পালাচ্ছে, কবর থেকে উঠে স্ত্রীর ভূত স্বামীকে ধরতে ছুটছে—এইরকম বহুজটিল এক আখ্যান, কার্যকারণহীন কিন্তু মজাদার এক পরম্পরা তৈরি করছে। এবং তার রসবিচিত্র, যার একটু নমুনা বঙ্গানুবাদে দেখা যেতেই পারে—

"আপনার বউকে খুন করা খুব কঠিন কাজ এমন মনে নাও হতে পারে, আর বব্‌ গ্ল্যান্ডিয়ারের ক্ষেত্রে এটা জলের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল, কর্মসূচি : দুজনে মিলে লাস ভেগাসে উড়ে যাও।

লেডি লাক্ মোটর লজে ঢোকো, বউয়ের গলা টিপে শেষ করো। তারপর মিনেসোটার প্লেন ধরো আর সেখানে উঁচু তলার এগজিকিউটিভ হয়ে জীবন আবার শুরু করো। পরে যা দাঁড়াল তা অবশ্য এত সহজ নয়।"

সমালোচকদের মতে টেলিভিশনে ফিল্মে ভূত প্রেত দৈত্যি দানোর বীভৎস ও কিম্ভূত রসের আখ্যানগুলি মূলত উত্তর-আধুনিক পর্বেরই প্রার্থনার ফল। এরমধ্যে একটা লঘু ক্রীড়া-চাপল্যের ব্যাপার আছে। রলাঁ বার্তে (Barthes) যাকে বলেন jouissance। এই লঘু চাপল্য উত্তর-আধুনিকতার নিজস্ব মেজাজ। উত্তর-আধুনিকতায় যৌনতা নিয়েও এই jouissance লক্ষ করি আমরা। কিছুই সম্ভ্রমযোগ্য নয়, কিছুই গ্রাম্ভারি বা ধানদুর্বো হাতে নিয়ে দেখাশোনার মতো নয় আর। হয়তো apocalyps বা শেষ ধ্বংসের আগেকার এটাই একটা লক্ষণ।

স্থাপত্যের ব্যাপারে আবার একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। এই বিষয়টার উপর স্থপতি ও স্থাপত্য সমালোচক চার্লস জেংক্স সবচেয়ে বেশি করে বলেছেন। উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যে প্রচুর জায়গা নিয়ে অদ্ভুত ও বিচিত্রদর্শন গঠন ও নির্মাণে কোনো বাধা নেই। শিল্পকে তারা সস্তা করে নকল করে বা কপি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পক্ষপাতী, কিন্তু স্থাপত্যে তারা বাহুল্যপ্রেমী ও অপচয়ী বলে মনে হয়। জেমসন তাঁর বইয়ে স্যান্টা মনিকার ফ্রাংক গেরি হাউসের [পৃঃ ১০ আর ১১-র মধ্যবর্তী সপ্তম ছবি, এবং ১১০-১১২ পৃষ্ঠায় তার অন্যান্য দিক ও নকশা দিয়েছেন। ১১৪ পৃষ্ঠাতে রান্নাঘরের ছাদের ছবিও] কথা বলেন, বলেন লস এঞ্জেলেসের 'বোনাভেঞ্চার' হোটেলের বিশাল বাড়িটির কথা। আম্মানের রাজপ্রাসাদের কথাও আসে। নিউ ইয়র্কের একটি বিল্ডিং, আটলান্টা জর্জিয়ার পিচট্রি সেন্টার ইত্যাদি অনেক বাড়ির কথা আসে। লাস ভেগাসের নানা রকমের সাইকাডেলিক আলোকসজ্জিত কিম্ভূতদর্শন বাড়িগুলির কথাও আসে, যেগুলিতে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আরবের শৈলীও মিশে যায়, চলে আসে মধ্য ইউরোপের দুর্গ-স্থাপত্য। [মাইক ডেভিস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬] লস এঞ্জেলেসের নাগরিক প্রতিবেশে বোনাভেঞ্চার হোটেলের আরোপকে savagery বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু savagery নয়, তাতে স্পর্ধা, বেপরোয়াভাব, ছেলেখেলা, দেখনদারি বা আদেখলেপনা—সবই আছে। আছে kitsch বা প্যারোডির প্রবণতা। পাওলো পোরটোগেসি বলে আর-এক স্থাপত্যবিশারদ এই কারণে এ স্থাপত্যকে "Paradoxical and ambiguous but vital" বলে বর্ণনা করেছেন [Portoghesi, 1983 : 10-11]। যাই হোক, তৃতীয় বিশ্বে বসে আমরা এর বিপুল খরচের কথা কেবল কল্পনাই করতে পারি।

৬.৭ বৃহদাখ্যানের বিচূর্ণন

দার্শনিক লিয়োতার [Lyotard, 1984]-এর যে অংশটি সাইডম্যান [Seidman, 1994] ছেপেছেন তার প্রথম বাক্যই হল 'I define postmodern as an incredulity toward metanarratives' [p. 27]। মেটান্যারেটিভ বা বৃহদাখ্যান কী? বৃহদাখ্যান হল সেই সব আদর্শ বা ইডিয়োলজি বা বিশ্বের বহু মানুষকে কোনো একটা বড়ো বিশ্বাসে বাঁধে, কোনো সামূহিক লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং সেই লক্ষ্যে এগোনোর জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য নির্দেশ করে, উজ্জীবিত করে। ধর্ম একটি বৃহদাখ্যান, ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ (সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ)—সবই এক-একটি বৃহদাখ্যান। কোনোটি মানুষের মুক্তির জন্য, কোনোটি মানুষের বশ্যতা আদায়ের জন্য। এক বৃহদাখ্যান হল বিজ্ঞান। আবার দর্শনগুলিও এক ধরনের বৃহদাখ্যান।

উত্তর-আধুনিক দর্শনের তত্ত্বের অংশ এত সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়নি। তার প্রয়োগকলা বা praxis অংশও এই সুবিস্তারিত চরিত্র লাভ করেনি। যাই হোক, মার্কসবাদের এবং অন্যান্য বৃহদাখ্যানের

প্রতিপক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে লিয়োতার সব কিছুর চূর্ণন লক্ষ করেন এবং বলেন, 'Consensus has become an outmoded and suspect value [p. 37]। এ বিষয়ে মতানৈক্যপন্থী হাবেরমাসের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য নেই।

বৃহদাখ্যান ভেঙে ছোটো ছোটো আখ্যান বা খণ্ডাখ্যান [Petit recit] তৈরি হচ্ছে। এই ভাঙার ঘটনাটা পৃথিবীর সবদেশে যতটা সত্য না হোক, পাশে বা আড়ালে পড়ে থাকা প্রান্তিক জীবন উঠে আসছে সামনে। মেয়েদের কথা, আদিবাসী-উপজাতিদের কথা, সমকামী বা নপুংসকদের কথা—এরকমই আরও অনেক অন্তেবাসী জীবন ও তাদের বঞ্চনা মধ্যবিত্ত পৃথিবীর চোখ ও চেতনাতে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। আসছে উন্মাদদের কথা, অপরাধীদের কথা। মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তাতে এমন হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ইউরোকেন্দ্রিক বা পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, বিদেশি অভিবাসীদের মতো তার মধ্যে আড়ালে থাকা অস্তিত্বগুলিও এসে ভিড় করছে। উত্তর-আধুনিকের এইটি এক ইতিবাচক দিক। কিন্তু বৃহদাখ্যান সব ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে, তাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথাও এখনই বুক ফুলিয়ে বলা যাচ্ছে না। টেরি ইগ্‌লটন একটু মজা করেই লিখেছেন, [Eagleton, 1986 : 144]... 'the obituary notices are greatly exaggerated'।

অবশ্যই পোস্টমডার্নিজমের ব্যাখ্যানে আরও অনেক কথা আসে। কিন্তু আপাতত এইটুকু পেশ করা গেল। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে লিন্ডা হাচন [Hutcheon, 1988 : 23] খুব জোর দিয়ে বলেন, Postmodernism is a fundamentally contradictory enterprise : its art forms (and its theory) at once use and abuse, install and then destabilize convention in parodic ways, self-consciously pointing both their own inherent paradoxes and provisionality and, of course, to their critical or ironic re-reading of the art of past. কিন্তু এই সচেতনভাবে স্ববিরোধী এবং আত্মগণ্ডগোলে উল্লসিত তত্ত্ব দক্ষিণ এশিয়া বা তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ মানুষের জন্য কোনো বড়ো আশ্বাস বহন করে আনে না। জেমসন যেভাবে তাদের সদ্যতন শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছেন—সে শিল্পব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বে কী ভূমিকা নিচ্ছে সে বিষয়ে তাঁরা অবহিত কি না জানি না। এখনও যে-পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আধপেটা খেয়ে থাকে, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে পালে পালে মরে, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ডুবে থাকে [বিশ্বকাপের ভারচুয়াল রিয়্যালিটি সত্ত্বেও] সেই রিয়্যালিটিকে অস্বীকার করতে চায় যে-মতবাদ তা সাহিত্যতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব—যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, তার সম্পর্কে আমাদের একটা অবস্থান নিতেই হবে। খ্রিস্টোফার নরিস অবশ্য জানিয়েছেন যে, [দ্র. Norris, 1993] লিয়োতার শ্রেণির দার্শনিকেরা আউস্‌ভিট্স-এ সহস্র ইহুদি-নিধনকেও 'textuality'—বা 'ভাষাপাঠ' হিসেবে দেখেন; ফলে তার সত্যতা সম্বন্ধেও তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। কারণ ভাষা বাস্তবের নিখুঁত প্রতিলিপি, একথা তাঁরা মানতে রাজি নন। এ বড়ো ভয়ংকর কথা। যে ঘটনা সম্বন্ধে আডোর্নো বলেন যে তার পরে কবিতা লেখাই সম্ভব নয়, তাকেই যারা অবাস্তব বলেন তাঁদের দার্শনিকতা হয়তো উচ্চাঙ্গের, কিন্তু মানবিকতা নয়। অবশ্য মানবিকতাও একটি বৃহদাখ্যান, তা নিশ্চয়ই তাঁরা বর্জনীয় মনে করেন। এই চূড়ান্ত সংশয়বাদীদের কাছে [নরিসের মতে 'নামবাদী' বা norminalist] যুদ্ধ অনাহার, মহামারী কতটা সত্য বলে গণ্য হবে কে জানে? উত্তর-আধুনিকতাকে অবশ্যই বুঝতে চাইব না এমন নয়, কিন্তু আধুনি... পাশ্চাত্যে তৈরি তত্ত্ব মানেই চূড়ান্ত ও চরম, আমাদের তাতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এবং তার উল্কি গায়ে লাগিয়ে গর্ব করে দেখাতে হবে—এই প্রয়াসের মধ্যে একটা লজ্জাকর হীনম্মন্যতা আছে বলে অন্তত এই লেখকের ধারণা। বাংলায় 'উত্তর-আধুনিক গল্প', 'উপন্যাস' ইত্যাদি ঢক্কা-নিনাদ শুনে অনেক সময় একথা মনে হয়।

টীকা

১. এই লেখক দেশি-বিদেশি কোনো উত্তর-আধুনিকতার নাগরিক বা সদস্য নয়, এ ধরনের কোনো আন্দোলনে সে অংশ নেয়নি। ফলে তার উত্তর-আধুনিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল পুথিগত, যদিও উত্তর-আধুনিক স্থাপত্য, চিত্রকলা, রচনা ইত্যাদির নমুনা অল্পস্বল্প সে দেখেছে। এ সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে গিয়ে প্রাথমিক, অগ্রসর—সব ধরনের বই-ই [হাতের কাছে যা সে পেয়েছে] সে পড়েছে। তা থেকে যতটুকু বুঝেছে তারই সাক্ষ্য এই নিবন্ধ। এ বিষয়ে যাঁরা প্রাজ্ঞতর তাঁরা এতে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পেতেও পারেন, সে জন্য ক্ষমা চেয়ে রাখছি। আরও জরুরি কথা, এসব ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার কথা তাঁরা যদি এ লেখককে কষ্ট করে জানান, সে প্রভূত কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

২. সমীরের এ ধরনের রচনার শেষ উদাহরণ বিনয় মজুমদারের কবিতার আলোচনা, *কবিতীর্থ*-৩৬, পৃঃ ৫৫-৭৮।

৩. সাদা অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্যাথলিক বা প্রেসবিটারিয়ান বা মেথডিস্টদের আচরণবিধি কী অর্থে প্রোটেস্টান্টদের চেয়ে ভালো, তা অবশ্য আমরা জানি না।

৪. ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর অনুরূপ একটি বাংলা লেখা দিল্লির *দিগঙ্গন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সম্প্রতি *দিগঙ্গনের* রজতজয়ন্তী সংকলনে [২০০৬] পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৫. Cultural dominant-এর ধারণাটিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মাইক ডেভিস [Mike Davis, 1988 : 80-81] তাঁর Urban renaissance and the spirit of Postmodernism প্রবন্ধে [দ্র. Ann Kaplan, 1988]। বলেছেন, অন্তত মার্কিন স্থাপত্যের প্রবণতা দেখে এ ধারণাটিকে খুব সংগত বলে মনে হয় না। তাঁর মতে, এটি reductionism বা সরলীকরণের উদাহরণ। এখানে সে তর্কে যাবার সাধ বা সাধ্য আমাদের নেই।

৬. আমাদের এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, তথ্য প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের এই ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ ব্যবহার মূলত পাশ্চাত্যের সমাজকে যেভাবে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাদের চৈতন্যে প্রভাব ফেলেছে সেটা পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের সম্বন্ধে এখনও সত্য নয়। আবার এই প্রাচ্যে জাপানে যতটা সত্য, সেখানে চিনে-ভারতে বা বাংলাদেশে সবক্ষেত্রে ততটা সত্য নয়। আমাদের এসব অঞ্চলকে Late capitalism এখনই গ্রাস করেছে এমন কথা বলা যাবে না। প্রাচ্যে অনেক জায়গায় অনাধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্ক এখনও টিকে আছে, উত্তর-আধুনিকতার ধাক্কা বাঁচিয়ে।

৭. মার্কিউস-এর *One-Dimensional Man*, [1964]-এর নামপত্রে তিনি Advanced Capitalism কথাটা ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয় Post-Industrial Society বা Late Capitalism প্রয়োগ দুটির চেয়ে সেটি সার্থকতব নাম।

৮. অবশ্যই এই ঐতিহ্যের সবটাই rational বা প্রখরভাবে যুক্তিভিত্তিক ছিল তা বলা যাবে না। গ্রিকদের দিয়োনুসস্ বন্দনা ও উৎসবে নানা ধরনের উন্মত্ততায়, ইহুদি মারণ-উচাটন-বশীকরণ ডাইনিতন্ত্রের খবরও আমরা রাখি। দ্র. Dodd, 1966। এখানে জেমসনের Cultural dominant-এর তত্ত্ব ধরেই হয়তো আমাদের বলতে হবে এক ধরনের যুক্তি ও বিশ্বাসের ভারসাম্য ওই পরম্পরার প্রধান লক্ষণ।

৯ দ্র. Olson, Charles, 1976.

১০. এটা সকলেই জানেন যে, প্রথাগত সমস্ত শিল্পকেই স্থানকেন্দ্রিক [spatial] এবং কালকেন্দ্রিক [temporal] এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্রকলা স্থাপত্য-ভাস্কর্য মূলত space বা স্থানের শিল্প। আর ভাষা ও ধ্বনিনির্মিত সমস্ত শিল্প—সাহিত্য [তার মধ্যে নাটক, চলচ্চিত্র আসতেই পারে] ও সঙ্গীত মূলত কালবদ্ধ শিল্প। ভেনচুরির আলোচনায় স্থান প্রাধান্য পেয়েছে।

১১. পশ্চিমিরা এমন কথা বলেন, কিন্তু এই ধরনের আলাভোলা সরলীকরণের কোনো মানে হয়? একজন একটা কথা বলল; আর তার থেকেই ইতিহাসের গতি বদলে গেল—একথা কদাচিৎ খাটে। নিট্‌শে কথাটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কারণ তখন ইউরোপের ইতিহাস ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করার দিকে এগোচ্ছিল।

১২. পরে আমরা দেখব যে দার্শনিক লিয়োতার এই ব্যাপক তত্ত্ব ও দর্শনগুলিকে, ব্যাপকতর মানবজীবনকে একটি সার্বিক বিশ্বাস ও সংকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত পরিবর্তিত করার সূত্রগুলিকে metanarratives বা grand-narratives বলেছেন। এই বৃহদাখ্যানকে বাতিল করে বহু ক্ষুদ্র আখ্যানের প্রতিষ্ঠাই লিয়োতারের মতে উত্তর-আধুনিকতার একটা লক্ষণ।

১৩. দ্র. রিডের *Phases of English Poetry* [উল্লেখ অসম্পূর্ণ]

১৪. ফলত ওয়েলেকদের প্রস্তাবের তাত্ত্বিক গভীরতা অনেক বেশি, এবং তাকে পুনরাবৃত্তির ধারণা থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। ওয়েলেকদের ধারণার পিছনে সম্ভবত কাজ করছে রুশ আঙ্গিকবাদীদের [automatization] ও প্রমুখণ [Aktualisace] বা [foregrounding]-এর সূত্র, যার উল্লেখ তাঁরা নিজেরাও করেছেন। এর মানে হল, ইতিহাসের একটা পর্যায়ে সাহিত্যের আদর্শগুলি যান্ত্রিক প্রথানুসরণে পর্যবসিত হয়, তাতে আর কোনো নবত্ব বা উজ্জ্বলতা অবশিষ্ট থাকে না। তখন নতুন স্রষ্টা সেসব আদল ভেঙে আবার নতুন রূপ ও ভঙ্গি এনে সাহিত্যকে পাঠকের প্রবল মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

১৫. অবশ্যই বাহুল্য ও অবাস্তব অলংকরণে স্থাপত্যে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় তা একমাত্র ধনী দেশের নিরঙ্কুশ অপচয়ের সংস্কৃতিতেই সম্ভব। তৃতীয় বিশ্ব হয়তো সাহিত্য রচনায় পোস্টমডার্ন লম্ফঝম্প করতে পারে—পোস্টমডার্নিজমের নানা লক্ষণ ধার করে নিজেদের রচনায় ঢুকিয়ে; এমনকি হয়তো চিত্রকলা বা ভাস্কর্যে বা সঙ্গীতে বা মিশ্র-মাধ্যমে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। ভিডিয়ো-শিল্পও তার অনায়ত্ত হবে না। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা যে তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব ফসল নয় তার প্রমাণ এই যে, উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যের ব্যাপক গ্রহণের কথা এ বিশ্বের ভাবার ক্ষমতাই নেই। সরকারি বা বহুজাতিকের টাকায় এখনও 'আধুনিক' স্থাপত্যেরই বাড়বাড়ন্ত।

১৬. বোদ্‌রিয়ার এটা ভাবেননি, কিন্তু টিভি সংবাদের বানানো চরিত্র আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও খানিকটা বেরিয়ে আসে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেল, তার অনেকক্ষণ পরে টিভির দল এসে পৌঁছোল। তাদের অনুরোধে আবার ভি আই পি-কে সেই পুরস্কার বিতরণের 'অভিনয়' করতে হল। জানি না, বোদ্‌রিয়ার একেই hyperreality বলবেন কি না!

সূত্র নির্দেশ :

চক্রবর্তী, উৎপল (সম্পা), ২০০৬, *কবিতীর্থ*-৬৬, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

রায়চৌধুরী, সমীর, ২০০৬, 'খাসমাতা রাধা আর গোপগোপিনীর সহনাচের কোরিওগ্রাফি', দ্র. চক্রবর্তী, উৎপল (সম্পা), জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ পৃ. ৫৫-৭৮

মনিরুজ্জামান, ১৪১০, *বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ও উত্তরকাল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি (লেখকের সৌজন্যে)

সরকার, পবিত্র, ১৯৯০, 'নাট্য সংলাপের বিবর্তন ও অ্যাবসার্ড নাট্য-সংলাপ', দ্র. সরকার, ১৯৯০, পৃঃ ৩৫১-৭২

—১৯৯০, *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী।

সেন, অঞ্জন, উদয়নারায়ণ সিংহ, শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, রাজীব চৌধুরী ও জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ২০০৪, *বাংলায় উত্তর-আধুনিক সাহিত্যচিন্তা*, গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা।

Ann Kaplan, E (ed), 1988 *Postmodernism and its Discontents*, London & New York, Verso.

Appignanesi, Richard & Chris Garet, 1995, *Postmodernism for Beginners*, Thumpington, Cambridge, Icon Books.

Bartens, Hans, 1995, *The idea of Postmodernism*, London and New York, Routledge.

Baudrillard, Jean, 1983, *Simulations*, New York, Semicontext....1988. *Selected Writings*, Cambridge, Polity Press.

Baurdieu, Pierre, 1979, *Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste*. (English Translation, 1984). London & New York, Routledge & Kegan Paul.

Benjamin, Walter, 1978, *Reflections*, New York, Harcourt Brace Jovanovich.

Bhattacharya, Tanushree (ed), *The Uttaradhunik*, 1996, Published by the Editor from Worthington, Ohio.

Cuncliffe, Marcus, (ed), 1975 *American Literature since* 1900, London Sphere Books.

Davis, Mike, 1988, '*Urban Renaissance and the spirit of Postmodernism*' in Ann Kaplan (ed), 1988 pp. 79-87.

Derrida, Jaques, 1976, *Of Grammatology*, Baltimore, Md., John Hopkins University Press.

Dodds A, 1966, *The Greeks and the Irrational Berkley and Los Angeles*, University of California Press.

Eagleton, Terry, 1986, *Against the Grain*, London, Verso.

'Fiedler, Leslie 1965. The new mutants', Partisan Review, 32 : 505-25.

—1975. 'Cross the border—close that gap : Postmodernism' in Cuncliff, 1975, pp. 344-66.

Harvey, David, 1989, *The Condition of Postmodernity : an enquiry into the Origins of Cultural Change*, Oxford & Cambridge, Ma, Blackwell.

Homer, Sean, 1998, *A Poetics of Postmodernism*. New York & London, Routledge.

Jameson, Fredric, 1991, *Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism*, London & New York, Verso.

Kahler, Eric, 1968, *The Disintegration of Form in the Arts*, New York, Braziller.

Kuhn, T. 1963. *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago, University of Chicago Press.

Lucy, Niall (ed), 2000, *Postmodern Literary Theory*, Oxford & Merlin (Mass.) Blackwell.

Lyotard, Jean-Francios, 1994, 'The Postmodern condition' in Seidman (ed), 1994, pp. 27-38.

Mercuse, Herbert, 1964, *One-Dimensional Man*, London & New York, Routledge.

Murdoch, Irish, 1963, *Sartre*, Oxford, Oxford University Press. Norris, Christopher, 1985, *The Contest of Faculties*, London & New York, Methven.

—, 1993. *The Truth about Postmodernism*. Oxford, UK, Cambridge, USA, Blackwell.

Olson, Charles, 1967. *Human Universe and Other Essays*. Ed. Donald Allen. New York, Grove Press.

Pfeil, Fred. 1988 'Potholders and Subcisions : on The Businessman Fiscadoro and Postmodern Paradise' in Ann Kaplan, 1988, pp. 59-78.

Portoghesi, Paolo, 1983 *Postmodernism : The Architecture of Postindustrial Society*, New York, Rizzoli.

Read, Herbert, 1963, *To Hell with Culture*, New York Schocken Books.

Seidman, Steven (ed). *The Postmodern Turn*, Cambridge, Cambridge University Press.

Ward, Glenn, 2003, *Postmodernism*, Teach yourself Series.

Wellek, Rene & Austin Warren, 1949, *Theory of Literature, Middlesex*, Penguin Books.

Wilde, Alan, 1981, *Horizons of Ascent : Postmodernism and the Ironic Imagination*, Baltimore, Md. John Hopkins University Press.



অন্বিত সম্পর্কে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য

• • • • • •

বিমল মুখোপাধ্যায়

'একই বস্তুকে একাধিক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় একই ভাষার মধ্যস্থতায় প্রকাশ করা। একই বস্তুর প্রেক্ষাপটের বহুত্বের জন্য এমন এক ঐশ্বরিক বিন্দুর সন্ধান মেলে না যেখান থেকে সমগ্র বস্তুকে দেখা সম্ভব।' মন্তব্যটি কোনো সাহিত্যিকের বা ভাষাতত্ত্ববিদের নয়। বক্তা বিজ্ঞানী নীলস্ বোর। বিজ্ঞানী বোর্ 'দেখা' এবং 'প্রকাশ করা'র অনৈক্য দেখছেন। এমন অনৈক্য যদি আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক কী রাদারফোর্ড পেতেন তাও বিশ্বাস করতাম অবশ্যই। কিন্তু নিউটনের এমন যাতনায় আমার বিশ্বাস হত না। সম্ভবত ক্লাসিকাল সায়েন্সের সঙ্গে মডার্ন সায়েন্সের পার্থক্যের অনেক সূত্রের মধ্যে একটি বোধ হয় এই, ক্লাসিকাল সায়েন্সের জিজ্ঞাসা অনেক বেশি ভূ-লগ্ন আর মডার্ন সায়েন্স-এর জিজ্ঞাসু মহাবিশ্বে মহাকাশে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বলতেও পারেন 'আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।' না, আইনস্টাইন এমন করে বলেন নি, বা আর যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা কেউই বলেন নি। বলেছেন 'বিশ্বপরিচয়' লিখেও বিজ্ঞানীর নির্দিষ্ট আসন যিনি প্রত্যাশা করেন নি সেই রবীন্দ্রনাথ। আবার রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হয়েও যে-কথাটা বললেন না, তা বললেন দার্শনিক বিটগেইনস্টেইন—'আমরা যা কিছু ভাবি তা স্বচ্ছ করে ভাবতে পারি, যা কিছু লিখি তাও অনুরূপ স্বচ্ছ হতে পারে; কিন্তু আমরা যা কিছু ভাবি তা সবই স্বচ্ছ করে প্রকাশ করতে পারি না।' কেমন যেন মনে হচ্ছে না কি? বিজ্ঞানী বলছেন সাহিত্যিকের সমস্যা, সাহিত্যিক লিখছেন বিজ্ঞানের বই, আর দার্শনিকের কলমে ধরা দিল সাহিত্যিকের যাতনার তীব্রতা। কবি যখন লেখেন 'আমি চোখ মেললুম আকাশে,/জ্বলে উঠল আলো/পুবে পশ্চিমে/গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'/সুন্দর হল সে।' তখন বুঝে নিই কবি পৌঁছে দিতে চাইছেন শব্দের সাহায্যেই 'to a speech beyond silence'. যাঁরা Speech-এর 'rule governed behaviour'-এ আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেই সব Patron, Client, Consumer, antagonist, arbiter এবং distorter নৈঃশব্দের নিবেদনে সাড়া দিতে পারেন নি, কারণ Infinite culture-এর অতলের আহ্বান তাঁদের কাছে পৌঁছয় নি। অথচ পুরুষোত্তম রসিকের চিন্ময়তা জগন্ময় সত্যকে নিবিড় আশ্লেষে আলিঙ্গন করে উচ্চারণ করে বসল আধুনিকতম বিজ্ঞানীর প্রভালব্ধ সত্যকে তাঁর সংবেদনশীল ধ্যানগম্ভীর বাক্যবন্ধে : 'শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,/জ্বলবে না কোথাও আলো। বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে, /বাজবে না সুর। /সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে/নীলিমাহীন আকাশে/ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।' আকাশ হবে 'নীলিমাহীন', বিধাতা হবেন কবিত্বহীন, অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব হবে তাঁর গবেষণার বিষয়—এমন এক মুহূর্ত কি সত্যিই কল্পনায় আসতে পারে? একটু চোখ চেয়ে দেখলেই ধরা পড়ে এই কথা সেই সময়ের যখন তিনি লিখছেন 'বিশ্বপরিচয়'। লিখলেন রবীন্দ্রনাথ 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু'; কিন্তু Astro-Physics-এ রবীন্দ্রনাথের পারদর্শিতা কি সর্বস্বীকৃত, না কি রবীন্দ্রনাথের পাঠকেরা তা প্রত্যাশা করেন? পাঠক না-করুন প্রত্যাশা, কিন্তু

সত্যের অতলান্তকে যিনি অনুভবে বা জ্ঞানে স্পর্শ করতে চান বাধার প্রাচীর বানাবে কে তাঁর সামনে? 'বিশ্বপরিচয়'-এ তিনি লিখলেন: 'আমাদের নক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এদিকে পরমাণু জগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটন-ইলেকট্রনের ঘুর খাওয়া। কালস্রোতে বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত।' মন বলছে, ভালো লেগেছে, একান্ত কোনো বিজ্ঞানভিক্ষু পারতেন না জ্ঞানলব্ধকে এত সাবলীলতায় তুলে ধরতে। এই লেখকের পক্ষেই লেখা সম্ভব 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর যে-মানুষের দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে যার অবস্থান সে কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য-মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই।' বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু মানবের এই মহিমা ঘোষণার অনেক আগেই বলেছিলেন— সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র। মানবচরিত্র কথাটা বলাও বোধ হয় বাহুল্য হল। সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয়। এইভাবেই মেলবন্ধন ঘটল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর কবির সঙ্গে 'বিশ্বপরিচয়'-এর লেখকের। লেও তলস্তয় অনুভবী চিত্তের অধিকারী হলেও কবিতা তাঁর স্ব-ভূমি ছিল না। কিন্তু অমর কথাকোবিদ্ তিনি। তাঁর মন্তব্যেও রবীন্দ্র-উচ্চারিত উক্তিকেই পেলাম, যার ভাষান্তরিত রূপ হল : 'Art is an organ of human life transmitting man's reasonable perception into feeling. In our age the common religious perfection of men is the consciousness of the brotherhood of man—we know that the well-being of man lies in union with his fellow-men. True science should indicate the various methods of applying this consciousness to life. Art should transform this perception into feeling. The task of art is enormous'. তলস্তয়ের বিশ্বাস—আদালত, পুলিশ, দাতব্যপ্রতিষ্ঠান-কলকারখানা অর্থাৎ যেগুলি বাইরের প্রতিষ্ঠান সেগুলি যা পারে, একদিন 'aided by science, guided by religion' সাহিত্যই সে কাজ করতে পারবে। Religion শব্দটি ব্যবহারে তলস্তয় সতর্ক ছিলেন ততটা, যতটা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'ধর্ম'/'মানবধর্ম' প্রভৃতি কথা ব্যবহারে। নইলে একই বাক্যে 'Science' এবং 'Religion'-কে সদৃশ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব তিনি দিতেন না। তলস্তয় 'বিজ্ঞান' ও 'দর্শন'কে সাহিত্যের সহায়ক বা নির্দেশক হতে বললেও কিন্তু সাহিত্যকে teaching ও learning-এর বিশ্বে নয়, সৃষ্টির বিশ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'But the production of something new is creation—the realistic activity'. কল্পনা একটা পৃথক মানসিক ক্রিয়া হলেও যে-কোনো Production-ই কি ব্যাপকার্থে Scientific নয়? পরেই তলস্তয় তাঁর মন্তব্যের সম্প্রসারণ ঘটালেন এইভাবে : Artistic [and also scientific] creation is such mental activity as brings dimly-perceived feelings [or thoughts] to such a degree of clearness that these feelings [or thoughts] are transmitted to other people'. রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-কে প্রমাণ-সাপেক্ষ 'জ্ঞানের কথা' এবং সাহিত্যকে প্রমাণ-নিরপেক্ষ 'ভাবের কথা' বলে গণ্য করে বলেছিলেন 'ভাবের কথা'কে সঞ্চারিত করে দিতে হয়। যা প্রমাণ করতে হয় তার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের মতে, যথাযথ হলেই চলে; কিন্তু যাকে সঞ্চারিত করে দিতে হয়, তার প্রকাশের জন্য আভাস-ইঙ্গিত ও ছলাকলার প্রয়োজন হয়। 'ছলাকলা' কথাটা হয়ত একটু লঘুচালের। অথচ মোদ্দা কথাটা ঐ 'ছলাকলা'ই, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'artistic'. ঐ 'ছলাকলা' না থাকলে একের কথা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। আর্ট হতে গেলে সৃষ্টরূপটাকে বিশিষ্টার্থে artistic হতে হবে। 'Art lies in concealing art' কথাটার তাৎপর্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং ঐ পথেই সম্ভব 'transmission of feeling'। তা হলেই 'রূপ' হবে 'artistic, বিজ্ঞান ও দর্শনের জগতে Infection-এর কোনো ভূমিকা নেই। 'Philosophy of literature' বলে যদি থাকে কিছু, তার অন্যতম মূলসূত্র হল 'transmission of feeling.' Philosophy of

Science স্থিত আছে transfusion of knowledge-এর ওপর। সঞ্চারক্রিয়া সার্থক বলেই 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর।' অথবা 'বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,/আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।। '— এই দুটো উদ্ধৃতিই সুরের মাধ্যমে যখন পরিবেশিত হয়, তখন সেই গান অনুভূতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। গান অন্যতম শিল্পকর্ম, তাই মাধ্যম ছাড়া শিল্প-দর্শনের নিরিখে কাব্য ও সংগীতে কোনো পার্থক্য নেই। শিল্প-সাহিত্যে ফর্মের বৈচিত্র্য ও 'কন্টেন্ট' নিত্যপরিবর্তনশীল। কন্টেন্টের যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে ফর্মের পরিবর্তনও হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'কন্টেন্ট' ও 'ফর্ম'-এর নবায়মানতা নিয়ে ভাবতে হয় না, হয়ত জানার বিষয়ের প্রায়োগিক দিকটি মুখ্য হয়ে যায় বলে। সাহিত্যিকের তো সেই অর্থে experiment-এর কোনো সুযোগ নেই। কীট্স্-এর 'Cooled a long age in the deep-delved earth' এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস হাঁটে আর মড়ক পায়ের তলে ঝুমঝুমি বাজায়'—এই ধরনের উক্তি কি গবেষণাগারে পরীক্ষার্থী? গবেষণাগার-নিরপেক্ষ ভাবেই বুঝতে হবে বুদ্ধদেব বসু-র এই রচনা : 'তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ; অনেক চাঁদ, আরো অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জ্বলন্ত আগুনের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ, জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্র মধুর উন্মাদনা।'

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আর প্রাণ আমার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ' ['রাত্রি']। অথবা জীবনানন্দের এই পঙ্ক্তি : 'হয়তো হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়'। কিছু পঙ্ক্তি এর ওর শুনিয়ে দিলাম আপনাদের; এই কথাটাই বোঝাতে যে কবিতার জন্ম হয়নি বীক্ষণাগারে, হয়েছে স্বজ্ঞালোকে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে 'Intution' দার্শনিক ক্রোচে বলেছিলেন, ঐ স্বজ্ঞা-ই কবিতা—স্বজ্ঞা ও প্রকাশ অভিন্ন, 'To every intuition there is expression, there is no expression without intuition.' স্বজ্ঞা বলতে ক্রোচে বুঝিয়েছেন সেই একদৃষ্টিপ্রসূত অখণ্ড উদ্ভাসকে যা Sensation, Perception ও Association তথা logical knowledge থেকে পৃথক। Logical knowledge বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনিবার্য। সামাজিক অনৌচিত্যের প্রশ্ন নয়, রসৌচিত্যই শিল্প-সাহিত্যে মুখ্য বিবেচ্য। যদিও কিছু সামাজিক ঔচিত্যবোধ শিল্পীর কাছ থেকেও কাম্য, কারণ শিল্প সামাজিকের জন্য সামাজিকদেরই সৃষ্টি। শিল্পীকে বলা হয় বক্রৌচিত্য ও রসৌচিত্য রক্ষা করতে। বুদ্ধদেব বসু'র 'হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে' পঙ্ক্তিটিতো সংবাদ নয়, এতো কাব্যিক Message। কবিতাই নয় শুধু, গদ্যও বহন করে সেই Message—জাঁপল সার্ত্রের ঘোষণা ছিল তাই। যিনি Message বহন করে নিয়ে গেলেন authority কি তাঁর! না। যিনি সেই Message-কে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে নেন সেই Reader তথা সহৃদয় সামাজিকই শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেন Author। আসলে ঐ Resonance বা ধ্বননক্রিয়া যাঁর মধ্যে যতটা হল তার বাইরে কাব্য-সাহিত্যের মূল্য কোথায়? পূর্ব মহাদেশের কবিরা কাব্য-পাঠক ও তাঁর রসানুভূতির উপর যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন আজ থেকে সহস্রাব্দ আগে; পশ্চিমের রলা বার্ত বিশ শতকে তাকে স্বীকৃতি জানালেন এই ভাষায়—'the birth of the reader must be at the cost of the death of Author.' 'সহৃদয় সামাজিক'কে গৌরব দান করতে পশ্চিম মহাদেশের কেটেছে বহুকাল, তবে পাঠকের 'মন' [যা চেতন-প্রাক্চেতন-অবচেতন-অচেতন স্তরে বিভক্ত] যে শেষ কথা বলে তা না জানলে প্রাচীন গ্রীসে পাঠকেরই Pity এবং Fear থেকে জাত 'Catharsis' বা tragic pleasure-এর কথা বলতেন না মনীষী অ্যারিস্টটল। ভীতি ও অনুকম্পার প্রতি মানবিক আকর্ষণ দুর্জ্ঞেয় কারণেই অবোধ্য। ভয় পেতে চায় কে? কে বা চায় অনুকম্পনার যাতনার শিকার হতে? তবু বারবার পড়ি দেস্দিমোনা হত্যার দৃশ্য, পায়ে পায়ে

জড়িয়ে যায় শুধু সাপ এই অনুভূতিতে আনন্দ-মিশ্রিত শিহরণে আপ্লুত হই 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' পড়তে গিয়ে, আর আলব্যের ক্যামু-র 'The Plague' পড়ার সময় দেখি পথে অজস্র মৃত ইঁদুর! হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চায় বা কে? তবু মানবসৃষ্ট সাহিত্যে জীবন-মৃত্যুর মিতালি। পশ্চিমের Naturist-রাও কি বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তি সঞ্চার করে দিতে পেরেছিলেন সাহিত্যে? দিয়ে থাকতে পারলে তাতো সাহিত্য না হয়ে Pathology-তে পরিণত হয়েছে। বালজাক সম্পর্কে এমিল জোলা তাঁর একটি প্রবন্ধে [The Experimental Novel] লিখেছিলেন : 'Balzac does not restrict himself to being a photographer of facts gathered by himself, but he intervenes directly to place his character in conditions over which he maintains control'. বৈজ্ঞানিকের কাজ Experiment করা; তিনি ভাবেন না 'Why of things' নিয়ে, তাঁর জিজ্ঞাসা 'how'; 'কেন' নয়, 'কীভাবে'—বৈজ্ঞানিকের প্রশ্ন সেটাই। তারপর স্তরে স্তরে 'He must see, understand, invent.' বৈজ্ঞানিক একজন Inventor। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে Intervene করতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 'এক'-কে অন্য কিছু বানানোর প্রয়োজন ছাড়া তাঁর সৃষ্টি ও গ্রহীতার মাঝখানে Intervene করতে পারেন না। জ্ঞানজগতে 'জ্ঞাপন'ই মূল কথা। ভাবজগতের কথা 'জ্ঞাপন' নয়, সুপ্ত অনুভূতিকে উদ্দীপিত করা। মহাবিশ্বের বিচিত্র তরঙ্গোৎক্ষেপের স্বরূপ নির্ণয় যদি করেন বিজ্ঞানী, তাহলে মানবচিত্তজগতে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেন সাহিত্যিক। তিনি তাঁর 'ভাবাকাশে' খণ্ডাংশকে রূপ দেন 'বিশ্বাকাশে' এবং স্বাভিমানে দাবি করেন, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে'। সাহিত্যিক রচয়িতার মর্যাদা দাবি করেন। বিজ্ঞানী নির্মাতা মাত্র। সর্বগ্রাসী সাহিত্যিক সৃষ্টির মধ্যে 'নির্মাণ'-কেও দেন যোগ করে আর 'নির্মিতি' তো তাঁর আপন সম্পদ। 'নির্মাণ' হল তা-ই যা অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা যায়, আর 'নির্মিতি'তে থাকে আত্মোৎসর্জন নামক একটি ব্যাপার। সেই কারণেই প্রয়োজনের দায় মেটাতে মেটাতে বিজ্ঞানী আপন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেন। তা-ই পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা, ভূ-বিদ্যা ছাড়াও মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞানও বিজ্ঞানবিশ্বের নাগরিক। আপাতদৃষ্টিতে আমরা বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় ভিন্নত্ব দেখি না ,অথচ প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞানের শাখাগুলি কি ধনবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বারা স্পৃষ্ট নয়? Mass এবং Minority—এই স্পষ্ট বিভাজন রেখায় সমাজের ধনসম্পদ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে যাবে অথচ তার কোনো প্রভাবই পড়বে না বিজ্ঞানে? রাষ্ট্রব্যবস্থার হস্তক্ষেপে কবি-কথিত বিদ্রোহী অণু-পরমাণু পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হয়। ঐ অস্ত্র নির্মাণে যে-বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রযুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্র তাতে নিরপেক্ষ থাকে নি। বৈনাশিক Global warming-এর জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, দায়ী বিজ্ঞানকে যাঁরা ব্যবহার করছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যের পাঠক জানেন জাপানীদের বোমাবর্ষণে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি। 'প্রশ্ন' কবিতায় মহাকাশে লক্ষ্য করেছিলেন 'সঞ্চয়ে ও অপচয়ে হানাহানি যেন', তাঁর বিহ্বল প্রশ্ন 'কিন্তু কেন?' অনেক অল্প বয়েস থেকেই মহাকাশবিজ্ঞান আকৃষ্ট করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। 'প্রভাতসংগীত'-এর 'মহাস্বপ্ন' কবিতা হিসেবে দুর্বল। কিন্তু বিজ্ঞান-পাঠ না থাকলে লিখতেন না 'পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহতারাগণ/ ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে একেকটি বিশ্বের মতন।' 'সোনারতরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতায় অভিব্যক্তিবাদের গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান মেলে, যা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল উত্তরকালে 'বলাকা'য়। নৈবেদ্য' কাব্যের ৮০ সংখ্যক কবিতায় অণুপরমাণুদের ভৌতরাসায়নিক চাঞ্চল্যের কথা মনে পড়ে না কি? 'নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি/পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি/ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ডসম/যুগে যুগান্তরে—চিত্ত-বাতায়ন মম/সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন/রাখিব উন্মুখ করি, হে অন্তবিহীন।' 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতায়

কে সে, যাঁর কথা রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে, উদ্‌বোধিনী বাণী—/সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্যরাজে, জানি, তারে জানি'। 'বিদ্রোহী পরমাণু'র কল্পনা পেয়েছি 'নৃত্য' নামাঙ্কিত কবিতায়: 'নৃত্যের বশে, সুন্দর হল/বিদ্রোহী পরমাণু;/পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে/বাজিল চন্দ্র-ভানু।' বয়সের ভারে ক্লান্ত দেহের গভীরে জাগ্রত সুস্থিত মন ধীরে বলে ফেলে একদিন : 'সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে-নিভৃতে নক্ষত্রসভায়/নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়/যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি/অনন্তের পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।' ভুললে চলে না আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের কথা, যে-সাক্ষাতের মুহূর্তটি দক্ষ ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে কত কৌশলে আটক করেছিলেন কবি অমিয়চন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের পর বিজ্ঞানকে কাব্য-বিষয়ে পরিণত করেছেন হয়ত অনেকেই, কিন্তু একালে বিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষণ পেয়েছি এবং বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রভাব সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয় যাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি তিনি জীবনানন্দ দাশ। ওঁর লেখায় পড়েছি 'ডানে বায়ে ওপরে নীচে সময়ের/জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।/শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের/ডানার উড্ডীন কলরোল;/আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।' 'জ্বলন্ত তিমির', 'শ্বেতপক্ষী সূর্য', 'আগুনের মহানপরিধি'...এই ধরনের Thermal imagery পেয়েছি তাঁর 'সময়ের তীরে' কবিতায়। অন্য দুটি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি; 'চারিদিকে রৌদ্রের ভিতর রয়ে গেছে নির্মল জলের অনুভূতি :/জল আকাশ ও আগুনের থেকে এই সব রাত্রির জন্ম দেয়' পড়ে বিজ্ঞান-পাঠক কাব্যরসিককে বলেতে শুনেছি এতো Thermodynamics-এর আত্তীকৃত দ্বিতীয় সূত্র, যেখানে বলা হয়েছে 'Conversion of heat into work essentially required a hot body and cold body simultaneously'. 'কবিতার কথা'য় গদ্যে লিখছেন জীবনানন্দ : 'মহাবিশ্বলোকের ঈশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।' অন্যত্র বলছেন, 'বিজ্ঞানের প্রকর্ষের দিনে আজকের কবি বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করে কবিতা সৃষ্টি করবার কোনো আবেদন অনুভব করছেন না'; অথবা 'কোয়ান্টাম থিওরি, সময়-দেশের আপেক্ষিকতা, দেশকালের সীমা প্রসৃতি, বিচূর্ণ পরমাণুর আশ্চর্য উত্তেজ, ধনতান্ত্রিক সুনিয়ম ও সুকৃতির উপর সৎসমাজের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রবর্তনার পক্ষেই মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা—কোনো আদর্শ-আবেগের পক্ষে নয়; আমাদের পরবর্তী যুগ এসে সত্যকে খতিয়ে দেখবে আর একবার।'

সাহিত্যকে প্রভাবিত করে এসেছে যতটা পদার্থবিদ্যা তার চেয়ে প্রকটতর ভাবে করেছে নীল আকাশের নক্ষত্র আর মাটির পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। প্রাক-শিল্পায়নকালের সমাজ ছিল, ড্যানিয়েল বেলের ভাষায় 'extractive', তখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে পেয়েছিলাম মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য ও বিচিত্র প্রেমকাব্য। ক্রমে এল শিল্পবিকাশের কাল, সহজসাধ্য হল উৎপাদন ব্যবস্থা, আমাদের সাহিত্যের সেই পর্ব চিহ্নিত হল নবজাগরণের কাল নামে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি নবজাগণের মুহূর্তকে প্রলম্বিত করে চলেছে যখন, তখন আমাদের প্রতীক্ষা সংবাদপ্রযুক্তি এবং বৃহত্তর ভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য। এ পর্যন্ত অর্থনীতি ছিল 'economics of goods', এখন আসছে 'economics of information'. Service Sector-এর নিরন্তর বিকাশের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যায় আগ্রহ, অধিক সংবাদ সংগ্রহের ঝোঁক, নারীদের কর্মে নিযুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, তত্ত্বসর্বস্ব জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে এবং স্বাভাবিকভাবেই। সাহিত্য পারছে না ঘটনা বা চরিত্রকে প্রাচীন মূল্যবোধের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে রুদ্ধ করতে। সমস্যার প্রেক্ষাবদল, অর্থনৈতিক সুযোগলাভের ভিন্নত্ব পৃথিবীর ইতিহাস, অর্থনীতি, মানবিক সম্পর্কের বদল ঘটাবেই। রবার্টসন যিনি সংকর শব্দ Globalization কথাটা

তৈরি করেছিলেন তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, 'not how the local and the global, but also the economic and the cultural, are highly interdependent.' পশ্চিমের সাহিত্যিকেরা লিখে চলেছেন সেই সমাজ ও যুগের কথা যাকে চিহ্নিত করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা নানা নামে— risk society, global age, information society, communicative era, Post-industrial Hypermodernity, Post-modernity এবং Mental homelessness-এর কাল বলে। এ যুগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও অর্থনীতির বিশ্বে চিহ্নিত হচ্ছে—'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন'-এর কাল বলে। সাহিত্যে বিজ্ঞান এসেছিল একদা বস্তুবিশ্বের সমস্যা পর্যালোচনার প্রয়োজনে। এখন সমাজবিজ্ঞান দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আগ্রাসী চেহারার ভয়াবহতার দিকে। বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব এ সমাজে 'A' মার্কা ভিডিওর যৌন আবেদনে, সহজে অজস্র অর্থ-উপার্জনের চেষ্টায় ও তীব্র ভোগবাদের মর্মাঘাতী প্রহারে আর্ত হয়েছে Mass আর সুখের নিবিড় নীলিমায় উড্ডীন Minority. এই সংকট লগ্নে 'সাহিত্য' কি Mass-এর কাছে মাননীয়তা হারাবে? বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য Minority-ই কি কণ্ঠরোধ করে দেবে সাহিত্যের? জীবনরসের পেয়ালা হলাহলে পূর্ণ হওয়ার আতঙ্কে তাই কবি আল মামুদ লিখলেন :

গ্লোবের পেটে কান লাগিয়ে খোকন, শোনে কান্না
বিশ্বগোলক ফুঁপিয়ে ওঠে, আর পারি না, আর না।
মানুষ নামের বিজ্ঞানীরা আমায় নিয়ে খেলছে
আমার সাগর পাহাড় নদী রোলার দিয়ে বেলছে।
ক্লোরোফিলের সবুজ ভরা ছিল আমার গাত্র
সাগর ভরা ছিল আমার লবণ জলের পাত্র।
সব বিষিয়ে দিচ্ছে মানুষ, ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধ
কলের বিষে তলিয়ে গেছে গোলাপ ফুলের গন্ধ।
শস্য ছিল, শ্যামল ছিল, ছিল সুখের পার্বণ
শান্তিটাকে পুড়িয়ে মানুষ করলো কালো কার্বন।
পক্ষী কাঁদে, পুষ্প কাঁদে, রসায়নের রান্না
বন্ধ করো, বন্ধ করো, আর পারি না, আর না।

উপসংহার : ২৯ বছর বয়স থেকে টানা ১৭ বছর যাঁর সাহচর্য পেয়েছি এবং প্রয়াত রবীন্দ্র গুপ্তের রবীন্দ্রভারতীতে আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত যিনি নির্মল অভিভাবকত্ব দিয়েছেন, শত বেদনার স্মৃতি নিয়েও সেই ক্ষেত্রদা'কে জানাই জ্ঞানের বিশ্বে পথপ্রদর্শকের প্রাপ্য গভীর শ্রদ্ধা। অগ্রজের প্রেরণা ও শাসন পেয়েছি ধীরেন্দ্র দেবনাথ ও ক্ষেত্র গুপ্তের কাছ থেকে। প্রথম জন চলে গেছেন অনেক দিন আগেই। নতুন ভাবনার দক্ষতা নিয়ে ক্ষেত্রদা আরও কয়েকটি বসন্তের সাথী থাকুন। তরুণের মন নিয়ে এই প্রবীণ দীর্ঘায়ু হোন। জাগ্রত মনের ক্ষেত্রদা কদাপি গুপ্ত বা সুপ্ত ছিলেন না।

❒

তখন বাঙালি

• • • • • • •

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

এককালে বাঙালিরা পক্ষীতুল্য গণ্য হত। সেই সময়টা শেষ বৈদিক যুগ। ঐতরেয় আরণ্যক-এর সেই বিখ্যাত পংক্তি 'বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ'। বগধ ও দক্ষিণ ভারতের চের জনজাতির সঙ্গে 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় পূর্ব উপকূলের এই মানুষেরা বৈদিক আচার আচরণে তখনও অভ্যস্ত হয়নি। 'বয়ঃ' শব্দটির এক অর্থ পাখি। বাঙালিরা পক্ষীগোত্রীয় উড়ুক্কুপ্রাণী নাকি তাদের কুলচিহ্ন বা টোটেম ছিল পাখি এবিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যায়নি এখনও। তবে উত্তর বৈদিক এই 'বঙ্গ' শব্দটি দেশবাচক নয় বরং জাতিবাচক তার ইঙ্গিত রয়েছে 'পাদাঃ' শব্দটিতে। পাদ শব্দটি যে শ্রদ্ধাবাচক তার প্রমাণ রয়েছে মহাভারতের [১৩.১৭.১২৪] এই শ্লোকাংশে—'ন্যায়নির্বাপণঃ পাদঃ পণ্ডিতো হ্যচলোপমঃ।' ন্যায় বিশারদ এবং পণ্ডিত অর্থে 'পাদ' শব্দটির প্রয়োগ তাই মহাভারতের কালেও প্রচলিত ছিল। বাঙালি পণ্ডিতদের অনেকেই ঐতরেয় আরণ্যক-এর ওই পংক্তিতে বাঙালি জাতির প্রতি বৈদিক মানুষদের তাচ্ছিল্যের বিষয়টি লক্ষ করেছেন। কিন্তু পাদ শব্দটির যে-অর্থ জ্ঞানবান মানুষকে বোঝায় সেটি বিবেচনা করলে তো 'বঙ্গ'দের প্রতি কোনও অবজ্ঞা প্রকাশের চেষ্টা দেখি নে। চর্যাপদের পদকর্তারা তো সবাই সিদ্ধাচার্য। তাদের নামের অন্তেও তো সেই জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবাচী শব্দ 'পাদ' যা এক honorific title। এবার ঐতরেয় আরণ্যক-এর বাক্যাংশের ইঙ্গিতটি থেকে প্রতীয়মান বঙ্গ, বগধ এবং চের এই তিন জনজাতির কুলচিহ্ন পাখি এবং তারা সম্ভ্রমের যোগ্য।

এবার দেখা যাক, দেশবাচক এবং জাতিবাচক 'বঙ্গ' শব্দটির ব্যবহার কবে থেকে শুরু। সাহিত্য এবং অভিলেখ থেকে তার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

মহাভারতে ভীমের অভিযান প্রসঙ্গে 'বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ' বাক্যাংশ প্রমাণ করে শব্দটি দেশবাচক, যার ভৌগোলিক অস্তিত্ব সম্ভবত লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমে। কামসূত্রের যশোধর কৃত টীকা অনুসারে 'বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্বেণ' অর্থাৎ অঞ্চলটি ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে' উল্লেখ থেকে মনে হয় বিক্রমপুর ও তৎসংলগ্ন ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব উপকূলের ভূখণ্ডই বঙ্গ। ওদিকে শক্তিসঙ্গমতন্ত্র অনুসারে সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।'

প্রাচীন সাহিত্যে ও শিলালিপি-তাম্রশাসনে বঙ্গ ছাড়াও 'বঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে সম্ভবত একাদশ শতাব্দী থেকে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই লিপি এবং চেদিরাজ কর্ণদেবের গোহরবা লিপিতে 'বঙ্গাল' শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। কলচুরি বংশের রাজা বিজ্জলের অবলূর লিপিতে বঙ্গ এবং বঙ্গাল দুটি শব্দকেই ভূমিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। 'অভিধানচিন্তামণি'র লেখক জৈন হেমচন্দ্র লিখেছেন 'বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ।' অনেকে প্রথম

শব্দটিকে দেশ অর্থে ধরলেও আমাদের মনে হয় হরিকেলবাসী এবং বঙ্গা [জাতিঅর্থে] মনুষ্যপদবাচী শব্দ। যেমন রঘুবংশ-এ কালিদাস লিখেছিলেন, রাজা রঘু নৌকা নির্মাণে পারঙ্গম বঙ্গদের উৎখাত করেন—'বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতো হন্তরেষু সঃ।।'

ভূমিবাচক আরও কয়েকটি সঙ্কীর্ণ অর্থের বঙ্গ-এর খবর পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে। বৃহৎসংহিতা এবং দিগ্বিজয় প্রকাশ [১৬শ ১৭শ শতক] গ্রন্থে 'উপবঙ্গ' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুক্তাঃ' 'মনোরথপুরনি' এবং অপাদান পালি গ্রন্থে 'বঙ্গান্তপুত্ত' এবং 'বঙ্গীশ', 'প্রবঙ্গ' জনপদ কিংবা দক্ষিণবঙ্গের মতো 'অনুত্তর বঙ্গ'-এর উল্লেখ রয়েছে।

বঙ্গ-প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এ-প্রবন্ধে নেই। তবে একথা বলতে হয় যে বঙ্গ শব্দটি ভূমি এবং জাতি দুই অর্থ বোঝাতেই সেকালে ব্যবহার করেছেন লেখকেরা। বলতে ভুলে গিয়েছি বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি মহাস্থান ফলকে 'সম্বঙ্গীয়' শব্দটি এ অঞ্চলের আদি জনজাতির পরিচয় বহন করছে। শিলালেখে শুধু বঙ্গীয় না বলে 'সম্-বঙ্গীয়' উল্লেখিত হয়েছে বঙ্গনামের একদল সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে। মনে রাখতে হবে মৌর্যযুগের শেষ পর্বে কেন্দ্রীয় কোষাগার এবং কোষ্ঠাগার থেকে কিছু মুদ্রা [গণ্ডক ও কাকনীক] এবং তিল, সর্ষে ও ধান পাঠানোর কথা বলা হয়েছিলো সম্বঙ্গীয়দের কাছে দুর্ভিক্ষের দাদন হিসেবে।

তাই ঐতরেয় আরণ্যক এবং মহাস্থানলিপির তথ্য প্রমাণে সিদ্ধান্ত করা যায় বাঙালি একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিল হাজার তিনেক বছর আগেই!

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য আর একটি 'বাঙ্গালির ইতিহাস' রচনা নয় বরং কিছু নূতন তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালি চরিতনামার সংক্ষিপ্ত সংকলন বানানো। ঘরকুনো বলে আখ্যাত সেকালের বাঙালি দেশ বিদেশে গিয়ে কী কীর্তিকলাপ রেখেছে, কিংবা অন্যায় দেখে কেমনভাবে প্রতিবাদ করেছে, সেকালের লেখকদের চোখে বাঙালি মেয়েদের চেহারা চরিত্র কিরকম ধরা দিয়েছে তারই চূর্ণ-ইতিহাস বলি এবার।

সেকালেও ঘরকুনো ছিল না বাঙালি। একালে তাকে যতই নিন্দামন্দ করুন কুয়োর ব্যাঙ বলে। ঠাটে বাটে চলনে বলনে বাঙালি সেকালেও স্বতন্ত্র। কাশ্মীরের দশম শতাব্দীর কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দেশোপদেশ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী যেত তাঁর দেশে পড়াশুনো করতে। ময়ূরপঙ্খী জুতো মচ মচ করে হেলে দুলে পথ চলত তারা। পোশাকের জমক দেখে ভিখিরিরা খোসামোদ করে গান গাইত। ছড়া বাঁধত। একটু অবশ্য অহমিকা ছিল এদের। রেগে গেলে বন্ধুর পেট ফাঁসিয়ে দিতেও কসুর করত না তারা। এ-স্বভাব কোন্ দেশে বা নেই!

সেই কাশ্মীর-ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'র লেখক কল্হন শুনিয়েছিলেন বাঙালি যুবকদের এক প্রতিবাদ-কাহিনী। কাশ্মীররাজ লালিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গৌড়নৃপতি গিয়েছিলেন তাঁর দেশে। গৌড়রাজের দুঃসময় চলছিল তখন। কিন্তু আশ্রয় দিয়েও তাঁকে হত্যা করা হয় শুনে রাজার অনুগত যুবজন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রাজ পরিবারের গৃহবিগ্রহ পরিহাসকেশবের মন্দিরে চড়াও হয়ে মূর্তি ভাঙতে যায়। কিন্তু ভুল বশতঃ তারা খণ্ড-বিখণ্ড করে রামস্বামীর মূর্তি। শেষে অবশ্য ধরা পড়ে যায় রাজার সৈন্যের হাতে। ফলে গর্দান কাটা যায় ওদের। তবে সেদিনের বাঙালির এই রুদ্র রূপ দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়েছিল কাশ্মীরবাসী।

তবু এই বাঙালিই খাজুরাহের রাজা যশোবর্মনের শিলালিপিতে যশের অধিকারী হয়েছিল হাজার বছর আগে। শিলাপ্রশস্তির কবি ছিলেন মাধব মধ্যদেশের লোক। আর প্রশস্তিটি অক্ষরে

খোদাই করে রেখেছেন গৌড়ের লিপিকর জন্ধ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর দখল, হাতের সুচারু কাজ অন্তরের নিষ্ঠা সব মিলিয়ে এক অভিনব মাত্রা দিয়েছে তার এই পাথর খোদাই করা কাজটি। বলতে ভুলে গিয়েছি, এই পাথুরে প্রমাণটি ৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের।

প্রায় সেই সময়েই মধ্যভারতের ধারাতে রাজত্ব করতেন কবি ও অলংকারশাস্ত্রের লেখক রাজা ভোজ। গৌড়ের ভট্টকোশল গ্রাম থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছোলেন এক বাঙালি কবি। নাম লক্ষ্মীধর। ইতিহাসবিদেরা বলেন, ভোজের রাজত্বকাল ১০১০ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ। বৈকুণ্ঠ ভট্টের ছেলে লক্ষ্মীধর শেষ পর্যন্ত সভাকবি হয়েছিলেন ভোজ দরবারে। তাঁর লেখা 'চক্রপাণিবিজয়' সেকালে মহাকাব্য হিসেবে প্রশংসাও পেয়েছিল প্রচুর। স্বদেশ থেকে বহু দূরে গিয়েও এই কবি ভোলেন নি বাংলার বধূদের লাজুক মিষ্টি স্বভাবের কথা। তাঁর লেখা এক চূর্ণপদাবলী পড়লে চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাজার বছর আগে একদল কুলের বউ পথ চলছে অলস মন্থর গতিতে। চোখের দৃষ্টি পায়ের দিকে। চলতে চলতে কথা বলছে। তাও পরিমিত। টুকরো টুকরো কথায় যেন মধু ঝরে পড়ছে। মূল শ্লোকটি তুলে দিলাম—

তং সহজরূঢ়লজ্জানতম্
গতং চ পরিমন্থরম্!
চরণকোটিলগ্নে দৃশো
বচঃ পরিমিতং চ।
যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং নিজম্
তদীয়মঙ্গনা বদতি
নূনমুচ্চৈঃ কুলম্।।

কূল ছেড়ে অকূলেও ভেসে পড়েছে বাঙালি সেই গুপ্তযুগে। এখবর দিচ্ছে মালয়েশিয়ায় আবিষ্কৃত এক শিলালিপি। ভারতীয় জাদুঘরের এই শিলাফলকটি দেখে কেন জানিনা জীবনানন্দ দাশের কবিতার কয়েকটুকরো অনুষঙ্গ মনে পড়ে। 'সিংহল সমুদ্র থেকে'—'মালয় সাগরে', 'অতিদূর সমুদ্রের পর' ইত্যাদি। এই ছুট শব্দগুলো জুড়ে তৈরি হয় একটা ছবি। মনে করুন মুর্শিদাবাদের এক গ্রাম। সেই গ্রাম থেকে গঙ্গানদী পেরিয়ে সাগরে। তারপর সিংহল ছুঁয়ে অতিদূর সমুদ্রে পৌঁছেছে নাবিক। জাহাজির নাম বুদ্ধগুপ্ত। নিবাস রক্তমৃত্তিকা। আজকের রাঙামাটি! সময় খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী। মালয়েশিয়ার ওয়েলেসলি থেকে পাওয়া সেই নাবিকেরই রেখে আসা স্মরণচিহ্ন একখানা শ্লেট পাথর। তার গায়ে বৌদ্ধস্তূপের ছবি খোদাই করে আঁকা। তাতে লেখা ছিল 'মহানাবিকস্য বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকাবাসিকস্য দানম্'। সেই গুপ্তযুগ। অনেকটা সেইকালেই 'রঘুবংশ' কাব্যে কালিদাস বলেছিলেন 'নৌসাধনোদ্যতান্ বঙ্গান্' সাগরবিলাসী বঙ্গবাসীর কথা।

ধরা যাক ঠিক হাজার বছর আগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বা ম্যান অব দ্য মিলেনিয়ামকে নির্বাচন করবেন দু'হাজার খ্রিস্টাব্দে বসে। কার নাম মনে পড়বে আপনার? পারছেন না তো। আমি বলে দিই সেই নাম যাঁকে স্মরণ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—'বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর/জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে....' হ্যাঁ তিনিই অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপংকর। আজকের বাংলাদেশের বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামেই ছিল তাঁর বাস্তুভিটে। ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। প্রথম জীবনে তন্ত্রদীক্ষা। তারপর বৌদ্ধভিক্ষু হয়ে নালন্দা মহাবিহারের আচার্য। পড়াশোনা করতে করতে ঘুরলেন ভারতের বিহারে বিহারে। তারপর জাভায়। সেই তিনি গিরিকান্তার পেরিয়ে নেপালে। অবশেষে চড়াই উৎরাই ভেঙে তিব্বতে। সেখানে ধর্মকে সংশোধন করে গড়ে দিলেন কদম্‌পা বৌদ্ধ সম্প্রদায় যার উত্তরাধিকার বয়ে চলেছেন দলাই লামারা। সেযুগে

এমন বাঙালি বলুন কে আছেন?

এদিকে শৈব ধর্মের প্রচারে প্রসারে চোল রাজাদের আমলে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন গৌড় দেশের বেশ কয়েজন শৈবাচার্য। এঁরা কেউ ভট্টাচার্য কেউ বা গাঙ্গোলি। কী আশ্চর্য সেই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিদম্বরম-এর নটরাজ মন্দিরে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চল থেকে গাঙ্গোলি ঈশ্বরশিব গিয়ে দান করছেন দেবতার উদ্দেশে একটি ফুলের বাগান! আর পল্লববংশীয় রাজা কোপ্পেরুচিঙ্গা তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করছেন ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে উৎসর্গ করা এক অভিলেখে। গাঙ্গোলি ঈশ্বরশিব ছিলেন চোলরাজাদের ধর্মগুরু। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ এবং তৃতীয় রাজরাজ-এর আমলে ত্রিভুবন এবং অচ্যুতমঙ্গল শিবমন্দির স্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। অনেকে মনে করেন রাজা কোপ্পেরুচিঙ্গা যখন চিদম্বরম মন্দিরের পুবদিকের গোপুরম্ সংস্কারে ব্রতী হন তখন গাঙ্গোলি ঈশ্বরশিব তাঁকে উপদেশ-নির্দেশ দিতেন। এর আগে গৌড়দেশ থেকে রাজগুরু হয়ে চিদম্বরম মন্দিরে নটরাজের পূজারী রূপে এসেছেন শ্রীকণ্ঠ শিব [১১২৫ খ্রিস্টাব্দে] ধ্যানশিব [সম্ভবত ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে] এবং উমাপতিদেবের জ্ঞানশিব [১১৭২ খ্রিস্টাব্দ]। গাঙ্গোলি ঈশ্বরশিব ছাড়াও চিদম্বরম মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় আর এক বাঙালি ধর্মগুরু ভট্টাচার্যর নাম। এই মন্দির পুরোহিত এতটাই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে রাজা বিক্রম চোলের সেনাপতি নরলোকবীর তাঁর একটি ধাতুমূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেন মন্দিরে দান হিসেবে। [ভট্টাচার্য ইতি শ্রুতাং ভুবি শিবাং মূর্তিং শুভাং যো বহন্..... তাং মূর্তিং বিনিবেদ লোকপরমানন্দ প্রদাং পাবনীম্]।

ভাবতে ভাল লাগে দক্ষিণ ভারতের এক বিখ্যাত মন্দিরে আজ থেকে হাজার বছর আগে গৌড়দেশ থেকে গাঙ্গুলি কিংবা ভট্টাচার্য পদবীধারী রাজগুরু বিশেষ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। সেকালে তামিলদেশে গৌড়ের সঙ্গীতও গাওয়া হত মন্দিরে মন্দিরে এমনকি দ্রাবিড় ভাষার গীত শোনা যেত এর পরে। এদেশের প্রাচীনতম আগম গ্রন্থ 'কামিকাগাম'-তে উল্লেখ করা হয়েছে নিত্য পূজার সময় গীত হত ' গৌড়ভাষাঙ্গম্ গানম্'! [তদূর্দ্ধং গৌড়ভাষাঙ্গম্ গানং ধূপান্তম্ আচরেৎ। ঊর্দ্ধং দ্রাবিড় ভাষাঢ্যং গানং নৃত্ত যুতং তুবা'।।]

তাই বলি, আজকের বাঙালিকে আর গৃহবলিভুক পাখির সঙ্গে তুলনা করবেন না। বাঙালি তো বেরিয়ে পড়েছে বর্হিবিশ্বে। তার বাঙালিয়ানা বিসর্জন সে দেবে না। সেকালেও সে তো তা করেনি।

এক রাজকুমারীর হাত ধরে পৌঁছে যেতে হবে পালযুগের বাংলায়। রাজকন্যার নাম লক্ষ্মীংকরা। সম্ভোল নগরের আড়াই লাখ প্রজার অধিপতি ইন্দ্রভূতির বোন। ধর্মপ্রাণ ইন্দ্রভূতির ইচ্ছেয় বিদূষী এই মহিলার বিয়ে হল লংকা রাজপুত্র সমোলের সঙ্গে। বিয়ের পর লক্ষ্মীংকরা লংকাপুরীতে এলেন বটে। তবে সেদিন অশুভ নক্ষত্র ছিলো বলে রাজপ্রসাদে তাঁর অভ্যর্থনা হল না। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত লক্ষ্মীংকরা প্রাসাদের বাইরে পালকিতে বসেই দেখতে পেলেন তাঁর স্বামীর নির্দেশে একদল লোক শিকার করে ফিরছে। পশুহত্যা দেখে তিনি বড় দুঃখ পেলেন। ভরা পেটে খাবাবের কথা শুনলে যেমন হয় তেমনি তাঁর মন বিরূপ হয়ে গেল শ্বশুরবাড়ির প্রতি। মনের দুঃখে বনে চলে গেলেন বঙ্গের রাজকন্যা। রাজা লোক পাঠালেন। লক্ষ্মীংকরা ফিরলেন না। নিজের সাধনভজন নিয়েই থাকলেন। ভেক ধরলেন পাগলির যাতে কেউ আর তাঁর কাছে সহজে না ঘেঁষতে পারে। লংকার মানুষের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ান। শ্মশানে মশানে শুয়ে কাটান। সাতটি বছর কেটে গেল। সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন একদিন। রাজার এক ঝাড়ুদার তাঁর সেবা করে। তাকে তিনি প্রথম দীক্ষা দিলেন। তারপর রাজা একদিন লক্ষ্মীংকরার শয়ন গুহায় এসে এক জ্যোতির্ময়ী রূপে তাঁকে দেখতে পেলেন। নিজের ভুল বুঝে দীক্ষা নিলেন বধূ লক্ষ্মীংকরার কাছে। লক্ষ্মীংকরার এই গল্প লেখা আছে তিব্বতী গ্রন্থ চুরাশি সিদ্ধর কাহিনীতে। মূল বইটির নাম-'চতুরশীতি সিদ্ধপ্রবৃত্তি'।

চুরাশিজন সিদ্ধাচার্য পাল-সেন যুগে অর্থাৎ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতে, নেপাল, তিব্বতে বজ্রযান সহজযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এঁদের চারজন মহিলা। মণিভদ্রর দুই বোন মেখলি এবং কংখলা আর মহাসিদ্ধ ইন্দ্রভূতির বোন লক্ষ্মীংকরা। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া সাধনার পথিকৃৎ সরহপাদ এবং লক্ষ্মীংকরা। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনাস্থা দেখিয়ে এঁরা বললেন, দেহই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কায়ার ছায়া। সরহ তাঁর দোহায় লিখলেন : 'সহজে সবাই সমান। সেখানে শূদ্রও নেই ব্রাহ্মণও নেই। এই শরীরেই বয়ে যায় পুণ্যসলিলা গঙ্গা-যমুনা। এখানেই গঙ্গাসাগর, প্রয়াগ বারাণসী। চন্দ্র, সূর্যও এখানেই। ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ ঘুরেছি সব তীর্থেই, তবু দেহের মতো এমন পবিত্র সুখস্থান পাইনি কোথাও।' লক্ষ্মীংকরা এই চিন্তাকে এগিয়ে নিলেন আর এক ধাপ। তিনি বললেন, সত্যকে পেতে হলে কোনও প্রয়োজন নেই উপোসের, আচার-অনুষ্ঠানের। মাটি, কাঠের বা পাথরের দেবতার মূর্তির পায়ে মাথা নোয়ানোরও কোন দরকার থাকে না। দেহকে দেবতার মন্দির ভেবে আত্মমগ্ন হও। এরই নাম সহজযোগ। লক্ষ্মীংকরা তাঁর নিজের সময়কে অতিক্রম করে নারীর অধিকারকে যোগ্য সম্মান দিতে বলেছিলেন, কোন রকমের বিদ্বেষ যেন স্পর্শ করেনা নারীকে, কেন না সে দেবী প্রজ্ঞার শরীরী রূপ।

হাজার বছর আগে এমনই আধুনিক চিন্তার শরিক হয়েছেন বাঙালি লক্ষ্মীংকরা। মধ্যযুগের সেই প্রগতিকামী এবং প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

বাঙালি রমণীর রূপ-রুচি, গান-নাচ প্রীতির উল্লেখ ছড়িয়ে আছে সেকালের গ্রন্থে। কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে লিখেছিলেন বঙ্গের নর্তকী কমলার কথা। রাজা জয়াপীড় কাশ্মীর থেকে একবার পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে আসেন। সেখানে কার্তিক মন্দিরে তিনি নর্তকী কমলার নৃত্য উপভোগ করেন। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতের নৃত্তগীত রীতির পৃষ্ঠপোষক কাশ্মীর নৃপতি বঙ্গনারীর নৃত্যকলায় সেবার অত্যন্ত মুগ্ধ হন। [লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্তিকেয় নিকেতনম্। ভরতানুগমলক্ষ্য নৃত্তগীতাদিশাস্ত্রবিৎ।। ৪২২।।]

বাঙালি বধূর সংগীতরসে মুগ্ধ হবার এক কাহিনী আছে হলায়ুধ মিশ্রের 'সেকশুভোদয়া'তে। রচনাকালবিতর্ক রয়েছে এই গ্রন্থটিকে ঘিরে। ১৬শ শতকের এই গ্রন্থে সেনরাজাদের আমলের কিছু কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। গঙ্গোনটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা একদিন লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় গান করছিলো। এদিকে কুঁয়ো থেকে জল তুলতে গিয়েছিল সন্তান কোলে এক রমণী। সুহই রাগের গীতে তন্ময় হয়ে বধূটি কলসের বদলে ছেলেকে দড়িতে বেঁধে কুঁয়োয় নামিয়ে দিয়েছিল বলে কাহিনীটি বর্ণনা করেছিলেন 'সেকশুভোদয়া'র লেখক। কাকতালীয় এবং কালানুক্রম দোষের হলেও একথা সত্য নবম শতকের পাহাড়পুর বিহারে একটি পোড়ামাটির ফলকে ঠিক এমনই এক দৃশ্য খোদাই করা আছে।

সেকালের বঙ্গললনাদের রূপেও মুগ্ধ ছিলেন কবিকুল। সব প্রদেশের মধ্যে বঙ্গনারীর দন্তরুচিকৌমুদী প্রশংসাযোগ্য সেকথা মধ্যযুগের কোনও কবি লিখেছিলেন—'দন্তে গৌড়াঙ্গনানাম্'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রশংসিত হয়েছে বাঙালি নারীর চূর্ণকুন্তল, কবরীবন্ধন এবং দীর্ঘ বেণীর লীলায়িত বিন্যাস 'গৌড়ীনামলক প্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম্'। সুমিষ্ট ভাষিণী, কোমলাঙ্গী অনুরাগবতী বলে গৌড়ের সুন্দরীদের স্তুতি করেছেন স্বয়ং কামসূত্রের লেখক বাৎস্যায়ন। আগেই বলেছি উচ্চকুলের বঙ্গরমণীর কথা বলেছেন বাঙালী লক্ষ্মীধর যিনি ভোজরাজের সভায় গিয়েছিলেন কবি হিসেবে। লক্ষ্মণ সেনের দুই সভাকবি ধোয়ী এবং উমাপতিধর বঙ্গনারীর চোখের কাজলে লেখা অশ্রুসিক্ত প্রণয়লিপির বর্ণনা দিয়েছেন যথাক্রমে 'পবনদূত' এবং 'সুদুক্তিকর্ণামৃত' কাব্য সংকলনে। [যত্র স্ত্রীণামধররুচকন্যস্ত সিন্দুরমুদ্রম্ তালিপত্রং প্রণয়িনিজনে প্রেমলেখত্বমেতি।।—পবনদূত] উমাপতিধর

লিখেছেন—[ক্বাপি স্বেদকণা নিপাত মসৃণং কুত্রাপিকম্পস্থলৎ পাণিব্যস্তলিপি...]

চর্যাপদের কবিদের মধ্যে ভুসুকুপাদের রচনা নেহাৎ কম নয়। কম করে ন'টি দোহা সৃজনের কৃতিত্ব কবি ভুসু বা ভুসুকুর। তাঁর এই চর্যাগীতিগুলো মল্লারী, পটমঞ্জরী, বরাড়ী, কামোদ, কুহুগুঞ্জরী এবং বঙ্গাল রাগ আশ্রয় করে রচিত। একাদশ শতাব্দীর এই কবি ও গীতিকার জীবনের প্রথম প্রহরে যত্রতত্র খান, ঘুমোন এবং প্রাতঃকৃত্য সারেন। এমন ধারা বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখে সবাই হাসাহাসি করে। বৌদ্ধসংঘ থেকে নির্দেশ আসে সূত্রপাঠ করে শোনাতে। নিরক্ষর ভুসুকুর মাথায় যেন বাজ পড়লো হঠাৎ। সংঘের উপাধ্যায় বললেন, সূত্রপাঠ না করতে পারলে রাজা দেবপালের নির্দেশে তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে রাজ্য থেকে। রাত জেগে 'অ-র-প-চ-ন' মন্ত্র মুখস্থ করতে থাকেন ভুসুকু খুঁটির সঙ্গে নিজেকে শেকলে বেঁধে। কাকভোরে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী দেখা দিয়ে বলেন—তুমি সিদ্ধ হলে আজ। তারপর একদিন ধোকিরি নামে এক নগরে এসে পৌঁছোলেন ভুসুক। রাজবাড়িতে কাজ নিলেন তরোয়ালধারী প্রহরীর। শরৎকালে একদিন উমা দেবীর পূজার আগে অস্ত্রধারী অন্য সঙ্গীদের সামনে বসে তরোয়াল শানাচ্ছেন। সঙ্গীরা দেখলো ভুসুকুর তরবারিটা কাঠের। রাজাকে গিয়ে নালিশ করলো তারা। রাজা ভুসুকুকে ডেকে বললেন, তোমার তরবাবির খাপ খোলো। আমি দেখবো। ভুসুকু বললেন, খুলছি তবে চোখ বন্ধ করতে হবে। সবাই বললো, চোখ বন্ধ করলে দেখবো কী করে। ভুসুকু উত্তর দিলেন, তবে এক চোখ বন্ধ রাখুন। তারপর তরোয়াল বের করতেই জমকালো আলোর দ্যুতি ঠিকরে এলো। আর উপস্থিত সবাইর একটা করে চোখ কানা হয়ে গেল।

ধোকিরি নগর ছেড়ে এবার ভুসুকু এলেন এক পাহাড়ী রাজ্যে। সেখানে থাকতে তার বিরুদ্ধে লোকেরা নালিশ করলো, এই লোকটা রোজ হরিণ মেরে মাংস খায়। শেষ হয়ে যাচ্ছে বন্য প্রাণীর দল। রাজা এলেন সৈন্য সামন্ত পাইক পেয়াদা নিয়ে। ভুসুকু বললেন, হ্যাঁ, আমি হরিণ ধরি বনবাদাড় থেকে। কিন্তু হত্যা তো করি না, বরং পালন করি। এই বলে কুটিরের দরজা খুলে দিলেন। বাড়ির বাগানে দেখা গেল বিচরণ করছে অসংখ্য হরিণ। এই রকম খামখেয়ালী জীবনযাপন করে ভুসুকু ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন একশো বছর জীবন কাটিয়ে।

চর্যাপদের এই কবি ভুসুকুর জীবনচরিত সত্যি বিচিত্র। তার ছটফটে জীবনে বাঁধাধরা কাজ ছিলো কমই। পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে হরিণের মতো ছুটোছুটি করতেন বলেই কী তিনি সেই অনবদ্য পদটি লিখেছিলেন— 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী' ইত্যাদি। মল্লারী রাগে রচিত তাঁর আর একটি পদ স্মরণ করি—

বাজ নাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
আদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।।
অজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলি।।

বজ্রনৌকা বেয়ে পদ্মখালে চলেছি। দেশ লুটে নিচ্ছে এক দঙ্গল মানুষ। আজ তাই ভুসুকুর বাঙালি হওয়া প্রয়োজন।

পণ্ডিতেরা ক্ষমা করবেন। পালরাজাদের শেষ বেলায় সিদ্ধদের আন্দোলন এবং কৈবর্ত বিদ্রোহের উত্তাল সময়ে ভুসুকুর মতো খেয়ালী কবি ডাক দিয়েছিলেন এক নতুন যুগের। নালন্দায় লালিত হয়ে ভুসুকু হয়ত এই বঙ্গে এসেছিলেন পথ চলতে চলতে। ঘর করেছিলেন কোনও বঙ্গরমণীকে নিয়ে তাঁর জাতপাত বিচার না করেই। দেখেছিলেন লুটেরারা দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে কীভাবে বিপর্যস্ত করছে। তাই দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছিলেন আজ ভুসুকুর 'বাঙালি' হওয়া প্রয়োজন। ১৪১৪ বঙ্গাব্দেও বোধহয় সেই একই কালবেলা। নালন্দাবাসী ভুসুকু বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে সেদিন কিন্তু কার্পণ্য করেন নি। আমরা কী করছি?

উল্লেখপঞ্জী

১. Hemchandra Raychaudhuri
বঙ্গ কোন্ দেশ? in Studies in Indian Antiquities Calcutta, 1989.

২. নীহাররঞ্জন রায়
বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, কলকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৩. D R Bhandarkar
Mauryan Brahmi Inscription of Mohasthan in Epigraphia Indica, XXI, Delhi, 1931.

৪. B M Barua
The old Brahmi Inscription of Mohasthan, in Indian Historical Quarterly, 1934

৫. Shyamalkanti Chakravarti
A Descriptive Catalogue of Prakrit and Sanskrit Inscriptions in the Indian - Museum Calcatta. 1977

৬. Paola G. Tinti
On the Brahmi Inscription of Mahasthan in Journal of Bengal Art, Vol. 1, 1996, Dacca

৭. Pandeya Ramtej Shastri
Kalhana's Rajatarangini, Kashi, 1960.

৮. Benoytosh Bhattacharya
A Bengali poet in the court of Bhoja (1010 - 1050 AD)
Select Works of Benoytosh Bhattacharya (ed) Shyamalkanti Chakravarti, Naihati, 1997.

৯. Sunil Chandra Roy
Early History and Culture of Kashmir, New Delhi, 1969

১০. **Khajuraho Inscription of Yasovarman V.S. 1011 (AD 954)**
Epigraphia Indica I, New Delhi.

১১. R Nagaswamy
(a) Eastern Indian contact with Tamilnad Journal of Bengal Art. Vol. 3. 1998
(b) Bengal and Chidambaram. Journal of Bengal Art, Vol. 4, 1999

১২. অলকা চট্টোপাধ্যায়
চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী, কলকাতা, ১৯৮৮.

১৩. প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত
বাচঃ পল্লবয়তি, কলকাতা, ১৯৮৩

১৪. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী ও সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত **বাঙলার লোক সংস্কৃতিতে নারী**, কলকাতা, ১৯৯৯



‘চলাটা আমার নিজের, তাই কিছু স্বাতন্ত্র্য...’

• • • • • •

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

‘একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।’

রবীন্দ্রনাথের ‘গানভঙ্গ’ কবিতায় স্রষ্টা ও রসজ্ঞের গভীর সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আসলে সহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সহৃদয় পাঠক ‘আত্মসংবিৎ’ চর্বণার দ্বারা সাহিত্য-রস আস্বাদন করেন—একথা বলেছেন আমাদের প্রাচ্য অলংকারিকরা। এক্ষেত্রে ‘সহৃদয় সামাজিক’ অর্থাৎ পাঠকের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কারণ, পাঠক ও সমালোচক দুটি স্বতন্ত্র গোত্রভুক্ত নন। তবে পাঠককে অবশ্যই ‘সৎ পাঠক’ হতে হবে। উত্তর-আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্ত্য সমালোচনাতত্ত্ব লেখক-পাঠক ও সমালোচকের সম্পর্কের ভিন্ন মাত্রিক নানা ব্যাখ্যা দিয়েছে—আমরা সে-সব আলোচনায় যাব না। কারণ, আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের সমালোচনার বিশেষ ভঙ্গি বা স্টাইল।

সাহিত্যবিচারের সময় তার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক অর্থাৎ ‘Content’ ও ‘form’—দুটি বিষয়ের উপর-ই গুরুত্ব দান জরুরি। প্রাজ্ঞ সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের রচনায় সমভাবে এই দুটি দিক-ই আলোচিত হয়েছে। ফলে আলোচনা-সমালোচনায় এসেছে কাম্য সম্পূর্ণতা। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকেও তাঁর সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো। একেবারে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত—সর্বত্রই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কাব্য-কবিতা থেকে শুরু করে নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তার প্রসার ও যুক্তির পরিধি বিস্তৃত। ‘প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন’ গ্রন্থে ‘চর্যাগীতি’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’, ‘বৈষ্ণব পদসাহিত্য’, ‘মঙ্গলকাব্য’, ‘ইউসুফ জোলেখা’, ‘লায়লী-মজনু’, ‘লোরচন্দ্রানী’, ‘পদ্মাবতী’র আলোচনার পাশাপাশি রামপ্রসাদের ‘শাক্তপদাবলী’ এবং ‘মৈমনসিংহগীতিকা’র বিস্তারিত বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। এমন কি স্বল্প পরিচিত আজু গোঁসাই-এর কৌতুকরসাত্মক প্যারোডি চুটকি গানের আলোচনাও বাদ পড়ে নি। শেষোক্তটির ক্ষেত্রে ইংরেজি প্যারোডি গানের প্রসঙ্গেরও অবতারণা ঘটিয়েছেন। সেই সঙ্গে আছে রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা।

সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার দুটি দিক আছে। একটি—বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে সমজাতীয় সৃষ্টি বা সমজাতীয় চরিত্রের তুলনামূলক বিচার এবং দ্বিতীয়টি—সম-মানসিকতা সম্পন্ন কবি ও লেখকদের মধ্যে পারস্পরিক অনুভব ও জীবনদৃষ্টির তুলনা ও প্রতি-তুলনা। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত এই উভয় পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ‘লায়লী-মজনু’ কাব্যে বর্ণিত মজনু ও লায়লীর ‘পাঠশালা-প্রেমে’র সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনী বা শরৎচন্দ্রে ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর বাল্য প্রেমের তুলনা। এছাড়া ‘দেবদাস’ ও ‘পল্লীসমাজ’-এর উল্লেখও তিনি করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত : ‘লায়লী-মজনুর ধারাটি আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত বাংলা

প্রেমকে তাড়া করেছে।' ['প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পৃষ্ঠা ২৩৬]। লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির আলোচনায় সমালোচক সম ভাষায় রচিত দুই ভিন্ন যুগের সাহিত্যিকের রচনার তুলনা-প্রসঙ্গ এনেছেন। এই আলোচনা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে যখন 'চর্যাপদ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-এর উল্লেখ পাই—'সীতারাম উপন্যাসে শ্রী ও জয়ন্তী একদা একটি ফুলের পাপড়ি-কেশর ইত্যাদি শতধাচ্ছিন্ন করে সৃষ্টিকর্তার মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম এদের ডাকিনী আখ্যা দিয়েছিলেন; আর ডাকিনী নিঃসংশয়ে কবির থেকে ভিন্ন জাত। চর্যার কবিও নলিনী বনে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু আসলে সে মহাসুখরূপ কমল—তার সঙ্গে পার্থিব পদ্মাদির সম্পর্ক নেই, বরং পার্থিব সব কিছুকেই প্রতিভাস বলে বিসর্জন দিলেই ঐ বোধে প্রবেশ সম্ভব।' চিন্তার মৌলিকতা ও তার দূর-প্রসারী বিস্তার প্রাবন্ধিক-সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের রচনাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

মধ্যযুগের কাব্য-আলোচনাকে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার সমপর্যায়ে নিয়ে আসার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, সে ব্যাপারে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁর পথপ্রদর্শক, একথা 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিংগ্নাসা ও নবমূল্যায়ন'-এর সূচনায় তিনি স্বীকার করেছেন এবং সেই সঙ্গে এও বলেছেন, "...আমি গুরু-নির্দেশিত সেই পথেই চলতে চেয়েছি। তবে চলাটা আমার নিজের, তাই কিছু স্বাতন্ত্র্য পদ্ধতিগতভাবেও সতর্ক পাঠক দেখতে পাবেন।' [পৃঃ ১২]। প্রসঙ্গত, তাঁর 'কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। এখানে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে কালিদাস, দ্বিজমাধব, ভারতচন্দ্র এবং ক্র্যাব ও চসারের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন তিনি। সমকাল ও সমভাষাকে অতিক্রম করে এই সমালোচনা ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন কালে প্রসারিত হয়েছে। আবার, তাঁর 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' গ্রন্থে মধুসূদনের কবি-প্রতিভার সব কটি দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদন দত্তের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় প্রাবন্ধিকের পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্য-সমালাচনায় তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়, যা একান্তভাবে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিপূর্ণ।

Comparative Criticism-এ ক্ষেত্র গুপ্তের আগ্রহ অধিক থাকলেও এর সঙ্গে Structuralism-এর পদ্ধতি নিজের মতো করে প্রয়োগ তাঁর প্রায় প্রতিটি আলোচনার ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। সাহিত্যের আঙ্গিক পর্যালোচনা এবং অবয়ব নিরীক্ষায় আঙ্কিক গণনা ও রেখাচিত্র সহযোগে গাণিতিক বিশ্লেষণ তাঁর সমালোচনা পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এই গাণিতিক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সাবলীল। মূল বক্তব্য বিষয়কে সূত্রাকারে এবং নির্দিষ্ট ছকের সাহায্যে বিন্যস্ত করায় তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ উপস্থাপন কৌশলটি সহজবোধ্যতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি তাঁর একান্ত নিজের বলেই অনেকটা পরীক্ষামূলকভাবে কোনো একটি গল্প বা উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র এবং প্রাসঙ্গিক প্রায় প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন তিনি এবং তার আঙ্কিক হিসাবও দিয়েছেন। যেমন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি এর ভূগোল, লোকজন, প্রকৃতি : বর্ণনা-বিবরণ, রোগ-মহামারী, কেন্দ্রানুগ-কেন্দ্রাতিগ—আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সমাজ-বীক্ষার নানাদিক, রসবৈচিত্র্য—ইত্যাদি আটটি সূত্রে উপন্যাসের চারটি পর্বের আলোচনাকে সংহত করেছেন। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের ঘটনাগত টানাপোড়েন ও হৃদয়গত আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রমটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা মতো। প্রাবন্ধিকের নিজের কথায়—'...অভিমুখিতা বা প্রতিমুখিতা বোঝাতে তীর চিহ্ন ব্যবহার করেছি। গঙ্গামাটিতে প্রণয় সম্পর্কের শূন্যতা বোঝাতে [০] ব্যবহার করেছি। তীরচিহ্নের সংখ্যাবৃদ্ধি আকর্ষণের বা বিকর্ষণের গভীরতা ও তীব্রতা সূচিত করে।

ক। রা ⟶ শ্রী
খ। রা ⟵ শ্রী
গ। রা শ্রী ⟶ ⟶
ঘ। রা ⟶ শ্রী
ঙ। ⟵ রা শ্রী
চ। রা⟵⟶শ্রী⟶
ছ। রা ⟵ শ্রী
জ। রা⟵⟶শ্রী
ঝ। ⟵⟵রা — ০ — শ্রী ⟶ ...' ইত্যাদি।

[বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৩, পৃ. ১২৫]

উদ্ধৃতাংশটি সমালোচকের বুদ্ধির প্রাখর্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ভরপুর এবং তা অত্যন্ত সংহত ভাবে উপস্থাপিত। এই সংহতি ও পরিমিতিবোধ-ই ক্ষেত্র গুপ্তের রচনার বিশেষত্ব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এই জাতীয় আলোচনায় সাহিত্যের সৌরভ ও উপভোগ্যতার অভাব ঘটে। কিন্তু এরই পাশাপাশি তিনি লেখকের ব্যক্তি-মানস, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর বোধ এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন, যার আবেদন অনস্বীকার্য। সমালোচকের নিজের কথায়— 'এই উপন্যাসে [শ্রীকান্ত] সমাজের-জীবনের-প্রকৃতির-মানব চরিত্রের নানারূপ—অজস্র রূপ, যেন ছবির মত ফুটে উঠেছে।' সুতরাং এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ যে সাহিত্য সুরভিত হবে তা বলাই বাহুল্য। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের গঠন তাঁকে আকর্ষণ করেছে। কারণ আঙ্গিকের দিক থেকে তা অভিনব। ক্ষেত্র গুপ্তের ভাষায় তা 'খোলামুঠি রীতি'। তাই উপন্যাসের প্রতিটি পর্বের বিশেষ বিশেষ অংশের গঠনগত দিক থেকে তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছেন।

তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে তথ্যনির্ভর, মননধর্মী, যুক্তিশৃঙ্খল সমন্বিত ও বুদ্ধিদীপ্ত সুবিস্তৃত আলোচনা বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস রচনার পরও এমন একটি গ্রন্থ রচনার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, তা 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস'-এর পাঠক মাত্রই অনুভব করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি শুধু উপন্যাস নয়, সাহিত্যের যে-কোনো প্রজাতির ইতিহাস রচনার একটি বিশিষ্ট রীতির পথপ্রদর্শক। যে নীরস তত্ত্ব আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই জাতীয় রচনার উপভোগ্যতার বাধাস্বরূপ ক্ষেত্র গুপ্তের প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। প্রাবন্ধিকের রসবোধের পরিচয় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণে পরিস্ফুট। যেমন—'পরিণীতা : সরল উন্নত উপভোগ্য'; 'নিষ্কৃতি : ভবানীপুরের স্বপ্নলোক', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'গল্পের পাল তুলে সরলতায়'; 'কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হাস্যের ফুলঝুরি'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, আলোচনার শিরোনামেই উক্ত লেখকদের রচনা-বৈশিষ্ট্য এবং প্রাবন্ধিক-সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের আলোচনার অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পের স্থান পরিচয় পৃথক একটি ছকের মাধ্যমে 'শরৎচন্দ্রের ভূগোল' এই শিরোনামায় লিপিবদ্ধ করে তিনি পাঠক-গবেষককে চমৎকৃত করেছেন।

সাহিত্য-সমালোচনায় ক্ষেত্র গুপ্ত মার্কসপন্থী। সাহিত্যের মূল ভিত্তি যে অর্থনীতি—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী। ইতিহাস চেতনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই বিশ্লেষণরীতি লক্ষণীয়। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত ক্ষেত্র গুপ্তের রচনা বৈশিষ্ট্যের যে-পরিচয় 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' গ্রন্থের ভূমিকায় নির্দেশ করেছেন তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য: '...কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁহার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ছাঁচে ঢালা নয়; তাঁহার প্রত্যয়ের অনুকূল তথ্য যেখানে সহজলভ্য নহে সেখানে তিনি

অনুকূল তথ্যের অনুমানের উপর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। চিন্তার কঠোরতার পরিবর্তে এই স্থিতিস্থাপকতা-গুণ তাঁহার দৌর্বল্যের পরিচায়ক হয় নাই, সত্যনিষ্ঠারই পরিচায়ক হইয়াছে।'

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনায় তিনি আর্থ-সামাজিক পটভূমির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ইতিহাস, সমাজ ও ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের ব্যাখ্যা যে অসম্ভব তা তিনি জানতেন। তবে 'সাহিত্যস্বাদকে ইতিহাস বিচার, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কিংবা ধর্মীয়বোধের প্রতিফলনের সঙ্গে একাকার করে ফেলাও' যে অনুচিত, তা পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাই তাত্ত্বিক সমালোচনার পরিবর্তে বিচার-বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার তিনি পক্ষপাতী। মননধর্মী গদ্য রচনায় তিনি হ্যাজলিট বা চার্লস ল্যাম্বের মতো Impressionistic Critic. আবার, Statistical Method বা গাণিতিক প্রক্রিয়া, রেখাচিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদিকে সমালোচনার ভিত্তি করায় তিনি Vernon Lee, Caroline Spurgeon বা Kaatc Hamburger-এর মতো Syslistic Critic. কিন্তু তিনি নির্বিচারে পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞানের পদ্ধতি নিজ সমালোচনায় গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আলোচনায় জানিয়েছেন—তিনি পাশ্চাত্ত্য শৈলীবিজ্ঞানের কয়েকটি পাখি নিজ সমালোচনার খাঁচায় পুরেছেন, সবগুলি পোরেন নি।

আসলে, সাহিত্য-সমালোচনার কোনো একটি নির্দিষ্ট পথে তিনি বিচরণ করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। সাহিত্যের আলোচনাকে সংহত ও সুস্পষ্ট রূপ দানের জন্য তিনি ছকের ব্যবহার করলেও কোনো সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা পথে সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য শুধু শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজ নয়,—বৃহৎ ছাত্রসমাজও। 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'-এর ভূমিকা অংশে তিনি তা স্বীকার করেছেন। ছক নির্মিতিতেও তিনি পাঠকের কথা-ই বিবেচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থেই এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হলো—''সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে ওঠে অজস্র তথ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু তথ্যের প্রাচুর্যে পাঠক পথ হারিয়ে ফেলতে পারেন।'' তাই এই ছকের অবতারণা। এর দ্বারা ঐতিহাসিক বোধ সঞ্চারেও তিনি প্রয়াসী ছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসের যে-কোনো আলোচনাই তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তাই তার মধ্যে রসগ্রাহিতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশ কম। কিন্তু ক্ষেত্র গুপ্তের গ্রন্থটি সেই অভাব পূরণ করেছে। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনার শেষে 'চুম্বক' অংশটি বিষয় সম্পর্কিত ধারণাকে মুঠোর মধ্যে এনে দেয়। এছাড়া এই গ্রন্থে তাঁর বাংলাদেশের সাহিত্যে আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন।

এই নূতনত্ব সৃষ্টির আগ্রহেই তাঁর জীবনানন্দের চিত্রকল্পের নবমূল্যায়নের প্রয়াস। এর প্রতিটি বিশ্লেষণ পাঠকের ভাবনাকে নাড়া দেয়। তাঁদের সাহিত্যচিন্তায় নবদিগন্ত উন্মোচিত করে। সাহিত্যবিচারে তিনি আধুনিক, প্রথা-বিরোধী না হলেও প্রথা-অতিক্রমী। তাঁর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্পরীতি কিম্বা নাট্যকার মধুসূদনের আলোচনা সাহিত্য-সমালোচনায় নূতন পথের দিশারী। প্রাবন্ধিকের প্রতিটি আলোচনা ও সিদ্ধান্তে আত্মবিশ্বাস এবং ছাপ সুস্পষ্ট। 'কপালকুণ্ডলা এবং প্রকৃতি—আদিতে মধ্যে অন্তে' শীর্ষক প্রবন্ধের [রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৯৩] কিছু অংশ উদ্ধার করছি—'এই উপন্যাসের নাম কপালকুণ্ডলা—নায়িকার নামে। নবকুমারের পরিজনেরা তার নাম দিয়েছিল মৃণ্ময়ী। মাটি দিয়ে পুতুল বা প্রতিমা তৈরি হতে পারে। ভয়ঙ্করী কালীমূর্তি মৃন্ময়ী হতে পারে। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' শব্দের ভীষণতা 'মৃণ্ময়ী'-তে নেই।...বাঙালি ঘরে ঘরে শ্মশানচারিণী কপালকুণ্ডলাকে মৃণ্ময়ী করে তুলেছে। ...বঙ্কিম বৈষ্ণবী ভক্তির চন্দন ও বসন সরিয়ে রক্তাক্ত জবায় ভূষিতা নায়িকা আদিশক্তিকে দেখতে চেয়েছিলেন কি?' কী নির্দ্বন্দ্ব প্রশ্ন! আসলে তাঁর প্রশ্নটাই সিদ্ধান্ত। তাই তা দ্বন্দ্বহীন, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের আলোচনায় প্রাবন্ধিকের সমালোচক-সত্তায় যেন লেখক-সত্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক্ষেত্রেও তিনি

স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তাই কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা নবকুমারের প্রতিই তাঁর সমর্থন উচ্চারিত— "সীতারামে আসক্ত পুরুষের বিপুল বিনষ্টির ট্র্যাজেডি দেখেছি,—নিরাসক্তির দেয়ালে ঠুকে কামনার অপচয়, অপমৃত্যু। দাহ্যমান এক বিশালকায় পুরুষের আশ্চর্য আকৃতি সীতারাম। আর 'কপালকুণ্ডলা'য আসক্ত পুরুষ নবকুমারের ট্রাজিক আর্তনাদ অনন্তে বিলীয়মান দূরশ্রুত এক ক্ষণিক কণ্ঠস্বর। মানববিশ্ব তখন বড় তুচ্ছ মনে হয়।"

এমন নির্মেদ ভারহীন সচল গদ্যে একমাত্র তাঁরই বিশিষ্ট অধিকার। তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনার শুরুতেই দেখি নাটকীয় চমক। কোনো গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া-ই আকস্মিক তার সূচনা। এটাই তাঁর নিজস্ব রচনা-ভঙ্গি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় [১৯৮৭] প্রকাশিত তাঁর 'চিন্তার ছবি, চিন্তার স্বাদ' : রবীন্দ্রপ্রবন্ধ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশটি. লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'চিন্তার রূপ আছে?'

এ নিয়ে দীর্ঘ ও জটিল দার্শনিক তর্ক জমে উঠতে পারে। তাতে আমার উৎসাহ কিম্বা প্রয়োজন নেই। বর্তমানে আমি একটি সীমাবদ্ধ অভিপ্রায়ে প্রশ্নটি তুলেছি।" এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে তাঁর মানস-প্রবণতাটি চমৎকার ধরা পড়ে। কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণার পূর্বে এমন সহজ উপস্থাপনা এবং সেই সহজ পথেই জটিল বিষয়ের স্বচ্ছন্দ এগিয়ে চলা—কোনো প্রাবন্ধিক বা সাহিত্য সমালোচকের রচনায় সচরাচর লক্ষিত হয় না। গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া-ই কীর্তনের শুভারম্ভ তাঁর মতো বলিষ্ঠ চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের পক্ষেই সম্ভব। কারণ যা তিনি ভাবেন তা একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি। এখানে তিনি কোনো ধার-কর্জ করেন না। নিজের বোঝা ও ভাবনার সঙ্গে করেন না কোনো সমঝোতাও। কাজেই সেই ভাবনা যখন সাবলীল গতিতে গদ্যে প্রকাশ পায়, তখন তাতে তাঁর নিজস্বতার সবটুকু ফুটে ওঠে। ইস্পাতের মতো মজবুত ও ঝকঝকে তাঁর গদ্য এবং সেই গদ্যের ভাষা। চিন্তার টানটান প্রতিফলন। মননের উজ্জ্বল দীপ্তি। যা উজ্জ্বল, কিন্তু উচ্ছল নয়। ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের উচ্ছ্বাস তিনি বর্জন করেছেন। ছোট ছোট বাক্যে বক্তব্যের ঋজুতা পরিস্ফুট। তাঁর ভাষায় প্রসাধনের কৃত্রিমতা নেই, আছে আটপৌরে সজীবতা, যা তাঁর মননের আভিজাত্য প্রকাশ করে। গদ্যকে অনাবশ্যক বিরাম চিহ্ন ও সংযোজক অব্যয় দিয়ে দীর্ঘ করেন নি তিনি। তাঁর 'কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থ থেকে দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে :

"মুকুন্দরাম মঙ্গলকাব্য লিখেছেন। চণ্ডীমঙ্গল।...মুকুন্দরামের এই স্বাতন্ত্র্য অনুসরণযোগ্য। কোথায় এই স্বাতন্ত্র্য? এর উৎস কি কবির জীবনে অথবা গভীর সত্তায়? কবির জীবনকথা সামান্য। উপকরণও বেশি নেই। কবির আত্মজীবনীটি এর প্রধান অবলম্বন। পণ্ডিতমহলে কিছু বিতর্ক আছে।...এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত অসম্ভব।" [পৃ. ১-২] একইভাবে 'কপালকুণ্ডলা এবং প্রকৃতি—আদিতে মধ্যে অন্তে' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'উদ্ধৃতির পরিমাণ বেড়ে গেল। কৈফিয়ৎ আছে—আমার সিদ্ধান্তের জন্যই এই আয়োজন।' বা এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র লিখলেন—'দুর্গেশনন্দিনীতে ইংরেজী সাহিত্যের কিছু কাঁচা গন্ধ আছে। আয়েষা দীপ্ত বাক্যে বিদ্রোহী-প্রণয়ের ঘোষণা করেছে। ওসমান জগৎসিংহকে প্রণয়-দ্বৈরথে আহ্বান জানিয়েছে।' 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৩' গ্রন্থে 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর আলোচনায় এমনই নির্ভার প্রাণবন্ত গদ্য, ছোট ছোট বাক্যে বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও প্রাঞ্জলতা লক্ষণীয় :

'গল্পটি সরল, তবে গঠনে সচেতন নিপুণতা আছে। কিঞ্চিৎ পূর্বকথন। বৈকুণ্ঠের দোকানদারী, শ্রমলব্ধ সাফল্য। তার সংসার—সৎ কিন্তু বোকাটে ভালোমানুষ গোকুল, মেধাবী বিনোদ, গোকুলের সৎমা—বিনোদের গর্ভধারিণী। সৎমায়ের সমস্নেহ।'

মধ্যযুগের কাব্য এবং একালের কবিতা আলোচনায় তাঁর শব্দ বিশ্লেষণের পদ্ধতি এক কথায়

অভিনব। যেমন গোবিন্দদাসের 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি' পদটির শাব্দিক বিশ্লেষণে তিনি বললেন : 'রাধার দেহজ্যোতি যেখানে পড়ছে সেখানেই যেন চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ; যেখানে সে ফেলছে পদযুগল সেখানেই ফুটে উঠছে স্থল কমল। কেবল বলার ভঙ্গিতে সাধারণ উপমা-উৎপ্রেক্ষার বস্তু একটি অভিনব ভাবের বাহন হয়েছে এখানে।...তারই দেহের জ্যোতি নিয়ে আকাশের বিদ্যুতের এত দীপ্তি, পদপাতের সৌন্দয নিয়ে স্থল কমলের এত পেলবতা।...রাধিকার মন্থর গতির ছন্দময়তাই কেবল নয়, যৌবন ভারাবনতা ভাবটিও এই তুলনার দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে।' আবার, গোবিন্দদাসের 'নীল অলকাকুল' পদটিতে ব্যবহৃত শব্দে তিনি চিত্ররসের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ— 'কৃষ্ণবর্ণ সরোবরে নীলপদ্মের অবস্থিতি যেমন লক্ষ্য করা যায় না তেমনি অন্ধকার রাত্রে আকুল কৃষ্ণ কেশে অঙ্গ আবৃত করে রাধার অভিসারও দুর্লক্ষ্য। কালো রঙে ছবি আঁকা সবচেয়ে দুরূহ।'' ['প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন',৩য় সং, পৃ. ১০৫]

'জীবনানন্দ : কবিতার শরীর' গ্রন্থে জীবনানন্দের কবিতাগুচ্ছ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে নতুন কিছু বলে। এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর সকলের চেয়ে আলাদা। ভাষাকে তিনি শৈলীবিজ্ঞানের দিকে নিয়ে গেছেন। প্রতিটি কবিতার শাব্দিক বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খতা যে-কোনো পাঠকের-ই পরম প্রাপ্তি, তা বিস্ময়কর, চমকপ্রদ, কিন্তু সুন্দর। শব্দ দিয়ে তৈরি হয় যে কবিতার শরীর তা সযত্নে পাঠককে চিনিয়ে দিয়েছেন তিনি। একটি অতি-পরিচিতি কবিতার কথা-ই ধরা যাক। 'বনলতা সেন' কবিতার আলোচনায় তিনি বললেন : 'এই কবিতার ভাষা-বিশ্লেষণে দেখা যায় অন্ধকার এবং রাত্রিবাচক প্রচুর শব্দ ও শব্দগুচ্ছ।...এইসব শব্দ, শব্দগুচ্ছ, শব্দবাহী চিত্র, ইন্দ্রিয়ানুগ এবং ইন্দ্রিয়ভেদী স্বাদ-বিশ্লেষণে কবিতার অনাবিষ্কৃত গভীর সত্যে পৌঁছন যাবে।...সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী— ...নদীরা যদি ঘরে আসে তো নদীর ঘর কি? উৎস? উৎসে ফিরে যাবার তাৎপর্য কি? কিন্তু এইসব কুশাগ্র চিন্তাকে নিরস্ত করে দেয় পরের শব্দগুচ্ছ 'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'। 'সব পাখি' 'সব নদী'—যাবতীয় ছবির উপরে মৃত্যুর নিশ্ছিদ্র কালো রং সেঁটে দেয়। এরই প্রসারিত বর্ণনা পরের চরণে গড়িয়ে যায় তিনটি শব্দে 'থাকে শুধু অন্ধকার।'...'' বাক্য গঠনের ধরা-বাঁধা নিয়ম থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে এসেছেন তিনি। কর্তা, ক্রিয়ার বাঁধাবাঁধি গঠন মানেন নি। ফলে গদ্য আরও সহজ, সাবলীল ও মুক্ত হয়েছে। ''জীবনানন্দ : কবিতার শরীর' গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশটি উল্লেখ করছি : '১৯৬৫ থেকে ইচ্ছা। এতদিনে তা হল। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে একটা বই। আমি তো আমার মতো লিখেছি। অনেকের লেখালেখির পাশে আর একটা।' তাঁর এরকমই আর একটি গ্রন্থ 'নজরুলের কবিতা : অসংযমের শিল্প'। এখানে কবিতার স্তবক-চরণ-অন্ত্যানুপ্রাস, এমন কী চরণের মাত্রা সংখ্যা বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ সত্যই চমৎকৃত হওয়ার মতো।

প্রাবন্ধিক তাঁর রচনায় শব্দ ও ভাষা ব্যবহারে 'প্রথাগত ফ্রেম' ভেঙেছেন। যেন ভাষার স্থিতিস্থাপকতা গুণ যাচাই করাই তাঁর উদ্দেশ্য। নিরেট বুননের দার্ঢ্য ও বলিষ্ঠ ভাষার পাশাপাশি প্রতিদিনের ব্যবহার্য শব্দ, যার প্রয়োগ একান্তভাবেই মৌখিক,—সেই মুখের কথা তাঁর বহু রচনার ভাষা হয়ে উঠেছে। অথচ তাঁর প্রবন্ধের ভাষা মার্জিত ও যথাযথ। তা চিন্তার ভাষা; যুক্তিতথ্য এবং বস্তুনিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রকাশক। কিন্তু তা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর বলার ভাষা এবং প্রবন্ধের ভাষা যেখানে অভিন্ন, সেখানেও তা লাবণ্যমুক্ত নয়। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন— 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের আলোচনা অংশটি : 'গল্পের শেষে দেখতে পাই উপেন মারা গেল। সুরবালা আগেই মরেছে। মানুষের ভারসাম্যহীন চিত্তোদ্বেলতা, নীতিভ্রষ্ট কামনার অগ্নিশিখা শান্তিবারি বর্ষণে নিভিয়ে দিয়ে সেবা প্রীতির একটি বাতাবরণ তৈরি করে আদর্শ দম্পতি বিদায় নিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ কি শান্তি না কল্যাণ? উন্মাদ কিরণময়ী ঘুমিয়ে রইল—...উন্মত্ততার এই সাময়িক ঘুম?... সাবিত্রীর 'ভাই' আর নেই, ভাই-বোনে বানপ্রস্থ কি করে হবে? কোথায় সেই পাপজর্জর

বিচূর্ণ যুবক দিবাকর? শরৎচন্দ্র অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে উপন্যাস শেষ করলেন।' উদ্ধৃতাংশে প্রতিটি শব্দের নিজস্ব ওজন বা ভার আছে এবং লেখকের তা সতর্ক সংযোজন। প্রশ্ন চিহ্নান্বিত বাক্যগুলি তাঁর চিন্তার প্রসার, মৌলিকতা ও সিদ্ধান্তের বলিষ্ঠতা এমনভাবে প্রকাশ করে যে, শাব্দিক তাৎপর্য পৃথকভাবে অন্বেষণ করতে হয় না। এরই পাশাপাশি আরও কিছু শব্দ ও বাক্য—'শতকের **তিনপোয়া** চলে গেছে', '**কান ভাঙান** যায় নি', [নিষ্কৃতি], 'এই নামকরণ খানিক **আমিষগন্ধী** মনে হতে পারে' [চরিত্রহীন], 'প্রথার চাপে ক্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে **ঘুমন্ত মৌলিকতা** খুঁজে বের করার দৃষ্টি' [প্রাচীন কাব্যসৌন্দর্যের খোঁজে], 'পড়বার সময় কিন্তু মনে হয় লেখাটি ভাবে-স্বাদে **চারধারে---উপরে-নিচুতে** ছড়িয়ে আছে' [নজরুলের কবিতা : অসংযমের শিল্প], 'শরৎচন্দ্র এর আগেও শ্রীকান্ত ২-য়ে অভয়াকে **বিতর্ক-কুশল** করে তুলেছিলেন' [শ্রীকান্ত], এই উপন্যাসে **লোকজন** অনেক [পথের দাবী], 'এই জাতীয় **চাপান** দেওয়ায় জীবনরস স্ফুরিত হয় না' [নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : পাপদগ্ধ আত্মার সন্ধানে সাম্যবাদী]—ইত্যাদি। তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' এবং উক্ত গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের কিছু উল্লেখে প্রাবন্ধিকের শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাটি বোধগম্য হয়।

ক্ষেত্র গুপ্তের রচনাশৈলীর বিস্তারিত আলোচনায় একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তিনি যেমন গবেষণাধর্মী প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন; তেমনি তাঁর প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনারও অবকাশ আছে। আমরা তো জানি, 'Style is the man himself'—ক্ষেত্র গুপ্তের রচনারীতি সম্পর্কে একথা অভ্রান্তভাবে সত্য। তিনি যেমন, তাঁর রচনাও ঠিক তেমন-ই। তাঁর মতো সৃজনশীল প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক বাংলা সাহিত্যে খুব কম-ই আছে।

বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা, তর্ক, বিচার ও সিদ্ধান্ত—এই নিয়ে তাঁর প্রবন্ধের দেহ গড়ে উঠেছে। তাতে আবেগের প্রকাশ কম এবং এই জাতীয় প্রবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর গদ্য বলিষ্ঠ, স্পষ্ট এবং দাপুটে গদ্য। বুদ্ধির দীপ্তি, প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা ও ঋজুতা, ভাষার তীক্ষ্ণতা এবং সাবলীলতায় তা উজ্জ্বল। ক্ষেত্র গুপ্ত পেশায় ছিলেন অধ্যাপক। অধ্যাপক-সমালোচকদের সমালোচনায় ফ্লবেয়র বলেছিলেন : 'What droll creatures these college professors are wherever they talk about art.' প্রায় অনুরূপ মনোভঙ্গি জীবনানন্দের 'সমারূঢ়' কবিতাতেও ব্যক্ত :

> 'পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের' পর
> বসে আছে সিংহাসনে— কবি নয়— অজর, অক্ষয়
> অধ্যাপক; ... ...
> বেতন হাজার টাকা মাসে— আর হাজার দেড়েক
> পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;

কিন্তু এসব সীমাবদ্ধ ও একদেশদর্শী মন্তব্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। কারণ, আমরা জানি, প্রকৃত সমালোচকের মধ্যে স্রষ্টার সব কটি গুণই বর্তমান। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত একাধারে স্রষ্টা ও সমালোচক। কেবল তথ্য ও তত্ত্বের নিগড়ে তিনি তাঁর রচনাকে বাঁধেন নি বলেই তা আমাদের মুগ্ধ, সচকিত ও কৌতুহলী করে তুলেছে। 'প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন : 'চলাটা আমার নিজের, তাই কিছু স্বাতন্ত্র্য পদ্ধতিগত-ভাবেও, সতর্ক পাঠক দেখতে পাবেন।'—বলাবাহুল্য, এটাই তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রথম ও শেষ কথা।

লেখার ভিতর দিয়ে যখন দেখি

• • • • • •

সন্দীপকুমার সোম

ড. ক্ষেত্র গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, আবার আছেও। 'পরিচয় নেই' বলার অর্থ : তাঁর ক্লাস করবার সুযোগ-সৌভাগ্য দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পরিচয়ও নেই। তবে আরও বড় পরিচয় আছে মনে হয়—তাঁর সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচয়। তাঁর বহু লেখাই আমি পড়েছি। এবং ভাবনার অভিনবত্বে ও প্রকাশভঙ্গির অ-পূর্ব স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ কত আগে বাংলা সমালোচনার ধারা সম্পর্কে দুঃখ করে বলেছিলেন, এতে 'ব্যক্তিবিশেষের মত' পাওয়া গেলেও 'মতবিশেষের সত্য' বিশেষ মেলে না। দুঃখটা যে আজও রয়ে গেছে একালের এক বিশিষ্ট সমালোচকের উক্তিতেই তার প্রমাণ : 'বাংলা সমালোচনা যে নিরুপায় পরীক্ষার্থীদের পেরিয়ে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সাহিত্যরসিক বাঙালির ভোজ্য হয়ে উঠতে পারেনি, তার কারণ, এর প্রায় সবটাই নঞর্থকভাবে ইম্প্রেশনিস্ট। দার্শনিক ভিত্তি ও যুক্তিকাঠামোর অভাবে সেই ইম্প্রেশন, ক্ষেত্রবিশেষে স্টাইলের সৌন্দর্য সত্ত্বেও টেঁকসই নয়।' এই আক্ষেপ, মনে হয়, ড. গুপ্ত কিছুটা মিটিয়েছেন। তাঁর সমালোচনায় ব্যক্তিগত মতামত নেই এমন নয়—তা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবও নয় বোধহয়—কিন্তু সেই 'মত'-কেই তিনি যুক্তিগ্রাহ্য নির্মোহ বিশ্লেষণে এবং উপলব্ধির সরসতায় 'মতবিশেষের সত্য' করে তুলতে পেরেছেন।

সমালোচনায় এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ এনেছেন তিনি, যেখানে সচেতনভাবেই ভাবালুতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন বক্তব্যের, বলা ভালো উপলব্ধির, বলিষ্ঠ উপস্থাপনা দেখা যায়। তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সে উপলব্ধি এবং তার প্রকাশের যুক্তিময়, সরস পরম্পরাকে অস্বীকার করা যাবে না। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, কিন্তু যখনই কলম ধরেছেন লেখাগুলো 'নিছক অ্যাকাডেমিক'-এর স্তর ছাড়িয়ে অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে।

আবার, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার—গবেষণার ক্ষেত্রটাই যদি ধরা যায়, তবে আলোচ্য-বিষয়ে অমন সুশৃঙ্খল পরিমিতির দৃষ্টান্তই বা কটা মেলে? দৃষ্টান্ত হিসেবে হালে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প' [২০০৭] বইটির কথাই ধরা যাক। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ যত কাহিনীমূলক কবিতা লিখেছেন, সেগুলির বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খল বিন্যাস ও বর্গীকরণ—এবং তারই ভিতর দিয়ে সেগুলির অনন্ত বৈচিত্র্য, পরস্পরলগ্নতা ও তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রয়াসে এটি বাংলা গবেষণার ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাবনার বিজ্ঞানসম্মত রূপায়ণের চেহারাটা এ-গ্রন্থে বিষয়বিন্যাসের দিকে তাকালে নজরে পড়বে : ১. গদ্য-গল্প, পদ্য-গল্প : রবীন্দ্রনাথ ২. সূচনা 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ৩. বর্ণাঢ্য গৈরিক 'কথা' ৪. সামাজিক দায়বদ্ধ 'কাহিনী' ৫. বিচিত্র স্বাদ : 'কল্পনা', 'শিশু', 'খেয়া' ৬. বিদ্রোহী সামাজিক 'পলাতকা' ৭. 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী': গদ্য ছন্দে পদ্যগল্প ৮. ছড়ায় গল্প : 'ছড়ার ছবি', 'সে', 'সহজপাঠ'। পরিশিষ্টে রেখেছেন : ১. রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' : ভাসমান গল্পকণা ২. বিচিত্র

স্বাদ : 'কণিকা' : এক শৈল্পিক বাসনা। এই বিন্যাস একদিকে যেমন বিষয়ের সমগ্রতা ধরবার প্রতিশ্রুতি দেয়, অন্যদিকে প্রতিটি অধ্যায়ের ব্যঞ্জনাময় শীর্ষনাম লেখকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতির কাজটুকু সেরে ফ্যালে।

অজস্র বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, করছেন এখনও; এবং সবকটি ক্ষেত্রেই বিষয়-বিন্যাসের এই বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা এবং বক্তব্য বিষয়ের প্রতি justice দেখা যায়। সেইসঙ্গে অসামান্য নজরদারিতে প্রতিটি পাঠকৃতির সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও থাকে, যে-বিশ্লেষণে রচনার শিল্পরূপ বিশেষ নিরীক্ষার বিষয় হয়,—আসে সমাজবাস্তবতার প্রসঙ্গ; জীবনরসের বিচিত্র মানদণ্ড। এসব মিলিয়েই তাঁর সমালোচনায় বড় হয়ে ওঠে 'সাহিত্যিক রূপ-উপভোগ'। আর এ-উপভোগকে মান্যতা দিতেই বিষয়ের সুনির্বাচন জরুরি হয়ে ওঠে।

তাঁর প্রথম বই 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন'-এ মধ্যযুগের সমস্ত কাব্য নয়, 'নির্বাচিত অল্প কিছু' লেখাই তাঁর আলোচনার বিষয়। এখানে একদিকে যেমন স্পষ্ট করে দেন মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সীমাবদ্ধতার জায়গাটা—বলে দেন, 'সেকালের সাহিত্যমাত্রের ধর্মের এবং বিবিধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও তত্ত্বদর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ লক্ষ্য করা যায়। অনেক লেখাই নির্দিষ্ট ধর্মপ্রচারের জন্যই রচিত। এই কাজ নিপুণভাবে করতে পারার সঙ্গে শিল্পরূপের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং উল্টে দেখা যায় ধর্মপ্রচারের জন্য তথা তত্ত্ববোধের ফলে বহু লেখা তার শিল্পগুণ হারিয়েছে। কেউ কেউ ধর্মতত্ত্বকে আত্মসাৎ করে ভাষায় আকৃতি দিতে পারেন। তিনি সার্থক শিল্পী। যিনি আত্মসাৎ করতে পারেন না, যাঁর ভাষা ও প্রকাশরীতি তত্ত্ব ও ধর্মকে বহনই করে বেড়ায় তিনি সাহিত্যিক হিসেবে ব্যর্থ। কোনো লেখক রূপ-সৌন্দর্যের পক্ষে ধর্ম-দর্শনের চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কেউ জেতেন—তিনি সফল সাহিত্যিক। কেউ হারেন—তিনি সাহিত্যিকরূপে বিফল। কারও লেখায় এই যুদ্ধের চিহ্ন লেগে থাকে। সাহিত্য-শিল্পের দিক থেকে সেরূপ লেখা খুবই ইন্টারেস্টিং—কৌতূহলোদ্দীপক।'

আবার, এর পাশে পাশে সাহিত্য-বিচারের এক উপযুক্ত মানদণ্ডও স্থির করে দেন : 'ইতিহাসকে, সমাজকে, ধর্মকে ট্রাডিশন বা ঐতিহ্যকে এড়িয়ে গিয়ে শিল্পমূল্যের ব্যাখ্যা তো করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যস্বাদকে ইতিহাস বিচার, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কিংবা ধর্মীয়- বোধের প্রতিফলনের সঙ্গে একাকার করে ফেলাও মোটেই কাজের কথা নয়। পুরনো যুগের কিংবা আধুনিক যুগেরই হোক, কোনো লেখা হয়তো ঐতিহাসিক বিচারে খুব মূল্যবান, কিন্তু তা সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান না-ও হতে পারে। আবার সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান লেখামাত্রেই যে সাহিত্যের ইতিহাসে বড় জায়গা পাবে তার মানে নেই।' শেষ বাক্যটিতে যেন ধিকৃত হয় সাহিত্য-সমালোচনার প্রচলিত সেই-ধারা, যেখানে অনেক মূল্যবান সাহিত্যকর্মই যথাযোগ্য স্থান পায় না; অনেক সময় অনুল্লেখিতই থেকে যায়।

ড. গুপ্ত সাহিত্য-সমালোচক মাত্র নন, সমালোচনায় বর্তমান ধারার সচেতন নিরীক্ষকও। সমালোচনায় inter-disciplinary approach আজ খুবই জনপ্রিয়। তাকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজস্ব জাগ্রত মননের পরিচয় দেন ঠিকই, কিন্তু এ-ব্যাপারে সতর্ক করতে ভোলেন না : 'আন্তর্বিদ্যা শৃঙ্খলার অনুশীলন আজকাল খুবই আদৃত হচ্ছে, তার মানে অবশ্য এ নয় যে প্রতিটি বিদ্যাশৃঙ্খলার নিজস্ব বিশিষ্ট চর্চাকে বিসর্জন দিতে হবে বা তাকে গুলিয়ে ফেলতে হবে।' বলাবাহুল্য ড. গুপ্ত তাঁর প্রতিটি লেখায় সাহিত্য রসোপভোগকে মান্যতা দিয়ে 'সাহিত্য' নামক 'বিদ্যাশৃঙ্খলা'র নিজস্ব 'বিশিষ্ট চর্চা'-কেই অব্যাহত রেখেছেন।

প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই ঋজু, স্পষ্ট, লক্ষ্যভেদী। শব্দব্যবহারে অনাবশ্যক আড়ম্বর

নেই—যা বলবার আবেগাতিশয্য বর্জন করে নির্মেদ গদ্যে সোজাসুজি বলেন। প্রথম বই থেকেই এই ধারা বহমান। তবে 'মধুসূদন : কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' বইয়ে গদ্য তৎসমশব্দবহুল, ঈষৎ ভারি। সে কি মধুসূদনের ধ্রুপদীয়ানার কথা মনে রেখে? অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'[২০০৭] নাটক সম্পাদনা করতে গিয়ে যে-গদ্য তিনি লেখেন, তা আশ্চর্য সংহত, নির্ভার—ব্যঞ্জনাময় শব্দ ব্যবহারেই যেন এখানে সবটা মনোযাগ ব্যয়িত। 'রাজা' নাটকের চরিত্রগুলির 'অন্তর্গত নাটকের' যথাযথ ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে এ-গদ্য খুব সংক্ষিপ্ত কাটাকাটা একাধিক বাক্যে টানা রয়ে গেছে।

কিন্তু এতোটাই সব নয়। সব্যসাচীর মতো তিনি তাঁর অক্ষয় তূণীর থেকে কতো বিচিত্র বিষয়-বাণ নিক্ষেপ করে বাঙলার বুধমণ্ডলীকে সচকিত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সিনেমার চিত্রনাট্যও যে সাহিত্য-রস পান করাতে পারে সেই সত্যের প্রতি তিনিই আমাদের আকর্ষণ করেছেন। বিশ্বায়ন বা বাজার অর্থনীতি লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে কোনো সঙ্কট তৈরি করতে পারে কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। লোকসৃষ্টির কি কোন নান্দনিক মূল্য আছে?—তাও উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি প্রতিনিয়ত তাঁকে অতৃপ্ত জিজ্ঞাসু করে তুলেছে। বাঙলার সংস্কৃতি চিন্তায় তাঁর অধ্যাস তাঁকে অপরিহার্য ও সম্মাননীয় করে তুলেছে।



দ্বিতীয় পর্ব

অন্তরঙ্গ সাহচর্য

ক্ষেত্র গুপ্ত : আমার কথা

• • • • • •

মমতাজ উদ্দীন আহমদ

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত আমার শ্রদ্ধার মানুষ। আবার অতি প্রিয় মানুষ তিনি। ড. গুপ্তের সহজ সরল জীবন-যাপন চলাফেরা আর স্বচ্ছ কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা আর আদর্শবোধের সঙ্গে আমার চিন্তাভাবনার খুব দূরত্ব নেই। তবে তিনি এ-বিষয়ে যত গভীরভাবে সিদ্ধ ততখানি গভীরে যাওয়ার সাহস আমার হবে না।

আমি সংসার জীবনে নানা জিজ্ঞাসা, ছলনা আর সংঘাতের মধ্যে চলাচল করি বলে, ছোটবড় আপোষ করতে কুণ্ঠিত হই না। ক্ষেত্র গুপ্ত সেরকম নন। তাঁর বিশ্বাসের জগৎ ও সীমানা অনেক বিস্তৃত, তাই তাঁকে সামান্যতে নত হতে হয় না।

ক্ষেত্র গুপ্ত সস্ত্রীক ঢাকায় এসেছিলেন। ছিলেন মাত্র কয়েকদিন। তখন তাঁকে দেখেছি। পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে কাছের মানুষ হিসেবে চিনেছি। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' বিষয়ে আমার কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। তিনি সে সবের সমাধান দিয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলীর সম্পাদক হিসেবে তাঁর গ্রন্থটি আমাকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছে। গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি বলেছেন,—'উনিশের শতকে বীর্যদৃপ্ত বঙ্গসাহিত্যে শক্তিমান হয়েও যিনি ললিত নন, বিকৃতভগ্ন মানুষের একটি স্বতন্ত্র জগতের যিনি অধীশ্বর, প্রীতিসিক্ত অথচ দূরবর্তী, কল্পনার সুদূরতায় যাঁর বিহার নয়, সত্য যার মৃত্তিকা-পরিক্রমা—তাঁর বিষয়ে পর্যাপ্ত ভাবনা আজও হল না।'

'বিকৃত ভগ্ন মানুষ' আর 'মৃত্তিকা-পরিক্রমা'—এ দুটি শব্দ-দ্বন্দ্বের সন্ধান পেয়ে আমি বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম। দীনবন্ধুকে যথার্থভাবে চেনার জন্য এ রকম চিহ্নিত ভাবনা আমাকে ভাবিয়েছে। বাংলা নাট্যক্ষেত্রে দীনবন্ধুকে মূল্যায়ন করার এমন সচেতন নির্দেশ আর কোথায় পাব!

কেবল দীনবন্ধু মিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র রচনা বিষয়েও ক্ষেত্র গুপ্তের কথা ও নবভাবনার উন্মেষ আমাকে সচেতন করেছে।

ক্ষেত্র গুপ্ত একনিষ্ঠভাবে সমাজবাদী মানুষ। তাঁর বিশ্বাসে ফাঁকি নেই, আর জীবন-যাপনে কোথাও আমাদের মতো শিথিল আচরণ নেই। সেজন্য সত্যকে সঠিকভাবে চিনে নিতে ক্ষেত্রবাবুর অসুবিধা হয়নি।

বাংলার লোকসংস্কৃতি আর তার সঙ্গে একালের নবীন জনপদের সংযোগ স্থাপনে ক্ষেত্রবাবুকে কখনই একই কথা একই সমস্যা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, 'পেঁচিয়ে-পুঁচিয়ে' কথা বলতে হয়নি। স্বচ্ছতা তাঁর অন্যতম শক্তি।

যা তিনি বিশ্বাস করেন না, যা তাঁর জীবনের আচরণের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাকে অযথা সমাদর করার কোনো দায় ক্ষেত্রবাবু বহন করেন না। অকপটে সত্য ভাবনাকে সহজেই উচ্চারণ করেন তিনি।

আর এখানেই তাঁর জন্য আমার শ্রদ্ধাবোধ উচ্চারিত হয়।

তিনি এখানকার বাংলাদেশের একটি সাহসী ও 'বীর্যদৃপ্ত' অঞ্চলের মানুষ। বৃহত্তর বরিশালের সন্তান ক্ষেত্রবাবুর সাহস ও মোহমুক্ত বিশ্বাস আমার মতো অন্যদেরও আকর্ষণ করতে বাধ্য।

বাংলা সাহিত্যের নবমূল্যায়নে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যকে বিশেষ মূল্য দিয়ে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যের পঠনপাঠন তাঁরই নির্দেশে রবীন্দ্র-ভারতীর শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ কাজটির জন্য আমরা অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাব।

বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু-মুসলিম দুভাগে ভাগ করে বিচার করার নিন্দনীয় প্রথার অবসান হলে আমি খুব খুশি হব।

আমার ধারণায় এদেশের সব কিছুই আমার সম্পদ। সকল দুঃখ, সকল আনন্দ আমার। প্রাচীন-মধ্য-বর্তমান সব আমার। সকল ধর্মের সত্য আমার। মসজিদ আমার, মন্দির আমার। তেমনি বৈষ্ণবপদাবলী—আলাওল আমার। রবীন্দ্রনাথ আমার, নজরুল আমার।

এই যে আমার সচেতন অহংকার—এই অহংকার অর্জন করেছি অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের সাহিত্য, জীবন ও বিশ্বাসের মূল্যায়ন থেকে।

আমি জানি, ক্ষেত্র গুপ্ত এখন প্রবীণ এক মানুষ। সম্প্রতি অতি প্রিয়জনের বিয়োগে মুহ্যমান। নিঃসঙ্গ তিনি।

আমার যত শুভেচ্ছা ও শুভকামনা তাঁর জন্য।

একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এনে আমার কথা শেষ করব। আমার সত্তরতম জন্মদিনে তিনি এবং তাঁর পত্নী আমাকে একটি শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন—"সাহিত্য হিসেবে আপনার একাধিক নাটক কলকাতায় রবীন্দ্রভারতীতে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও নাট্যরসিকেরা এর মধ্য দিয়ে আপনার নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একটি পথ খুঁজে পাবে। আপনার নাটকে ব্যঙ্গ ও বেদনার, বুদ্ধিবক্রতা ও আবেগের, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও চিরন্তন মানবসত্যের একটি সহজ মিলন দেখেছি।"

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বোধকরি স্নেহাধিক্যে আমার নাট্যকর্ম সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন। তা যদি করে থাকেন তাতে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। আমি তাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ড. ক্ষেত্র গুপ্তকে বারম্বার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই। দীর্ঘকাল তাঁর সাহিত্য-আলোচনা এবং সচেতন দৃষ্টিপাত অক্ষুণ্ণ থাক—তাই আমার প্রার্থনা।



হৃদয়ে তাঁর বাংলাদেশও

• • • • • •

সৌমিত্র শেখর

আমার আজকের যে হয়ে-ওঠা, এর জন্য আমি আর যাঁর কাছে ঋণী ছিলাম-আছি-থাকব, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক প্রফেসর ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। এ-ঋণের অবধি নেই, তুলনা নেই ত্রিভুবনে। ১৯৯০ সালে যখন আমি ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখনই তাঁকে প্রথম দেখি সেখানের এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের উপর বলেছিলেন। শুধু বলেন নি মুগ্ধ করেছিলেন, বিজয় করেছিলেন। শুধু ছাত্রদের মন নয়, ছাত্রীদেরও; শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয় অধ্যাপকমণ্ডলীকেও। কথাগুলো তীক্ষ্ণ, যুক্তিগুলো শাণিত, বলার ঢঙে মেদবাহুল্যহীন কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। সাদা ধুতি, সাদা ফতুয়া, মাথায় খাড়া খাড়া ছোট ছাটের চুল, চলায় স্বাচ্ছন্দ্য—এমন বেশ ও প্রবেশ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-কড়িডোরে দেখা যায় না, তাই চমকে গিয়েছিলাম প্রথমত। সেদিন কথা বলার সাহস ও সুযোগ কোনোটাই হয় নি।

১৯৯২ সালে এম. এ. পাশ করে ভারত সরকারের আইসিসিআর বৃত্তি নিয়ে সে বছরই আমি কলকাতায় যাই। বিশ্বভারতী আর রবীন্দ্রভারতী এ-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো একটিতে আমি পিএইচ. ডি. গবেষণা করতে পারবো—এরকম অনুমোদন পত্র এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ফরম আমাকে দেয়া হলো। সিদ্ধান্ত নিতে আমার বিলম্ব হয় নি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি নির্বাচন করলাম; সেখানে প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্তকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাব বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ, ঢাকা থেকে এক অধ্যাপকের অনুরোধপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম তার উদ্দেশে। কিন্তু বিধি বাম। জানা গেল, ইউজিসির নিয়মানুসারে প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্তর তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট সংখ্যক গবেষক রেজিস্ট্রেশন করে আছেন, আর নতুন কাউকে আপাতত তিনি নিতে পারেন না। এটা ১৯৯২ সালের জুন মাসের কথা। আমি তখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবছিলাম। স্যার অভয় দিলেন, বললেন রবীন্দ্রভারতীতেই থেকে যেতে। আমার জন্য তাঁরই অকৃত্রিম বন্ধু অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র গুপ্তকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সম্মত করালেন এবং আমাকে জানালেন যে, তিনি সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা থাকবেন, আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি। বিষয় হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প নিয়ে তখন আমরা ভাবছি। এ সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, ১৯৯২ সালের অগস্ট মাসে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখনও আমার রেজিস্ট্রেশন হয় নি। ফিরে আসতে হলো বাংলাদেশে; বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে আমাকে জড়িয়েও পড়তে হলো নানা ঝামেলায়। ভেবেছিলাম আমার পক্ষে গবেষণা করা আর হবে না। কিছুটা সামলে নিয়ে ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার কলকাতায় গেলাম সবকিছু চুকিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বাধ সেধেছিলেন তিনি, এই দূরদর্শী অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। তিনি বিলম্বে হলেও, ১৯৯৩ সালের মার্চে—আমার নাম পিএইচ. ডি. গবেষক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করানোর ব্যবস্থা নিলেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. রবীন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু বিষয়

দিলেন পাল্টে। বললেন, তুমি যাতে বাংলাদেশে বসেও কাজটা করতে পার এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনেও বিঘ্ন না ঘটে তাই তোমাকে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে হবে। এতে তোমার স্কলারশিপও ঠিক থাকবে। আমরা বলবো, তুমি ফিল্ড ওয়ার্ক করতে বাংলাদেশে গেছ। শেষে আমার গবেষণার শিরোনাম নির্ধারিত হলো 'বাংলাদেশের উপন্যাস : সমাজ-রাজনীতি-সাহিত্য মূল্যায়ন'। এ-সিদ্ধান্ত যে আমার গবেষণা আরম্ভ ও সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রেখেছিল তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। ফলে আমি গবেষণার কাজ আরম্ভ করলাম। বৃত্তির টাকার অঙ্ক মন্দ ছিল না। তাই কলকাতায় ঘর ভাড়া করে থেকেও কষ্ট পাই নি। সে-সময়ে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার রবীন্দ্রভারতীর বাংলা বিভাগে প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্তকে নিয়ে বিদগ্ধ অধ্যাপকদের অন্য ধরনের আড্ডা জমে উঠত। সে-সূত্রে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য জন্মে আমার। ক্লাস ও আড্ডা শেষে ট্যাক্সিতে উঠতেন দুই বন্ধু ক্ষেত্র গুপ্ত আর রবীন্দ্র গুপ্ত; কালিন্দী আর বাঙুরের বাসিন্দা। বহুদিন ট্যাক্সির সামনের আসনে বসেছি আমি, তাঁদের সঙ্গ দিয়েছি বাড়ি পর্যন্ত। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দিই। তখনও কাজ আমার শেষ হয় নি। বাংলাদেশ থেকে কথা হলো ফোনে। স্যার পরামর্শ দিলেন, পারলে ছুটি নিয়ে এসে কাজ শেষ করে যাও, পরে ব্যস্ততা বাড়বে। পার্মানেন্ট পোস্টে যোগ দিয়েছিলাম বলে সত্যি ছুটি পেলাম। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে গেলাম কলকাতায়। সে বছরই অকস্মাৎ লোকান্তরিত হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. রবীন্দ্র গুপ্ত। মনে আছে, সে দুর্যোগকালেও প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্ত আমাকে নিয়ে সরাসরি তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকারের অফিসকক্ষে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে, আমার তত্ত্বাবধায়ক হবেন তিনি নিজেই। নিয়মে না-পড়লে স্পেশাল কেস হিসেবে উপাচার্য যেন এ বিষয়টি অনুমোদন করেন। প্রফেসর পবিত্র সরকার অনুমোদন করেছিলেন। তাই, যে-কোনো ভাবেই হোক না কেন, অবশেষে প্রফেসর ড. ক্ষেত্র গুপ্তকে আমি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পেলাম এবং আমার ডিগ্রিও হলো তাঁর হাত দিয়ে। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন গ্রন্থরচনা এবং গবেষণাপত্র নির্মাণের পার্থক্য। মুদ্রিত রচনামাত্রই যে উদ্ধৃতিযোগ্য নয়, প্রাগুক্ত বা তদেব ঋষির ছড়াছড়ি গবেষণাপত্রকে কতোটা দুর্বল করে আমি তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিয়েছি। দৈনিক 'সংবাদ সোনার বাংলা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তাঁর পুত্র। সে পত্রিকায় বাংলাদেশ বিষয়ে অনেক সময় আমি নামে/বেনামে লিখতাম। ওই লেখার সম্পাদনা -মন্তব্যও আমাকে পরবর্তীকালে লেখার ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে।

আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে কলকাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে রবীন্দ্রভারতীতে অধ্যয়ন বা গবেষণা করতে গিয়েছিলাম তাদের জন্য প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্ত একটু বেশি স্নেহ অনুভব করতেন।

সে সময়ে বাংলাদেশের আমরা পাঁচজন বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক বাংলা বিভাগে, নয় জন সংস্কৃত বিভাগে গবেষণা করছি। অন্তত বিশজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে পড়ছে। যে-কোনো প্রশাসনিক সমস্যা তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমাধানের ব্যবস্থা করে দিতেন। নাম ধরেই প্রায় ডাকতেন সব অধ্যাপক আর প্রশাসনিক কর্তাদের। 'ক্ষেত্রদা পাঠিয়েছেন—' এ-রকম একটা বোল মুখে তুলেই সবাই নিমিষে সম্পন্ন করতেন কর্ম। প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের আলাদিন। তিনি শুধু চেরাগে ঘষা দেবেন! তাই দেবেন ঠাকুর স্ট্রিট থেকে বিটি রোড ক্যাম্পাস, দুই আঙিনাতেই তিনি ছিলেন সমান শ্রদ্ধার।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত এতো কম লেখেন, তাঁর মতো এতো কম বোধ করি আর করো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়; তিনি এতো বেশি লিখছেন, তা অতিক্রম করাও বোধ করি কঠিন। কম লেখেন

আয়তনে। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সুসংবদ্ধ শব্দের বিন্যাসে সংযমের পরাকাষ্ঠায়। কোনো গ্রন্থের ভূমিকা [নিজের বা অনুরাগীর] এক/আধ পৃষ্ঠার বেশি লেখেন নি। জ্যামিতিতে নিরঙ্কুশ অধিকার, তাই সাহিত্য সমালোচনায় তা প্রয়োগ করে বাংলায় তিনি নিয়ে এলেন এক ভিন্ন মাত্রা। জ্যামিতির চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং প্রমাণিত তো আর কিছু হতে পারে না। এ-এক নতুন চমক, বিস্ময়! চমক তাঁর গ্রন্থের নামকরণেও। 'নজরুলের কবিতা; অসংযমের শিল্প'। বাংলাদেশ ভারত মিলিয়ে কয়েকশ বই বেরিয়েছে নজরুলের উপর। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম আমি তো শুনি নি! এখনো ক্ষেত্র গুপ্ত লিখছেন অনবরত। আগে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া টাইপ রাইটারে লিখতেন, এখন লিখছেন কম্পিউটারে। তাঁর বন্ধু 'চিন্ময়' [চিন্ময় মজুমদার], অনুজপ্রতিম 'সনৎ' [সনৎকুমার মিত্র] এখন প্রকাশ করছেন শুধু! অসাধারণ একটি কাজ 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস'। কোনো ছাত্র বা গবেষকের সাহায্যে নয়, নিজ হাতে প্রতিটি শব্দ বয়ন করে নির্মাণ করছেন এই উষ্ণতার চাদর। একে অতিক্রম করা সবার পক্ষে সহজ হবে না। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও প্রথম লিখলেন তিনি। যা লেখার কথা ছিল বাংলাদেশের লেখক-গবেষকের, তাদের নীরবতা বা নির্লিপ্ততার স্থানটুকু পূরণ করলেন বাংলাদেশের বন্ধু এই অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে তিনি বাংলাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক-অধ্যাপককে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী থেকে ড. আহমদ শরীফকে ডি. লিট প্রদানের প্রস্তাবটি ছিল মূলত তাঁরই। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য', সিলেবাসভুক্ত করণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন। এর প্রভাবে এবং তাঁর পরামর্শে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ধরনের কোর্স অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অসাম্প্রদায়িক জ্ঞানময় বৃক্ষের ছায়ায় নিশ্চিত নির্বাণ জানি।



মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ক্ষেত্রদার সঙ্গে

• • • • • •

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আপাতদৃষ্টিতে ক্ষেত্রদার সঙ্গে আমার মিলের থেকে গরমিলটাই বেশি। যদি রাজনৈতিক ভাবনার কথা বলি, তাহলে ক্ষেত্রদা কম্যুনিস্ট, আমি জাতীয়তাবাদী। যদি ভৌগোলিক ক্ষেত্রের কথা ভাবি, তাহলে ক্ষেত্রদা বাঙাল, আমি ঘটি। যদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক মেলামেশার কথা ভাবি তাহলে ক্ষেত্রদার যাঁরা পরিকর তাঁরা প্রায়শ আমায় এড়িয়ে চলেন। তাঁরা ক্ষেত্রদার মিত্রবৎ কিন্তু আমার নন। বরঞ্চ সুযোগ পেলেই তাঁরা আমাকে একহাত দেখে নিতে চান। সাজ পোষাকে ক্ষেত্রদা শৌখিন নন, আমি একটু বিপরীত। বিদ্যাচর্চায় ক্ষেত্রদা গুরু ধরেছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আমি সুকুমার সেনকে। অথচ ক্ষেত্রদাকে আমি ছাড়তে পারি না, আমাকেও ক্ষেত্রদা। ভাবি, এর রহস্যটা কী!

আমলে দুজনে দুজনের সারস্বত সাধনাকে মর্যাদা দিতুম। ক্ষেত্রদার ধারণা ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমার সামান্য জ্ঞানগম্যি আছে আর আমার শ্রদ্ধা ছিল ক্ষেত্রদার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে। এই সম্পর্ক নিয়ে দুজনের মধ্যে লড়াই হয়েছে কিন্তু মনোমালিন্য হয়নি। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে আমি মুকুন্দ বলতুম, ক্ষেত্রদা মুকুন্দরাম। কবি মুকুন্দরাম নামে ক্ষেত্রদার একটি ছোট বইও আছে। রামহীন মুকুন্দ ও রামযুক্ত মুকুন্দ নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ক্ষেত্রদা ছাড়বার পাত্র নয়, বাঙালের গোঁ। আমিও খাঁটি 'রেঢ়ো'। ছাড়ব না। মুকুন্দ করবই। আমার প্রমাণের অভাব নেই। ক্ষেত্রদা বই চালালেন মুকুন্দরাম দিয়ে; কিন্তু 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'-এ নতুন সংস্করণে 'রাম' বাদ দিয়ে মুকুন্দ লিখলেন। এই হচ্ছেন ক্ষেত্রদা। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সত্যকে মানতে পারেন, প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যের সব শাখায় ক্ষেত্র গুপ্তের অবাধ বিচরণ। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষত কথাসাহিত্য। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চায় তাঁর মনোভঙ্গি লক্ষ্য করবার মতো। ক্ষেত্রদার সমকালে বা তার কিঞ্চিৎ আগে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে এক ধরনের ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য বলে অনেকে মনে করতেন। কথাটার মধ্যে সামান্য সত্য ছিল, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আর এই ধর্ম ধর্ম করতে করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামে একটি সংকলন গ্রন্থে পণ্ডিতরা বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী হচ্ছে বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। দীর্ঘকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনে এই ধারা চলল। ক্ষেত্রদার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গি মেলে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির নাম দিতে পারি আধুনিক মনস্কতা। যেখানে তত্ত্বের রসভাষ্য বড় নয়, বড় হল জীবনরস। এই কাল-পাত্র নিয়ে যে সাহিত্য তা তো সামজবিজ্ঞানেরই নামান্তর। তাই আমি মনে করি সাহিত্যও এক ধরনের সোস্যাল সায়েন্স। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে আমি অনেকটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার

চেষ্টা করেছি। তাই রাধাকে রাধিকা করে সাধিকা করা বা চণ্ডীদাসকে কবি-তাপস বলা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। এই রকম চিন্তাজগতে ক্ষেত্রদার অগ্রণী ভূমিকা আছে। এখানেই ক্ষেত্রদার সঙ্গে আমার মিল। ক্ষেত্রদা নতুন কথা বলতে পারেন, নতুন বিশ্লেষণ পদ্ধতি তৈরি করতে পারেন, অপরের চিন্তাকে উসকে দিতে পারেন। বড় মাপের গবেষকের এটাই ধর্ম।

ক্ষেত্র গুপ্তের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের লেখা একটি গ্রন্থের সঙ্গে ছাত্র বয়সে আমার পরিচয় ঘটে। বইটির নাম 'প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন।' বইটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত। বইটি পড়তে গিয়ে আমি একজন তেজি সাহিত্য-সমালোচকের সন্ধান পাই। এমন আর একটি বই হচ্ছে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বাংলা কাব্য'। এটিও লেখকের যৌবনের প্রথম দিকের তেজি রচনা। ক্ষেত্র গুপ্তের বইটির নাম দেখে আমি একটু উদ্বুদ্ধ হই—প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা! এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে ক্ষেত্র গুপ্তর স্বক্ষেত্র চিনে নেওয়া যায়। তা হল নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ। ক্ষেত্র গুপ্ত এই শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, পরোক্ষভাবে সুকুমার সেনের কাছ থেকে। এই হচ্ছে বিদ্যাচর্চা। এক পুরুষ একটা জিনিস তৈরি করে, উত্তর পুরুষ তাকে নবরূপ দান করে। একেই বলে গবেষণা। ক্ষেত্র গুপ্তের গবেষণা তাই পণ্ডিতি ঘরানার। সস্তায় বাজিমাৎ নয়।

আগেই বলেছি ক্ষেত্র গুপ্ত মূলত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গবেষক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাঁর দু-একটি মাত্র বই আছে। তবে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তিনি 'সেকাল'-এর সাহিত্য নিয়ে নানা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রায় অর্ধেকটাই সেকালের অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর আপ্ত মণ্ডলীর মধ্যে আমার নামও উল্লেখ করেছেন। এতে আমার ভালো লেগেছে। এই বইটির সবচেয়ে বড় গুণ সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা। এখনকার দিনে অনেকে সংক্ষেপে কিছু লিখতে পারেন না। আর অধিকাংশের লেখা স্পষ্ট নয়। কী যে বলতে চাইলেন তা বোঝা গেল না। এঁরা এই রোগের ওষুধ হিসাবে ক্ষেত্র গুপ্তের 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস' বইটা ব্যবহার করতে পারেন। ক্ষেত্র গুপ্তের সংক্ষিপ্ততার ও স্পষ্টতার নমুনা একটু তুলে ধরা যাক।

'চর্যাপদ গান, শ্লোক নয়। শ্লোক চিত্রধর্মী। বহু-চরণ-সমন্বিত চর্যাপদ গীতিধর্মী এবং প্রকৃতপক্ষে এই পদগুলি গাওয়া হত। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্লোক বাংলা সাহিত্যে কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। চর্যার পদ সেকালের বাংলা সাহিত্যে বিস্তৃত পদসাহিত্যের আদর্শ যুগিয়েছে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, চর্যার পদগুলি সংস্কৃত কবিতার মতো মিলহীন নয়, আদ্যন্ত এখানে অন্ত্যানুপ্রাস সযত্নে রক্ষিত। পুরাতন বাংলা কবিতার এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কাহিনীমূলক কাব্যগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—একটি পৌরাণিক পাঁচালী, অন্যটি লৌকিক পাঁচালী। এই দুটি ধারাকে বিশেষ নামে পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন—প্রথমটি অনুবাদ কাব্যধারা, যেমন রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল, মহাভারত পাঁচালী, দ্বিতীয়টি মঙ্গলকাব্য, যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল। ক্ষেত্র গুপ্তও এই চালু নাম দুটি গ্রহণ করেছেন, আমি করতে চাইনি। বিশেষত প্রথমটি। কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী বা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা কাশীরাম দাসের মহাভারত কোনাটিই অনুবাদ সাহিত্য নয়। মধ্যযুগের অর্থেও নয়, আধুনিক অর্থেও নয়। মধ্যযুগে 'অনুবাদ' বলতে বোঝাত সংক্ষিপ্তসার। মঙ্গলকাব্যে অষ্টমঙ্গলা হল 'অনুবাদ' অর্থাৎ পুরো কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার। আধুনিক অর্থে অনুবাদ হল 'ট্রানশ্লেসন' অর্থাৎ ভাষান্তর। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এর কোনটাই নয়। আসলে এগুলি হল অনুসারী সাহিত্য। সংস্কৃত [বাল্মীকি]

রামায়ণ অনুসরণে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ইত্যাদি। অনুবাদের পক্ষে কোনো কবি-স্বীকৃতিও নেই। কৃত্তিবাস বলছেন :

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।

কৃষ্ণমঙ্গলের কবি বলেছেন :

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে।
লোকভাষা রূপে কহি সেই সে কারণে।।

এসব ক্ষেত্রে অনুবাদ -প্রসঙ্গ কোথায়? ক্ষেত্রদার কাছে আমি আশা করেছিলুম একটু ভিন্ন মত। কিন্তু তিনিও প্রচলিত পথে হেঁটেছেন। সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে। তবে মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনায় তাঁর আধুনিক মন বিশেষ ক্রিয়াশীল। এ-মনের পরিচয় আমি তাঁর লেখায় পেয়েছি, কথাবার্তায় পেয়েছি।

ক্ষেত্রদার জান্যার কৌতূহল ও মহৎ প্রাণের সামান্য পরিচয় দিয়ে এই নিবন্ধের উপসংহার টানব। একদিন ক্ষেত্রদার ফোন পেলুম, 'রবি, মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'ব্যালিশ বাজন' বলে একটা শব্দ পাচ্ছি, এর মানে কি? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলাম, ক্ষুদিরাম দাসও দেখলাম, পেলাম না। তোমাকে ফোন করছি।' আমি বললুম, ব্যালিশ বাজন হচ্ছে যে বাজনায় ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী বাজে। ৬ + ৩৬ = ৪২; বিয়াল্লিশই হচ্ছে ব্যালিশ। উনি উত্তর শুনে বললেন, 'তুমি রিটায়ার করেছ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা ডিকসনারি করে দিয়ে যাও। পরে আর কেউ করতে পারবে না।' অনুজের প্রতি ক্ষেত্রদার এই বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় সেদিন আবার নতুন করে পেলুম।

ক্ষেত্রদার বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। তিনি শতায়ু হোন। তাঁর নির্দেশ পালন করে শ্রদ্ধার্ঘ্যটি তাঁর হাতে তুলে দিতে চাই। ক্ষেত্রদার এই নির্দেশের ক্ষেত্রে বৃন্দাবন দাসের গুরু-আজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। :

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বুলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।।

জয়তু ক্ষেত্র গুপ্ত।



মাষ্টারমশাই সমীপেষু

• • • • • •

তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার মাষ্টারমশাই অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত স্বক্ষেত্রে, সগর্বে আজও বিরাজিত স্বমহিমায়। সততই আমরা তাঁর শতায়ু কামনা করি। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমার আত্মার আনন্দ, যৌবনের উপবন— বার্ধক্যের বারানসী। এই উক্তি আমার স্পর্ধার পরিণতি কিনা জানিনা, তবে এটুকু বলতে পারি— আমার ছাত্রজীবন থেকে সুরু করে গবেষণার কাল অবধি যে নম্র-নিবিড়-নৈকট্যের আঙিনায় এসেছি তা গবেষক-নির্দেশকের বিরল দৃষ্টান্তের একটি।

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি এক ঝলক ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্ব নিয়ে সিটি কলেজে [মেইন] আমাদের বাংলার অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের আবির্ভাব। সে সময়ে সিটি কলেজের বাংলা বিভাগ দিক্‌পাল শিক্ষকমণ্ডলীয় পরিমণ্ডলে আলোকিত।

মাষ্টারমশাই তখন হালকা বাদামী রং-এর পাঞ্জাবী এবং ধুতি পরিহিত। জ্বলন্ত চুরুট শোভিত এবং ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত। তাঁর পাঠদানের রীতি কৌশল, সস্নেহ আলাপী বাচনভঙ্গি প্রথম দিনেই আমাদের মন জয় করেছিল। ফলে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের মোড়ে 'কমলে কামিনী' কেবিনের কাছ থেকে আমরা দলবেঁধে তাঁকে সঙ্গ দিয়ে কলেজের 'টিচার্স-রুম' অবধি পৌঁছে দিতাম। ছুটির সময় একইভাবে তাঁর কড়া চুরুটের গন্ধে আমোদিত এবং বাচনভঙ্গিতে আহ্লাদিত হয়ে কখনও কখনও কেশব সেন স্ট্রীট অবধি হেঁটে যেতাম। এই হাঁটা কিন্তু পদযাত্রা ছিল না, ছিল অন্তরঙ্গ হওয়ার সাধু প্রয়াস। চলতি পথে গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন, বিশেষ করে সন্ধান দিতেন নতুন বইয়ের। সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর সম্মুখে-আন্দোলিত কেশরাশির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সস্নেহ হাসিটি। 'কমলে কামিনী' কেবিনের চা-টা বিখ্যাত ছিল কিন্তু সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেও তাঁকে নিয়ে চা খাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। সমস্ত প্রকার উদ্যোগ বানচাল হয়ে গেছে।

সিটি কলেজে বাংলা অনার্সের ছাত্র। অন্যতম শিক্ষক ক্ষেত্র গুপ্ত। ভাষা ও সাহিত্যের উপবনে চঞ্চল-চিত্তে পাঠ গ্রহণে মত্ত। পাঠক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনকার মতো অজস্র সাহায্য পুস্তক তখন ছিল না। সেদিনকার সেই গতানুগতিক পঠন-পাঠনের পরিবেশে মাষ্টারমশাই ভিন্ন-চিন্তার যুক্তিবাদী মনন-ফসল নিয়ে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। শেখালেন নির্দিষ্ট রীতিতে সমালোচনামূলক চিন্তার স্রোতে অবগাহন করতে। তিনি সীমানা নির্দিষ্ট করে নিতে বলেছিলেন :

'The drawing of a line between the objective context and subjective form of phi!osophical doctrins, in such .a dialetical-materiatisl principle of scientific inquiary.'

যৌবনের উপবনে শিক্ষক-দার্শনিক হিসাবে যাকে গ্রহণ করেছিলাম তিনিই বার্ধক্যের প্রারম্ভে নির্দেশক হয়ে গবেষণার পথ দেখান। সাহিত্যপাঠ ভিন্ন পথে চলতে সুরু করেছিল। সাহিত্যের সঙ্গে

মানুষের সম্পর্কের গভীরতা, মাটির সঙ্গে আকাশের মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ভাবের সঙ্গে বস্তুবাদের যুক্তিনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলাম ছাত্রজীবনের ব্যাপক পরিমণ্ডলের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। মাষ্টারমশাইয়ের সাহচর্য সেদিন ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর অকৃপণ দানে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার, চিন্তা ও চেতনা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করেছিল—আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলাম। কাব্য করে বলা যেতে পারে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহন-বাঁশির সুরে তখনকার সাম্মানিক বাংলার শিক্ষার্থীরা মোহিত ছিলাম। মাঝে মাঝে তাঁর উদাস-গম্ভীর নির্দেশনাভঙ্গি আমাদের ভাবনার কারণ ছিল—পড়াশুনোর ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার সমঝোতা পছন্দ করতে না। আন্তরিক অভিব্যক্তিতে আমাদের আকৃষ্ট করতেন এবং নির্দেশ দিতেন সস্নেহে। কখনও কখনও সেই আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে এক স্পন্দনশীল বার্তা পৌঁছে দিত। রচিত হত শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের এক বিরল সেতু। এই সেতুই যুক্ত করেছে অতীতের ছাত্রজীবনের সঙ্গে বর্তমানের আমার গবেষক-শিক্ষক জীবনকে।

অধ্যাপক জীবনের প্রান্তে পৌঁছে মাষ্টারমশাইয়ের দরজায় উপনীত হয়েছিলাম অতীতের হার্দিক সম্পর্ক স্মরণ করে গবেষণার বিষয় নিয়ে গবেষক-বন্ধু সনৎ কুমার মিত্রের দৌত্যে। মাষ্টারমশাই সোজাসুজি বলেছিলেন বিষয় যখন 'রবীন্দ্রনাথ' তখন তাঁর দর্শনের গভীরে প্রবেশ না করে বিশ্লেষণাত্মক বিষয় নির্বাচিত করে শিক্ষা-আলোচনায় প্রয়োগের দিকটি নবতর ভাবনায় উন্মোচিত করতে। শিক্ষক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা ও প্রয়োগের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে গবেষণার বিষয়বস্তু কী সংগঠিত হবে আমি তার বয়স্ক-ছাত্র সেই নির্দেশ মনে রেখে গবেষণার কাঠামো তৈরি করি। তাঁর সস্নেহ নির্দেশে সাফল্য লাভ করি। প্রয়োগের মানদণ্ডে রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূল্যায়ন করতে সক্ষম হই। ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষাকর্মে, বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরি। রবীন্দ্রচর্চাকে মানুষের কাছাকাছি তৃণমূলে নিয়ে যাবার এই দীর্ঘ প্রচেষ্টায় প্রেরণার উৎসস্থল আমার অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত। যৌবনের শিক্ষাগুরু, বার্ধক্যের দীক্ষাগুরু। শতবর্ষে তাঁকে পাবো আরও নোতুন করে।



অনন্য শিক্ষক

• • • • • •

মীনাক্ষী সিংহ

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে যাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, এবং দু-দশক আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁর স্নেহ-সান্নিধ্যে এসে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি—তিনি এই সময়ের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে প্রথম তাঁকে জেনেছি, পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এবং আমার গবেষণার নির্দেশক হিসেবে তাঁর অধীনে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছি।

পরিণত বয়সে এম. ফিল করতে এসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাদপ্রতিম বহু অধ্যাপকের কাছে পাঠলাভের দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল করতে এসে আবার ঘটলো সেই বিরল সুযোগ। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের আশ্চর্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঋজুরেখ বিশ্লেষণ ও গভীর ব্যাখ্যার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হলাম। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য-আধুনিক যুগ থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, আধুনিকতম অবয়ববাদী বিশ্লেষণ অথবা উত্তর-আধুনিক পাঠক্রম সর্বত্রই তাঁর অনায়াস বিচরণ। তাঁর প্রতিটি আলোচনাই নতুন তত্ত্ব ও তথ্যকে আলোকিত করে। প্রথাসিদ্ধ চর্বিত-চর্বণে নয়, নতুন দৃষ্টিকোণের চকিত উদ্ভাসনে তাঁর বিশ্লেষণ অসামান্য। তাঁর কাছে শোনা রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি'র [Instant made eternity]-র অনুভব কিংবা জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর নিপুণ ব্যাখ্যা সমান আকর্ষণীয়। আবার মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথের ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক সমন্বয়ী রীতির আলোচনা শেষে মনে হয়েছে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের সুমিত সংহত অন্তর্লীন আবেগদীপ্ত ভাষণও সেই ক্ল্যাসিক-রোম্যান্টিক রীতির সমন্বয়ী রূপ। তাঁর কোনো আলোচনাই পুনরাবৃত্ত নয়, প্রতিটি ভাষণ নতুনতর ব্যাখ্যায়, নবীনতর বোধে, নবরূপে ঋদ্ধ।

আমার সৌভাগ্য তাঁর নির্দেশনায় গবেষণা করতে পেরেছি। বিষয়টি স্যারের নির্বাচিত—'রবীন্দ্র প্রেমকবিতায় মানবিক প্রেম বনাম তাত্ত্বিকতা'। বিষয়টির গুরুত্ব ও গভীরতা উপলব্ধি করে হয়তো একটু শঙ্কিত ছিলাম, কিন্তু স্যার তাঁর সংযত সংহত ব্যাখ্যায় বিষয়টিকে সহজ করে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনায় তত্ত্বের প্রয়োগ আসে অনিবার্যভাবেই। তত্ত্ববিনির্মুক্ত, রবীন্দ্রকাব্যালোচনা প্রায় অসম্ভব। একথা সত্য যে তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি প্রয়োগ করেছেন সচেতনভাবে। তাঁর কবিতায়, গদ্যে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে এমনকি চিঠিপত্রেও তত্ত্ব এসেছে। কিন্তু স্যার বোঝালেন কেবল তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তাঁকে খুঁজতে যাওয়া আংশিক ও অসম্পূর্ণ। দেহ-মনে পূর্ণ মানুষকে খোঁজাই আসল কাজ। তত্ত্বের প্রতিফলন হিসেবে কবিতাকে দেখা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সেইভাবে দেখার মূল্য হয় তো আছে। কিন্তু আরও তাৎপর্য-পূর্ণ হল জীবনকে দেখা। সেই কাজ যত বেশি হবে ততই রবীন্দ্রকবিতা তার পূর্ণ স্বরূপে আমাদের কাছে ধরা দেবে। এই সূত্র ধরেই আমি রবীন্দ্রকবিতার নিবিড় পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনীও নতুন ভাবে পড়তে

শুরু করি। ফলে নানা সহায়ক গ্রন্থের অরণ্যে না হারিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির নিবিড় পাঠের মধ্যেই তাঁর জীবন, জীবনবোধ ও তত্ত্বকে খুঁজতে চেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা নিয়ে অবিরাম, অনিঃশেষ আলোচনা হয়ে চলেছে। আমার সীমিত সাধ্যে এই দুরূহ কাজে হয়তো ব্রতী হতে সাহসী হতাম না, যদি স্যার উৎসাহ ও সাহস না জোগাতেন।

রবীন্দ্রপ্রেমকবিতার ক্ষেত্রে তিনি দেখাতে চাইলেন কিভাবে তত্ত্বযুক্ত ও তত্ত্বমুক্ত ভাবনা এসেছে। কবির প্রথম দিকের কবিতায় তত্ত্ব এসেছে অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে; অথচ পরিণত প্রায়বৃদ্ধ বয়সে রচিত তাঁর প্রেমকবিতায় তত্ত্বের ভার নেই, নেই দার্শনিকতার মোহিনী আড়াল। তাঁর শেষবেলাকার প্রেমকবিতা তত্ত্ববিনির্মুক্ত আবেগকে ধরে রেখেছে। এ যেন Wordsworth কথিত 'emotion recollected in tranquility'—পরিণত প্রজ্ঞায় স্মৃতিরসে জারিত আবেগের স্বতোৎসার। তাই কবির প্রথম যৌবনের প্রেমকবিতায় যে-কবিমানসী তত্ত্বের নির্মোকে অধরা, বার্ধক্যে তিনি যেন সেই মোহিনী আড়াল সরিয়ে স্বয়ংপ্রকাশ।

আবার রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম আছে কিন্তু প্রেমিক নেই—এই প্রসঙ্গ এনে কল্লোলের কবিরা যে তাঁর বিরুদ্ধে 'নীরক্ত প্রেম'-এর অভিযোগ এনেছিলেন, সেই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি মেলে স্যার তার উত্তর দেবার কথা বলেছিলেন। প্রেমকবিতায় সর্বদা ব্যক্তিপ্রেমিককেই আমরা খুঁজি না—প্রেমের অনন্য অনুভবকে উপলব্ধি করি। প্রেমের প্রথম অনুভব তো ব্যক্তিকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। তাই ব্যক্তি অন্তরালে থাকলেও প্রেম 'নীরক্ত' হয়ে যায় না। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রপ্রেমকবিতা আমার কাছে তার স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে স্যার আমার দৃষ্টিনির্দেশ করেছিলেন এবং ভাবনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন আমার ওপর। তাঁর অধীনে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার তিনি সকলকে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ করার চেষ্টা করেছি—এটাই আমার সৌভাগ্য। আর সেই সূত্র ধরে আজও সাহিত্যবিষয়ক যে কোনও প্রশ্ন, সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে যাই; এখনো না বোঝা কোনো তত্ত্ব তাঁর কাছে বুঝে নিতে চাই। জানি গতানুগতিক ধারায় নয়,—নতুন ভাবনায়, নতুনতর ব্যাখ্যায় স্যার বিষয়টিকে আলোকিত করে তুলবেন। তাঁর কাছে গেলে মনে হয় আমার ছাত্রীজীবন এখনও শেষ হয়নি। তাঁর পাঠদান ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈদগ্ধ্য এটাই বোঝায় যে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত হলেন শিক্ষকদের শিক্ষক—teacher of teachers.

তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।



একজন বর্ণময় শিক্ষকের সান্নিধ্যে

• • • • • •

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

তাঁর নাম তখন শুনেছি, তাঁর লেখা বইও পড়েছি। কিন্তু তখনও দেখিনি সেই মানুষটিকে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নানা কলেজ থেকে আসা ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে। স্নাতক স্তরে কোন কোন শিক্ষকের কাছে আমরা পড়েছি সেসব বিষয়ে কথাবার্তা হত। সিটি কলেজ থেকে যারা এসেছিল তাদের মুখে এমন কয়েকজনের নাম শুনতাম যাঁরা বইয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে খুব পরিচিত নাম। বিভূতি চৌধুরী, বিনয় সরকার, শঙ্খ ঘোষ, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ। আমিও ছিলাম অজিতকুমার ঘোষ, বিভূতি কাঁঠালের ছাত্র। কিন্তু সিটি কলেজ তখন বোধহয় সব কলেজের বাংলা বিভাগকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ছাত্রজীবন শেষ হল। কর্মজীবনের অনেকটা সময় অতিক্রান্ত। তখনও ক্ষেত্র গুপ্তকে দেখিনি। জানছি, অনলসভাবে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছেন।

এমনি করে গত শতকের আটের দশকের গোড়ায় পৌঁছলাম। হঠাৎ মাত্র ষাট বছর বয়সে প্রয়াত হলেন অরুণকুমার রায়। তিনি আমাদের মতো অনেকেরই প্রাথমিক লোকসংস্কৃতি-চর্চার শিক্ষক। প্রথাগত ও আকাদেমিক লোকসংস্কৃতি-চর্চা তিনি করতেন না। অসাধারণ পদ্ধতির সৃষ্টি করে গিয়েছেন তিনি। ১৯৮২ সালের ১৬ অগাস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

পরের বছর প্রয়াত রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে স্মরণসভার অনুষ্ঠান করেন সি. সি. সি. এ নামে এক অসরকারি সংস্থার কর্ণধার শ্রীসঞ্জীব সরকার। সভা হয়েছিল প্রমেথেশ বড়ুয়া সরণিতে, জুট টেকনোলজি অব ইন্ডিয়ার কেনেডি হলে। সেদিন প্রথম দেখলাম ক্ষেত্র গুপ্তকে।

হাফ-হাতা খাটো পাঞ্জাবি ও ধুতি-পরা কোন শিক্ষককে সভায় আসতে সেই আমি প্রথম দেখলাম। ছোট করে কাটা চুল, খোঁচাখোঁচা হয়ে রয়েছে। মঞ্চে উঠে মানুষটি পনেরো মিনিট ভাষণ দিলেন,—বিষয় : সংযোগ ও সম্প্রচার। বিস্মিত হয়ে গেলাম অনন্য বাচনভঙ্গি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও বক্তব্যের গভীরতায়। বিষয়টি নিয়ে গভীরতম অনুধ্যান না থাকলে এভাবে স্পষ্ট উচ্চারণ সম্ভব নয়। নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম।

ছাত্র অবস্থা থেকে অনেক মানুষের ভাষণ শুনেছি। সকলেই প্রায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ স্বনামখ্যাত শিক্ষক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা বক্তব্য বিষয়ে আসার আগে এত ধানাই-পানাই করতেন, মাইকের সামনে অকারণে ডালপালা ছড়িয়ে দিতেন যে মনে হত, তাঁদের বক্তব্যে পৌঁছতে শিবের গীত নয়, মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্বের আমলে চলে গিয়েছেন। অবশ্য এই ছড়িয়ে পড়া ভাষণ আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য,—বড় বেশি অকারণ কথা ব্যয় করি আমরা। অথচ ইউরোপীয় ঐতিহ্য ঠিক এর বিপরীত। বাঙালি বক্তাদের মধ্যে ক্ষেত্র গুপ্তকে আমার সেদিন স্পর্ধিত ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল।

পরপর কয়েক বছর অরুণ রায়ের স্মরণসভা হয়েছিল। প্রতি বছরই তিনি বিচিত্র বিষয়ে ভাষণ

দিতেন। আজও সেসব দিনের সংক্ষিপ্ত দীপ্ত বিশ্লেষণমূলক ভাষণগুলো ভুলিনি।

গত বছর এশিয়াটিক সোসাইটিতে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একটি আলোচনা সভার উদ্বোধক হিসেবে এসেছিলেন ক্ষেত্র গুপ্ত। অশক্ত শরীর, ম্রিয়মাণ উজ্জ্বলতা,—কিন্তু কথাবার্তায় কোন বিষণ্ণতা নেই। যে বক্তব্য পেশ করলেন তা মনে করিয়ে দিল তাঁর প্রথম বক্তৃতার সময়কার কথা। সেই সপ্রতিভ দীপ্ত উচ্চারণ।

প্রথম ভাষণ শোনার পরে পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। সভা-সমিতিতে দেখা হয়েছে। কোনদিন কথা হয়নি। দূর থেকেই সম্ভ্রম জানিয়েছি।

১৯৮৭ সাল। বেশ কিছুকাল আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি সরকারি কর্মসূত্রে। এই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তাঁর কাছে ডাকযোগে প্রবন্ধ আহ্বান করি। প্রবন্ধ চাইলেই ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতেন কোন ছাত্র-ছাত্রীর হাত দিয়ে।

১৯৮৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত বললেন, তোমাকে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষেত্রদার সঙ্গে দেখা করতে হবে। পল্লবদার সঙ্গে পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন তিনি ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

গেলাম রবীন্দ্রভারতীতে। পল্লবদা নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর অধ্যাপকের ঘরে। ঢুকতেই বললো, এসো। বসলাম। বললেন, আমি পল্লবের কাছে শুনেছি, তুমি টাইপ ও মোটিফ নিয়ে লেখালেখি করছ। এই বিষয়ে তুমি পি. এইচ. ডি করো। আমি তোমার গাইড হব।

হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। আকাদেমিক কোন কাজ করব ভাবিনি। আবার ইচ্ছেও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু নিজের ওপর আস্থা ছিলনা। পল্লবদা আমার জীবনে নানাভাবে অশেষ উপকার করেছেন। তিনি যে এভাবে ক্ষেত্র গুপ্তের তত্ত্বাবধানে আমাকে কাজ করাবেন, তা ভাবতে পারিনি।

দেখলাম পল্লবদা ফর্ম বের করলেন, নিজেই পূরণ করলেন। স্বাক্ষর করলাম, ক্ষেত্র গুপ্ত স্বাক্ষর করলেন। পরের জমা দেবার কাজ পল্লবদাই করেছিলেন।

প্রথম দিনে ক্ষেত্র গুপ্ত বললেন, শোনো দিব্য, পল্লব যখন তোমার বিষয়টার কথা বলল, তখন বিষয়টা আমার ভালো লাগল। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানিনা, তুমি যা করবে তাই চূড়ান্ত। আমাকে দেখিয়ে নিয়ো, কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিছু জানিনা।

দু'বছর কাজ করার সময় মাঝে মাঝে তাঁকে লেখা দেখাতাম। মাঝে-মধ্যে যেসব মন্তব্য করতেন, তাতে বুঝেছি বিদ্যা কীভাবে একজন প্রাজ্ঞ মানুষকে সত্যিকার বিনয়ী করে তোলে।

গবেষণার অধ্যায়গুলো লিখে তাঁকে দেখাতাম। খাতার পাতাগুলো উল্টে যেতেন। কিন্তু লক্ষ করেছি প্রখর দৃষ্টিতে দেখছেন, তখন কথা বলতেন না।

একদিন বললেন,—তুমি 'অনুবাদিত' শব্দটি লিখেছ। এই শব্দটি অশুদ্ধ প্রয়োগ বলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুনতে ভালো লাগে না। বিশেষ করে 'অনূদিত' শব্দটি যখন শুনতে খুব ভালো লাগে।

বললাম, আমি অশুদ্ধ প্রয়োগ জানি। কিন্তু সাক্ষরতা প্রকাশন থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের ছয় খণ্ডে প্রকাশিত মহাভারতে 'অনুবাদিত' শব্দটি রয়েছে। তথ্যের খাতিরে লিখেছি।

তিনি বললেন, তথ্যের খাতিরে তুমি ঠিকই লিখেছো, কিন্তু আমার সন্দেহ রয়েছে, পুরনো সংস্করণে 'অনুবাদিত' শব্দটি নেই। কেননা, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রাজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকুল। তাঁরা এ শব্দ লিখতে পারেন না। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পণ্ডিতেরা ব্যাকরণ বিষয়ে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন।

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী মহাভারতের পুরনো সংস্করণ আর দেখা হয়ে ওঠেনি।

পল্লবদার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাঙুর অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে গিয়েছি। তিনি আমার লেখা খাতা দেখছেন। হঠাৎ বললেন, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। সিগারেট দাও তো।

আমি সিগারেট খেতাম, তখনও খাই। কিন্তু শিক্ষকের এমন কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। বললাম, স্যার, কাছেই তো দোকান, এনে দিচ্ছি।

বললেন, আরে আনতে হবে না। তোমার কাছেই আছে, তার থেকেই দাও।

জীবনে বহুবার অপ্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু শিক্ষকের কাছে এমন অপদস্থ আর কখনও হইনি। এ-চরিত্র তো ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরাকে অস্বীকার করেই গড়ে উঠেছে। পাশে বসে থাকা পল্লবদা মিট্‌মিট্ করে তখন হাসছেন। তিনি তো অনেক ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর ক্ষেত্রদাকে চেনেন।

দু-বছর কেটে গেল। রেজিস্ট্রেশন হওয়ার দু-বছরের পরের দিন গবেষণা-পত্রটি জমা দিলাম। প্রশাসনিক সব কাজ করিয়ে দিলেন পল্লবদা।

স্যারের চিঠি পেলাম। ওমুক তারিখে মৌখিক পরীক্ষা এসব গবেষণা, আকাদেমিক বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। বেশ দুশ্চিন্তায় আছি। পরীক্ষক যদি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন, যদি উত্তর দিতে না পারি! স্যার তো গবেষণা নিয়ে কোনদিন কোনো আলোচনাই করলেন না।

মুশকিল আসান পল্লবদাকে জানালাম। হেসে বললেন, সেদিন একটু তাড়াতাড়ি যেয়ো। ক্ষেত্রদার সঙ্গে কথা বলে নিয়ো।

সেদিন গেলাম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের ঘরে। অনেক কথা হল, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করতে পারলাম না। এমন ব্যক্তিত্ব যে নিজে থেকে কিছু বলা অসম্ভব।

ঘরে ঢুকলেন প্রবীণ অধ্যাপক হরিপদ চক্রবর্তী। দূর থেকে দু-একবার দেখেছি। কেমন যেন প্রাজ্ঞ বৈষ্ণব মানুষ বলে অনুভব হয়। মুখে-চোখে-অবয়বে আশ্চর্য প্রশান্তি। তাঁকে প্রণাম করলাম।

স্যার বললেন, স্যার, এবার দিব্যজ্যোতিকে প্রশ্ন করুন। পরীক্ষক চক্রবর্তী বললেন, তোমার বিষয়টি অন্য ধরনের। আমি এ বিষয়ে তেমন জানি না। তবে তোমার কাজ আমার ভাল লেগেছে। শুধু একটা কথা বলি, আমরা হলাম রসের কারবারি। কিন্তু তোমার গবেষণায় কোন রসকষ নেই। বাবা, কিছু মনে করো না।

কেমন যেন ভয় পেলাম। মুহূর্তে পাশ থেকে শুনতে পেলাম, স্যার, পদ্ধতিবিদ্যায় রসকষ থাকে না, রসের কথা থাকলে পদ্ধতি-বিচার হয় না। ও কিছু করার নেই। নিন, সই করুন।

সহৃদয় পরীক্ষক স্মিত হাসলেন। বললেন, না তা বলছি না, তবে ক্ষেত্র মনের কথা তো বলতেই হবে।

অপরূপ হেসে স্যারের দেওয়া কাগজে স্বাক্ষর দিলেন আমার পরীক্ষক পূজনীয় হরিপদ চক্রবর্তী।

সেদিন অনেকক্ষণ ছিলাম স্যারের ঘরে, সঙ্গে পল্লবদা। স্যার বললেন, তুমিই বোধহয় প্রথম যে আমার কাছে গবেষণা করে মাত্র দু-বছর পরে গবেষণা পত্র জমা দিলে। খুব ভাল লাগছে। আরও ভাল লাগছে, তুমি সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত। যাঃ, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে, দাও সিগারেট। লজ্জার কি আছে? সিগারেট খাওয়ায় কোন পাপ নেই।

এই বর্ণময় শিক্ষককে প্রণাম। এমন মানুষের সান্নিধ্যে মন ভাল হয়ে যায়।

❐

লোকসংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত

• • • • • • •

বরুণকুমার চক্রবর্তী

বর্তমান স্পেশালাইজেশনের যুগে যখন জ্ঞানচর্চায় আমরা Water tight compartment- এ নিজেদের অন্তরীণ করে ফেলেছি, তখন যদি কোনো বিরল ব্যক্তিত্ব সেই সংকীর্ণ পরিসর ভেঙে জ্ঞানচর্চার উদার ও বিরাট প্রাঙ্গণে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন, স্বভাবতই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়দৃষ্টি গিয়ে পড়ে। একে একে নিভিছে দেউটি, বাঙালি মনীষার উজ্জ্বল দীপগুলি যখন প্রায় নির্বাপিত, তখনও কতিপয় ব্যতিক্রমী যাঁরা সারস্বত সাধনায় নিজেদের শালপ্রাংশুর ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, বাঙালির শেষ আশা ভরসার স্থল হয়ে বিরাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি ভক্তিবিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হবেই। এতসব কথা বলার উপলক্ষ যিনি তিনি অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত। এই মুহূর্তে ক্ষেত্র গুপ্তের মত সক্রিয় সৃষ্টিশীল সারস্বত সাধকের আর দ্বিতীয় নজির মিলবে না। বিস্মৃত হলে চলবে না, বয়স তাঁর প্রৌঢ়ত্বকে অতিক্রম করেছে অনেক আগেই, সেই সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় এক দশক তিনি এক মারণ ব্যাধিকে মোকাবিলা করে চলেছেন। কিন্তু বয়স বা কালান্তক ব্যাধি কিছুই এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী 'যুবক'কে নিরুৎসাহ করতে পারেনি, হতোদ্যম করেনি। গত বছর দশেকে ক্ষেত্র গুপ্তর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দেখলে বোঝা যাবে যতই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন, ততই যেন তাঁর মানসিক দৃঢ়তা জোরদার হয়েছে, নিত্য নতুন বিষয় নির্বাচনে এবং মননশীলতার অতুলনীয় পরিচয় দানে আমাদের মত তথাকথিত সমস্যা ও প্রতিকূলতামুক্ত মানুষদের লজ্জায় সঙ্কুচিত করেছেন। যুবশক্তির মত এই অতন্দ্র মননশীল মানুষটি নিত্য নতুন বিষয় নির্বাচন করে অফুরন্ত উৎসাহের এবং অসীম প্রাণশক্তি তথা চেতনার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি, একান্তভাবেই আধুনিক সাহিত্যের চর্চা করে এসেছেন এবং সেই মানসিকতা নিয়েই মাঝে মাঝে মধ্যযুগে ঘুরে এসেছেন। গ্রন্থসংখ্যার নিরিখে তাঁর দাবি অকাট্য, কিন্তু তাই বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে নিছক মুখ বদলাবার জন্য তাঁর এই বিষয়ান্তরে কিংবা যুগান্তরে গমন। ক্ষেত্র গুপ্ত রচিত 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' এবং 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস' তৎসহ 'কবি·মুকুন্দরাম' গ্রন্থত্রয় প্রমাণ করে আমাদের অবহেলিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কি অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তিনি, সে আলোচনায় তাঁর উন্নাসিকতা প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে গভীর মমত্ববোধ এবং এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দেন নি। আধুনিক মননে মধ্যযুগের সাহিত্যের কি বিশেষত্ব তা বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে তাঁর আলোচনায়। সে আলোচনা অবশ্যই চর্বিত-চর্বন নয়, পরন্তু নবতর মূল্যায়ন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর বিরল দৃষ্টিভঙ্গি এবং অননুকরণীয় আলোচনার সুবাদে।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা মূলত ক্ষেত্রবাবুর লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার পরিচয় নেব। যে নতুনত্বের সন্ধানে তিনি সত্যজিতের চিত্রনাট্যগুলির সাহিত্য- গুণ সম্পর্কে আলোকপাত করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চৌহদ্দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই নতুনত্বের সন্ধানেই

তাঁর লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা ও তার প্রাঙ্গণে পদচারণা। না, এই ব্যাপারে তিনি অবাঞ্ছিত ত নন‌ই, এমনকি তিনি অনভিপ্রেত এমন কথাও কেউ বলবে না। প্রদীপ প্রজ্বলনের পূর্বে যেমন সলতে পাকানো, তেমনি লোকসংস্কৃতির আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর Warming up ঘটেছে একাধিক গবেষককে অবিমিশ্র লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণায় তত্ত্বাবধান করার সময়ে। এমন কি এঁদের মধ্যে রয়েছেন লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব আলোচনায় প্রবীন ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার এবং বয়সে নবীন অথচ মেধাবী ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তও। তাঁর‌ই হাতে তৈরি।

এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ। সবেতেই বিশ্বায়নের উপস্থিতি। শুধু রাজনীতি কিংবা অর্থনীতিতেই নয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিশ্বায়ন এখন নিয়ন্তার ভূমিকা নিচ্ছে। ক্ষেত্র গুপ্ত লিখলেন একটি গোটা বই 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি' [২০০২]। গ্রন্থভুক্ত আলোচনাগুলি যথাক্রমে ক, খ ও গ এই তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। শেষ থেকেই শুরু করি। 'গ' পর্যায়ে তিনি রবীন্দ্র-গল্পে লোকসংস্কৃতির অভিঘাত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আলোচনা করেছেন 'মুক্তধারা ও গ্রামীণ থিয়েটার' প্রসঙ্গে, যাত্রাপালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র 'বাঙ্গালী' পালাটিও আলোচিত হয়েছে। 'খ' পর্যায়ে লেখক দুর্গা, গণেশ, অরণ্যচণ্ডী ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার কথা জানিয়েছেন। তাঁর সব বক্তব্যই যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এমন নয়, কিন্তু তাঁর চিন্তার মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমান প্রতিবেদকের মতে গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 'ক' পর্যায়ের আলোচনাগুলি। গ্লোবালাইজেশনের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মোকাবিলা করার দাওয়াই হিসেবে তিনি সঠিকভাবেই বাতলেছেন লোকসংস্কৃতিকে—'লোকসংস্কৃতির সেইসব নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগাবার সময় এসেছে'। ....অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'ভাবুক পণ্ডিত কর্মী এবং অপরাপর সামাজিকদের গ্লোবালাইজেশনের মধ্যেও নিসর্গ চেতনা, স্বাদেশিকতা, ঐতিহ্য ও মানবিক বিশিষ্ট মূল্যবোধে জাতিকে জাগ্রত রাখার জন্য ফোকলোরের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে—প্রতিবেদকের মতে নান্য পন্থা বিদ্যতে।'

কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনেই দায়িত্ব শেষ হয়নি, কারণগুলিও ব্যাখ্যাত হয়েছে যুক্তিনিষ্ঠভাবে। তাই ফোকলোরের অসাধারণ সংযোগ ক্ষমতা, এর মধ্যে নিহিত স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেম, এমনকি বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষুদ্রাংশও অন্ততপক্ষে ফোক ক্রাফট প্রভাবিত করবে। লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত একের পর এক দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। যেমন ভবানী সেনের নির্বাচনী বক্তৃতাকে কথকতার আদলে উপস্থাপিত করা, মোহনবাঁশি বাবুর পদ্মবিড়িকে জনপ্রিয় করে তুলতে মানভঞ্জন ও নৌকাবিলাস পালাগানের সহায়তা গ্রহণ ইত্যাদি। পর্যটন কেন্দ্রকে জনপ্রিয় করে তুলতেও লেখক লোকসংস্কৃতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করার ওপর জোর দিয়েছেন—'প্রতিটি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি, লোক বিনোদন, লোককারু সম্ভার সব মিলিয়ে যে পর্যটন পণ্য তৈরি হবে, বিশ্ব বাণিজ্যের হাটে তাতে দেশের ছাপ থেকে যাবে।' বিশ্ববাণিজ্যের যুগে আত্মসম্মানে স্বাতন্ত্র্যে বাঁচার চাবিটি রয়ে গেছে লোকসংস্কৃতির জঠরেই। না, এ নিছক ভাবালুতা নয়, দিবাস্বপ্নও নয়, খাঁটি বাস্তব। 'মিথ ও আধুনিককাল' শীর্ষক আলোচনায় চলচ্চিত্র, সাহিত্যের বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে লেখক দেখিয়েছেন মিথের শিল্পপ্রকরণ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার প্রসঙ্গটি, শুধু কি তাই? আধুনিক, অবিশ্বাসী আর সংশয়ী মানুষের কাছেও মিথ বাস্তবতার উপাদান রূপে গৃহীত, মিথপ্রাণ আদিম গোষ্ঠীগুলিকে বোঝাবার এবং কাব্যে শিল্পে ব্যবহার্য উপাদান হিসাবে অত্যন্ত কার্যকরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। 'লোক-সহযোগ : একটি গণমাধ্যম' একটি ভিন্ন মাত্রার রচনা। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণমাধ্যমগুলি যতই সমৃদ্ধ ও কার্যকরী ভূমিকা-সম্বলিত হোক তথাপি এগুলির রয়েছে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। লেখক সঠিক ভাবেই বলেছেন, 'যাবতীয় গণমাধ্যমই কতকগুলি উপায়

মাত্র—মানুষের কাছে পৌঁছবার কৌশল বা পদ্ধতিই শুধু।' এই প্রেক্ষিতেই তিনি আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি গণমাধ্যম রূপে কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিয়ে অত্যন্ত জরুরী কিছু পথ নির্দেশ করেছেন। লোকসংস্কৃতি নিছক উপায় মাত্র নয়, তা বিষয়ও, তা বিনোদন এবং মাধ্যমও। লোকসংস্কৃতির অন্তর্লীন শক্তিকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করার জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল উন্নয়নমূলক ও শিক্ষামূলক কাজ, বিনোদনমূলক লোকসংস্কৃতি কর্মী ও শিল্পীর বিকল্প উপার্জনের সুযোগ, গণমাধ্যম রূপে এর উন্নয়ন ও ব্যবহার। ক্ষেত্রবাবু প্রায়োগিক লোকসংস্কৃতিকে 'ঐতিহাসিক নিয়তি' বলে অভিহিত করেছেন। তাই বলে তিনি শুদ্ধ লোকসংস্কৃতির অনুশীলনের বিরোধিতা করেন নি, বলেছেন ব্যবহারিক লোকসংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ লোকসংস্কৃতির অনুশীলন বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। বাস্তবতাই তাঁকে মধ্যপন্থী করেছে।

'সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি' [পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০২] ক্ষেত্র গুপ্তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। সংযোগ যে তাঁর প্রিয় বিষয় এ পরিচয় ইতিমধ্যেই মিলেছে, অবিমিশ্র সাহিত্যের মানুষ যে কমিউনিকেশনের মত অত্যাধুনিক একটি বিষয় নিয়ে এমন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারেন, এ গ্রন্থটি প্রকাশিত না হলে সে তথ্য অজ্ঞাত থেকে যেত। আলোচনার সূচনাতেই তিনি মোক্ষম প্রশ্ন নিক্ষেপ করেছেন :

আমাদের সাহিত্য যতই আধুনিক হচ্ছে, জটিল ও বিচিত্র হচ্ছে, ততই জনগণ দূরে সরে যাচ্ছে।... আধুনিক শিল্প সাহিত্য বা নাট্যসঙ্গীত বা চিত্র যদি তার সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে আসতে চায় তাতে কি উঁচু মান থেকে নেমে আসতেই হবে? অন্য পথ নেই। যত নামবে ততই বাড়বে গণসংযোগ। অথবা গণচেতনাকে টেনে তুলতে হবে উঁচু সূক্ষ্ম শিল্পবোধের দিকে। আর সে কাজও একান্ত অসম্ভব বলেই একটা রফা করতে হবে।' পরবর্তী পর্যায়ে লেখক ক্রমান্বয়ে এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধান করেছেন। চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শনের মত শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলির সীমাবদ্ধতা কোথায় লেখক তা দেখিয়েছেন—সরকারী নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ এক ভাষার ব্যবহার, রাজনৈতিক প্রভাব এসবের কারণেই এই সব মাধ্যম বাঞ্ছিত সংযোগ সাধনে ব্যর্থ, অন্তত আংশিক ভাবেও। অন্যদিকে লোকমাধ্যমগুলি কি পরিমাণে সংযোগ ক্ষমতার অধিকারী তার অনুপুঙ্খ বিশেষণ করেছেন। কথকতা, পাঁচালী গান, রয়ানি গান, নীলের গান, বহুরূপী, পুতুল খেলা এই লোকমাধ্যমগুলির সবিস্তারে পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি সংযোগের নিরিখে এগুলির অনন্যতা বিশ্লেষণ করেছেন। লোকমাধ্যমগুলির গণসংযোগের ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয় দান ব্যতীত একটি নির্মম সত্যকেও সামনে এনেছেন— নিছক লোক-আঙ্গিকের ব্যবহারেই কি তা লোকজের মর্যাদা পাবে? ক্ষেত্রগুপ্ত নির্ভীকভাবে এর উত্তরও দিয়েছেন, দ্বিধাহীন ভাবে বলেছেন :

'বাউল, কবিগান, ঝুমুর প্রভৃতির সুর, ঢং এবং গাইবার ভঙ্গী বজায় রেখে, ভাষা প্রয়োগের প্রচলিত কৌশলে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে লোকশিল্পীরা আজকাল নারীনিগ্রহ, বা সার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে গান বাঁধে ও গায়, তাকে লোক মাধ্যমের ব্যবহারই বলব, লোকগীতি বলা চলবে না। .. কেউ যদি এভাবে তৈরি গানকে লোকগীতের নবরূপায়ণ, বিবর্তিত ও দায়বদ্ধ অভিব্যক্তি বলে চালাতে চান তো প্রতিবাদ করতেই হবে। তাছাড়া এই ধরনের ব্যবহার যদি সতর্ক না হয় তবে লোকশিল্পী সহজে মত বিশেষের প্রচারক বলে চিহ্নিত হবেন... জনসংযোগের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে।'

'লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব' [২০০২] আমাদের আলোচ্য শেষ গ্রন্থ। লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব নিয়েও খুব বেশি আলোচনা হয়নি। এ বিষয়ে পবিত্র সরকার একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, আর একটি

দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন পল্লব সেনগুপ্ত। আলোচ্য গ্রন্থটি এবং পূর্বোল্লিখিত রচনার জাত এক হলেও পাঁত এক নয়। এক্ষেত্রেও ক্ষেত্র গুপ্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। প্রথমেই গ্রন্থটির অভিনব উপস্থাপন-ভঙ্গির কথা বলতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারদের অনুসরণে লেখক কারিকা তথা সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আবার উপস্থিত কারিকার টিকাও তিনিই রচনা করেছেন। লেখক নাম দিয়েছেন লোকনন্দনিকা চিত্তরঞ্জিনী। লোকসংস্কৃতির যে উপভোগ্যতা আছে নিছক ব্যবহারিক উপযোগিতাতেই তা সীমাবদ্ধ নয়, এ-সত্য অনস্বীকার্য। এই উপভোগ্যতার স্বাদ পেতেই একটি সুশৃঙ্খল শাস্ত্রের প্রয়োজন। লেখকের সেই কারণেই বর্তমান প্রয়াস। সাকুল্যে ৬৯টি সূত্র বা কারিকা উপস্থাপিত হয়েছে, প্রদত্ত হয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যাও। এই একটি গ্রন্থ নিয়েই সবিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারত, কিন্তু স্থানাভাবে শুধু এইটুকুই বলার যে লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্বের এমন আনুপূর্বিক আলোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে হয়নি। লেখক সচেতন সৃজনের সঙ্গে অচেতন সৃজনের পার্থক্য দেখিয়েছেন, অ্যামেচার এবং প্রফেশনাল এই দুটি বিভাগ করেছেন, লোকসংস্কৃতির স্বপ্নময় পরাবাস্তবতায় তৃতীয় মাত্রাকে সংযোজিত দেখেছেন, লোকনান্দনিকতা শিষ্ট নান্দনিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে দাবি পেশ করেছেন, মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে লোকনন্দনতত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

সামগ্রিক ভাবে তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য এবারে পেশ করি। ফোকলোরের প্রতিশব্দ রূপে 'লোকসৃষ্টি' একটি নতুন coinage, কিন্তু প্রশ্ন হল লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকপ্রথা, লোকাচার এসব কি সৃষ্টির পর্যায়ে পড়বে! লোককথার দুটি বিভাগ করেছেন লেখক : রূপকথা ও উপকথা। ব্রতকথার প্রসঙ্গটি অনুল্লিখিত থেকে গেছে। পশুকথাকে তিনি উপকথা বলেছেন। বর্তমানে কিন্তু Animal tales পশুকথা বলেই পরিচিত, উপকথা অভিধাটি পরিত্যক্ত। কিন্তু এসব টুকিটাকি বিতর্ক বাদ দিলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ক্ষেত্র গুপ্ত এই তিনটি গ্রন্থ রচনার সুবাদে পুরোদস্তুর একজন লোকসংস্কৃতিবিদ রূপে নিজের স্থানটিকে স্থায়ী করে নিয়েছেন। কোনো কোনো বিত্তবান ও রুচিশীল আমন্ত্রণকর্তা আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের জন্য রাজকীয় আয়োজন করেও অনেক সময় দীনতা প্রকাশ করেন তাঁর আয়োজন যৎসামান্য বলে, তেমনিই তিনটি গ্রন্থে অধ্যাপক গুপ্ত লোকসংস্কৃতির রাজকীয় আয়োজন সত্ত্বেও একধরনের কুণ্ঠা দেখিয়েছেন, ভাবটা এমন যেন তিনি তাঁর এক্তিয়ার ছাড়িয়ে অহেতুক অন্য বিষয়ে নাক গলিয়েছেন। গ্রন্থ তিনটি পাঠের পর কিন্তু ধরা পড়ে যায় অধ্যাপক গুপ্তের কুণ্ঠা কতখানি অর্থহীন। এমন তিনটি বিষয়কে তিনি উপজীব্য করেছেন যা সচরাচর পেশাদার লোকসংস্কৃতিবিদও আলোচনায় সাহসী হতেন না। কোনো চর্বিতচর্বণ নয়, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নয়, এ দেশীয় অথবা বিদেশীয় পণ্ডিতদের অভিমতের বারংবার উল্লেখে নিজের বক্তব্যের সমীচীনতা প্রমাণে তিনি উৎসাহী নন। কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে তবেই এটা সম্ভব বোঝা যায়। সবশেষে, আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অন্দরমহলের এত অনুপুঙ্খ তথ্যাদির অধিকারী হয়েও লেখক এতদিন নীরবতা পালন করেছিলেন কেন? তাঁর মৌনতা আরও কিছু পুর্বে ভঙ্গ হলে আমাদের লোকসংস্কৃতিচর্চা সমৃদ্ধ হত, অন্যবিধ এক ডাইমেনশন পেত। Better late than never–বিলম্বে হোক, তবু এমন Matured আলোচনা সহজলভ্য নয়। অধ্যাপক গুপ্তকে কৃতজ্ঞতা জানাই বিলম্বে হলেও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে লেখনী ধারণের জন্য।

❒

যে যা খুশি বলতে পারে, আমি ক্ষেত্র গুপ্ত-পন্থী

• • • • • •

দেবকুমার ঘোষ

যে-যা খুশি বলতে পারে কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে নিজেকে আমি ক্ষেত্র গুপ্ত-পন্থী বলেই মনে করি। তাঁর বই পড়তে পড়তেই আমার সাহিত্যবিচার করতে শেখা এবং সাহিত্যবিচারের পথ জানা। তাঁর মতোই টেক্সট ও গঠন নির্ভর সাহিত্যালোচনায় আমি বিশ্বাসী। তাঁর হাত ধরেই 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচক হয়ে ওঠা। তাঁর পাশে থেকেই আমার গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা। রচনাসঙ্গী এবং প্রবন্ধসঙ্গী : সাহিত্য-সংস্কৃতি ১১২-গ্রন্থ দুটি তাঁর পাশে থেকেই তাঁরই সঙ্গে করা। তাঁর দেনাপাওনা এবং মুক্তধারা দিয়েই আমার উপন্যাস ও নাটকের আলোচনা শুরু। তাঁর স্বীকৃতি পেয়েই মধ্যযুগের সাহিত্যালোচনায় আমার স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর নির্দেশ আশীর্বাদ ও স্নেহধন্যতাতেই রবীন্দ্রসাহিত্যে পাঠান্তর নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় আমি ক্রমশ পরিণত থেকে পরিণততর—রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর : মানসী, সোনার তরী : বিষয়-পাঠান্তর, চিত্রা : অপ্রকাশিত-অমনোনীত, স্মরণ [পাঠান্তরিত সংস্করণ] : সম্পাদনা ও ভূমিকা, ছেলেবেলা [টীকা ও পাঠান্তর] : সম্পাদনা ও ভূমিকা, শারদোৎসব থেকে ঋণশোধ-এর মতো সব গ্রন্থে।

তাঁরই তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পি. এইচ. ডি. ['রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর : মানসী থেকে চিত্রা'] ১৯৯৪-এ। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও তাগিদে রবীন্দ্রভারতী থেকেই আমি ডি. লিট্ [রবীন্দ্রকবিতার মধ্যপর্বের পাঠান্তর : কল্পনা থেকে খেয়া] ১৯৯৭-এ। তাঁর উদ্যোগেই আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক।

আমি আমার পি এইচ ডি এবং ডি লিট্ গবেষণায় যে কথা বোঝাতে চেয়েছি তা খুব সংক্ষেপে এইরকম :

রবীন্দ্রকাব্যের যাত্রা কবিকাহিনী দিয়ে ১৮৭৮-এ; কিন্তু সে তো প্রকাশকাল। জীবনস্মৃতি ছেলেবেলা-র সাক্ষ্য গ্রহণ করলে রবীন্দ্র-কাব্যরচনারম্ভ-কাল আরো বেশ কিছুটা পেছিয়ে যায়। ছেলেবেলায় ১১ অধ্যায়ে আছে 'ছাত্রবৃত্তির ক্লাসে যখন পড়ি সুপরিন্টেডেন্ট গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি'। এই সময়-পর্ব 'রবিজীবনী' অনুসারে ১৮৭০। জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপি অনুসারে শ্রীযুক্তগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফরমায়েসী কবিতাটি: সদ্ভাব। অবশ্য এরও আগে ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশের কাছ থেকে চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে পয়ার লিখতে শেখার পরে পদ্মের ওপর কবিতা রচনার প্রয়াস, 'নীলখাতায়' লেখা পদ্ম-সম্পর্কিত কবিতা। এ নিয়ে শ্রীযুক্তনবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মতামত থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনারম্ভ ১৮৭০-র আগেই হয়ে গেছে।

১৮৭০-এ 'সদ্ভাব' দিয়ে শুরু করা হলে ১৯০০ -তে 'কল্পনা'য় রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও কাব্য রচনার প্রথম তিরিশ-বছর অতিক্রম করেছেন। তাঁর রচনার শেষ-তিরিশ বছর : ১৯১০-১৯৪১। যদি প্রথম তিরিশ-বছর আদ্যপর্ব হয়, তবে শেষ তিরিশ-বছর অন্ত্যপর্ব। আর ১৯০০-১৯০৯

মধ্যপর্ব : কল্পনা থেকে খেয়ার পর্ব। রবীন্দ্রকাব্যের আদ্যপর্ব বলতে তাই ১৮৭০-১৯০০। এর পরিণত অংশ : 'মানসী' থেকে 'চিত্রা' কাব্যপর্ব। মধ্যপর্ব বলতে তাই 'কল্পনা' [১৯০০] থেকে 'খেয়া' [১৯০৬]। খেয়া [১৯০৬] থেকে গীতাঞ্জলি [১৯১০] প্রকাশের মধ্যে ১৯০৯-র 'শিশু'ই একমাত্র প্রকাশিত কাব্য। এই পর্বে প্রকাশিত কাব্য : কল্পনা ক্ষণিকা। [১৯০০]; 'কাব্যগ্রন্থাবলী' [১৯০৩]-তে সংকলিত স্মরণ [স্বতন্ত্র ১৯১৪] শিশু [স্বতন্ত্র ১৯০৯] ও উৎসর্গ [স্বতন্ত্র]; এবং খেয়া [১৯০৬]।

রবীন্দ্রকাব্যের আদ্যপর্বের পরিণত-অংশের [মানসী থেকে চিত্রা : মানসী, সোনার তরী এবং চিত্রা] কাব্য-কবিতার পাঠান্তর বিবেচনার মধ্য দিয়ে চারটি বিশিষ্ট-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম :

১. রবীন্দ্রনাথের কবিতা কোনো অলৌকিক-ক্রিয়ার পরিণতি নয়, সেখানে বারবার নান্দনিক-শ্রমের মধ্য দিয়ে সিদ্ধি অর্জন করতে হয়। পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা অর্জন করেছেন।

২. কবির মধ্যে স্রষ্টা ও নির্মাতা দুই-সত্তা আছে। এই দুই-সত্তা যতক্ষণ পরস্পর মিলিত ও তৃপ্ত না হয়—একক-সত্তার রূপ পরিগ্রহ না করে, ততক্ষণ কবিতা সার্থক হয়ে ওঠে না এবং সেই অভিপ্রায়ে পাণ্ডুলিপিতে-পত্রিকায়-সংকলনে-সংস্করণে-সংস্করণে চলে কবিতার পাঠ পরিবর্তন-পরিবর্জন ইত্যাদি। কালানুক্রমিক ভাবে এসব পরপর সাজিয়েই তৈরি হয় কবিতার পাঠান্তর। কবিতার পাঠান্তরের মধ্য থেকেই কবির সৃষ্টি ও নির্মাণের বিভিন্ন অজানা প্রদেশ সন্ধান করা যায়। প্রচলিত ছাপা কবিতার মধ্যে সেই সন্ধান মেলে না।

৩. কবিতার পূর্ণাঙ্গ-পাঠ [সব পাঠান্তর এবং কবির জীবিতাবস্থায় কাব্য ও কবিতার শেষতম প্রচলিত পাঠের কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত রূপই কবিতার পূর্ণাঙ্গ পাঠ] ছাড়া কবিতাকে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। পাঠান্তরের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে।

৪. কবিতার কালানুক্রমিক বিন্যাস-পর্যবেক্ষণে কবি ও কবিতার ভাবলোক ও নির্মাণ-কৌশলের ধারাবাহিক বিকাশের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের কাব্যগুলির পাঠান্তর-বিবেচনার মাধ্যমে কয়েকটি নবতর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে :

১. কবির মধ্যে কেবল স্রষ্টা নয়, নির্মাতা নয়, একজন পাঠক [রসিক এবং সমালোচক-সত্তাও] আছেন। কবিতার সিদ্ধির দিগন্ত তাঁর দ্বারাই নিরুপিত হয়। তাঁরই তৃপ্তি-অতৃপ্তি ও সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে পাঠান্তরের পথে কবিতা সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

২. পাঠান্তর-বিবেচনার মধ্য দিয়ে একক কাব্যে কবির একাধিক বিশিষ্ট-প্রবণতা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি সমগ্র একটি কাব্যপর্বেও [যেমন মধ্যপর্বে] কবির কয়েকটি বিশিষ্ট-প্রবণতার হদিশ মেলে।

৩. কবিক্রিয়ার অন্তরালে যে নান্দনিক-বিজ্ঞান ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিক আছে, তার সন্ধানও পাঠান্তর দান করতে পারে।

পাঠান্তর-নির্ভর এই সব গবেষণা আর বিভিন্ন গ্রন্থ নিয়ে সমালোচকদের নানা ধরনের প্রশস্তি আমার নয়, আমার গবেষণার নয়, পরোক্ষে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক আমার গবেষণার অনুপ্রেরণাদাতা প্রত্যক্ষে অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তেরই প্রাপ্য :

এক. '...যে ভাষায় পাশ্চাত্যের অনুরূপ Manuscriptology-র বই দুর্লভ সেখানে নির্মলবাবুর [ড. নির্মল দাশ] লেখা পুঁথি পাঠের ভূমিকা প্রবন্ধের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি নীতি নির্দেশাত্মক রীতিতে

উচ্চারিত অভিজ্ঞজনের মন্তব্য বলে মান্য হতে পারে :

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ বিচার-বিশ্লেষণের জন্য পাঠকসমালোচককে আলোচ্য যুগের ভাষা ছন্দ ও সাহিত্যভঙ্গী সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হতে হবে, নতুবা শুদ্ধ করতে গিয়ে নূতনতর অশুদ্ধি দেখা দিতে পারে। কাজেই মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের তিনিই যোগ্যতম পাঠক, তিনি একাধারে নিপুণ পাঠ সমালোচক ও সহৃদয় রসগ্রাহী।

শুধু মধ্যযুগের কাব্যপাঠের ক্ষেত্রে কেন, দেবকুমার ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী ও চিত্র সম্পর্কে এমন দু'খানি বই লিখেছেন যা পড়ার সময় নির্মলবাবুর এই উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। বই দু'খানি হল : সোনার তরী : বিষয়-পাঠান্তর ও চিত্রা : অপ্রকাশিত-অমনোনীত।' [ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ]।

দুই. 'রবীন্দ্রকবিতার পাঠভেদ নিয়ে জীবেন্দ্র সিংহরায়ের একটি প্রবন্ধ আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃততর কাজ করেছেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় [সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের পাঠভেদ বিষয়ে] এবং দেবকুমার ঘোষ [রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর : মানসী]।' [ড. পিণাকেশ সরকার। রবীন্দ্রকবিতার সমালোচনা : রূপে-রূপান্তরে। রবীন্দ্রচর্চা, র. ভা. বি.]

তবে এসব-কিছু ছাপিয়ে যে-কোনো পুরস্কারের চেয়েও আমার সব-পাওয়ার বড়ো-পাওয়া আমার-অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের লেখা 'স্বাগত পথিকৃৎ'।

দেবকুমার ঘোষের লেখার বিষয় রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বিশেষ করে ওঁর আনাগোনা 'পাঠান্তরে'র একটিমাত্র বহুমহলা বাড়িতে। গত ১২ বছর ধরে ঘুরে ফিরে বুঝেছেন, গোটা জীবন কেটে যাবে তো বেরুবার পথ পাবেন না। মাঝপথে আমার সঙ্গে যোগাযোগ। ওঁর এই মহাভোজের রান্নাঘরের কাজটা আমার ভাল লাগল, কারণ মহাপ্রতিভার সৃষ্টিকেও আমি বানিয়ে তোলা ব্যাপারই ভাবি, সতর্ক সচেতন কারুকর্ম, ছেঁড়া কাটা জোড়া থাকে প্রচুর। দেবকুমারের অশেষ গবেষণার ধারাবাহিকতাকে খণ্ডিত করে সীমাবদ্ধ করে একা ডিগ্রীমুখী কাজের দিকে প্রণোদিত করা গেল। উনি ডিগ্রীটি পেলেন, যেটি পাওয়ার অধিকার দাপটের সঙ্গে অর্জিত হয়েছিল। ৬০টির বেশি দেশি-বিদেশি পি এইচ ডি-প্রাপ্তের সাহচর্যের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সেরা জন ৬-য়ের অভিসন্দর্ভের মান ডি. লিটের সমান বলে আমি মনে করি। দেবকুমার আমার সেই সেরা ছাত্রদের অন্যতম। তাঁর পি. এইচ. ডি. গবেষণার একটি অংশ নিয়ে 'রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর : মানসী'-বইটি।

'মানসী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অপরিণতির অস্থিরতা এবং সিদ্ধির নিশ্চয়তার মধ্যে আন্দোলিত—প্রায় সব শ্রেণীর রবীন্দ্র-কাব্য-সমালোচকেরা এ ব্যাপারে একমত। তাই পাণ্ডুলিপিতে যেমন ছাপা বইয়ের সংস্করণে-সংস্করণেও তেমনি পাঠভেদ অজস্র। 'মানসী'র পাঠান্তর নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেবকুমার অকূল সমুদ্রে পড়েছিলেন। নিজের শক্তিতে ও কৌশলে তিনি পেরিয়ে ডাঙায় উঠেছেন। তার ফলে রবীন্দ্র-পাঠকদের কাছে বিস্ময়ের এক বৃহৎ সঞ্চয় তিনি তুলে আনতে পেরেছেন। শুধু সঞ্চয়ে নয়, ব্যাখ্যানে—পাঠান্তরের সঙ্গত কারণ অনুসন্ধানে তাঁর যুক্তিবিদ্ধ মনন এবং শিল্পবোদ্ধা অনুভব এক সুরে বেজেছে।

রবীন্দ্র-রচনার পাঠভেদ নিয়ে দুই একজন কিছু শৌখিন কাজ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু দেবকুমারের রচনা প্রমাণ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, এ বিষয়ে যথার্থ পথিকৃতের মুকুট তাঁরই প্রাপ্য।' [স্বাগত পথিকৃৎ : ক্ষেত্র গুপ্ত। ২১২ বাঙুর অ্যাভেনিউ, বি-ব্লক, কলকাতা-৭০০ ০৫৫। তারিখ ৩০.৮.৯৬]।

গিয়েছিলাম বাঙুরের বাড়িতে ১ বৈশাখ ১৪১৪-এর সকালে। সন্তান-স্নেহে বলেছিলেন পাঠান্তরের কাজ না থামাতে। জেনেছিলাম নিকটতম-জনের বিচ্ছেদের নিগূঢ় শোকেও লিখে চলেছেন

রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চভাবনা নিয়ে। প্রণামের সঙ্গে প্রার্থনা ছিল নীরবে : 'সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা'। কবির সুর নয় এ। এ সুর সেই বিচ্ছেদে বিরহে একাকী স্তব্ধ হয়েও নিসঙ্গতায় নিজেকে সৃজিত করে তোলার সুর—নতুন কথায় নতুন স্বাদে। যদি ওঁর তত্ত্বাবধানে আবার গবেষণা করতে পেতাম আর-একবার!



আমার মাস্টারমশাই

• • • • • •

চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. ক্ষেত্র গুপ্তকে আমি পরোক্ষভাবে জানতাম তিনটি কারণে—১) আমার বাবার ছাত্র হিসাবে ২) রামমোহন কলেজে আমার অধ্যাপিকা ড. জ্যোৎস্না গুপ্তর স্বামী হিসাবে ৩) সিটি কলেজে আমার স্বামীর কিছুদিনের সহকর্মী হিসাবে। তারপর ওঁকে চাক্ষুষ দেখি বিয়ের পর বাঙ্গুর এভিনিউ-এর সাময়িক বাসিন্দা হয়ে। বাঙ্গুরের নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বাবার কাছে তাঁর ছাত্রের মেধার অসম্ভব প্রশাংসা শুনেছি। তাই বাঙ্গুরে থাকাকালীন দু-একবার জ্যোস্নাদির কাছে গেলেও ক্ষেত্রদার কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতাম। কেন জানি না। ক্ষেত্রদাকে বেশ ভয় করতাম।

এম. এ. পাশ করার পর থেকেই বাবা গবেষণা করার জন্য সমানে বলতে লাগলেন। তখন আমি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে উঠেছি। তবু দু-একজন মাস্টারমশাই-এর কাছে গেলাম এবং তাঁদের রকমসকম দেখে চক্ষু বিস্ফারিত করে ফেরৎ এলাম। তখন বাবা বললেন তাঁর অধীনেই তিনি আমাকে গবেষণার কাজ করাবেন। এটাও কতখানি বাস্তব, সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। বাবা জীবনে আমার পড়াশোনার খোঁজ রাখেন নি, তাঁর কাছে গবেষণা কতদূর এগোবে তাই একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। সেইসময় একদিন বাবা ফিরে একগাল হেসে বললেন 'বাসে ক্ষেত্রর সঙ্গে দেখা, সে-ই তোর গাইড হবে বলেছে।' তখন তিনি তাঁর ছাত্রর গল্প শুরু করলেন। শুনতে শুনতে অনুভব করছিলাম, গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যেও একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব থাকে—আমরা এযুগে তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত।

দুরু দুরু বক্ষে গেলাম বাবার ছাত্রের কাছে। আগে দু-একটা সাধারণ কথা বলেছি, এইবার প্রথম গুরুগম্ভীর আলোচনা। আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসের আঙ্গিক'। সে সময়ে আঙ্গিকের আলোচনা বেশি ছিল না। ক্ষেত্রদার, আর বোধহয় দু-একজনের। আঙ্গিক নিয়ে কাজ করতে চাইলেও এ সম্পর্কে ধারণা যে খুব স্পষ্ট ছিল তা নয়। এর মধ্যে কতটা সীমারেখা থাকবে, অন্য বিষয়ের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে না, সে ব্যাপারে আমার একটু সংশয় ছিল। ক্ষেত্রদা প্রথমেই আমাকে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া থেকে উদ্ধার করলেন। দু'জনের উপন্যাস থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস বেছে নেওয়া হল। কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হল বক্তব্য বিষয়কে ক) উপন্যাসে আঙ্গিক ও বিভিন্ন সমস্যা খ) বাংলা উপন্যাসে আঙ্গিক বিবর্তন : বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র গ) বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অনুবর্তন, দেবযান, ইছামতী এবং তারাশঙ্করের গণদেবতা, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, রাধা উপন্যাসের আঙ্গিক আলোচনা ঘ) দুই লেখকের উপন্যাসে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা। দুটো ফাইল করা হল। একটাতে লেখা নিয়ে এসে সংশোধনের জন্য রেখে আসতাম। আর একটা ফাইলে সংশোধিত লেখা ক্ষেত্রদা ফেরৎ দিতেন, পাশে পাশে মন্তব্য থাকত। একটা ফাইল

জমা দেওয়ার আর একটা ফাইল ফেরৎ নেওয়া—এইভাবে exchange করা হত। পরের বার আবার ওঁর নির্দেশমতো লিখে জমা দিতাম। প্রয়োজন মত জার্নাল বা পত্র-পত্রিকা ক্ষেত্রদাই দিতেন। ক্ষেত্রদার বোঝানোর সবথেকে মজার দিকটি হল, তিনি বোঝাতেন অংকের মত করে। সাহিত্যের আবেগতাড়িত অতিরঞ্জন তাঁর মধ্যে ছিল না। যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই। খুব কম কথায় অনেকখানি বুঝিয়ে বলার বিস্ময়কর ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখেছি। আমার গবেষণার কাজ শেষ হল ঠিক দুবছরের মধ্যেই। এই দু-বছরের মধ্যে কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখা থেকে শুরু করে ছেলেদের পড়ানো নিজের class lecture তৈরি করা সবই করেছি। আমার মাস্টারমশাই এত মেথডিকাল, যে কারণে আমাকে পড়াশোনার ছুতো করে অসামাজিক হতে হয়নি।

বরাবর সাধাসিধে জামাকাপড় পরা মাটির মানুষটিকে যতই দেখেছি, বুঝেছি, তিনি খপ্ করে রেগে যান, ঝপ্ করে নিভে যান। আমার Ph. D. Degree-র চিঠি হাতে পাবার পর ক্ষেত্রদার কাছে যেতে আমার কদিন দেরি হয়েছিল। তখন বাড়িতে মিস্তিরির কাজ চলছিল, আর কথা দিয়ে কথা না রাখার ব্যাপারে তারা কত দক্ষ সে সবাই জানে, ফলে বাড়ি থেকে বেরতেই পারছিলাম না। গেলাম যেদিন, সেই প্রথম তিনি ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন 'খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি', প্রায় গর্তে ঢুকে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল আমার।

ক্ষেত্রদাকে এ-পর্যন্ত যা দেখেছি, স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর জুড়ি নেই। কে কী মনে করল, তা তিনি গ্রাহ্যও করেন না। এ বৈশিষ্ট্য অবশ্য পূর্ববঙ্গীয়দেরই বৈশিষ্ট্য। তবে আমার মনে হয়, যাঁদের পা শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁরা অনায়াসে সত্যিকথাটা জোর গলায় বলতে পারেন। শুধু গবেষণা নয়, অন্য ব্যাপারেও ক্ষেত্রদার কাছাকাছি এসেছি, আপাতরুক্ষ মানুষটির মধ্যে স্নেহপ্রবণ হৃদয়টিকে অনুভব করেছি। সবার ওপর ছিল জ্যোৎস্নাদির তত্ত্বাবধান। বাঙ্গুর এভিনিউ-এর ২১২ নং বাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে ভালোবাসা। এখন খুব সতর্ক হয়ে ক্ষেত্রদার সঙ্গে কথা বলি, ক্ষেত্রদা ফোন তুললে আমতা আমতা করি। কারণ এখনও আমি ক্ষেত্রদাকে শুধু যে ভয় পাই, তাই নয়, ক্ষেত্রদার সামনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ আমাকে আমি আর খুঁজেই পাই না।



'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে'

• • • • • •

নন্দদুলাল বণিক

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।।
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো।।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে সে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।।

১.

আমার শিক্ষক পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-র প্রতি হৃদয়ের গভীর প্রণাম নিবেদন সূত্রে মনে পড়ছে গীতাঞ্জলির এই সংগীতটি—'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—'। এই সঙ্গীতটির কথাগুলি আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজছে কারণ, অধ্যাপক গুপ্তর সংগ্রামময় জীবনে জ্ঞানের চর্চা, অধ্যাপনা, বাংলা সাহিত্য সমালোচনা সূত্রে অজস্র গ্রন্থ রচনা কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে নয়, তা ছিল—এখনও আছে—তাঁর জীবন সাধনা। বস্তুতপক্ষে সারস্বত সাধনার আলোতেই তিনি তাঁর প্রাণের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এইজন্য যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম, তাঁর তত্ত্বাবধানেই সম্পূর্ণ হয়েছিল আমার পি-এইচ. ডি. গবেষণা। এক সময়ে, আমার প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহই সম্ভব করেছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে আমার যোগদান। আমরা জানি, এই প্রবাদ-প্রতিম অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে তাঁর মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বাংলা বিভাগের উন্নতিসাধনে। নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাংলা বিভাগ অল্পকালের মধ্যেই ঐশ্বর্যময় এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপকগণের সঙ্গে বিশেষভাবে অধ্যাপক গুপ্তের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মযজ্ঞের দ্বারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরিচালন-ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিত্বময় ভূমিকা নিয়েই অবস্থান করেছেন।

আমার অভিজ্ঞতায় তিনি যুক্তিবাদী, অত্যন্ত গতিশীল। তাঁর প্রতি আস্থাবান মানুষদের তিনি অনেক সার্থকতায় ভরিয়ে দিতে জানেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময়ে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাসঙ্গিক বি য়টির স্বরূপ-সন্ধানে ব্রতী থাকতেন, মৌলিক চিন্তার ধাক্কায় জিজ্ঞাসুর আত্মাকে জাগ্রত করে দিতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষক-ছাত্র স্বাধীন অভিমত প্রদানে কখনই বাধাপ্রাপ্ত হতেন না। কতো বিচিত্র বিষয়ে তাঁর নির্দেশনায় গবেষণা-কর্ম পুরস্কৃত হয়েছে। বিভাগের পাঠ-পর্ষদের সভায়, উচ্চতর-উপাধি-সমিতির সভায়, আলোচনা-চক্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে—সর্বত্রই তাঁকে দেখেছি 'একম্ অদ্বিতীয়ম্'। তাঁর পছন্দের-অপছন্দের মানুষদের নিয়েই তিনি বাংলা বিভাগকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন। কখনো কখনো অধ্যাপক গুপ্তকে দেখেছি দেশ-কাল-সমাজ-এর প্রসঙ্গ নিয়ে তুমুল বিতর্ক জুড়তেও। সমকালের বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্য-সমালোচনা নিয়েও তিনি আসর জমাতেন। সর্বত্রই তিনি অন্তরঙ্গ, জাগ্রত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমাধানপন্থী। তাঁর সংস্পর্শে বাস্তবায়িত হতে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি :

> কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মতো একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মতো উচ্ছসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে।... কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে ঘরে ফিরিতে পানে, কাহারো সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই।
>
> **'পঞ্চভূত' : 'কাব্যের তাৎপর্য'**

২.

কী বিশাল মনস্বী অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত-র সাহিত্য সাধনার চালচিত্র। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির শিরোনামই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ—যেমন, 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন', 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প', 'নাট্যকার মধুসূদন', 'মধুবিচিত্রা', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি', 'বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং', 'রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব', 'Structures and Variations : Novels of Tagore', 'রবীন্দ্র-গল্প : নারী বিদ্রোহিনী', 'রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প', 'রবীন্দ্রসঙ্গীত : শব্দের মন্ত্র', 'কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার', 'সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার', 'নজরুলের কবিতা : অসংযমের শিল্প', 'তারাশঙ্কর অনুসন্ধান', 'জীবনানন্দ : কবিতার শরীর', 'সত্যজিতের গল্প', 'সত্যজিতের চিত্রনাট্য', 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি', 'লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব', 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ১ম খণ্ড থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত [৭ম খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়] এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থের শিরোনাম হাতের কাছে নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থগুলিও—'মধুসূদন রচনাবলী', 'দীনবন্ধু রচনাবলী', 'ভারতচন্দ্রের রচনাসমগ্র', 'অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন', 'শ্রীচৈতন্য : একালের দৃষ্টিকোণ', 'বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত', 'বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন', 'সেকালীন ব্যঙ্গকবিতা',

'বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ-সমস্যা', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা', 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্প [২১ খণ্ড], 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর-কাহিনী' [৯ খণ্ড] প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় নিজের মানসিকতা সম্পর্কে অধ্যাপক গুপ্ত লিখেছেন : 'আমি একান্তভাবেই আধুনিক সাহিত্যের চর্চা করেছি—সেই মন নিয়েই মাঝে মাঝে মধ্যযুগে ঘুরে এসেছি।' [নিবেদন : 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি'] এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছি লোকসংস্কৃতিচর্চা। 'বিশ্বায়ন ও লোকংস্কৃতি'-গ্রন্থের নিবেদন-অংশে এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ইংরেজি পত্রিকা Folklore Research-এর প্রধান সম্পাদক রূপে কাজ করতে করতে এ বিষয়ে শুধু আগ্রহই জন্মায় নি, একটি দার্শনিক প্রত্যয়কেও মনের মধ্যে পেয়ে গেছি। তার তাগিদেই কিছু লেখাপড়া এবং নিজের মত কিছু ভাবনা। সাংস্কৃতিক সংযোগ বা Cultural Comunication নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এবং অতি সম্প্রতি অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করতে করতে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব আমার কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।' 'লোকসংস্কৃতি শুধু সমাজতত্ত্ব নয়, আবয়বিক বিশ্লেষণের বিষয় নয়, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের নিদর্শনও নয়', তার যে 'একটি নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব' ও আছে, তা আলোচনা করেছেন অধ্যাপক গুপ্ত তাঁর 'লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব'-বইটিতে। শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা অতি প্রাচীন, আচার্য ভরত ও অ্যারিস্টটলের কাল থেকেই চলে আসছে, তবু লোকসংস্কৃতির রূপলোকের সৌন্দর্য সম্ভোগের জন্য একটি বিশেষ নন্দনতত্ত্বের প্রয়োজন, কারণ লোকসংস্কৃতির অধিকারীগণ একান্ত সাধারণ। শিষ্ট ও অভিজাত শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ প্রয়োজনকে যাচাই করে নিয়েছেন অধ্যাপক গুপ্ত। লোকসৃষ্টির প্রাণ সরলতায় এবং কখনো কখনো স্থূলতায়—আর এখানেই এর সৌন্দর্য নিহিত।—তার বিশ্বাস।

৩.

আচার্য ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ক্ষেত্রবাবুর প্রতি 'আশীর্বাণী'তে লিখেছিলেন :

> দৃষ্টিভঙ্গীর সেই স্বাতন্ত্র্য লইয়াই অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সমালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রথম প্রয়াসে রচিত 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' গ্রন্থখানি আস্বাদন ও আলোচনের জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।... প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নব মূল্যায়নের জন্যও একটি ইতিহাস-চেতনার প্রয়োজন এই মৌলিক সত্যটি সম্বন্ধে বর্তমান লেখক যথেষ্ট অবহিত, এবং এই কার্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি স্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা যে তাহার মধ্যে রহিয়াছে 'প্রাচীন বাংলা কাব্যপাঠের ভূমিকা' শীর্ষক প্রারম্ভিক আলোচনাটিতে তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। এই আলোচনাটি সুসংহত এবং চিন্তা-উদ্রেককারী সঙ্কেতযুক্ত। এই আলোচনাটি পড়িলে বোঝা যায়, ইতিহাস-চেতনার ক্ষেত্রে তিনি মার্ক্সপন্থী; মানুষের সাহিত্য, সৌন্দর্য ও অন্যান্য সকল সুকুমার-বোধের মূলভিত্তি যে অর্থনীতিতে এ-বিষয়ে তাঁহার প্রত্যয় দৃঢ়। বিভিন্ন যুগের কাব্য-কবিতার সৌন্দর্য বা অন্যান্য সাহিত্যগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি ইতিহাসের পটভূমির প্রতি মার্ক্সীয় পন্থায় মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তাঁহার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ছাঁচে-ঢালা নয়,....।'

বস্তুতই, অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-র সাহিত্য-সমালোচনা 'ছাঁচে-ঢালা নয়'। তাই 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব

অবশ্যই একটি বিশেষ বিদ্যা' এবং 'উক্ত সমাজতত্ত্বের বিবেচনায় মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ খুবই সহায়ক হতে পারে—আমার তো ধারণা একরূপ অপরিহার্যই' বলেও ক্ষেত্রবাবু পুনরায় বলেন, 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিচারে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক মত, সামাজিক চিন্তা প্রভৃতি গৌণ, প্রসঙ্গক্রমে এলেও তাকে আধিকারিক করে তুললে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হবে। আসলে রচনায় প্রতিফলিত হয় যে মনোভাব, মতামত, জিজ্ঞাসা, তাই-ই বিবেচ্য।' [তারাশঙ্কর : আলোকিত দিগ্বলয়— 'তারাশঙ্কর' ৯৮'] এরূপ মনোভাব নিয়েই তিনি মহাকবি মধুসূদনের কবি-আত্মার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প'-গ্রন্থে। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে তিনি জায়িয়েছেন, 'যুগপরিপ্রেক্ষিতের কথা এসেছে, কিছু আসা প্রয়োজন ছিল কবির ব্যক্তিত্বের পরিচিতির জন্যই; কিন্তু ব্যক্তিউপকরণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছি; এবং সর্বাধিক মূল্য দিয়েছি কাব্যসৌন্দর্যকে'। সাহিত্যিক মহাকাব্যের মতই ব্যাপক এবং গভীর এই সমালোচনা গ্রন্থখানি। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : 'শিল্পরীতি' গ্রন্থের, বিশ্বখ্যাত উপন্যাসতত্ত্বের গ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়কে ব্যবহার না করে শিল্পস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অবয়বের মধ্য দিয়েই তিনি পরিস্ফুট করেছেন বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি। মহৎ-স্রষ্টা আত্মপ্রকাশের 'নির্মাণ'কে নিজেই তৈরি করে নেন—এই বিশ্বাস বহন করেছেন সাহিত্য সাধক অধ্যাপক গুপ্ত। রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'-গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়টিতে। পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে তিনি গভীর আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্র-গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ'-গ্রন্থে। এখানে তিনি, কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পড়তে পড়তে যা ভেবেছেন এবং ভাবতে ভাবতে পড়েছেন, সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস এই বইটি। প্রথাবদ্ধ সমালোচনার রীতি তাতে ভেঙেছে। এখানে জীবনকে তিনি খুঁজেছেন শব্দ এবং রূপের মধ্যে। শব্দসমুদ্রে অবগাহন করে রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতারূপে রসাস্বাদনের প্রয়াসে সৃষ্টি হয়েছে 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত : শব্দের মন্ত্র' গ্রন্থটি। 'শব্দের সিঁড়ি বেয়ে নামলে কবিতার অনেক লুকানো' রহস্য আবিষ্কার করা যায়, তার প্রমাণ ক্ষেত্রবাবু রেখেছেন 'জীবনানন্দ : কবিতার শরীর' গ্রন্থটিতে। কবি জীবনানন্দ দাশ-এর 'বনলতা সেন' কবিতাটি কেবল প্রেম ও প্রকৃতি অনুরাগের কবিতা নয়, সেটি যে কবির মৃত্যু-প্রীতিরও কবিতা, তা ক্ষেত্রবাবু দেখিয়ে দিয়েছেন কবির ব্যবহৃত শব্দ-সম্পদের মধ্য দিয়েই। নিরলস অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর স্থাপত্যধর্মী রচনা 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', যার ছ'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, বাকি একটি খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের আদি পর্ব থেকে প্রায় বর্তমান মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি লিপিবদ্ধ করে যাবেন তাঁর এই সুবিশাল গ্রন্থের খণ্ডে খণ্ডে। বিস্ময় এবং সম্ভ্রম জাগায় তাঁর সাহিত্য সাধনা। এই সাধনায় তিনি সৃষ্টির অন্তঃপুরে অনায়াসে প্রবেশ ও পরিক্রমা করেছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'-নাটকের নিবেদন-অংশে ক্ষেত্রবাবু লিখেছেন— 'অবিশ্বাসী বস্তুবাদীর ঈশ্বরদর্শন হল।—তাতে সে বিশ্বাসী হয়ে উঠল না ঠিকই কিন্তু ক্ষণিকের দর্শন তো হল।' অদ্ভুত সুন্দর তাঁর এই আত্মকথন। তাঁর উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

❒

আমার শিক্ষক : স্মৃতিচারণ

• • • • • •

তিমিরবরণ চক্রবর্তী

১.

'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। '

—অর্থাৎ অজ্ঞান তিমিরের অন্ধকারে আবৃত যে ব্যক্তি, এবং যার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়নি; জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা তার জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত কোরে তাকে অন্ধকারের আবরণ থেকে মুক্ত করেছেন যে ব্যক্তি তিনিই হলেন গুরু, এমন আমার গুরু ড. ক্ষেত্র গুপ্তকে প্রণাম করি।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত আমার শিক্ষক—আমার শিক্ষাগুরু। বাঙলায় সাহিত্য-চর্চায় তিনি আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, তাই আমার দীক্ষা গুরুও বটেন। এমন গুরুর সান্নিধ্যে এসে কিভাবে আমি পরিশীলিত হয়েছি, সে-সম্বন্ধে আমার আন্তরিক কিছু উপলব্ধি বর্তমান লেখায় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

২. বর্তমানে আমি উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের প্রধান বা চেয়ারম্যান। ১৯৮৫ সালে আমি একজন সাধারণ লেকচারার হিসাবে এখানে যোগদান করি! সে-সময়ে স্নাতকোত্তর কোন উপাধি আমার অর্জন করা হয়ে ওঠে নি। এমন একটা নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু একটা এম. এ. পাশের তক্‌মা নিয়ে কাজ করতে নিজেকে বড়ো ছোট মনে হতো। বাঙলা থেকে এতো দূরে বসে কিভাবে কি করবো ভেবে মনটা আকুলি-বিকুলি করতো। কলকাতার সঙ্গেও তেমন যোগাযোগ করতে পারছি না। যদিও আমি কলকাতারই ছেলে। কলকাতাতেই মানুষ, সেখানেই লেখাপড়া— তবুও।

৩. আমি ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. বাঙলার ব্যাচ। আমার বিশেষপত্র ছিলো 'লোকসাহিত্য'। বিশ্রুত অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ছিলেন এই পত্রের মুখ্য অধ্যাপক। এই বিশেষ পত্রের জন্য 'ক্ষেত্র সমীক্ষা' [Field work] ছিলো আবশ্যিক। তাই ড. ভট্টাচার্যের সঙ্গে দু-বার ক্ষেত্র-সমীক্ষা শিবিরে যোগদান করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র ছিলেন— যাঁরা সেই সময়ে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করছেন। পরবর্তী সময়ে আমিও এককভাবে গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে কিছু কাজ করেছি।

৪. কলকাতায় যখন আমি কলেজের ছাত্র তখনই অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-এর নাম শুনেছি। উনি তখন সিটি কলেজে পড়াচ্ছেন। বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে কয়েকবার ওঁর ক্লাস করেছি। ওঁর পড়ানো খুব ভালো লাগতো। অবাক হতাম ওঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহিত্যের বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার দক্ষতা দেখে। ছোটো-খাটো মানুষ, কিন্তু কি রাশভারী। ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশিয়ে ওঁকে মনের মধ্যে ধারণ করেছিলাম। মনের মধ্যে সর্বদাই একটা আশা জাগতো,—ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন ওঁর কাছে যেতে পারি, ওঁর সঙ্গে কাজ করতে পারি ইত্যাদি?

৫. তারপর দেখতে দেখতে কোথা থেকে কতো কি ঘটে গেলো। ছাত্রজীবন শেষ হলো, শুরু হলো কর্মজীবন। ছাত্রাবস্থাতেই ইচ্ছা পোষণ করতাম যে আমি জীবনে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করবো। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কলকাতা বা তার বাইরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে চাকরি করছি। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে শেষ দিল্লীর কাছে 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অন্তর্গত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য শাখায় অধ্যাপনা পেয়ে গেলাম। প্রবাসে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে বড় অসহায় লাগতো। সেই পরিবেশে স্থানীয় কিছু সুবন্ধু অধ্যাপকের পরামর্শ এবং তাঁদের সহযোগিতায় নিজেকে স্থির রেখে অধ্যাপনার কাজ করতে থাকলাম। এই ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল,—কাজ করছি কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না। এখানে সব বড় বড় ডাকা বুকো অধ্যাপকেরা পড়ান। সকলের নামের আগে-পাছে কত উপাধি—পি. এইচ. ডি., ডি. লিট. ইত্যাদি;—আর আমার কিছুই নেই। সঙ্গত কারণেই নিজেকে বড়ো সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হতো।

৬. ১৯৮৭ সালের ২৬-২৯ নভেম্বর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ ও ইউ. জি. সি.-র যৌথ উদ্যোগে 'ভারতীয় ভাষা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক তিন দিনের একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়। তাতে বাঙলা, বিহার-দিল্লী-বারাণসী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক ও স্কলার যোগ দেন। যেমন, অমিয় দেব, শিশিরকুমার দাশ, চিত্তরঞ্জন লাহা, শুকদেব সিন্হা, রামবহাল তেওয়ারী, ক্ষুদিরাম দাস, সনৎকুমার মিত্র প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্রকে দেখে খুব আনন্দ হলো। প্রায় কুড়ি বছর পরে ওঁর সঙ্গে দেখা। পুরুলিয়ার মাঠা শিবিরের সেই মধুর দিনগুলির কথা বারে বারে মনে পড়তে থাকে।

৭. তিন দিনের সেমিনার শেষ হলো, সবার সঙ্গে সনৎদাও বাড়ি ফিরে যাবেন। যাওয়ার আগের দিন আমার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। আমি সভয়ে এবং সসঙ্কোচে সনৎদাকে আমার মনোবাঞ্ছা নিবেদন করলাম। উনি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছো—আর তোমার পি. এইচ. ডি. নেই।' আমি কেমন যেন গুটিয়ে গেলাম। উনি আমার অবস্থা অনুমান করে বললেন : কলকাতায় যাই, দেখি কি করতে পারি।'

৮. বোধহয় এক মাসও হয়নি। হঠাৎ একদিন রাতে সনৎদার ফোন : 'ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে, তুমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্তর নিয়ে কলকাতায় চলে এসো। দু-তিন দিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে কলকাতায় হাজির হলাম।

৯. কলকাতা পৌঁছে যথারীতি সনৎদাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গিয়ে পৌঁছলাম। ক্ষেত্রবাবু এসে পৌঁছলেন একটু পরে। সনৎদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। গুটিগুটি পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করলাম। উনি একবার আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা! তুমিই তিমিরবরণ।'—স্যার। অনেকেই জানেন—উনি খুম কম কথা বলেন; অকেজো কথা তো একদমই নয়। সেদিনও সংক্ষেপে দু-একটি কথা বললেন : 'তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছ। গবেষণার কাজও সেই রকম মানেরই হওয়া চাই। নিয়মিত আসবে, কাজ করবে, দেখাবে, বুঝে নেবে। ধীরে ধীরে সব শিখিয়ে দেব।' ব্যস্, আর কোনো কথা নয়। আমি বললাম : 'আজ্ঞে। আপনার আশীর্বাদ থাকলে সব কিছুই ঠিক-ঠাক করতে পারবো।'

১০. আমি ক্ষেত্র গুপ্তের অধীনে পি. এইচ. ডি. করেছি এবং যদিও ডি.লিট-এর ক্ষেত্রে কোন নির্দেশক লাগে না, তবুও তিনি আগাগোড়া আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। পি. এইচ. ডি.-র সময়ে একটানা দু-বছর এবং ডি.লিট-এর সময়ে একটানা তিন মাস এবং মাঝে মধ্যে আলিগড় থেকে কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন ওঁর সান্নিধ্যে থেকে কাজ করেছি। সুতরাং গবেষণা কর্মের প্রেক্ষাপটে সব

মিলিয়ে প্রায় তিন বছর ওঁর একেবারে কাছে বসে, কখনো ওঁর বাড়িতে গিয়ে, গবেষণা কর্মের পাঠ নিয়েছি। বলাবাহুল্য, আগেকার সেই ভীতির ভাবও দিনে দিনে কেটে গেছে। এই মেলমেশা যাওয়া-আসার সুবাদে ওঁর কাছে আমি অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি। আর সব বলতে দ্বিধা নেই, গবেষণা বা যে-কোনো সৃজনশীল কাজ কিভাবে করতে হয়, কোথায় তার বাধা-বিপত্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োগ-পদ্ধতি একদম হাতে কলমে তিনি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এটা যে কত বড় পাওয়া, এর অনুভূতি যে কত গভীর, কত আনন্দের তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি আজও সেই স্মৃতি-আনন্দ ধরে রেখেছি।

১০.১. ভুল ত্রুটি হলে বকুনিও দিয়েছেন। আবার স্নেহসিক্ত প্রশ্রয়ও পেয়েছি। সত্যি বলতে কি— একটুও রাগ করিনি, অভিমান অথবা অপমানও বোধ করিনি। কেননা আমি বুঝেছিলাম, — আমার গুরু বিদ্যার সাগর, জ্ঞানের পরশমণি। তিরস্কারের ছলে আমাকে বিদ্যাশিক্ষার রত্নের সন্ধান দিচ্ছেন। আজকের এই মুহূর্তে আলিগড়ের সাহারার বুকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে ফসল ফলিয়ে চলেছি, তা গুরুর আশীর্বাদ এবং তাঁর নির্দেশিত পথ ও আদর্শকে পাথেয় করেই।

পি. এইচ.ডি-র ছাত্র হিসাবে গবেষণাকালীন অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-এর সাহচার্যের যে অভিজ্ঞতা তা আমার একান্ত হৃদয়ের কথা, তাঁর সান্নিধ্যে থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছি তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন, তা এই লেখা থেকে সকলে বুঝতে পারবেন।

বাংলা সাহিত্যের সার্বিক মূল্যায়নে, বিশেষ করে বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক গুপ্তের অবদান অপরিশোধ্য। বয়স হয়েছে, শরীরও ভালো নেই এই অবস্থাতেও তিনি লিখে চলেছেন। বিচিত্র তাঁর লেখার বিষয়— আর সবেতেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

১১. শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অন্তর মথিত ভাষায় তাই বলি :

'গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন।
ও তোর অতীত গুরু পন্ডিত গুরু,
    গুরু অগণন; কারে প্রণাম করবি মন।
গুরু যে তোর বরন ডালা
গুরু যে তোর মরণ জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা
ঝরায় দু'নয়ন;
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন।'

এর মর্মার্থ চিরসত্য, চিরন্তন। 'গুরু' শব্দের চিরসত্য বাণী এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এখানে নিরর্থক। সেদিকে অগ্রসরও হবো না। আমার হৃদয়ের ক্ষেত্রভূমিতে আমার শিক্ষক, আমার স্যার, আমার গুরু 'ক্ষেত্র গুপ্ত' যে আসনে উপবিষ্ট আছেন তাকে অস্বীকার করা যায় না। আমার দুটি চোখের চাহনি যদি গুরু প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হয়, তা হলে আমার নয়নের মণি হলো আমার ভবিষ্যৎ চলার পথের দিশারী, অর্থাৎ গুরু-প্রদত্ত আলো অনুসরণে 'এগিয়ে চলা'। সুতরাং হে গুরুদেব লহ প্রণাম, জীবনে মরণে, কাল থেকে কালান্তরে আমার প্রণাম তোমাতে নিবেদিত হোক।

❐

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত

• • • • • •

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত .

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তকে আমি খুব ছোটবয়স থেকেই চিনি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তাঁর সহকর্মী ছিলেন আমার বাবা অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত। তখন 'ক্ষেত্রজেঠু'-কে মাঝে মাঝে দেখতম—সাদা ধুতি, ছোটো হাতা সাদা ফতুয়া পরা সদাব্যস্ত একজন মানুষ হিসেবে। স্কুলপড়ুয়া আমি তখনও জানতাম না তিনি আসলে কে!

দিন, মাস, বছর গড়ালো, আমি বড়ো হলাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়তে গেলাম। তখন আমার পরিচয় হল আরেক ক্ষেত্র গুপ্তের সঙ্গে, যিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিদ্বৎমহলের এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপণ্ডিত ও অসাধারণ শিক্ষক। স্নাতক পেরিয়ে স্নাতকোত্তর— তাঁর লেখা বইগুলি হলো আমার পড়াশোনার পরম সহায়। ততদিনে পরিচিত হয়েছি তাঁর পরিবারের সঙ্গেও— মানে বিশেষভাবে জ্যোৎস্নাজেঠিমার সঙ্গে— পূষণদা-টুনাইবৌদিদের সঙ্গেও। বাবা এবং আমার মা ছন্দা সেনগুপ্তের সঙ্গেও ওঁদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

স্নাতকোত্তর স্তরে এসে যবে থেকে বুঝতে পারলাম সর্বোচ্চ স্তরে নাচ, নাটক ইত্যাদি যাই এতদিন ধরে করে আসিনা কেন, পেশা হিসেবে নিতে পারব না, তবে থেকে জীবনে প্রথমবার লেখাপড়ায় মন দিলাম। বুদ্ধিও খানিকটা পেকেছিল, এম. এ. পাশ করার আগেই যে পরবর্তী কর্মজীবনের দিশাটি নির্দিষ্ট করে ফেলতে হবে সেটা বোধগম্য হয়ে গেছিল। পছন্দ ছিল হয় সিভিল সার্ভিস নয়ত গবেষণা—এবং অবশেষে অধ্যাপনা [বলে রাখি এ ব্যাপারে পারিবারিক একটা প্রত্যাশাও ছিল নিঃসন্দেহে]।

এম. এ. পরীক্ষা দিলাম। পাশ করে এম.ফিল-এ ভর্তি হলাম সময় কাটাতে, পরীক্ষায় বসলাম NET-এ। মনে মনে একটা ক্ষীণ স্বপ্ন—যদি গবেষণা করার সুযোগ জোটে তাহলে যদি সেটা অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের অবেক্ষণে করা যায়। ততদিনে জেনে গেছি ওই মানুষটির scholar হওয়াটা দারুণ মর্যাদার। কারণ তিনি নাকি ভীষণ রাগী এবং দাম্ভিক, খুব ভালো ছাত্র না হলে কাজই করান না।

মনের বাসনা মনেই ছিল। NET-এর রেজাল্ট বেরোল। .02% পাশ করে সারা ভারতে, তাই রেজাল্ট দেখতে যাইনি ভয়ে। বাবা ফোন করে জানালেন, আমি Masters' অর্থাৎ UGC Fellowship ও Lecturer Eligibility দুটোই পেয়েছি।

ব্যাস, এম.ফিল শিকেয় তুলে দিলাম। যাদবপুরে বিভাগে অনুরোধ করলাম আমায় Super Annuate করে Fellowship দিতে UGC-এর নিয়মানুসারে।

অজ্ঞাতকারণে আমায় কিছুতেই Super Annuate করা হল না। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম এক বছরের মধ্যে Fellowship-এ যোগ না দিলে UGC আমার নির্বাচন বাতিল করে দেবে। এই পরিস্থিতিতে প্রায়-সমাপতনের মতো তখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিভাগে Junior

Research Fellow চেয়ে বিজ্ঞাপন বেরোল। মরিয়া হয়ে কপাল ঠুকে আবেদন করে দিলাম কারণ ততদিনে এম.ফিল পড়াটা বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছে আর মনের ভেতর জমা হতে শুরু করেছে প্রবল অভিমান, বিভাগ ও Alma-Mater সম্পর্কে। নির্বাচিত হলাম UGC-JRF হিসেবে। তখন সময় হলো, স্বপ্নকে আরেকবার ঝাঁপি থেকে বার করে আনার। না, নিজে বলতে সাহস পাইনি, বাবাকে দিয়ে বলিয়েছিলাম 'স্যার'-কে—তখন থেকে আর 'জেঠু' বলতাম না। Bengal Tiger রাজি হয়ে গেলেন। আমার তো প্রায় আনন্দে আত্মহারা ভাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীর্ঘ ছ-বছরের সম্পর্ক ছেদ করে চলে আসতে হওয়ার বাধ্যতায় যে-বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিল, তাতে কোথাও যেন প্রলেপ পড়ল। আমি অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের scholar হবো। এই অনুভূতিটাই মলমের কাজ করেছিল। ১৯৯৪-তে UGC/JRF হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। তারপর ১৯৯৫ সালের জুন মাসে আমার Ph.D. রেজিস্ট্রেশান হল স্যারের কাছে, UGC এর সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় বিষয় বদল করে কাজ শুরু করলাম 'বাংলা সাহিত্য ও মিথ' বিষয়ে।১৯৯৪-১৯৯৬-এর সেপ্টেম্বর এই প্রায় আড়াই বছর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্যারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, কখনো শিক্ষক, কখনো অবেক্ষক হিসেবে এবং কখনো বিকেলে স্যারের ঘরের মুড়ি চানাচুরের নিত্যদিনের আড্ডার মধ্যমণি হিসেবে। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও ওই রাগী-দাম্ভিক মানুষটির আড্ডাঘরে অবাধ যোগদানের অনুমতি পেয়েছিল অর্বাচীন Research Fellow গুলোও—আমি, রাতুল, রেজাউল, সৌমিত্র, গোকুল সব্বাই। খানিকটা লঘু চালের সেই দৈনিক আড্ডায় চিনলাম আরো এক ক্ষেত্র গুপ্তকে, যিনি ঘর ফাটিয়ে হাসতে পারেন, প্রাপ্তবয়স্ক ইয়ার্কি মেরে আমাদের দিকে হেসে তাকিয়ে বলেন, "লজ্জা পেওনা যেন, তোমরা তো এখন Adult।" ছিলেন আরেক প্রবল আড্ডাবাজ অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত। দুই মহাপণ্ডিত সেই আড্ডায় যখন মাধুরী দীক্ষিত ও শ্রীদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তুমুল তর্ক করতেন, তখন আমরাও দু-দলে ভাগ হয়ে গিয়ে সেই ঝগড়ায় ইন্ধন জোগাতাম এবং স্যারের সঙ্গে সহমত হতাম না কারণ আমি ছিলাম শ্রীদেবীর সমর্থক।

এরই মাঝে গবেষণা-সংক্রান্ত পড়াশোনা চলছিল স্যারের তত্ত্বাবধানে। সে ছিল ভারি আনন্দের দিন। বিভাগে সর্বকনিষ্ঠ হবার কারণে প্রবল পক্ষপাতিত্বের সুবিধে পেতাম এবং সেটা প্রবল রাগী ক্ষেত্র গুপ্তের থেকেও। খুব গরমে স্টাফরুমে ঢুকে দুটো Cold Drink আনাতেন, একটা নিজের একটা আমার। সহ-গবেষকদের সবুজ মুখ দেখে আমি অবশ্য তাদের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিতাম। কিন্তু যেটা ভাগ করে নিতাম না সেটা স্যারের বাড়িতে গিয়ে জ্যোৎস্না জেঠিমার হাতে তৈরি খাবার খেতে খেতে আড্ডার ছলে পাওয়া সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্মবিষয়ক ও জীবনের পাঠগুলি এবং বিদ্যুৎচমকের মতো মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে আসা একেকটা "Spark"—স্যারের কোনো একটি অভাবনীয় ব্যাখ্যা যা কোনোদিন ভাবতে পারিনি আগে। আর সেভাবেই মানুষটির পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি, বোধের গভীরতা আর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনটির ছবিও দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আরো জেনেছিলাম স্যার শিক্ষক হিসেবে কতটা উদারমনস্ক। আমার গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলাম এমন একটি অধ্যায়—যেটি স্যারের না-পসন্দ ছিল। কিন্তু আমি যে যুক্তি দেখিয়েছিলাম প্রবল দুঃসাহসে, সেটা স্যার শুনেছিলেন এবং অধ্যায়টি সংযুক্ত করার অনুমতিও দিয়েছিলেন। এই মানসিক উদারতা খুব কম শিক্ষকের মধ্যেই দেখেছি, আসলে যাঁরা পাণ্ডিত্যের শিখরে বাস করেন তাঁরাই হয়ত এতটা নমনীয় হতে পারেন; তবে সকলে নন বলাই বাহুল্য।

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে আমি যোগ দিলাম আশুতোষ কলেজে, ছেড়ে দিতে হলো Fellowship। স্যারের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগাযোগ ছিন্ন হলো, কিন্তু কয়েকমাস পর পর বাড়িতে

যাবার অভ্যাসে ছেদ পড়লো না। তবে নতুন চাকরির বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে গবেষণার কাজে বিরতি দিতে হল বাধ্য হয়ে। যখনই বাঙ্গুরের বাড়িতে যেতাম স্যার ও জেঠিমা বারবার বলতেন কাজটা শেষ করার কথা। লজ্জায় মাথা নীচু হতো, পরিস্থিতিজনিত অপারগতায় অসহায় লাগত। লজ্জা কাটাতে প্রতিবার স্যারকে কাজ না করতে পারার মিথ্যে অজুহাত দিতাম। স্যার বুঝেও তিরস্কার করতেন না কখনো। এভাবে পার হয়ে গেল প্রায় দুটি বছর। অপরাধবোধ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলাম এক বছরের Registration Extension-এর জন্যে। পেয়েও গেলাম। মনে হতে লাগল কাজটা যদি শেষ না করি বাবা-মা দুঃখ পাবেন, আর যে স্বপ্ন সফল করতে রবীন্দ্রভারতীতে চলে এসেছিলাম সেটাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মনস্থির করতে পারছিলাম না তবু, দীর্ঘ দু-বছর গবেষণার ফাইলপত্র খুলেও দেখিনি। ভয় হচ্ছিল কেঁচে গণ্ডুষ করে কাজটা আদৌ আর করতে পারব তো?

ঠিক এইসময়ে একদিন স্যার ফোন করে আমায় এমন একটা কথা বললেন যেটা শুনে এক মুহূর্তে আমার সব দ্বিধা চলে গেল। স্যার খুব দুঃখদায়ক একটা কথা বলেছিলেন এবং খুব সম্ভবত ইচ্ছে করেই যাতে আমি বাধ্য হই কাজটা আবার শুরু করতে।

ঠিক তাই হলো—১৯৯৯-এর শেষের দিকে আমি আবার ধুলো ঝাড়লাম গুটিয়ে রাখা ফাইলগুলির। আড়াই বছরের Fellowship-এ তথ্য সংগ্রহের মূল কাজটা করাই ছিল। এখন শুধু বেছে নিয়ে লেখার পালা। লিখতাম, স্যার শুধু মার্জিনে একটা, দুটো মন্তব্য লিখতেন। বিশ্বাসই হতো না এই মানুষটি সম্পর্কে অন্য গবেষকরা বলেছিলেন যে স্যারের যদি লেখা পছন্দ না হয় তাহলে 'কোদাল' দিয়ে চেঁছে দেন, মানে বাতিল করেন। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল।

কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে কলেজ থেকে দু'মাসের Study Leave নিলাম। বাড়িতে এবং প্রেসে মোটামুটি এই ছিল আমার ওই দু'মাসের রোজনামচা। অবশ্য না করে উপায়ও ছিল না, একে তো জমা দেবার deadline তার ওপর নিয়মিত ফোন। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, ফোনটা স্যারই করতেন তবে আমাকে নয়, আমার মা-কে। আমি বাড়িতে পড়ছি, প্রেসে টাইপ করাচ্ছি না আড্ডা দিতে বেরিয়েছি সেটা নিশ্চিত করতে। যথাঅর্থে স্যার ওই দু'মাস আমায় স্রেফ কড়া পাহারায় রেখেছিলেন যাতে আমি ফাঁকি মারতে না পরি কোনো মতে। আমার গবেষণায় একটি গাণিতিক সূত্র দেওয়া আছে। সেটির নেপথ্যেও স্যারের ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যের গবেষণাপত্রে গাণিতিক সূত্র দিয়ে যে মূল বক্তব্যটি উপস্থাপন করা যায়, সেটি স্যারই আমার মাথায় ঢুকিয়েছিলেন কাজের শেষপর্বে। ওই সূত্রটিই আমার গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়েছে; স্যারেরই জন্যে।

যাইহোক জমা দিলাম ২০০০ সালের মার্চ মাসে। তারপর Viva হলো। ১৯৯৪ সালে আমার 'Project Defense' সেমিনারে অধ্যাপক অজিত ঘোষ ও তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকারের অতি সঙ্গত প্রশ্নবাণের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার, কিন্তু আজ ছ-বছর পরে 'বড়ো হয়ে যাওয়া' আমাকে আর ঢালের আড়াল দিলেন না। হয়ত এই বিশ্বাস ছিল এবারে আমি পারব।

Degree পেলাম, তারসঙ্গে পেলাম দুই পরীক্ষক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, লোকবিদ দিব্যজ্যোতি মজুমদার এবং অবশ্যই আমার অবেক্ষক অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের মূল্যবান নির্দেশ যা পরবর্তীকালে বই করার সময়ে খুব প্রয়োজনীয় হয়েছিল; যে বইয়ের একটি অসাধারণ মুখবন্ধ লিখে স্যার একই সঙ্গে আমায় লজ্জিত ও গর্বিত করেছেন। ওনার কাছ থেকে পাওয়া ওই মুদ্রিত শংসাপত্রটি আমার

এক অমূল্য সম্পদ আজও। স্যারের নিজের হাতে টাইপ করা মূল কপিটি এখনো আমার ফাইলে থাকে।

এরপর থেকে স্যারের সঙ্গে কর্মনির্ভর যোগাযোগ ছিন্ন হলেও অব্যাহত থেকে গেছে আজ অবধি ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তা প্রসারিত হয়েছিল জেঠিমা পর্যন্ত—Degree পাবার পর জেঠিমা আমায় উপহার দিয়েছিলেন একটি শাড়ি, তারপর প্রতি পুজোয় আরো একটি করে। জেঠিমার অপরিমিত স্নেহ ও অযাচিত ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে সেগুলি আমার কাছে পরমপ্রাপ্তি স্বরূপ।

এখন বছরে দু-তিনবার মা-বাবা-আমি স্যারের বাড়ি যাই পুজোর পরে, পয়লা বৈশাখে, কখনো বা আমার পেশাগত কোনো সামান্য সাফল্যের পর প্রণাম করতে। বড়ো হয়ে গেছি তো তাই স্যার আমার সঙ্গে প্রায় বন্ধুর মতো কথা বলেন—অনেক গম্ভীর বিষয় নিয়ে মন খুলে কথা বলেন এবং আমার কথাও সমান গুরুত্ব দিয়ে শোনেন। পেশাগত জগতের সমস্যা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্যারকে বলে হাল্‌কা হই। স্যার ভরসা দেন আর বিশ্বাস ধরে রাখতে সাহায্য করেন তাঁর পরিমিত সংক্ষিপ্ত আশ্বাসে। জীবনের প্রাপ্তির অন্যতর একটি অর্থও যে আছে সেটাও বুঝিয়ে দেন। মন ভালো হয়ে যায়।

এই লেখাটি যখন লিখছি, তার মাত্র কয়েকদিন আগে জেঠিমা চলে গেছেন। গিয়েছিলাম স্যারের কাছে। দেখতে ভালো লাগেনি। বিপর্যস্ত মানুষটিকে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে হেঁটে গেলে ছাত্ররা কাঁপতো; যাঁর কাছে গবেষণা করেছি শুনে লোকজন আঁত্‌কে উঠে বলে "বাপরে তোমার তো খুব দুঃসাহস বাঘের কাছে কাজ করেছো!'—যিনি প্রবল শারীরিক অসুস্থতাকে হেলায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লিখেছেন একটার পর একটা বই যা আমার এবং বাংলার ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে আজও।

পারিবারিক ক্ষেত্র গুপ্তকে জেঠিমাকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারি না। যেমন ভাবতে পারি না বাঙ্গুর এভিনিউর বাড়িতে গিয়ে সদাহাস্যময়ী ফিটফাট্ সজ্জিত স্নেহশীল জ্যোৎস্নাধারাটিকে আর দেখতে পাবো না।

তবু জীবন তো কোথাও থেমে থাকে না। তাই স্যারের কাছে যাবো—ওখানে বসে মনে করবো ওঁদের দুজনের থেকে কত স্নেহ, প্রশ্রয় ভালোবাসা পেয়েছি, পেয়েছি অকুণ্ঠ প্রশংসা—যা আমার জীবনের পরম পাথেয়। আমি বিশ্বাস করি স্যারের মতো মানুষেরা যাঁরা আমাদের মতো সাধারণ নন তাঁরা যেকোনো অবস্থাতেই মন ও মস্তিষ্কে সৃষ্টিশীলতায় সক্রিয় থাকেন। তাই স্যার আরো আরো অনেক লিখবেন—আমাদের জন্যে, আরো পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে— যাতে ওনার নির্দেশ আমাদের বৌদ্ধিক কি পেশাগত দুটি জগতেই সঠিক ভাবে চলতে সাহায্য করে।

আর এরই পাশাপাশি চিরন্তন হয়ে থাকবে আমার জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি একালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষাদের অন্যতম এক মানুষের সন্নিধানে এসে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা ও স্নেহ পাওয়া— যার কোনো পরিমাপ সম্ভব নয়। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি তা পেয়েছি— এখনো পাচ্ছি।

❒

'ফতুয়ার মত পাঞ্জাবী—আর কালা পেড়ে ধুতি'

• • • • • •

জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী

ভেঙে পড়া শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে স্যার যেভাবে আমার পি. এইচ. ডি. করার সময় অভিসন্দর্ভপত্রের নির্দেশনা দান করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। কম কথায় যথাযথ নির্দেশনা দেবার মত সুযোগ্য নির্দেশক আজকাল প্রায় নেই বললেই চলে।

বিস্তৃত ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করানো এবং তা যথাযথভাবে লেখানো, সমস্ত কিছু মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তিনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। তাঁর মত মহীরুহের স্নেহছায়ায় কাজ করতে পেরে আমি ধন্য। কলকাতা থেকে ১৪০০ কিলোমিটার দূরে কালাপানি পার আন্দামানপ্রবাসী গবেষককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। তিনি চেয়েছিলেন মূল ভূখণ্ডের সংস্কৃতির সঙ্গে দ্বীপপুঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালির সংস্কৃতির—এতদিন পরে—চেহারাটা কেমন হয়েছে তার পরিচয়টাকে আমদেশবাসীকে জানাতে। আমাকে এমন দায়িত্ব দেওয়ার কারণ এই যে, আমি শিক্ষকতাসূত্রে ওখানে ছাত্রসহ সব স্তরের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাচ্ছি, তাই আমার পক্ষেই এই কাজটা করা সবচেয়ে সহজ। এই যে দূরদৃষ্টি তাঁর মতো শিক্ষকের পক্ষে থাকা সম্ভব। তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ড. সনৎকুমার মিত্র, আমার এম. ফিল. ক্লাসের শিক্ষক।

আন্দামান কলেজে যোগদানের খবর আমি ড. মিত্রকে জানালে তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে আমি যেন ঐ অঞ্চলের বাঙালির সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যালোচনায় মনোযোগ দিই। তাঁর নির্দেশমত ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ শুরু করে দিই। একদিকে যেমন বাঙালি উপনিবেশগুলিতে গিয়ে পুনর্বাসন-প্রাপ্ত উদ্বাস্তু বাঙালিদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির খবরাখবর সংগ্রহ করতাম, অন্যদিকে তেমনি চলতে থাকে আন্দামানের আদিবাসী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ. জি. সি.-র ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে যোগ দিতে যখন কলকাতায় আসি, তখন ড. মিত্র আমাকে স্যারের কাছে নিয়ে যান। স্যার সেদিন গবেষণার বিষয় সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের সারবস্তু, প্রস্তাবনা কিভাবে লিখে আনতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। দেখলাম আন্দামান সম্পর্কে অনেক কিছুই তিনি বেশ ভালই জানেন। পোর্টব্লেয়ারে ফিরে আসার আগে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করে চূড়ান্তভাবে সারবস্তু লিখে তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। সামনেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা। অবশেষে সুদূরবর্তী অবেদকের আবেদনটি গৃহীত হলো। আমি আন্দামানে ফিরে যাবার আগেই প্রি-রেজিস্ট্রেশন পর্বটি চুকে গেল।

'মে' মাসে গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসে ড, মিত্র এবং স্যার দু-জনের সঙ্গেই দেখা করলাম। স্যার জানালেন, তোমার রেজিস্ট্রেশনের সময় এসে গিয়েছে। জুনে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের

পরবর্তী মিটিং; সেই মিটিং-এ আমার আবেদনটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হলো। জুনের পাঁচ তারিখে রবীন্দ্রভারতীর তৎকালীন ডেপুটি-রেজিস্টার ড. এস. পি. আচার্য পত্র মারফৎ জানিয়ে দিলেন যে পি. এইচ. ডি. কার্যক্রমে আমার নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আমার কাজ শেষ করার জন্য চার বছর সময় দেওয়া হয়েছে।

আন্দামানে ফিরে এসে কাজ শুরু করেদিলাম। ড. মিত্র প্রায়শই টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আমার কাজের অগ্রগতির খবর স্যারের কাছে পৌঁছে যেত। গবেষণা কতদূর এগোল সে সম্পর্কে আরও দু-জন আগ্রহী ব্যক্তিত্ব খবর রাখতেন; তাঁরা হলেন ড. জ্যোৎস্না গুপ্ত এবং শ্রীমতি চিত্রা মিত্র। অন্তরালে থেকে আমার গবেষণায় এঁরা যে প্রেরণা যুগিয়েছেন তা আজীবন স্মৃতির মণিকোঠায় তোলা থাকবে। মাঝে মধ্যে স্যারের সঙ্গে টেলিফোনে সোজাসুজি কথা বলে নিতাম। খুবই সংক্ষিপ্ত সব নির্দেশ, কিন্তু কোথাও কোনও নেতিবাচকতা নেই।

তথ্য সংগ্রহের জন্য দূরদূরান্তের দ্বীপগুলিতে গিয়ে কাজ করতে হতো। লোক জানাজানি যাতে না হয় তারজন্য সাবধানতাও নিতে হতো। ছুটিছাটায় ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে বেরিয়ে পড়তাম। ১৯৯৮-এর ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটির সঙ্গে কয়েকটি ছুটি জুড়ে নিয়ে কাজ করেছিলাম উত্তর আন্দামানের কয়েকটি প্রত্যন্ত দ্বীপে, মায়াবন্দর তহশীলের পহেলগাঁও গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। ঘুরে ঘুরে ধূলি ধূসরিত অবস্থায় একদিন দুপুরে কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা দেখতে মায়াবন্দরের পি. ডব্লুডি. গেস্ট হাউসে গিয়ে দেখি রবীন্দ্রভারতীর ডেপুটি রেজিস্টার ড. এস. পি. আচার্য অদূরে লাউঞ্জের সোফায় বসে আছেন। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। চিনতে পারলেন। সব দেখে-শুনে তিনি তখন হতবাক। খাওয়া দাওয়ার পর মনে আছে জেটির পথে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিলেন। আমিও বিকেল তিনটের লঞ্চে কালিঘাটগঞ্জ হয়ে ডিগলিপুর রওনা হই। আন্দামান ভ্রমণ সেরে কলকাতায় ফিরে ড. আচার্য তার অভিজ্ঞতা ক্ষেত্রবাবু এবং সনৎবাবুকে শুনিয়েছিলেন। সমাবর্তনে উপাধি নেওয়ার সময় ড. আচার্য আবার সেদিনের কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

দু-হাজার সালের ফেব্রুয়ারিতে ড. মিত্র সস্ত্রীক আন্দামানে এলেন তামিলদের গাজন দেখতে। তাঁকে নিয়ে যতটা পারলাম উত্তর আন্দামান ঘুরলাম। বাকি দ্বীপগুলি ওঁরা নিজেরাই ঘুরে নিলেন। কাজ কেমন হচ্ছে এবং কিভাবে করতে হবে তার নির্দেশনাও দিয়ে গেলেন ড. মিত্র। অসুস্থ স্ত্রী শ্রীমতি মিত্রকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিজের হাতে ঠেলে বেড়ালেন তিনি সবসময় এবং সর্বত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয় ফিরে যাবার পনের দিনের মধ্যে আমার গবেষণার অন্যতম প্রেরণাস্থল শ্রীমতি মিত্র চিরতরে বিদায় নিলেন। পর্যটন প্রিয় মানুষটির শেষ-ভ্রমণের সাক্ষী হয়ে রইল আন্দামান।

এরপর ড. মিত্রের কাছে আমার কাজকর্মের বিষয় শুনে স্যার আবার কিছু নির্দেশ পাঠালেন। গরমের ছুটিতে গিয়ে লেখার পদ্ধতি এবং পরিবেশনা সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ লাভ করলাম। এই সময়ে ড. জ্যোৎস্না গুপ্তও আমাকে প্রেরণা যোগাতেন এবং আমার কাছে আন্দামানের গল্প শুনতে বসতেন। আর বলতেন—'যাবো, তোমার কাজটা হয়ে যাক। যেতেই হবে আন্দামান।' দু-হাজারের আগস্ট থেকে শুরু করে অক্টোবরে যখন যেমন লেখা হয়ে যেত সেইমত কয়েক দফায় অভিসন্দর্ভ পত্রটি পর্বে পর্বে পাঠিয়ে দিলাম স্যারের কাছে। স্যার অনুগ্রহ করে সুদূরবর্তী এই গবেষকের অভিসন্দর্ভ পত্রটি কম্পিউটারে ছাপাবার, বাঁধাবার, এমনকি জমা দেবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। অবশেষে দু-হাজার একের ১২ ফেব্রুয়ারি মৌখিকের দিন ধার্য হলো। লিখিত গবেষণা পত্র পরীক্ষকদের দ্বারা প্রসশংসিত হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষা হয়। সব রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার ভিত্তিতে বিশে মার্চ ডেপুটি রেজিস্টার একটি চিঠি দিয়ে জানান—'You have been declared

eligible for admission to Ph.D. in Bengali.'

'মে' মাসের সাত তারিখ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সমাবর্তন উৎসবে তৎকালীন রাজ্যপাল বীরেন জে. শাহের হাত থেকে আমার পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি গ্রহণের মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছিলাম ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মত মহান ব্যক্তিত্বকে। অনেক পুণ্যে তাঁর সম্মানকে রক্ষা করতে পেরেছি। পিতৃস্নেহে তিনি আমাকে যোগ্য করে নিয়েছেন।

সে বছরেই পুজোর ঠিক আগে ড. গুপ্ত সস্ত্রীক বেড়াতে আসেন আন্দামানে। সপ্তমীর সকালে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে বলেছিলেন—'এইখানেই থাকবে তুমি। দ্বীপবাসী বাঙালিদের জন্য অনেক কিছু করার আছে তোমার।' সেই আদেশ শিরোধার্য করে আজও আমি আন্দামানে অধ্যাপনা করে চলেছি। ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো পোর্টব্লেয়ারের সুবিখ্যাত সরকারী গেস্ট হাউস—'স্টিল হাউসে'। ওই কটা দিন যেন আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গিয়েছিল 'স্টিল হাউসে'। 'স্টিল হাউসে'-এর খোলা জানালা দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে মুগ্ধ নেত্রে মাসীমা তাকিয়ে থাকতেন খোলা সমুদ্রের দিকে। আর মাঝে মাঝে বলে উঠতেন—'কি সুন্দর ঘরের ব্যবস্থা করেছ তুমি।' দূরে ছোট ছোট দ্বীপ, লাইট হাউস আর জাহাজ ও নৌকার আনাগোনা যেন আনমনা করে তুলত তাঁকে। মাসীমা কলকাতা থেকে নানান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের জন্য। কলকাতায় ফেরার পর ফোনে জানিয়েছিলেন—'জ্যোতির্ময়, তোমাদের ওখানকার একটা ছবি বড় করে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি, এসে দেখবে।'' কত গল্প, কত কথা, ওঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ানো সব স্মৃতির মণিকোঠায় তুলে রেখেছি। এমন সুভদ্র এবং মার্জিত দম্পতি আর দুটি দেখিনি।

এখনও স্যারের সঙ্গে আগের মতই টেলিফোনে বছরের বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে আমি বিশেষভাবে যোগাযোগ রাখি। গবেষণাসূত্রে রাশভারি ক্ষেত্র গুপ্ত এখন আমার অতি আপনজন। এম. এ. পড়ার সময় স্যারের ব্যক্তিত্বকে বেশ ভয়ই করতাম। ভয়টা একটু ভাঙল এম. ফিল. পড়ার সময়। একদিন একটা মজার প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। এখনও মনে আছে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তুমি তো লোকসংস্কৃতির ছাত্র। আচ্ছা, দক্ষিণ রায়ের বুট জুতো পরাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?" প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম।

স্যারের পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে নানান জনের নানান মত থাকলেও আমি মনে করি স্যারের ওই ডায়াগ্রাম করে বোঝানোর পদ্ধতিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মগজে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম। তাই পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্যার, সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর লেখাকে যেভাবে বুঝেছেন অন্য কেউ সেভাবে বুঝেছেন কিনা সন্দেহ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের অন্যতম শিক্ষক প্রয়াত ড. রবীন্দ্র গুপ্ত এবং স্যারকে প্রায়শই দিনের শেষে বি. টি. রোডের দিকে যেতে যেতে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে শুনেছি। সে সব আলোচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। আমার সৌভাগ্য এই যে, আমি সে-সব আলোচনা কিছু কিছু, অংশ শুনেছি।

বরাবর স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মীদের সম্মান করতেন। বাংলা বিভাগের নিমাইদাকে তিনি খুব ভালবাসতেন এবং সে সময় নিমাইদা যে হারে তাঁর কাছে প্রশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরকালের জন্য একটা নজির হয়ে থাকবে।

স্যার বলতেই আমার মনে ফুটে ওঠে সেই চির পরিচিত ছবিটি—'সেই ফতুয়ার মত সাদা পাঞ্জাবি, আর কালো পেড়ে ধুতি পরা মানুষটি। স্নেহপরায়ণ, স্পষ্টবাক্ অথচ উদার এবং মহৎ।

❒

মন ভালো হয়ে যায়

• • • • • • •

বীথি চট্টোপাধ্যায়

ক্ষেত্র গুপ্তর লেখা সম্পর্কে কিছু লিখব ভাবলেই আমার মন ভলো হয়ে যায়। কেন মন ভালো হয়ে যায়—সেটাই খুলে বলছি। ধরা যাক কোনো লেখাপড়া জানা বাঙালি যিনি সাহিত্য ভালোবাসেন না। বই ইত্যাদি পড়তে দেওয়া মানে তাঁকে শাস্তি দেওয়া। এবার সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হল যে ক্ষেত্র গুপ্তর যে-কোনো একটি বই তাঁকে পড়তেই হবে। প্রথমে তিনি ভয় পাবেন। তারপর বইটা যখন তিনি পড়তে শুরু করবেন তখন তিনি বদলে যাবেন। তিনি গোটা বাংলা সাহিত্য পড়ে ফেলতে চাইবেন, অথচ ক্ষেত্র গুপ্ত না প'ড়ে তিনি যদি সোজা সাহিত্য পড়তে আসতেন তাহলে কী হত বলা যায় না। হয়তো তিনি সাহিত্যবিমুখই থেকে যেতেন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর বই পড়লে সাহিত্য সম্পর্কে যে কৌতূহল তাঁর তৈরি হবে তা সহজে মিটবে না। এখানেরই ক্ষেত্রবাবুর মৌলিকতা। সাহিত্যের সৌন্দর্যস্থানগুলি তিনি ধরিয়ে দেন। সাহিত্যের পাঠ কতোটা ইনটারেস্টিং সেটা ব্যাখ্যা করেন। সহজ করে বোঝান যেন গল্প করছেন, পাশে বসে। তাঁর জ্ঞান এতটাই গভীর যে তা সাধারণের সঙ্গে অনায়াসে কমিউনিকেট করতে পারে। কীভাবে আমরা সাহিত্য পড়ব, তা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ বা বাংলা উপন্যাসের ধারানুক্রমিক বিবরণ লিখতে গেলে লেখকের যতটা পরিশ্রম হয় সেই পরিশ্রমের ক্লান্তি অনেক সময় লেখাগুলির ওপর ছাপ ফেলে। অথচ ক্ষেত্রবাবুর লেখার কোনো ক্লান্তির ছাপ আমি খুঁজে পাইনি। যেন একজন নবীন যুবক নতুন উদ্যমে তাঁর উপন্যাস লিখছেন। এত ফ্রেশ, টানটান ভাষা। আসলে সাহিত্য পাঠে তাঁর ক্লান্তি আসেই না। সেইজন্য এত তরতাজা তাঁর বইগুলি। আমি কোনো উপন্যাসের ভালোমন্দ বিচারের সময় ক্ষেত্রবাবুর নির্দেশিত দিক্‌নির্দেশগুলো মনে করি । তাতে লাভ হয় যেটা তা হলো মনে মনে অনেক নিরপেক্ষ হয়ে উঠি।

সংস্কারহীন বিশ্লেষণ নতুন প্রজন্মকে তাঁর লেখার প্রতি চুম্বকের মত আকর্ষণ করে । তাঁর লেখায় কোনো ট্যাবু নেই—এটা ভাবতে যত সরল, কাজটা তত সরল আদৌ নয়। এক জায়গায় তিনি শারীরিক ছোঁয়াছুঁয়ির প্রশ্নে রবীন্দ্র উপন্যাসকে, বঙ্কিম বা শরৎ এর চেয়ে অনেক বেশি শুচিবায়ুগ্রস্থ বলেছেন আর ওঁর বলা তো এমনি এমনি বলে দেওয়া নয়। যথার্থ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করাও বটে। ভাবার যেটা ক্ষেত্রবাবু কিন্তু দুর্দান্ত রবীন্দ্রপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর প্রেম অন্ধ নয়—এখানেই তাঁর অসামান্য আবেদন। সেই জন্যেই তাঁর লেখা পড়ে মন ভালো হয়। মনে হয় তিনি কিছু দিতে চান, শাসন করতে চান না। এই মেগালোম্যানিয়াক রাজ্যে যেখানে সাহিত্য সমালোচনাতেও মৌলবাদ বেশ গেড়েই বসেছে সেখানে ওঁর লেখা ভালো তো লাগবেই। এটা কোনো উচ্ছ্বাস থেকে বলছি না। যুক্তিবোধ থেকে বলছি। মার্কসবাদী মন হলেও পুরো মাকর্সীয় ধারায় তিনি সমালোচনা করেননি। মার্কসবাদের নির্যাসটুকু আছে, কিন্তু সাহিত্যকে কোনো সীমায় বাঁধারই তিনি বিপক্ষে তা যত পরিশীলিত সীমাই হোক না কেন। সাহিত্যপাঠ করে তিনি যে আনন্দ পান সেটাই তিনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আর আমাদের তখন মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

❐

তৃতীয় পর্ব

'আমার ভাবনা, আমার লেখা'

—ক্ষেত্র গুপ্ত

ফেডেরালইজমের বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এদেশে তো নয়ই। বহুজাতিক দেশ, বাস্তব অভিজ্ঞতা হলেও তাকে তত্ত্বগতভাবে এদেশের চিন্তাবিদেরা আয়ত্ত করেন নি। বাংলার নবজাগরণের নেতারা প্রাচীন ধর্ম-দর্শন-সমাজ এবং সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের পুনর্ব্যাখ্যানে আত্মনিয়োগ করে নব জাতি গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ছিল শুধু মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালিত্বের বোধ। প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল রেনেসাঁ ছিল ইন্ডিয়ান রেনেসাঁ ইন বেঙ্গল। এর নেতৃকুল পশ্চিমের মানবিক-জাগতিক আদর্শ আত্মসাৎ করার চেষ্টায় নিজের অতীতকে আমন্ত্রণ জানালেন, সেই আইডেনটিটি প্রাচীন ভারতীয়ত্ব। বাঙালিত্ব নয়। ভারতীয়ত্ব— তবে বঙ্গীয় ভাষায় ধৃত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থসংগ্রহের পৃষ্ঠায় পাল রাজদের প্রসঙ্গে কিছুটা কাজ করেছিলেন বটে তবে বঙ্কিমই প্রথম বঙ্গ-ভারতীয়ত্বের তত্ত্বটি মননের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সৃষ্টির দিক থেকে মধুসূদন অবশ্য প্রথম।

বঙ্কিম পত্রিকার নাম দিলেন 'বঙ্গদর্শন'। এবং একটি আন্দোলন গড়ে তুললেন। প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল স্টাডিজ-এর সূত্রপাত এখান থেকে।

গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক উচ্চস্তরের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গবেষক হয়েও, তাঁর বহুমুখি কর্মধারা বিপুলভাবে বজায় রেখেও সুনিশ্চিত ভাবে বঙ্গবিদ্যার চর্চা করে গেছেন। এ-দুয়ের মধ্যে বিরোধ নেই, এবং এই চর্চা যে অতি প্রয়োজনীয়—এ না হলে জাতির আত্মপরিচয়ে যে বড় রকমের অসত্য ও অপূর্ণতা থেকে যায় এই প্রত্যয়ের কথাও বলেছেন।

তিন.

তিনি ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে একটি পুঁথি পেলেন। মনে হয় এই পুঁথির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এর অন্তর্নিহিত দারুণ এক সম্ভাবনা অনুমান করে তিনি এটির বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হাজার হাজার পুঁথি সম্বন্ধে সমান উৎসাহ দেখাননি, দেখানো সম্ভব ছিল না—সেগুলির ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ তৈরি করা বা কোনো কোনোটির সম্পাদিত সংস্করণ প্রস্তুত করার দীর্ঘকালব্যাপী যে দায়িত্ব তার থেকে এই কাজটি একটু পৃথক। তিনি বাংলা ভাসা ও বাঙালি জাতির আদিরূপের সন্ধান পেয়ে এক ধরনের উল্লাস অনুভব করেছিলেন, যা নিরপেক্ষ পাণ্ডিত্যের থেকে একটু অন্যরকম। 'হাজার বছরের পুরান বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে বইটি প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের আদিরূপ তিনি বাঙালি জাতির সামনের মেলে ধরলেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এটি যে প্রাচীনতম তার প্রমাণ মিলল। বাংলা ভাষার ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে শ-পাঁচেক বছর পেছনে নিয়ে আয়ু বাড়িয়ে দিলেন। বাঙালির অতীতের—হাজার বছর পূর্বেকার সমাজ ধর্ম রীতিনীতি প্রেম কবিত্ব—এসবের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিলেন। বাঙালি জাতির হাতে একুট বাড়াবাড়ি রকমের অহংকার করার হাতলও ধরিয়ে দিলেন। হরপ্রসাদ তাঁর বেঙ্গল স্টাডিজের তাৎপর্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে কতটা সচেতন ছিলেন তা পরিষ্কার করে বলেছেন :

'বাঙ্গালা পুঁথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে,—১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধধর্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৪। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালা ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে।... পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে।... সকলের আগে আমি কি সেটুকু চেনা চাই, সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে [নিম্নরেখা আমার]।

বাংলা পুঁথি সংগ্রহ প্রসঙ্গে কথাগুলি বলেছেন—তার মানেই হল ভারতীয়ত্বের মধ্যে আমাদের বাঙালিত্বের আইডেনটিটি তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল।

চার

১৯১৪ সালে তিনি বাংলার প্রাচীন গৌরব শিরোনামে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পরে তা বই হয়ে বেরয়। এই পুস্তিকায় আলোচিত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ আছে। আমি শুধু বিষয়সূচীটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—হস্তি চিকিৎসা, নানা ধর্মমত, রেশম, বাকলের কাপড়, থিয়েটার, নৌকা ও জাহাজ, বৌদ্ধ শীলভদ্র, বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব, নাথপন্থ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র, লুইপাদ ও সিদ্ধাচার্যগণ, ভাস্করের কাজ, বাঙ্গালায় সংস্কৃত, বৃহস্পতি-শ্রীকর-শ্রীনাথ-রঘুনন্দন, ন্যায়শাস্ত্র, চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর, তান্ত্রিকগণ, বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ রাজা। অনেক বিস্তারিত গবেষণায় ও আলোচনায় বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়ভার অনুগামীদের—এইগুলি সবই গৌরবের ব্যাপার কি না জাতির জীবনে তাও বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের জানতে গেলে, বাঙালিত্বকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে চেনবার জন্য এগুলি কুঞ্চিকাস্বরূপ। এর মধ্যে দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার, ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকলেও হরপ্রসাদ শ্রমজীবী-কারুবিদদের নিপুণতাকে বাংলার প্রাচীন গৌরবের কারণ রূপে অভিহিত করেছেন,—রেশম, বাকলের কাপড়, নৌকাও জাহাজের কথা বলতে গিয়ে। তিনি এই বইয়ের বাইরে বাংলার ব্রাত্যদের নিয়ে আলোচনা করে পূর্ণাঙ্গ দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন, এবং লোকায়ত বিশ্বাস ও রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন ডাক ও খনা নিয়ে লেখা প্রবন্ধে। এ-সবকে বাংলার ঐতিহ্য বলে স্বীকার করার তাৎপর্য আছে। হরপ্রসাদ আমরণ এই আগ্রহ বজায় রেখেছেন। জীবনের শেষদিকেও তিনি পুরনো বাংলার ইতিহাসের কথা বলেছেন, এবং পাল রাজত্বকালের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সামাজিক ইতিহাস—তাও পাল আমলের— সেকালে এ-সব লেখার চেষ্টা বড় সহজ কাজ ছিল না।

পাঁচ

হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে মূলত ভারততত্ত্ববিদরূপে অমূল্য কাজ করেছিলেন। এর পাশাপাশি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি বঙ্গবিদ্যাচর্চার এক মুখ্য প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা নিয়ে পরপর পুরানো পুঁথির সম্পাদনা ও প্রকাশ করে গেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথেক ইণ্ডিকার আদলে বঙ্গ ীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে দ্বিমাসিক 'প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হতে থাকে। ১১টি খণ্ড ছাপা হয় হরপ্রসাদের পরিচালনায়। এতে পুরনো অনেক পুঁথির সম্পাদিত রূপ সংকলিত হয়েছিল।

হরপ্রসাদের বাংলা পুঁথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনা করে পুঁথি প্রকাশের পিছনে সুনির্দিষ্ট মোটিভেশন ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক যে বদ্ধমূল ধারণা শিক্ষিত সমাজে উনিশের শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তার নিরসন করা। হাতের সামনে মুদ্রিত নজির রূপে পুরানো বই যত বেশি সম্ভব হাজির করা। এই মনোভাব তিনি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন :

'রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল, তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ।... লোকের ধারণা ছিল, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, ইহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না।...'

শাস্ত্রী মহোদয় একটা বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পুঁথির কাজে ধারাবাহিকভাবে আত্মনিয়োগ

করেন। শুধু এক নিষ্ঠাবান পুঁথি-গবেষক ছিলেন না তিনি, একটা সামগ্রিক জীবন-সাধনা সারস্বত-সাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল বাংলা পুঁথি নিয়ে তাঁর এই ব্যাপক কাজকর্ম।

ছয়

হরপ্রসাদের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লিখেছিলেন :

'অনেকের সংস্কার, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা।... আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গালার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বলি।...সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম।'

তিনি ইংরেজির আদলে বাংলা লেখাকে নিন্দা করেছেন, তার চেয়েও বড় কথা সংস্কৃত ভাষার অনুগামিতাকে প্রতিরোধ করার পক্ষে তিনি জোরাল সওয়াল করেন, এবং সংস্কৃতওয়ালাদের মুসলমানি শব্দাদি ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাকেও একটি গাজোয়ারি প্রক্রিয়া বলে পরিত্যাগ করেন।

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ও সুন্দর রূপের কথা রামমোহন থেকে শুরু করে বেঙ্গল রেনেসাঁর সব মহারথীই ভেবেছেন। প্যারীচাঁদ বঙ্কিম তো এই নিয়ে আন্দোলনও করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের চিন্তা আর এক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মত মাত্র;—এই যা। এই বিষয়ে একটু ভাবার ব্যাপার আছে। হরপ্রসাদ নিজেকে ইংরেজির অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির চেলা বলে দাবি করতেন। এই গাঙ্গুলি মশাই ক্যালকাটা রিভিউতে বাংলা ভাষা বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখে বেশ হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা ও ব্যাকবণের স্বাধীনতার ভাবনা সেখানে ছিল, একজন পয়লা সারির ইণ্ডোলজিস্টের পক্ষে বাংলা ভাষা নিয়ে এই ধরনের একটি আন্দোলনে যোগ দেবার মধ্যে তাঁর বঙ্গ-তাত্ত্বিকতার পরিচয় মেলে।

সাত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার প্রাচীন ধর্মগুলি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছিলেন। এবিষয়ে তাঁর একটি বড় কীর্তি বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের লৌকিক রূপের আবিষ্কার। বাংলার মহান বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বিহারগুলির মহিমা নিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখলেও বঙ্গসংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের একটি পৃথক মাটিঘেঁষা চরিত্র তিনি দেখেছেন। তিনি সেকালের সাধারণ মানুষের—বিশেষভাবে অন্ত্যজ স্তরের লোকেদের মধ্যে ছদ্মভাবে বিমিশ্র আকারে—শুধু মহাযানী-কালচক্রযানী-বজ্রযানী-সহজযানী বলে জানিত বৌদ্ধ স্কুলগুলির নয়, বিচিত্র তান্ত্রিক-হঠযৌগিক এবং একান্ত লৌকিক আচার-বিশ্বাসের যৌগিক রূপে বৌদ্ধদের দেখেছেন। এর মধ্যে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির ভিত খুঁজেছেন। শুধু উচ্চবর্ণগুলি এবং তাদের ব্রাহ্মণ্য বিধান নয়, বাঙালির উৎসে পৌঁছতে গেলে ঐ বঙ্গ-বৌদ্ধ ধর্মকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে, বাঙালিকে এই সত্য শেখাতে চেয়েছেন।

অর্থাৎ হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন শুধু ধর্মতত্ত্বের প্রাজ্ঞ বিশ্লেষক হিসেবে নয়—একজন অ্যাকাডেমিসিয়ানের মতোও শুধু নয়। তিনি বাঙালিত্বের খোঁজে একটা খুব গুরুতর স্তম্ভ পেয়ে গেছেন 'বাঙালির বৌদ্ধধর্মে'।

আট

সর্বশেষে আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলব। তিনি ঔপন্যাসিক না হলেও তাঁর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনী, এবং বাংলার হাজার বছর আগের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনটি মানবিক করে তুলে আমাদের নিজ অতীতের মুখোমুখি করা ছিল তাঁর অভিপ্রায়। বেনের মেয়ের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কথা এখানে আমার আলোচ্য নয়।

এ বইয়ের সমাজতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনায় দেখানো যেতে পারে হাজার বছর আগের বাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়—সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখানে দেবার চেষ্টা। বঙ্কিম-প্রভাবিত ঐতিহাসিক রোমান্সের বর্ণাঢ্যও রাজকীয়তা নয়, গোটা জাতির সামগ্রিকতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। একদিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের স্মৃতি-শাসিত বিন্যাসের কঠোর মুঠি, অন্যদিকে সহজিয়া বৌদ্ধদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, অন্ত্যজ সমাজের বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ে রাজশক্তি অধিকার, বহির্বাণিজ্যের ফলে গন্ধবণিকদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য, সেনাবাহিনীতে 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোমদে'র শৌর্য। স্বয়ং চর্যাকার লুইপাদের তুম্বি বীণা বাজিয়ে কায়াসাধনের গান গাইতে গাইতে পরিক্রমা। জ্ঞানে তত্ত্বে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় যা কিছু তিনি বহু প্রবন্ধে বলেছেন বঙ্গ-তাত্ত্বিক রূপে তাকে চরিত্রে-কাহিনীতে রক্তে-মাংসে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন 'বেনের মেয়ে'তে।

ভারতীয় জাদুঘরে প্রদত্ত বক্তৃতা।



২.

সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাসের তত্ত্ব এবং গোপাল হালদার

এক.

গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা/প্রথম খণ্ড—প্রাচীন ও মধ্যযুগ, বইটি বের হয় ১৯৫৪ সালের মে মাসে। পরে তিনি বইটির দ্বিতীয় খণ্ড—নবযুগ প্রকাশ করেন ১৯৫৮ সালে। আমরা তখন ছাত্রাবস্থার গুটি কেটে নব্য অধ্যাপক হিসেবে পেশাদার সাহিত্য-সাধক হয়ে উঠেছি। এ-বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অজস্র তথ্যের মধ্য থেকে সাহিত্যের ইতিহাসকে বুঝে নেবার একটা পথ এতদিনে পাওয়া গেল! কালেজী পড়াশুনার বাইরে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা এবং সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির সম্পর্ক আবিষ্কারে আগ্রহীরা এতকালে সামনে একটা কিছু পেলেন। যতদূর মনে পড়ছে অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানস' বইটি তখন প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনার সেই মার্কসবাদী বিশ্লেষণে শিল্পচেতনার অভাব, তথা যান্ত্রিকতা দেখে যাঁরা পীড়িত বোধ করছিলেন, তাঁদের স্বস্তি পাবার মতো কিছু ছিল গোপাল হালদারে।

গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' এবং 'ইংরেজী' সাহিত্যের রূপরেখা'র প্রত্যক্ষ

লক্ষ্য ছিল অনার্স এবং এম এ-র ছাত্ররা। আমার ধারণা, পাঠ্যপুস্তক লেখার ভাবনা থাকার ফলে একটা বড় বইয়ের গণ্ডী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি, বরং সুনির্দিষ্ট হয়েছে। তাতে কলেজের পড়ুয়া যারা নন, তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নি, পথটি সুচিহ্নিত ও লক্ষ্যাভিমুখী হয়েছে। ছাত্ররা নতুনভাবে এবং অনেকটা ঠিক পথে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পড়তে শিখেছে। বাইরের পাঠকেরা বুঝতে পেরেছে, সাহিত্যের ইতিহাস শুধু ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা পেরুবার জন্য নয়, বাঙালিমাত্রের আত্মানুসন্ধানের দিগদর্শন।

দুই.

সুকুমার সেনের বিপুলায়তন 'সাহিত্যের ইতিহাস' কালানুক্রমে সুবিন্যস্ত একটি অতি বিস্তৃত ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ। এমন কি বাংলা সাহিত্যের মহাফেজখানা বললেও অত্যুক্তি হয় না। আহমদ শরীফ রচিত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশের পরে সেকালের বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশের পরিচয় পেয়েছি, যা এতকাল আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল। শরীফের গ্রন্থে প্রাপ্ত নতুন তথ্যাদি সহ সুকুমার সেনের লেখায় পুরনো দিনের কাব্যাদির যে পরিচয় পাই, মূলত তার উপরে ভিত্তি করেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠবে। 'আকাইভ্‌স' বা মহাফেজখানা, 'ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ', পুঁথির বিবরণ এবং সাহিত্যের ইতিহাস এক বস্তু নয়। উৎস থেকে যেমন প্রয়োজন নির্বাচন করে, গুরুত্ব-অনুযায়ী গ্রহণ বর্জনে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হয়, তেমনি সময়ের সঙ্গে তাকে অন্বিত করতে হয়, কালানুক্রমকে যুগ থেকে যুগে বিকাশের সূত্রে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়।

একথা অবশ্য ঠিক, রামগতি ন্যায়রত্ন থেকে শুরু করে যাঁরাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তাঁরাই প্রাথমিক রকমের হলেও কোন একটা যুগবিভাগের চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইয়ে যুগের বিভাগ অনেক সুনির্দিষ্ট। সময়ের সঙ্গে সমকালের সাহিত্যকে—সাহিত্যের মূল প্রবণতাকে যুক্ত করার একটা ঘনিষ্ঠ তৎপরতাও সেখানে দেখা গিয়েছে। তিনি যে সব তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন, যে সব তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাতে অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের সায় না থাকলেও পদ্ধতির দিক থেকে দীনেশচন্দ্রের বাংলা বইটির মূল্য মানতেই হয়।

একথা ঠিক যে লেখক আদ্যন্ত যুগের বিন্যাসে সুসঙ্গত কোন রীতি অবলম্বন করেন নি। যেমন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র চতুর্থ অধ্যায় তাঁর মতে 'হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ, পঞ্চম অধ্যায় কোন যুগ নয়। অনুমান করা যায়, লেখক হিন্দু রাজত্বের অবসানে তুর্কীরবিজয়-পরবর্তী সময়ে লিখিত সাহিত্যের কোন তথ্য না পেয়ে এই কালকে যুগচিহ্নহীন করেছেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে অবশ্য এখানে পঞ্চদশ শতকের সাহিত্যের ভূমিকা হিসেবে তিনি কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে পরবর্তী স্তর হল 'গৌড়ীয় যুগ'। ব্যাখ্যায় বলেছেন—'চৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য'। কিন্তু পরের স্তরে একই কালসীমার সাহিত্যকে তিনি দুটি যুগে ভাগ করে বিন্যস্ত করেছেন। সপ্তম অধ্যায়—'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ'। এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের বৈষ্ণব সাহিত্য। অষ্টম অধ্যায়-'সংস্কার যুগ'—যার অন্তর্গত চৈতন্য-প্রভাব কালীন মঙ্গলকাব্য, উনি যাঁকে বলেছেন লৌকিক শাখা এবং রামায়ণাদির 'অনুবাদ শাখা'। একই কালসীমায়, এভাবে দুটি যুগের ধারণা অবশ্যই যুক্তিসহ নয়। দীনেশচন্দ্র যাদের যুগ বলেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে যুগ নয়। কারণ এদের একটির সঙ্গে পরবর্তীর পার্থক্য মৌলিক ও গুণগত নয়—রূপগত। এজন্য আচার্যকে অভিযুক্ত করা যায় না—কারণ তখনও 'যুগ' শব্দটির দ্বারা ঐতিহাসিক পর্যায়ের যে মূল রূপান্তর দ্যোতিত হয়, সে ভাবনা

আসে নি। তিনি যুগ বলতে পর্বই বুঝিয়েছেন। তবে গৌড়ীয় যুগের সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের পার্থক্য যে যথার্থ যুগগত, শুধুই স্তর বা পর্বগত নয়, এই সত্য অনুধাবন করেন নি। তাছাড়া স্তরগুলির নামকরণ ও লক্ষণ-নির্ণয়ে তাঁর অনেক কথা হয়তো মানা যায় না। তবুও সব অসঙ্গতি সত্ত্বেও এ কথা বলা, যে বাংলা সাহিত্যের ইতিাসের প্রথম বড় লেখক কালবিভাজনের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, ঐ কাজটি ছাড়া যে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা যায় না এসত্য তাঁর জানা ছিল। কিন্তু এই কাল-বিভাজনের ভিত্তি কি তিনি আমাদের জানান নি নিজে স্পষ্ট করে জানতেন কি? যুগের সঙ্গে যুগের পার্থক্য এবং যুগের অন্তর্ভুক্ত পর্বের বা স্তরের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের পার্থক্য সম্বন্ধেও সাহিত্যের ইতিহাসের এই যথার্থ পথিকৃৎ আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন নি।

তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বইটির বিন্যাস কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি বিভিন্ন শাখা ধরে বিবরণ ও বিকাশ দেখিয়েছেন। কোন্ পথটি সঠিক বলে আচার্য মনে করতেন? বাংলা বইটির পদ্ধতি-যুগানুযায়ী সাহিত্যের বিকাশ দেখা, যুগের মধ্যে শাখাগুলিকে নিয়ে অধ্যয়ন? অথবা, ইংরেজি বইয়ের রীতি—শাখা ধরে পরিচয় এবং প্রসঙ্গক্রমে যুগের প্রশ্ন জানা? অবশ্য দীনেশচন্দ্রের কাছে যুগ [আমাদের ভাষায় হওয়া উচিত পর্ব] এবং শাখাগুলিও আছে। আমি বিশেষভাবে ইংরেজি 'বেঙ্গলি রামায়ণস্'-এর কথা বলছি। চৈতন্য পূর্ব অর্থাৎ দীনেশবাবু-কথিত গৌড়ীয় যুগে, চৈতন্য-প্রভাব কালে এবং তথাকথিত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে [দীনেশবাবু অষ্টাদশ শতককে এই নাম দিয়েছিলেন] বাংলায় অনূদিত রামায়ণে যে সব যুগোচিত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তার চমৎকার বিশ্লেষণ ঐ বইয়ে আছে। অবশ্য তার সঙ্গে সবাই একমত নাও হতে পারেন। তবুও লেখকের চেতনায় যে ইতিহাসের ছন্দ আন্দোলিত হত তাতে সন্দেহ নেই।

তিন.

সুকুমার সেন তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক বেশি তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তথ্য সংকলন এবং কালনির্ণয় ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, যদিও পুঁথির প্রাচীনত্ব বিচারে সর্বদা নিরপেক্ষ নন। তবুও তাঁর গ্রন্থ তথ্যের আকর রূপে সকলের মান্য। সম্ভবত বস্তুনিষ্ঠার জন্যই তিনি যুগবিভাগকে আরোপিত ব্যাপার বলে মনে করেছেন। বইয়ের প্রথম সংস্করণে তিনি লিখেছিলেন, "বাঙ্গালার সাহিত্যের ইতিহাসকে যথসম্ভব কালানুক্রমিক এবং অব্জেকটিভ্ বা বস্তুগত ভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।...সত্যকথা বলিতে কি, বাঙ্গালা দেশে তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বৌদ্ধ' 'শৈব' 'ব্রাহ্মণ্য' 'ঐশ্লামিক' ইত্যাদি যুগবিভাগ একেবারে কাল্পনিক।" ইঙ্গিতটা দীনেশচন্দ্রের প্রতি বোঝা যায়। মনে হয় কোনরূপ যুগবিভাগ ব্যাপারটিকেই তিনি ইতিহাসের পক্ষে অবাস্তব, এমন কি ক্ষতিকর মনে করেছেন। করেছেন কি?

তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণেই গ্রন্থটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ আকার নেয়। পরবর্তী সংস্ককরণগুলি এরই উপরে কিছু সংযোজন, সংশোধন। দেখা যায় বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক কতকগুলি পর্বের কল্পনা করেছেন—যুগের নয়। তাঁর নিজের ভাষায় সেগুলির পরিচয় দিচ্ছি :

প্রথম পর্ব—চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত
দ্বিতীয় পর্ব—পঞ্চদশ শতাব্দী
তৃতীয় পর্ব—পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ঃ পাঠান ও আফগান আমল [১৪৯৪-১৫৭৫]
চতুর্থ পর্ব—মোগল শাসনের সূত্রপাত [১৫৭৫-১৬০৭]
পঞ্চম পর্ব—সপ্তদশ শতাব্দী : মোগল আমল [১৬০৭-১৭০৭]

ষষ্ঠ পর্ব—অষ্টাদশ শতাব্দী : নবাবী আমল [১৭০৭-১৭৬৫]

সপ্তম পর্ব—অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী : কোম্পানী আমল [১৭৬৫-১৮৫৭]

লেখক এইভাবেই পর্ববিভাগ করেছেন, নামকরণ করেছেন, কাল-নির্ধারণ করেছেন। কেন যুগ না বলে এদের পর্ব বলছেন তা বোঝার উপায় রাখেন নি। নামগুলি দেখে মনে হয় রাজনৈতিক রদবদলের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এই ভাগগুলি করেছেন। অথচ তুর্কীবিজয় ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়কে একটা পর্বের মধ্যে রেখেছেন, যদিও বাঙালি জাতিগঠনে তুর্ক অধিকারের তাৎপর্য নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। আবার বাংলার ইতিহাসকে পাঠান-আফগান আমল, মোগল শাসনের সূত্রপাত, মোগল আমল, নবাবী আমল এইভাবে সাল মেপে বিভক্ত করেছেন। এর সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের পর্বান্তরের যেমন কোন যোগ নেই, তেমনি বাংলা সাহিত্যের কোন লক্ষণীয় রূপান্তরের চিহ্ন নেই। লেখক প্রায়ই সুনির্দিষ্ট সালেরও উল্লেখ করেছেন পর্ববিভাগ প্রসঙ্গে, যেমন ১৪৯৪, ১৫৭৫, ১৬০৭, ১৭০৭, ১৭৬৫। কিন্তু এই সালগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যঘটিত কোন্ তাৎপর্যের জন্য ওঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কোন পর্বের আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি বিষয়ে ক্বচিৎ যে দু-একটি মন্তব্য করেছেন তা আকস্মিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। কোন পর্বকে তার কালগত বৈশিষ্ট্যে যেমন লেখক চিহ্নিত করতে পারেন নি, তেমনি ঐ সময়ে রচনার সঙ্গে তার কোনরূপ সম্পর্কের সন্ধান করেন নি। মনে হয় এসব তিনি জেনেশুনে করেছেন বস্তুনিষ্ঠার জন্য। ফলে তাঁর মহাগ্রন্থ লিটারারি আকাইভ্স্ হয়ে উঠলেও সাহিত্যের ইতিহাস হল না।

চার.

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এই দুই লেখকের কথা মনে রেখেই গোপাল হালদারের ছোট বইটির কথা ভাবব।

দীনেশচন্দ্র এবং সুকুমার সেন, দু-জনই দু-ভাবে সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ-মনীষী। নিজ নিজ কালে তাঁরা ছিলেন তথ্যের প্রভু। গোপালবাবুর উপরে এই দুই কৃতিত্বের কোনোটি আরোপ করাই সম্ভব নয়। আর দীনেশ সেন, সুকুমার সেনকে টক্কর দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের কোন আদর্শ কেতাব লেখবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান স্বতন্ত্র ধরনের উপন্যাস লেখার সুবাদে, এবং বাংলা সংস্কৃতির মার্কসবাদী ভাষ্যকার রূপে। আমার মনে হয় প্রকাশক ছাত্র-পাঠ্য একটি বই বের করতে চেয়েছিলেন, গোপাল হালদার সেই উদ্দেশ্যে লিখতে গিয়েও প্রয়োজন ছাপিয়ে যান। পূর্বসূরীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে গুরুত্ব বিবেচনায় কিছু গ্রহণ করে তিনি একটি খাঁটি সাহিত্যের ইতিহাসই লিখলেন। আকারটা সংক্ষিপ্ত এবং অপূর্ণ বলেই নাম দিলেন 'রূপরেখা'। কিন্তু তা যথার্থ রূপরেখা। তাঁর ভেতরে খাঁটি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতিকে বুঝে নেবার যে বৌদ্ধিক তাগিদ ছিল এই সুযোগে তার মুক্তি ঘটল। বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যানে এই বস্তুটি অপেক্ষিত ছিল, তা তিনি জানতেন। আর প্রকৃত অবজেকটিভিটি যে শুধু নিষ্প্রাণ তথ্যনিষ্ঠায় নয়, বস্তুবাদী প্রত্যয়ে,—সুকুমার-ঘরানার সামনে সেই বক্তব্যটি তুলে ধরার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। তবে এসব করতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের সীমানা ডিঙোন নি। সেকারণে এই বইয়ের প্রকৃত গুরুত্ব ততটা প্রচারিত নয়।

পাঁচ.

সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কুঞ্চিকা :

১. যুগ-বিভাজন

২. বর্গীকরণ

জাতির ইতিহাস যুগ থেকে যুগান্তরে এগিয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সহজ ও জটিল নানা সম্পর্কে বিবর্তিত হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস। কিন্তু যুগ থেকে যুগের যে ভাগ তার মাপক কি? এবং যুগ থেকে যুগান্তরে বিবর্তনে কি কোনরূপ উপরিভাগ মেনে নেবার প্রয়োজন আছে?

এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট একটা নীতি মার্কসবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। মোটাদাগের সূত্রটা হল এই যে, অর্থনৈতিক ভিত্তির বদল ঘটাটাই যুগান্তরের মূল বিভাজিকা। অন্যেরা এত সুনির্দিষ্ট করে কিছু না বলে সাধারণভাবে বলেন, সমাজে-রাজনীতিতে-অর্থনীতিতে-সংস্কৃতিতে যখন কোন মূল পরিবর্তন ঘটে।

তখন জাতির ইতিহাস এক যুগ থেকে পরবর্তী যুগে উত্তীর্ণ হয়। মার্কসবাদীরা সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসেবে দেখেন অর্থনীতিকে। তাকে বলেন বেস, অন্য সবকিছু সুপারস্ট্রাকচার। ভিত্তি বদলালে সাহিত্য প্রভৃতি উপরিসৌধও একেবারে গুণগতভাবে বদলে যায়।

দেখা যাক, গোপাল হালদার মার্কসবাদীদের কাছে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ উক্ত ধারণাটি কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে তুর্কীবিজয়ের ফলে বঙ্গের অর্থনৈতিক ভিতের বদল ঘটেনি। তাই তুর্কীবিজয়কে মধ্যে রেখে আদিযুগ-মধ্যযুগ—এইরূপ পরিকল্পনা যুক্তিসহ নয়। করা সঙ্গত নয়। বৃটিশ অধিকারের পর্ব পর্যন্ত একই ধাঁচের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি—সে কারণে বাংলা সাহিত্যের একটাই যুগ। গোপালবাবু এ যুক্তি মানেন নি। তুর্কীবিজয় নামক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডটি পুরানো বাংলার জীবনে এমনই একটি ঘটনা যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী—যুগান্তকারী, সমাজে, ধর্মক্ষেত্র এবং সাহিত্যেও। যদিও ফিউডাল অর্থনীতির প্রচলিত কাঠামোটি ভেঙে পড়েনি। গোপাল হালদারের মতো মার্কসবাদী পণ্ডিত বেস-সুপার স্ট্রাকচারের সিদ্ধ ধারণার অনুবর্তী না হয়েও এখানে ইতিহাসের যুগবিভাগ করেছেন। সাহিত্য ইত্যাদি সুপার-স্ট্রাকচার নয়—একথা অবশ্য ঘোষণা করেন নি। কিন্তু কার্যত এই তত্ত্বের পোষণ করেছেন। আটের দশকে অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্তের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব মার্কসবাদের মৌল প্রত্যয়ে আস্থা রেখেও, কিন্তু পাঁচের দশকে গোপাল হালদারের মতো মুক্তবুদ্ধি মার্কসবাদীর পক্ষেও সেটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

যদিও তৃতীয় যুগের পরিকল্পনায় সমস্যা ছিল না। সেখানে রাজনীতির পালা ও অর্থনীতির ভিত একই সঙ্গে বদলেছে। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনার ফলে মধ্যযুগের ফিউডাল ব্যবস্থার স্থানে আধা-ঔপনিবেশিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে।

দেখা যাচ্ছে গোপাল হালদার ঐতিহাসিক যুগবিভাগে, যদিও প্রত্যক্ষত সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে—আসলে জাতির জীবনেতিহাসের সমগ্রতায়ই, রাজনৈতিক ঘটনাকেই সামনে রেখেছেন—যদি অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তন তার সঙ্গে মিলে থাকে তো ভালো, না মিললেও রাজনৈতিক কালবিভাজনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কমে না।

দুই খণ্ডে বিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা বইয়ে আমরা তিনটি যুগ-বিভাগের মুখোমুখি হই : ১. প্রাচীনযুগ ২. মধ্যযুগ ৩. নবযুগ। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ সে তার কাল মোটামুটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডকে নবযুগ নামে উল্লেখ করে, তার প্রথম ভাগ, প্রস্তুতির পর্ব পর্যন্ত

আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন লেখক। এ-থেকে বোঝা যায়, নবযুগের অন্তর্গত আরও কিছু কিছু পর্ব আছে, যার আলোচনা পরবর্তী কোন খণ্ডে করার পরিকল্পনা লেখকের ছিল। তবে বৃটিশ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তি তথা দেশবিভাগের সূচনা থেকে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের কোন নতুন যুগের পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা তা অনুমান করার উপযোগী কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই।

ছয়.

বইটির প্রথম খণ্ডের কথায় ফিরে আসি। লেখক স্পষ্ট করে দুটি যুগকে কতকগুলি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগের মধ্যে একটিই পর্ব। তুর্কী বিজয়ে ১২০০ সালে যার শেষ। দ্বিতীয় যুগ—মধ্যযুগকে তিনি ভাগ করেছেন তিনটি উপযুগ বা পর্বে :

১. প্রাক্-চৈতন্য পর্ব ১২০০-১৫০০ সাল।
২. চৈতন্য পর্ব ১৫০০-১৭০০ সাল।
৩. নবাবী আমল ১৭০০-১৮০০ সাল।

পর্ব এবং যুগ নাম দুটিকে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন, একথা বলা যায় না। তার একটা বড় কারণ এই, বাংলায় এসব বিভাজনের ক্ষেত্রে যে দুটি স্তর পরিকল্পিত হওয়া সঙ্গত—এবিষয়ে গোপালবাবুর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। প্রথমটি মূলের পরিবর্তন-গুণগত, দ্বিতীয়টি রূপ ও ভাবগত। আজকাল যুগ এবং উপযুগ বা পর্ব এই নাম মোটামুটি গৃহীত, যদিও সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। ইতিহাসে অগ্রগতির একটা ছন্দ থাকে, তা অবশ্যই সমমাত্রিক নয়। চলতে চলতে হঠাৎ জাতির জীবনে যখন সবকিছু নাড়িয়ে, পুরনোকে ভেঙেচুরে নতুন বোধ ও মূল্যমান এসে যায় সেই পরিবর্তনটাকে বলি বৈপ্লবিক। তখন ঘটে যুগান্তর। কিন্তু যুগান্তরের প্রতীক্ষায় তো সবকিছু স্থির হয়ে থাকে না। পরিবর্তন তো নিরন্তর ঘটতে থাকে। একটি যুগের মধ্যবর্তী সময়ের বিবিধ অদলবদল—ভাব ও রূপ দু-দিক থেকেই যা ঘটে তারও দাম কিছু কম নয়। ধরা যাক চৈতন্য-আবির্ভাবের কথা। বাংলার জীবনে সামগ্রিকভাবে তার যে প্রভাব গুরুত্বে তা সাধারণ। তবুও তাকে একটি উপযুগই বলব কারণ মধ্যযুগের মৌল স্বভাবে তা একটি অত্যুজ্জ্বল পর্ব-অন্তকাঙ্ক্ষী পর্ব নয়, যেমন মধ্যযুগের অন্তকারী হিসেবে দেখা দেয় বৃটিশ অধিকার। পর্বগুলির পারম্পর্যই শেষ পর্যন্ত যুগান্তরের মুখে পৌঁছে দেয়। তবু প্রবল নাড়া যার মধ্যে প্রলয়ংকর শক্তি থাকে যাকে বাদ দিয়ে নতুন যুগের আগমন ঘটে না। যুগের তুলনায় পর্বের তাৎপর্য অবশ্যই গৌণ, কিন্তু পর্বের ভূমিকাকে লঘু করে দেখলে ঐতিহাসিক অগ্রগতির প্যাটার্নটাই ধরা যাবে না।

গোপাল হালদার সেই প্যাটার্নটা নিশ্চিত ভাবে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় প্রতিটি যুগ ও পর্বের ভূমিকায় দেশের এবং সময়ের সম্ভবমতো স্পষ্ট পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে, তাতে অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলেও প্রয়োজনমাফিক তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানেও যুগ ও পর্বের সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ সূত্রে বদ্ধ করেছেন কোথাও এই সম্পর্ককে অতি উৎসাহে সর্বব্যাপী করে দেখাবার চেষ্টা নেই। সাহিত্যে সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব যেমন অনিবার্য বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু তাতে এই সত্য ভোলেন নি যে, সাহিত্য মূলত ব্যক্তির সৃষ্টি, সমাজ কাজ করে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে।

এইভাবে অনেক 'ডগমা' যা মার্কসবাদের নামে দীর্ঘকাল এদেশে ও বিদেশে কার্যকর ছিল, গোপাল হালদার তাঁর এই ছোট বইয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে সেই বিতর্ক তোলেন নি, বোধের গভীরতা নিয়ে তাকে প্রয়োগে কার্যকর করে তুলেছেন।

সাত.

গোপাল হালদার কতটা যাথার্থ্য নিয়ে পুরনো বাংলা সাহিত্যের বর্গ-উপবর্গগুলিকে যুগ ও পর্বগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখেছেন তা নিয়ে বেশ কিছু বলবার আছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ অন্য আলোচনায় জন্য স্থগিত রেখে আমি আরও দু-একটি দিকে একবার চোখবুলিয়ে নিতে চাই—ইতিহাসবোধের মূল সূত্র হিসেবে যা লক্ষণীয়। সে সবের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে বসলে লেখা অনেক বেড়ে যাবে।

১. ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু কোনো দেশের স্ফুট-অস্ফুট ধর্মচেতনা ও আন্দোলনের পেছনে এবং ভেতরে একটি সমাজতত্ত্ব থাকে। গোপালবাবুর বই সেদিকে অভ্রান্ত তর্জনী তুলেছে। ধর্মসর্বস্ব মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে বিচরণ করতে তাকে গুরুতর বিশ্লেষণের বিষয় করে তুলতে একজন বস্তুতন্ত্রবাদীর যে সংকোচ নেই, বিরূপতা নেই, অর্ধশত বর্ষ আগে বাঙালির ঐতিহ্য সন্ধানে তার গুরুত্ব অসাধারণ।

২. তুর্কীবিজয়ের পরবর্তী বাঙালির সমাজ-সংগঠনে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের যে তত্ত্বটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি তার অপব্যাখ্যা করতে পারে জেনেও তিনি আপন প্রত্যয় থেকে সরে আসেননি। এখনও এই 'অন্ধকার পর্বের' ধর্ম-সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যায় চিন্তাবিভ্রাটের যে অস্পষ্টতা আছে তার মধ্যে হালদারের তত্ত্ব আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের স্বল্প উপস্থিতি গোপাল হালদারকে ভাবিয়েছে, যে কোন সাহিত্যের ইতিহাসকারকে ভাবাবে। তখনও পূর্ববঙ্গ-বাংলাদেশের গবেষক-পণ্ডিতেরা মুসলমান লেখকদের বিপুল সংখ্যক পুঁথি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেননি। তখনও সেই ভূমিকার যথাযোগ্য বিশ্লেষণের উপযোগী উপাদান গোপালবাবু সামনে পাননি। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান আলোচ্য তা নির্দেশ করেছেন বেশ গুরুত্ব দিয়ে।

৪. মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি তাঁর কাম্য ছিল। এবিষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লেখকের জনমুখিনতা প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্য যে ভদ্রলোকের লেখা বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়, নিরক্ষর নিচুপাড়ার রচনার দামও যে মেনে নিতে হবে—এটা একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক প্রত্যয়।

আট.

রবীন্দ্র গুপ্ত [ভবানী সেন] কথিত মার্কসবাদীর ঐতিহ্যবিচার নিয়ে উত্তেজনা ৫৪ সালে কিছু কমলেও, প্রগতিশীলদের ভেতরে যে উগ্রতার বীজ বোনা হয়েছিল তার জের সমানে চলছিল। সেই ভূমিতে গোপাল হালদারের এই অতীত সন্ধান, এর বস্তুবাদী অভ্রান্ততা এবং আশ্চর্য ভারসাম্য তথা সাহিত্যসৃষ্টির আংশিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস বাংলার বুদ্ধিজীবীর সামনে পদচিহ্ন হয়ে রইল।

❒

৩.

ফোকলোর-চর্চা : এই সময়

খুব গুরুতর ভাবনায় আপনারা প্রবেশ করতে যাচ্চেন সমবেত প্রজ্ঞার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। সূত্রধারণের জন্য বাংলার লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের যেরূপ সর্বজনীন উপস্থিতির আয়োজন করা হয়েছে তেমন সমাবেশ খুব কমই দেখেছি। বিচার-বিবেচনায় যোগদানের জন্য যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁদের তালিকাটিও মেধায় উজ্জ্বল। পরিচালকেরা আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেছেন, লোকসংস্কৃতির প্রথাবদ্ধ চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট আরও নানা বিদ্যাশৃঙ্খলায়— দরজা-জানালা খোলা রাখার এই নীতি সঠিক তর্জনী বলে আমার বিশ্বাস। সূত্রাকারে আমার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য নিবেদন করছি :

১. আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি এখনও মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত—সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ, কতক অচ্ছেদ্য অংশ পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলির মতো মিউজিয়াম-জাত সংগ্রহমাত্র নয়। প্রধানত এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের জন্যই এদেশের ফোকলোর-চর্চা শুধু অ্যাকাডেমিক নয়, বাস্তব কর্মমুখি। পণ্ডিতদের গবেষকদের মহল্লার বাইরে তার যাতায়াত। এ জনাই শুধু সেমিনার সিম্পোসিয়ামের পরেও প্রয়োজন কর্মশালার। মননকে বিতর্ককে সামাজিক কর্মমুখি করে তোলার পথে দাঁড় করাবার দায় এদেশে আজ না নিলেই নয়। তত্ত্ব ও পদ্ধতি-বিদ্যা বা মেথডলজির ক্ষেত্রে পশ্চিমী পণ্ডিতদের সাহায্য নিন, কিন্তু এর দেশি স্বভাব-চরিত্র ভুললে বিপদ হবে, এ-দুয়ের মৌল প্রভেদ মনে রেখেই চিন্তা এবং কাজে এগোতে হবে। এবং বিনীতভাবে বলি রুশিদের সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়ার সাধনা সত্তর বছর পরে বিপর্যস্ত হলেও, ওদের ফোকলোর-ভাবনার সামাজিক প্রয়োগ-নীতি বাতিল বা পরিত্যাজ্য বলে যেন স্থিরসংকল্প না করে বসি।

২. এদেশি লোকসংস্কৃতির চর্চায় তার সামাজিক অস্তিত্বের কথা বলেছি বলে আমি আদৌ পিউরইজমের ভক্ত নই। লোকসৃষ্টি এবং লোক-আচার তার স্বাভাবিক ধর্মেই নিত্য পরিবর্তমান। তাকে শোকেসে সাজিয়ে রাখা বা বর্তমান জীবনের উত্তাপ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা ঠিক নয়, ফলপ্রসূও হতে পারে না। সৃজ্যমান লোকসংস্কৃতি বহুক্ষেত্রে সমাজে ঢুকে পড়ছে। সেই ঢোকা যদি ভিতর থেকে হয় তো বলবার কিছু নেই। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হলে সমস্যা। এখন এই বাইরে ভিতরটা ঠিক করবে কে?

৩. আর একটা কথা, আমরা দেখেছি স্বাধীনতার বছর দশেক পর থেকে লোকসংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। গুরুত্বপূর্ণ হলেও ব্যক্তিগত কাজকর্মের স্থানে যৌথ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক অ্যাকাডেমিক ও পেশাদারি কাজ, অপেশাদার ব্যক্তিবিশেষের বা কিছু সংস্থার ভালোবেসে নিষ্ঠাপূর্ণ—যদিও শৌখিন সাধনা, দু-একটি গবেষণা-পত্রিকার অসামান্য ভূমিকা এবং গত কয়েক বছর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত কাজকর্ম—এই ত্রিধারায় প্রাপ্তি বড় কম হয়নি। আগে বহুকাল ধরে প্রধানত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ রূপেই লোকসংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলেছে। সেই আংশিকতার দোষ থেকে বেরুবার চেষ্টা এখন সরব। তবে অনেক বিদ্যাশৃঙ্খলার বিশেষ বিশেষ অংশের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে এখনও একে দেখা আমাদের রপ্ত হয়নি। সেই বোধটা মজ্জাগত হওয়া চাই। এই কর্মশালার আলোচ্যসূচী দেখে আমার মনে হয়েছে পরিচালকমণ্ডলী সেই সত্যবোধে নব্য লোকসংস্কৃতিবিদদের দীক্ষিত করতে উদ্যোগী।

৪. আমি মনে করি লোকসংস্কৃতির মৌল চরিত্র নিয়ে বিচারবিতর্কের এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। মনে রাখা ভালো, আমাদের লোকসংস্কৃতি একটি জীবন্ত সত্য হলেও এর একটা ক্ষয়িষ্ণু দিকও আছে, কালের প্রভাবে পরিস্থিতির কারণে যে সব অংশ খসে ঝরে পড়ছে। তাদের চিহ্নিত করা এবং স্বাভাবিক মৃত্যু হতে দেওয়া বোধহয় সংগত। আর যার মধ্যে প্রাণশক্তি এখনও আছে তাকে বাড়তে সাহায্য করা, যে-সব অংশ আপনি চলমান তাদের পথ বাধামুক্ত করা। এই কর্মের প্রেরণা যদি সৃষ্টি করতে পারে বর্তমান কর্মশালার সুবিস্তৃত মনন-কাণ্ড, তবেই এর সার্থকতা।

৫. আমাদের মতো দেশে লোক-সৃষ্টি ও লোক-আচারের নানা অংশকে সমাজ-সংস্কার ও উন্নয়নের সহযোগী করার চেষ্টা চলছে। এতে ফেকলোর জাত হারিয়ে ফোকলোরে পরিণত হচ্ছে ও গোল্লায় যাচ্ছে বলে আমি মনে করি না। তবে অপরিশীলিত কর্মীদের হাতে যে সব ক্ষত তৈরি হচ্ছে শিক্ষিত ভাবুক ও গবেষকদের নির্দেশে অচিরে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। এ ধরনের কর্মশালা সেজন্য সুস্বাগত। তবে সরকারি-বেসরকারি কর্ম-প্রয়াসগুলির সঙ্গে এই তাত্ত্বিক আলোচনার সংযোগ স্থাপনের বিধিব্যবস্থা তৈরি হয়ে ওঠা জরুরি।

৬. কয়েক বছর আগেও যে সমস্যা ছিল না, এখন তা খুব বেশি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলি অতি দ্রুত আমাদের মতো অনগ্রসর গরিব দেশেও অজস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। প্রযুক্তির নবনব বিস্ফোরণে এবং বাজার-অর্থনীতির প্রভাবে শীঘ্রই দূরের গ্রামও এর আওতায় এসে যাবে। এর ফলে লোকসংস্কৃতির সর্বস্তরে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তার ব্যাপকতা বাড়বে। টিভি-বাহিত প্রমোদ ও বিনোদনের সঙ্গে লোকসৃষ্টির কি ধরনের সম্পর্ক ঘটবে, তার কতটা অভিপ্রেত, কতটা অনভিপ্রেত, এবং কতটা অনিবার্য, অনিবার্যের মধ্যেও তার প্রাণকে বাঁচাবার পথ কোথায়, অথবা, এই বিপুল শক্তিশালী ব্যাপারটিকে লোকসৃষ্টির নিজের বাঁচার ও বাড়াবার কাজে লাগানো যায় কিনা, আপনারা এই কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশনে সে-সব কথাও ভাববেন।

৭. লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন এই কর্মশালায় স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিষয়ে সম্প্রতি কিছু কাজ করতে গিয়ে [বইটি শীঘ্র ছেপে বেরুবে] আমার মনে হয়েছে যৌথসৃষ্টি ও যৌথ-উপভোগের এমন আয়োজন এর মধ্যে রয়েছে যা আমাদের শিষ্টসৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত নন্দনতত্ত্বেও নতুন মাত্রা আনতে পারবে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমন অংশ আছে যা শুধু বিশ্লেষণের ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়, পদে পদে স্বাদুও।

৮. লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটা বড় ব্যাপার আছে তা হল স্বভাবজাত সংযোগের বা কমিউনিকেশনের সুযোগ। আজকের জীবনে যে বিচ্ছিন্নতা আমাদের প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট করে, লোকসংস্কৃতি তার মধ্যে কোনো মুক্তির পথ দেখাতে পারে কি?

৯. আমি এই সূত্রে গ্লোবালাইজেসন বা বিশ্বায়নের কথাটা না তুলে পারছি না। কনজুমারইজম বা ভোগ্যপণ্যবাদ, আরবানাইজেসন বা নগরীকরণের এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মুক্ত প্রতিযোগিতার তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয় একটি সামগ্রিক সমাজদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে বাঁচার অন্য বিকল্প নেই বলে অনেকে মনে করছে। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে আমরা একে এড়াতে পারব না। এই নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদের,—বলা হয়েছে 'ইট ইজ কলোনাইজেসন, বাট দেয়ার ইজ নো কলোনাইজার'—[আহা কী মহৎ পরিস্থিতি!] ফলে আমাদের জাতিসত্তা শুধু সাংবিধানিক সার্বভৌমতার বেলুন উড়িয়ে বাঁচবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অধিকারে ভদ্রলোকী জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতাচেতনা যে প্রতিরোধী স্তর তৈরি করে বাঁচিয়েছিল, তাদের সেই শক্তি আজ পুরোই তলিয়ে গেছে। নাগরিকতা-ভোগ্যপণ্যসর্বস্বতায় গ্রস্ত ভদ্রলোকেরা

আর কোনো প্রতিরোধী ভূমিকায় দাঁড়াতে পারবে না। বেশ কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে, তারা স্বাদেশিকতাকে একটা পুরনো ও পরিহার্য প্রত্যয় বলে সরিয়ে রাখছে। অন্যপক্ষে গরিব দেশে নগরীকরণ অতি শ্লথগতি, নিরন্ন মানুষের রক্তে কনজুমারইজম বাসা বাঁধাও এত সহজ নয়। এই কারণে যদি কেউ লোকসংস্কৃতির মধ্যে—পল্লীই যার প্রধান আবাস-স্বাভাবিক জাতীয়তাবাদ এবং বিশ্বায়নের প্রতিরোধী একটা আভ্যন্তর শক্তির উৎস আবিষ্কার করতে চান তো বিফল হবেন না বলেই আমি মনে করি।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালায়
উদ্বোধকের ভাষণ। ২০.১০.২০০২

৪.

অসিতবাবু স্যার—শেষ প্রণাম

অসিতবাবু স্যার চলে গেলেন, ধ্রুপদীদের পালা ফুরিয়ে এল।

অসিতবাবুকে স্যার বলতাম, যদিও ওঁর কাছে ক্লাসে পড়িনি। উনি যখন সুরেন্দ্রনাথে তখন নারায়ণবাবুর কাছে সিটিতে পড়তাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসার বেশ কিছু পরে উনি পড়াতে আসেন। উনি দাদা বলার অনুমতি দিলেও আদ্যন্ত প্রফেসার এই মানুষটিকে যেন সহজাতভাবেই স্যার বলতাম। আমাদের কালে মাষ্টারকে দাদা বলাটা বেয়াদবি বলে গণ্য হত। পুরনো কালের অনেক দোষ।

অসিতবাবু একজন পুরোদস্তুর অ্যাকাডেমিক্‌ মানুষ ছিলেন। পেশায় এবং নেশায়। পড়ায় পড়ানোয় এবং লেখায়। অ্যাকাডেমিক শব্দটার সঙ্গে কটাক্ষ জড়িয়ে আছে বলে অনেকে মনে করেন। একজন বিজ্ঞান-সাধক বা ইতিহাস-গবেষক অ্যাকাডেমিক হতে পারেন, তাতে বিশেষ দোষ নেই। একেবারে কি নেই? পারমাণবিক বিস্ফোরণের নিন্দা করলে বিজ্ঞানী, বাবরি-রাম নিয়ে মত দিলে ঐতিহাসিক—পুঁথিপড়ো অ্যাকাডেমিশিয়ান থেকে সামাজিক ও সাম্প্রতিক মননের জন্য বাড়তি প্রশংসা পান, ছবিটবি টিভিতে দেখানো হয়। তবে সাহিত্য নিয়ে যাঁরা অ্যাকাডেমিক এবং প্রফেশনাল তাঁদের টুলো পণ্ডিতি সরবে নিন্দিত। পত্রপত্রিকা সাহিত্য-স্রষ্টারা তাদের গুণগ্রাহীরা ওদের শত্রু বলে ভাবেন। এটা ঘটনা, কাউকে দোষ দিচ্ছি না। সাহিত্য কি জানবার প্রয়োজন নেই তা উপভোগের জন্য—মূল্যায়নের জন্য। তাই প্রফেশনালরা বাড়তি খাতির পান না, বরং তাঁরা রক্ষণশীল বলে একঘরে হয়ে পড়েন। এই নিয়তি রোধ করার কথা বলছি না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও দেখেছি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আপাদমস্তক অ্যাকাডেমিশিয়ান, সঙ্গে প্রফেশনাল শব্দটি যোগ করতেও দ্বিধা নেই। আমরা ছোটখাট অনুগামী বলে উনি আমাদের টানতেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে—তখন সবে ধন কলকাতা—বাংলা যাঁরা পড়াতেন তাঁদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, জনার্দন চক্রবর্তী উঁচু মানের শিক্ষক ছিলেন। দু-একজন তো পাহাড়-পর্বতের মতো। এঁদের পরে পরে যাঁদের আগমন এবং অল্পদিনে নামডাক ছড়াল তাঁরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নারায়ণবাবুর কাছে অনার্সে পড়েছি। অসিতবাবুর পড়ানোর রকমসকম

শুনেছি জুনিয়র অধ্যাপক বন্ধুদের কাছে, আর সাক্ষাতে নানা আলোচনাচক্রে তার নমুনাও পেয়েছি। তাতে জেনেছি ওই মহাবলীদের ঐতিহ্য তিনি ধরে রেখেছিলেন। নারায়ণবাবুর মতো উজ্জ্বল সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব বিদ্যুৎবিকীর্ণ ভাষায় যখন জনমনোহারী তখনও অসিতবাবু নিবাতনিষ্কম্প গাম্ভীর্যে ধ্রুপদী ধারার অনুবর্তন করে সাফল্যের শীর্ষে উঠেছিলেন। সর্বদা সুস্বাদু না হলেও তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যপ্রদ।

অসিতবাবু সর্বাংশে শিক্ষক—ছাত্রদের পথপ্রদর্শক, গবেষকদের গুরু এবং অধ্যাপকদের অধ্যাপক। বাংলা বিদ্যার এক মুখ্য সংগঠক ও নেতা। একজন সফল ও নিষ্ঠাবান অধ্যাপকের শুধু অ্যাকাডেমিক থাকা বড় কঠিন। চার ধারে সুবিস্তৃত প্রলোভনের জাল ছড়িয়ে আছে, বিশেষত মিডিয়ার এইরকম দাপটের যুগে। অ্যাকাডেমিশিয়ান হওয়ার মধ্যে কোনও হাততালি নেই—তার মাপটা যত বড়ই হোক, কারণ এই বৃত্তিতে শোম্যানশিপ ব্যাপারটা একদম নেই। অসিতবাবুর মাপের মানুষ একটু মিডিয়ামুখী হয়ে এই সুযোগটা নিতে পারতেন, কিন্তু একটুও চঞ্চল হননি, তাঁর অধ্যাপকসত্তা কিছুমাত্র আপস করেনি। অসিতবাবুর অধ্যাপনারই একটা অংশ তাঁর গ্রন্থরচনা। তিনি প্রচুর লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন, সঙ্কলন করেছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় এবং রচনারীতি দুইই ওজনদার। এই বইগুলিতে তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, মননের শক্তি, ব্যাখ্যানের নৈপুণ্য পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর পাঠক কারা? তিনি যাঁদের কথা ভেবে লিখেছিলেন তাঁরাই—তিনি তৃপ্ত করেন এবং অতৃপ্তি উসকে দেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিককুল, তাঁদের ভক্তবৃন্দ, পত্রিকায় পুস্তক সমালোচকরা তাঁর লেখা পছন্দ না করতে পারেন, এই ভেবে যে আধুনিক বৈদ্যুতিন মিডিয়ার যুগে 'টুলো' পণ্ডিতদের এইসব লেখা কী কাজে লাগবে—তবুও অসিতবাবু বিচলিত হননি। সাহিত্য নিয়ে কারবার করেন বলেই সাম্প্রতিকের স্রোতে গা ভাসাতে চাননি। গত ৩০ বছরের আলোড়ন ও চমক একটু থিতিয়ে যাক। নবীনেরা খানিক প্রবীণ হোক। কিছু স্বল্পপ্রাণতা উড়ে যাক। তখন নবযুগের অ্যাকাডেমিশিয়ানরা স্থিতধী মূল্যায়নে এগোবেন। এখন চলুক নূতনের কলকলানি। শান্তমনে অসিতবাবু স্যারেরা ধ্রুপদী রাগে তানপুরা বেঁধে সনাতনের সাধনা করে গেলেন। নতুন অ্যাকাডেমিশিয়ানরা সেই সঞ্চিত সম্পদ থেকে ভাবিকালের মানসকর্ষণার উপাদান খুঁজে নেবেন। আমরা পুরাতন যে দু-চারজন এখনও ওই পথের নীরব পথিক রয়ে গেলাম, অসিতবাবু স্যারের মৃত্যু সেই আমাদের অভিভাবকহীন করে দিল।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে লিখিত।
'সানন্দা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।



চতুর্থ পর্ব

জীবন-কর্ম

জীবন-পঞ্জী

জন্ম ও পিতৃ পরিচয়

১৯৩০ সালে বঙ্গদেশের বরিশাল জেলার মহকুমা শহর পিরোজপুরে জন্ম। বাবা মৃন্ময় গুপ্ত পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথ্ ডাক্তার। নেশা ছিল দুটি—[১] স্বদেশী [২] থিয়েটার। কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী এবং আঞ্চলিক নেতা [এ-আই-সি-সি সভ্য]। ২১-এর আন্দোলনে কয়েক বছর জেল খেটেছেন। ৩০-এ পুলিশ-পীড়নের শিকার হন। ৪২-এ ছয় মাসের বেশি গৃহবন্দী থাকেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের দিকে ঝোঁক ছিল। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। দেশ বিভাগের পরে বারাসতে বাসকালে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। স্থানীয় বয়স্কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কমিউনিস্টদের একমাত্র কাছের লোক। পিরোজপুরে সমকালীন মঞ্চ-সফল বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন। কলকাতা মাঝে মাঝেই আসতেন। থিয়েটার দেখা চাই। পুত্র বালকবয়স থেকে ছিলেন থিয়েটার হলে তাঁর নিত্য সঙ্গী।

মা সরযূ দেবী অত্যন্ত তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। তিনি ২১-এর আন্দোলনে পুলিশ-আদেশ অমান্য করার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বিপ্লবী দলের ছেলেদের নানাভাবে সাহায্য করতেন।

শিক্ষা

ক্ষেত্র গুপ্ত পিরোজপুরে সরকারি বিদ্যালয় থেকে স্টার পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। অনেকগুলি বিষয়ে লেটার পান। ডিভিশনাল বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে আই. এস. সি. পড়তে থাকেন। এই সময়ে দেশভাগ হয় এবং তাঁদের পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তিনিই তার দায়িত্বে থাকেন। কারণ পাকিস্তান সরকার ডাক্তার বলে ছয় মাসের জন্য পিতৃদেবের দেশত্যাগ বন্ধ করে রাখেন। ১৯৪৮ সালে বাবাও দেশ ছেড়ে আসেন এবং বারাসতে বাস করতে থাকেন। ১৯৪৮ সালে ক্ষেত্র বাবু আই. এস. সি. পাস করেন, শতকরা ৭৩ ভাগ মত মার্কস পান। এবং সিটি কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। সেখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতি চৌধুরীর মতো অত্যুচ্চ মানের শিক্ষকদের কাছে পড়বার সুযোগ পান। তিনি অনার্সে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হলেও, ফাইনাল পরীক্ষার কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ায় অনার্স দিতে পারেন নি, পাশ কোর্সে বি. এ. পাস করেন। বাংলা তৃতীয় পত্রের খাতা বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়ে ফেলায় তাঁকে মার্কসিটে অনুপস্থিত দেখান হয়। কয়েক নম্বরের জন্য তিনি ডিস্টিংসন থেকে বঞ্চিত হন। অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা সম্ভব হয়নি।

তিনি মনোক্ষোভে এম এ-তে ভর্তি না হয়ে বারাসতে গান্ধীস্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবার সংকল্প করেন। কিন্তু বান্ধবী জ্যোৎস্না বসুর পরামর্শে বঙ্গবাসী কলেজে সাধন ভট্টাচার্য-পরিচালিত 'গিরিশ সংস্কৃতি ভবনে' সান্ধ্য এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কয়েকমাস পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছর পিছিয়ে এম. এ.-তে ভর্তি হন জ্যোৎস্না বসুর

কথায় স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন। টিউশানি ইত্যাদি সবেগে করতে থাকেন, কারণ তীব্র আর্থিক অনটন ছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন সুকঠিন সিলেবাসে এবং তাঁর কঠোর ও কৃপণ হাতে কয়েক বছরের মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রথম শ্রেণী। তিনি প্রায় সব পত্রেই [দ্বিতীয় পত্র বাদে] প্রথম হন। এবং ৬টি স্বর্ণপদক একটি রৌপ্যপদক ও অন্যান্য পুরস্কার পান। শ্রীকুমার বাবু, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্তের মতো শিক্ষকের কাছে পড়াকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করেন।

রাজনীতি

ছাত্রজীবনে ছাত্র কংগ্রেস করেছেন। পিরোজপুর ছাত্র কংগ্রেসের মহকুমা কমিটির সভাপতি ছিলেন। বরিশাল জেলার ছাত্র কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ থেকে নেতাজীপন্থী হয়ে ওঠেন। কলেজের ছাত্রজীবনে সুভাষবাদী ছাত্র ব্লকে কিছুকাল ছিলেন। ১৯৪৭-এ বি পি এস এফে যোগ দেন। এটি কমিউনিস্ট ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কলেজে সুকুমার গুপ্ত এবং বাইরে মামা যাদবপুরের শচীন সেনের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পরিচয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে পার্টি-সভ্যপদ প্রাপ্তি। ছাত্র আন্দোলনের এক সংগঠক হিসেবে পরিচিতি। বেআইনি পার্টির কর্মীরূপে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার এবং ১৪দিন জেল হাজতে অবস্থান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বি পি এস এফের জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদের প্রথম কমিউনিস্ট সভাপতি।

বরানগরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কেন্দ্র গণসংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠা, তার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত এলাকায় পার্টি সংগঠন তৈরি। জ্যোতিবাবুর ৫২ সালের নির্বাচনে ১নং ওয়ার্ডের দায়িত্বপালন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বারাসতে কমিউনিস্ট পাটি প্রতিষ্ঠার একক চেষ্টা, পরে হৃদয় পাল এবং শীতাংশু মজুমদারের সহযোগিতায় পার্টি বেশ বড় চেহারা নেয়। সংসদে পার্টিপ্রার্থী ভবানী সেন ভালো ভোট পান।

অধ্যাপনা-গবেষণা

এম এ পাস করার পরেই তিনি রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের শেষে কলকাতা চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। সেখান থেকে ১৯৫৬ সালে আসেন সিটি কলেজে। সিটি কলেজে চাকরি করতে করতে তিনি মধুসূদনের উপরে গবেষণা করে ডি. ফিল. [পরে পি. এইচ. ডি. নাম হয়] ডিগ্রিলাভ করেন। কলেজে শিক্ষক হিসেবে তিনি দ্রুত খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন।

তিনি ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রথমে লেকচারার পরে রীডার এবং ১৯৮৩ সালে বিদ্যাসাগর প্রোফেসরের পদটি লাভ করেন।১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে রবীন্দ্রভারতীর এই বিভাগটিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা বিভাগরূপে গড়ে তোলেন। পরের ৫ বৎসরও তিনি প্রবীণতম প্রোফেসর রূপে বিভাগের নতুন নতুন কার্যক্রম উদ্ভাবন এবং রূপায়ণে নেতৃত্ব দেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী কমিটির অত্যন্ত প্রভাবশীল সভ্য হিসেবে এবং শিক্ষক সমিতির প্রধান হিসেবে এই তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনে এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এমনকি অবসর গ্রহণের কয়েক মাস আগে তিনি ১. বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকাটির পুনরুজ্জীবন

ঘটান। পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার বিপুলায়তন সংখ্যা তিনটি দেখলেই বোঝা যাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা বলতে কী ধরনের উঁচু মানের পত্রিকা তিনি বুঝতেন। তাঁর হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ইংরেজি পত্রিকাও প্রবর্তিত হয়।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি.-ডি. লিট. সম্পর্কিত আইন-কানুনকে আধুনিক চরিত্র ও চেহারা দেবার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল স্থপতির।

৩. করেসপনডেনস এবং ডিসট্যান্ট এডুকেশন কোর্সটির একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তিনি তৈরি করে দিয়ে আসেন। বহু বছর পরে তা কার্যকর হয়।

১৯৯৫ সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষা-সংগঠক

১. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে রবীন্দ্রভারতীতে এম. ফিল. বাংলা চালু হয়। তাঁর নেতৃত্বেই একটি মডেল সিলেবাস তৈরি হয় যাতে এম. এ. এবং পি. এইচ. ডির মধ্যবর্তী, টিচিং কাম রিসার্চ ওরিয়েন্টেশন অনুসরণ করা হয়। সাহিত্যের ইতিহাসতত্ত্ব পড়াবার ব্যবস্থা হয়। ২. তিনি এম এ-র একটি নতুন কোর্স স্ট্রাকচার তৈরি করেন। সেটিই বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। তাতে **ক.** বিষয়ের সাধারণ পাঠ এবং বিশেষ পাঠের সমান্তরাল রীতি থাকে। **খ.** অবহেলিত মুসলমান লেখকদের লেখার একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠের ব্যবস্থা হয়। গ. বাংলাদেশের সাহিত্যের উপর দু-শ নম্বরের একটি বিশেষ বিষয় পাঠের ব্যবস্থা হয়। ঘ. অধুনাতম শক্তিমান লেখকদের রচনা, যাত্রাপালা এবং চিত্রনাট্যকে পাঠ্যতালিকায় আনা হয়। ৩. বাংলা সাহিত্য, ভাষা, ফোকলোর প্রভৃতি পড়বার, পড়াবার জন্য ম্যাপ তৈরি করানো, প্রোজেক্টর ও স্লাইডের ব্যবহার, ফোকলোর মিউজিয়াম তৈরির সূত্রপাত করেন তিনি।

গবেষণা-পরিচালক :

তাঁর তত্ত্বাবধানে ২৬টি এম ফিল ছাত্র এবং ৬৩টি পি এইচ ডি ছাত্র গবেষণা শেষ করে ডিগ্রি লাভ করেন। ২টি পোস্ট-ডক্টোরাল স্কলার তাঁর নির্দেশাধীনে কাজ করেন। তাঁর পরিচালনায় গবেষণাকে প্রধানত ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ ১. মধ্যযুগ বিষয়ক কিছু শুদ্ধ সাহিত্যিক ব্যাখ্যান, মধ্যযুগের বিশেষজ্ঞরা সাধারণত এসথেটিক বিচারের দিক এড়িয়ে যান বলেই। ২. উনবিংশ শতকের কয়েকজন মধ্যম স্তরের লেখকের পূর্ণ পরিচয় আবিষ্কার, যার ফলে বাংলা সাহিত্যের কিছু অজানা অংশে আলো পড়ে। ৩. উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, এস্থেটিক, আঙ্গিক ও শিল্পরূপঘটিত কাজ। ৪. তুলনামূলক সাহিত্য-আলোচনা। ৫. মিথের ব্যবহার, স্টাইলিসটিকস ও স্ট্রাকচারাল স্টাডি, আর্কিটাইপ-ঘটিত কাজও কিছু করিয়েছেন। ৬. বাংলাদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অধীনে গবেষণা হয়েছে অনেকগুলি।

সেমিনার-সংগঠক ঃ

একটি আন্তর্জাতিক; ছয়টি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার সংগঠন করেন। NET-এর course structure [Bengali] প্রথম তৈরি হয়—U G C অনুদানে সংগঠিত ৫ দিনের ওয়ার্কশপে। আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটরের কাজ করেন।

বাংলাদেশ স্টাডিজ

এদেশে ক্ষেত্রবাবু বাংলাদেশি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথম বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে পি এইচ ডি হয়। এ বিষয়ে পি. এইচ. ডি.র সংখ্যা ৭ ডি.লিটের কাজে সহায়তা করেছেন অন্তত ৩ জনকে। বাংলাদেশ নিয়ে ২টি পোস্টডক্টোরাল কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এঁদের কেউ ভারতীয় কেউ বাংলাদেশি। তিনি অনেক বাংলাদেশি অধ্যাপককে ডক্টরেট করিয়েছেন।

বাংলা এম ফিল কোর্সে বাংলা এম এ-তে বিশেষ নির্বাচিত বিষয় হিসাবে বাংলাদেশের সাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা তিনিই চালু করেন। বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে তিনি কলকাতা, বিশ্বভারতী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফ্রেসার্স কোর্সের অধ্যাপকদের কাছে ৬টি বক্তৃতা করেছেন। এই বিষয়ে দীর্ঘ দুই দিনব্যাপী বক্তৃতা দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতীতে মদনমোহন রায় অনুদান বক্তৃতামালায়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং ইনস্‌টিটিউট ও একাডেমির আমন্ত্রণে তিনি বহুবার বাংলাদেশে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর দেওয়া বক্তৃতার তালিকা ঃ

১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র ১২৫-তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত। সেমিনারে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতি।

২. ঐ। প্রথম দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্র-গল্প এবং সামাজিকতা বিষয়ে মুখ্যভাষণ।

৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে আমন্ত্রিত বক্তৃতা। বিষয় ঃ জীবনানন্দের বনলতা।

৪. ঐ- উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রে বক্তৃতা। বিষয় ঃ সংযোগের সন্ধানে বাংলা লোকসংস্কৃতি।

৫. জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-আমন্ত্রিত বক্তৃতা। বিষয় ঃ রবীন্দ্র-গল্পের শিল্পরূপ।

৬. বাংলা একাডেমি, ঢাকা। আমন্ত্রিত বক্তৃতা ঃ বিভাগোত্তর দুই বাংলার সাহিত্য—দুইটি স্বতন্ত্র ধারা।

৭. নজরুল ইনস্টিটিউট। আমন্ত্রিত বক্তৃতা ঃ নজরুল-কবিতার শব্দ ও বাক্যবন্ধন। সময়াভাবে তিনটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার একটি বক্তৃতায় পেশ করা হয়। বক্তৃতা তিনটির পূর্ণাঙ্গ লিখিত রূপ ইনস্টিটিউট পুস্তকাকারে প্রকাশ করে।

৮. শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা। বিষয় ঃ রবীন্দ্র-থিয়েটার বাংলায় প্রথম স্বতন্ত্র থিয়েটার।

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠক। বিষয় ঃ বাংলা পঠনপাঠন ও গবেষণা রীতির আদর্শ।

১০. কুষ্টিয়া কলেজে সংবর্ধনা। সেমিনার। বক্তৃতার বিষয় ঃ জীবনানন্দ।

এছাড়া বাংলাদেশ ভাষাপরিষদ, ঢাকা থিয়েটার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, শিল্পতরু প্রভৃতি সংস্কৃতি সংস্থায় বক্তৃতা করেন এবং রাজশাহী এসোসিয়েশন, প্রাকৃত, মিজানুর রহমানের পত্রিকা ও ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য প্রচারের জন্য তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ঢাকা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হারুন-উর রশিদ বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে একটি ইলেক্ট্রনিক্স বাংলা টাইপ রাইটার উপহার দেন।

গত কয়েক বছর ধরে তিনি বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে একটি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

জাতীয় অধ্যাপক

[বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন]

১৯৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [ইউ জি সি] কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক [ন্যাশনাল লেকচারার] নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্তির শর্তানুযায়ী দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে প্রতিটি ২ দিন ব্যাপী একক বক্তৃতা দিতে হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলি টেগোর'স নভেলস : স্ট্রাকচারস অ্যান্ড ভেরিয়েশন' নামে প্রকাশিত হয়। ড. গুপ্তের আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেবল ড. ভবতোষ দত্ত এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সাংগঠনিক দায়িত্ব

১. আইনের বঙ্গানুবাদ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন বিভাগের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৮৮ সাল থেকে। দীর্ঘ ১৩ বছর পরে শারীরিক কারণে তিনি এই দায়িত্ব থেকে অবসর নেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আইন এবং রাজ্য আইন, সংবিধান সংশোধন এবং আইনের পরিভাষা নির্মাণ এই কমিটির কাজ। এই অনুবাদ এবং পরিভাষাই রাষ্ট্রপতি অনুমোদিত একমাত্র সরকারি পরিভাষা।

২. ১৯৯৩ সালে বাংলা বিদ্যা সম্মিলনী নামে বাংলার অধ্যাপক ও গবেষকদের সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এই সম্পূর্ণ আকাডেমিক সংগঠন প্রতি বছর ১টি করে সর্বভারতীয় সমাবেশের আয়োজন করে। ২/৩ দিনের এই সমাবেশে ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকেরা যোগদান করেন। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন।

৩. লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সভাপতি। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক সনৎকুমার মিত্রের দক্ষতা ও কর্মতৎপরতায় এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও পরিষদ প্রকাশিত পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে।

সেমিনার

১. ক্ষেত্রবাবু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ এবং সভাপতিত্ব করেছেন, তার বিবরণ :

ক. রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়—জাতীয় সংহতি ও বাংলা সাহিত্য—একটি সেসনে সভাপতি, একটিতে প্রবন্ধ-পাঠক।

খ. জামসেদপুর স্নাতকোত্তর কেন্দ্র—সভাপতি। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য।

গ. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়—সাহিত্য-রীতি। একটিতে প্রবন্ধ পাঠ, একটিতে সভাপতিত্ব।

ঘ. আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা মুসলিম সাহিত্য। কি-নোট অ্যাড্রেস। অনুপস্থিত, লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়।

ঙ. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক কবিতা। সভাপতি।

চ. বিশ্বভারতী। উপন্যাসে বাস্তবতা। প্রবন্ধপাঠ।

ছ. ঐ। একক বক্তৃতা। রবীন্দ্র-গল্প।

জ. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। নজরুল ও আধুনিক কবিতা। সভাপতি।

ঝ. ঐ। বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্কিম। সভাপতি।

ঞ. ঐ। বিশ্ববিদ্যালয়। একক বক্তৃতা। সত্যজিতের গল্প।
ট. উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্র-নাট্য। একক বক্তৃতা।
ঠ. ঐ। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ। একক বক্তৃতা।
ড. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি-আধুনিক কবিতা সেমিনার।
ঢ. ঐ। রবীন্দ্র সাহিত্য বক্তৃতা।
ণ. ঐ। একক বক্তৃতা। সত্যজিতের গল্প।
ত. ঐ। সভাপতি বঙ্কিম-সেমিনার।
থ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সভাপতি, বঙ্কিম সেমিনার।
দ. ঐ। সভাপতি, বিভূতিভূষণ সেমিনার।
ধ. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ। একক বক্তৃতা।
ন. ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি, আধুনিক কবিতা বিষয়ক বক্তৃতা।
প. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি। কবিতা পড়া ও পড়ানো।

২. রবীন্দ্রভারতীতে অধ্যাপনার বাইরে বিশেষ বক্তৃতা :

ক. সত্যজিতের গল্প [দুটি বক্তৃতা]—কমলা সেন বক্তৃতা।
খ. বাংলাদেশের সাহিত্য [দুটি বক্তৃতা]—মদনমোহন রায় বক্তৃতা।
গ. বনফুলের গল্প [দুটি বক্তৃতা]—বনফুল বক্তৃতা।
ঘ. কাঞ্চনজঙ্ঘা। চিত্রনাট্য [সাহিত্যিক বিচার] দুটি বক্তৃতা।
ঙ. রবীন্দ্র-গল্প—সাধন ভট্টাচার্য বক্তৃতা। তিনটি বক্তৃতা।
চ. মার্কসীয় সাহিত্য এবং আধুনিক নন্দনতত্ত্ব—রবীন্দ্র গুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতা।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র পুরস্কার : ৬টি স্বর্ণপদক, ১টি রৌপ্যপদক।

এশিয়াটিক সোসাইটি : সুকুমার সেন স্বর্ণপদক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার : বিদ্যাসাগর পুরস্কার।

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ : নজরুল স্মারক পুরস্কার।

রেনেশাঁ আকাদেমি, বাংলাদেশ : মধুসূদন পুরস্কার।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় : আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য পুরস্কার।

বি. এফ. জে. এ. : 'সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ পুরস্কার।

রবীন্দ্র সোসাইটি, বহরমপুর : 'রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপথিক পুরস্কার।

যুবমেলা কমিটি, বাঙুর এভিনিউ : জাতীয় অধ্যাপক [ইউ জি সি] নিযুক্তির জন্য স্বর্ণপদক।

পারিবারিক জীবন

বরানগরে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ এবং জ্যোতি বসু-র হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে সংস্পর্শে আসেন কাশীপুরের বনেদি বসু পরিবারের মেয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মেয়র থাকাকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট আইনজীবী জিতেন্দ্রিয় নাথ বসু ও হিরণ্ময়ী বসু-র কন্যা জ্যোৎস্না পরিবারের সঙ্গে বৈপ্লবিক বিরোধিতা করেই কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্ষেত্র গুপ্তের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ হন। ১৯৫৫ সালে ওঁদের বিয়ে হয়। জ্যোৎস্না গুপ্ত ৩৩ বছর কলকাতার রামমোহন কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীকালে রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান হন। তিনি ছিলেন অতি দক্ষ সংগঠক এবং সুলেখক। সুন্দরায়ম এবং বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চা নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ২টি গল্পগ্রন্থ সহ ১২টি গ্রন্থের রচয়িতা। ২০০৭ সালের ১২ মার্চ অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ক্ষেত্র-জ্যোৎস্নার ৩ পুত্র, পূষন, প্রচেত, পুষ্কর স্বক্ষেত্রে যশস্বী। ৩ পুত্রবধূ শ্রাবণী, মিত্রা, সোমা শিক্ষকতা করেন। ৪ পৌত্রপৌত্রী—সমুদ্র, মোহনা, মৃত্তিকা এবং নক্ষত্র।

রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের তালিকা

১৯৫৯ সালে 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন' বইটি দিয়ে প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত। তারপরেই জ্যোৎস্না গুপ্তের সঙ্গে মিলে 'বাংলা উপন্যাসের আলোচনা' এবং 'বাংলা নাটকের আলোচনা' প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের বই সত্ত্বেও ৪/৫ সংস্করণ বিক্রি হওয়ায় ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। ক্ষেত্রবাবু ১৯৫৯ থেকে এখন পর্যন্ত [২০০৭, এপ্রিল] অবিরাম লিখে চলেছেন। বাংলার প্রধান লেখকদের এবং তাৎপর্যপূর্ণ সর্ব রচনার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন যেন তাঁর দায়—এরকম একটা মিশনারিসুলভ একগুঁয়েমি নিয়ে তিনি কাজ করেছেন।

বিষয় ঃ প্রাচীন কাব্য

১. প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নব্যমূল্যায়ন। ১৯৫৯। গ্রন্থনিলয় আরো ২টি সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের শিল্প-ব্যক্তিত্বের সন্ধান, কাব্যের ধর্মবিবিক্ত রূপের বিচার।

২. কবি মুকুন্দরাম। ১৯৬৪। গ্রন্থনিলয়।

পুরোনো কবি, নতুন ব্যাখ্যান ও বিচার।

৩. ভারতচন্দ্র রচনা-সমগ্র। ১৯৭৪। ভৌমিক।

বিশাল ভূমিকাসহ সম্পাদনা।

৪. সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা। ১৯৬১। গ্রন্থগৃহ।

সংকলন-সম্পাদনা

বিষয় : সাহিত্যের ইতিহাস

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস। ২০০০। গ্রন্থনিলয়।

প্রত্যক্ষত অনার্স, স্নাতকোত্তর, পি এইচ ডি ছাত্রদের কথা মনে রেখে লেখা হলেও, এই প্রথম সাহিত্যের ইতিহাসকে তথ্যের গুদাম থেকে উদ্ধার করে খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

৬. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। ১৯৮২। গ্রন্থনিলয়।

৭. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯৯৪। গ্রন্থনিলয়।

৮. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড। ২০০৪। গ্রন্থনিলয়।

৯. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। চতুর্থ খণ্ড। ২০০৫। গ্রন্থনিলয়।

১০. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। পঞ্চম খণ্ড। ২০০৬। গ্রন্থনিলয়।

১১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। ষষ্ঠ খণ্ড। ২০০৭। গ্রন্থনিলয়।

পরবর্তী অর্থাৎ শেষ খণ্ডটি লেখা চলছে। বাংলা উপন্যাস নিয়ে এত বিস্তৃত কাজ আগে হয় নি। বড় ও মাঝারি উপন্যাসের অকৃপণ সমালোচনার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসগত ভূমিকার যুগপৎ বিচার-বিশ্লেষণ।

বিষয় ঃ ক্লাসিক

১২. হেমচন্দ্রের নির্বাচিত রচনাবলী। ১৯৬৪। এ কে সরকার।

১৩. অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন। ১৯৭২। পুঁথি।

১৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক। ১৯৭৩। পুঁথি।

১৫. দীনবন্ধু রচনাবলী। সমগ্র। ১৯৬৭। সাহিত্য সংসদ।

১৬. ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ কাহিনী। ১৯৭৫। পুঁথি।

১৭. ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক। ১৯৭৮। পুঁথি।

১৮. ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। ২য় খণ্ড। ১৯৮১। ভৌমিক।

বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের কালে তাঁদের মধ্যে মধু-বঙ্কিমের মতো উচ্চ মানের লেখকের পাশে মধ্য শক্তির লেখকেরাও ছিলেন। তাঁদের ভূমিকা ঠিকমতো বুঝবার ও বিশ্লেষণ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি এই জাতের সংকলনের দরকার।

বিষয় ঃ মধুসূদন

১৯. মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প। ১৯৬৩। এ কে সরকার।

মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-সন্ধান এবং তাঁর কাব্যের বিশদ সমালোচনা—তখন থেকেই মধুসূদনের লেখায় অবয়ববাদী রীতির প্রয়োগের সূচনা।

২০. নাট্যকার মধুসূদন। ১৯৬২। গ্রন্থনিলয়।

মধুসূদনের নাটকগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার এই প্রথম বই।

২১. কবি মধুসূদন এবং তাঁর পত্রাবলী। ১৯৬৩। গ্রন্থনিলয়।

কবির চিঠিপত্রের এই সটীক সংস্করণটি কবিকে এবং কাব্যকে বুঝবার এক মহামূল্য উপাদান।

২২. মধুবিচিত্রা। ১৯৬৩। এ কে ভৌমিক।

কবির গৌণ রচনা, অসম্পূর্ণ রচনা—এতবড় এক কবিকে পুরো জানতে এগুলিরও প্রয়োজন আছে।

২৩. মধুসূদন রচনাবলী [ইংরেজি সহ সম্পূর্ণ]। ১৯৬৩। সাহিত্য সংসদ।

এখনো সেরা রচনাবলী রূপে স্বীকৃত।

বিষয় : বঙ্কিম

২৪. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্পরীতি। ১৯৭৪। গ্রন্থনিলয়।

বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন, বাচনরীতি, বিবিধ উপাদানের ব্যবহার, চরিত্র-গঠন পদ্ধতি। অতীত ইতিহাসকে বর্তমানের সঙ্গে মেলাবার কলাকৌশল।

২৫. বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্র। ১৯৮১। গ্রন্থগৃহ।

সংকলন, সটীক শিল্পীর চিত্তগহণে প্রবেশের চেষ্টা।

২৬. বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৮১।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিষয়ক কয়েকটি পর্যবেক্ষণ।

২৭. বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক মন। পুস্তক বিপণি। ১৯৯০।

বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখানো বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির কয়েকটি দিক। পরিকল্পনা ও সম্পাদনা — ক্ষেত্র গুপ্ত।

২৮. বঙ্কিমী রঙ্গ-ব্যঙ্গ। গ্রন্থগৃহ। ১৯৯০।

বঙ্কিমের কৌতুক দৃষ্টি ও কৌতুকসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখানো প্রবন্ধের সংকলন। পরিকল্পনা ও সম্পাদনা—ক্ষেত্র গুপ্ত।

২৯. পুনশ্চ বঙ্কিম। ১৯৯০। সাহিত্য প্রকাশ।

বঙ্কিমের উপন্যাস এবং প্রবন্ধ নিয়ে লেখকের কিছু নতুন ভাবনা যা ওঁর আগের বইগুলিতে নেই।

বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথ

৩০. রবীন্দ্রগল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ। ১৯৮৩। গ্রন্থনিলয়।

প্রতিটি গল্পের মূল্যায়ন—তার মধ্য দিয়ে গল্পকারের সঙ্গে নতুন করে চেনাজানা। রবীন্দ্র-গল্পের এবং গল্পকার রবীন্দ্রের একটা নতুন না-জানা অন্য পরিচয় উদঘাটন। চিত্রী রবীন্দ্রের সঙ্গে গল্পকার রবীন্দ্রের সম্পর্ক।

৩১. রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব। ১৯৮৬। সাহিত্য-প্রকাশ।

১. সমাজ পটভূমির সঙ্গে সাহিত্যিকের সম্পর্ক, ২. সাহিত্যে সমাজ-সমস্যাদির প্রতিফলন। এই দুই দিক দিয়েই সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক দেখা হয়ে থাকে। এ বইয়ে একটু উল্টোভাবে দেখা গল্পের জানালা দিয়ে সমাজের মধ্যে ঢুকতে চেয়েছেন তিনি। ফলে কবির সমাজবোধও এখানে নৈর্ব্যক্তিক না হয়ে হয়েছে ব্যক্তিগত।

৩২. । Structures & Variations : Tagore's Novels। ১৯৯১। পুঁথি।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কাঠামো আর শিল্পরীতি নিয়ে লেখা ইংরেজি গ্রন্থ।

৩৩. রবীন্দ্রনাথ : মধ্যযুগের বাংলা। ১৯৯০। পুঁথি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কবির যাবতীয় রচনার, এমনকি ছোটখাটো মন্তব্যের পূর্ণাঙ্গ সংকলন। টীকা-ভাষ্য সহ।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঃ বাংলা লোকসংস্কৃতি। ১৯৯২। সাহিত্য প্রকাশ।

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে কবির যাবতীয় রচনার, এমন কি ছোটোখাটো মন্তব্যের পূর্ণাঙ্গ সংকলন। বিস্তৃত টীকা-ভাষ্য সহ।

৩৫. রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ শব্দের মন্ত্র। ২০০৬। গ্রন্থনিলয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার কাব্যমূল্যের বিচার ও মূল্যায়ন—কবিতা হিসেবে পাঠ।

৩৬. রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প। ২০০৬। সাহিত্য প্রকাশ।

ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লেখা ১০০টি গল্পের ভাণ্ডার আছে কবির। সেগুলির মূল্যায়ন। তৎসহ 'খাপছাড়া' এবং 'কণিকা' কাব্য দুটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

৩৭. ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। ১৯৮৬। বাংলাদেশ প্রকাশনা।

বিষয় ঃ রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতা

৩৮. কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার। গ্রন্থনিলয়। ১৯৫১।

৩৯. সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার। গ্রন্থনিলয়। ১৯৬১।

৪০. নজরুলের কবি-ব্যক্তিত্ব ঃ শব্দ ও বাক্যবন্ধের পরিপ্রেক্ষিত। ১৯৯২। নজরুল ইনসটিটিউট।

০০. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র। ২০০১। ভারবি

বাংলাদেশে প্রদত্ত তিনটি ভাষণের সংকলন।

৪১. নজরুলের কবিতা ঃ অসংযমের শিল্প। ১৯৯৪। সাহিত্য প্রকাশ।

৪২. জীবনানন্দের কবিতার শরীর। ঐ।

বিষয় ঃ সত্যজিৎ

৪৩. সত্যজিতের সাহিত্য। ১৯৯২। পুঁথি।

৪৪. সত্যজিতের গল্প। ২০০২। সাহিত্য প্রকাশ।

'সত্যজিতের সাহিত্য' দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন নাম। দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু সংযোজন, পরিবর্তন আছে।

৪৫. সত্যজিতের চিত্রনাট্য। সাহিত্য প্রকাশ। ২০০৩। BFJ পুরস্কার প্রাপ্ত।

বিষয় ঃ সংযোগ সমস্যা

৪৬. বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা। ১৯৮৩।

কালচারাল কমিউনিকেশন বিষয়ে কয়েকজন মননশীল ব্যক্তিকে দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে সংকলনটি বের করা হয়। পরিকল্পনা ও সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪৭. সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি। ১৯৯২।

৪৮. উচ্চশিক্ষায় সংযোগ সমস্যা। পুঁথি। ১৯৯৪।

বিষয় ঃ লোকসংস্কৃতি

৪৯. লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব। সাহিত্য প্রকাশ। ২০০১।

৫০. বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি। সাহিত্য প্রকাশ। ২০০০।

৫১. Folklore : A Modern Challenge। সাহিত্য প্রকাশ।

বিষয় ঃ বিশ্বসাহিত্য

৫২-৭৬. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্প। ২৫ খণ্ড। গ্রন্থনিলয়। ১৯৭৮-২০০৭। শেষ খণ্ডটি ছাপা হচ্ছে।

এগুলি গল্পের সংক্ষেপীকরণ বা ভাষান্তর নয়। খাঁটি অনুবাদ এবং হুবহু অনুবাদের চেষ্টা। একটি বিচক্ষণ গোষ্ঠী এই ২৫ খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রধান সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত।

৭৭-৮৮. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর কাহিনী। ১২ খণ্ড। গ্রন্থনিলয়। শেষ খণ্ডটি প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রধান সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত।

৮৯. ১২ খণ্ডের একটি রহস্য-গল্পের সিরিজেরও [গ্রন্থনিলয় প্রকাশিত] উপদেষ্টা। ১২ নং বইটি ছাপা হচ্ছে।

বিষয় ঃ বাংলাদেশ

৯০. বাংলাদেশ ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি। গ্রন্থনিলয়। ২০০৬।

অনেক বাঙালির প্রিয় হলেও এ বিষয়ে মৌলিক আলোচনার অভাব। এ বইখানি সেই অভাব কিছুটা মেটাবে।

বিষয় ঃ রাজনীতি

৯১. ১৯৪৭। মৈনুদ্দিন। ১৯৮৯। সোনার বাংলা প্রকাশন।

মৈনুদ্দিন ছদ্মনামে রচিত। আত্মজৈবনিক, রাজনৈতিক স্মৃতিকথা। দেশভাগের আগে-পরে দশ

দিনে বাঙালির বিপর্যস্ত অস্তিত্বের, আবেগ ও মননের রক্তক্ষরণ। ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের পথে।

৯২. বাঙালের বঙ্গবিজয়। মৈনুদ্দিন। ১৯৯২। সোনার বাংলা প্রকাশন।

পূর্ববর্তী বইয়ের অনুক্রম। দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় চলে আসা উদ্বাস্তু বাঙালির উত্থান-পতনের কাহিনী।

৯৩. সাবধান তালিবান। মৈনুদ্দিন। ২০০২। গ্রন্থনিলয়।

২১ শতকের শুরুতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব। সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের [তালিবান থেকে আলকায়দা] গ্রসারি।

বিষয় ঃ টেক্সট-সম্পাদনা

সহিত্যের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কিছু ক্লাসিকের সম্পাদনা

৯৪. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'।

৯৫. দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'।

৯৬. গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌল্লা'।

৯৭. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'।

৯৮. বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ'।

৯৯. রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'।

১০০. রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'।

১০১. 'নারী বিদ্রোহিনী' রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প।

১০২. শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'।

১০৩. বাংলা উপন্যাসের আলোচনা।

১০৪. বাংলা নাটকের আলোচনা।

১০৫. শ্রীচৈতন্য ঃ একালের দৃষ্টিকোণ। ১৯৯০। রায় কোম্পানী।

কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। পরিকল্পনা এবং সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত।

১০৬. বঙ্গীয় নাট্যশালা [ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় রচিত] ১৯৯৯। জাতীয় প্রকাশন।

সটীক সম্পাদনা। গিরিশ যুগের থিয়েটার নিয়ে নির্ভরযোগ্য বই।

১০৭. বাংলা রঙ্গমঞ্চ-প্রথম যুগ। সাহিত্যসঙ্গী। ২০০৭।

১০৮. রমণীয় শরবিন্দু। ১৯৯০। গ্রন্থনিলয়।

বিষয় ঃ সম্পাদিত পত্রপত্রিকা

১. ফতোয়া। ১৯৫০। সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত।

সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা। একসংখ্যা মাত্র বেরোয়। কিন্তু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়ন তোলে।

২. ছাড়পত্র। ১৯৫২। সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত।

কমিউনিস্টপন্থী ভাবনা প্রচার এর লক্ষ্য ছিল।

৩. লোকসংস্কৃতি গবেষণা। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক। ১৯৮৮ থেকে ১৯ বছর ধরে ত্রৈমাসিক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

৪. ফোকলোর জার্নাল। ১৯৯৫ থেকে ইংরেজি। প্রধান সম্পাদক।

অর্ধবার্ষিকী গবেষণামূলক পত্রিকা

৫. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা [ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা]। নবপর্যায় ১৯৯৪। সম্পাদক। ৩ সংখ্যা।

৬. রবীন্দ্রভারতী বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা। [বার্ষিক]।

সভাপতি মণ্ডলীর সভাপতি, ৪ বার, ১৯৮৩-১৯৯০।

সভাপতিমণ্ডলীর সভ্য, ৭ বার। ১৯৭৮-৮২, ১৯৯১-৯২'

৭. ইংরেজি রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। বার্ষিকী ১৯৯৫। সম্পাদক।

